তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৭১

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস. এম. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

উপন্যাস

আগুন ১

মন্বন্তর ৯৯

নিশিপদ্ম ২৯১

গল্প

ছলনাময়ী ৩৮৯

রাধারাণী ৪০৩

আগুন

উৎসর্গ

পিতৃদেবতার চরণোদ্দেশে

লাভপুর, বীরভূম
মহালয়া, ১৩৪৪

এক

সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথের কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। কত কথা মনে হইতেছে! দীর্ঘ এত দিনের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে কয়টি পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ গভীর রাত্রির মধ্যগগনচারী কালপুরুষ নক্ষত্রের মত দীপ্তিতে পরিধিতে প্রদীপ্ত ও প্রধান হইয়া আছে। কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। ঐ নক্ষত্রটির খড়্গধারী ভীমকায় আকৃতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের আকৃতির যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এমনই দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার এ উন্মত্ত যাত্রা তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—হীরুকে।

চন্দ্রনাথ, হীরু, আমি সহপাঠী। আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবুকে। কেমন করিয়া যে এই তিনজন একই সময়ে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করিব না। আগ্নেয়গিরি গর্ভের মধ্যে কল্পনাতীত বিচিত্র সমাবেশে যত কিছু প্রলয়ঙ্কর দাহ্য বস্তু সমাবিষ্ট হয় কি করিয়া! এও হয়তো সেই বিচিত্র সমাবেশ।

ঘরে কেহ নাই। টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা অকম্পিত প্রদীপ্ত জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। আলোকিত কক্ষের মধ্যে একা বসিয়া চন্দ্রনাথ, হীরু ও নিশানাথকে ভাবিতেছি। সম্মুখেই দেওয়ালে বিলম্বিত বড় আয়নাটির মধ্যে আমারই প্রতিবিম্ব আমার দিকে চিন্তাকুল নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে। অলীক কায়াময় ছায়া, তবু সে আমার এই স্মৃতি-স্মরণে বাধা দিয়া তাহারই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আলোটা নিভাইয়া দিলাম। মুহূর্তে ঘরখানা প্রগাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল।

অতীতের রূপ এই অন্ধকার। আলোকিত যে দিবসটি অবসান হইয়া তমসা-পারাবারের মধ্যে ডুব দিল, আর সে তো আলোকিত প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেরে না। তাই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতেছি। সে দেখা দিল। অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কিশোর চন্দ্রনাথ। দীর্ঘাকৃতি সবল সুস্থদেহ নির্ভীকদৃষ্টি কিশোর। অসাধারণ তাহার মুখাকৃতি; প্রথমেই চোখে পড়ে চন্দ্রনাথের অদ্ভুত মোটা নাক; সামান্য মাত্র চাঞ্চল্যেই নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া ওঠে। বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল, আর সেই কপালে ঠিক মধ্যস্থলে শিরায় রচিত এক ত্রিশূল-চিহ্ন। এই কিশোর বয়সেও চন্দ্রনাথের ললাটে শিরার চিহ্ন দেখা যায়। সামান্য উত্তেজনায় রক্তের চাপ ঈষৎ প্রবল হইলেই নাকের ঠিক উপরেই মধ্য-ললাটের ওই ত্রিশূল-চিহ্ন মোটা হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মহাশয়কে মনে পড়িতেছে। শীর্ণ দীর্ঘকায় শান্তপ্রকৃতির মানুষটি —ওই যে বোর্ডিঙের ফটকের সম্মুখেই চেয়ার-বেঞ্চের আসর পাতিয়া বসিয়া আছেন। হুঁকাটি হাতে ধরাই আছে। চিন্তাকুল বিমর্ষ নেত্রে আমাকে বলিলেন—নরু, তুমি একবার জেনে এস তো চন্দ্রনাথ কি বলে!

দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাইজ

ডিস্ট্রিবিউশনের সময়; চন্দ্রনাথ প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র দিয়াছে। সেকেণ্ড প্রাইজ সে গ্রহণ করিতে চায় না। সে আজ পর্যন্ত কখনও সেকেণ্ড হয় নাই। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না। যদিও তখন আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, স্কুলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তবুও ওই স্নেহময় মানুষটিকে লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। স্মৃতি স্মরণ করিতে বসিয়া এই অতীত মুহূর্ত বর্তমান হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা আজও প্রত্যক্ষ বর্তমানে, দীর্ঘ কত বৎসর পরেও, মাস্টার মহাশয় এক এক-দিন স্বপ্নে আসিয়া পড়া ধরেন, মৃদু তিরস্কার করেন, আমি ভয় পাই। আবার কত দিন হাসিমুখে প্রসন্ন উৎসাহে আশীর্বাদ করিয়া যান, মনে বল পাই। যাক, প্রত্যক্ষ বর্তমানকে ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যেই রাখিয়া দিতে হইবে, মন মন্থন করিয়া অতীত বর্তমান হইয়া এই পরম নির্জন অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠুক।

চন্দ্রনাথের কাছেই গেলাম। দারিদ্র্য-জীর্ণ স্বল্পালোকিত চন্দ্রনাথের ঘরখানার মধ্যে চন্দ্রনাথ বসিয়া আপন মনে কি লিখিতেছিল। তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে লিখিতেই থাকিল, কোন অভ্যর্থনা করিল না; সে তাহার স্বভাব নয়। আমি নিজেই বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি লিখছিস?

লিখিতে-লিখিতেই চন্দ্রনাথ উত্তর দিল, ইউনিভারসিটি একজামিনের রেজাল্ট তৈরি করছি। কে কত নম্বর পাবে তাই দেখছি।

তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ আরও খানিকটা লিখিয়া কাগজখানা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখ।

কাগজটায় চোখ বুলাইতেছিলাম। চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, আমার যদি সাড়ে-পাঁচ-শো কি তার বেশি ওঠে, তবে স্কুলের এই রেজাল্ট হবে—মানে দুটো ফেল, অমিয় আর শ্যামা; তা ছাড়া সব পাস হবে। আর আমার যদি পাঁচ-শো-পঁচিশের নীচে হয়, তবে দশটা ফেল; তুই তা হ'লে থার্ড ডিভিশনে যাবি।

বেশ মনে পড়িতেছে, তাহার কথা শুনিয়া রাগ হইয়াছিল। এই দাম্ভিকটা যেন ফেল হয় —এ কামনাও বোধ হয় করিয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, তুই বোধ হয় রাগ করছিস? কিন্তু অনুপাতের আঙ্কিক নিয়মে যার মূল্য যতবার ক'ষে দেখবে, একই হবে। একের মূল্য কমে, সকলের মূল্য কমবে। দিস ইজ ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স।

আমি এইবার কথাটা পাড়িব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু সে হইল না। চন্দ্রনাথের দাদা একখানা পত্র হাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথের হাতে পত্রখানা দিয়া বলিলেন, এ কি!

পত্রখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে বলিল, আমি সেকেণ্ড প্রাইজ রিফিউজ করেছি।

কারণ?

কারণ? চন্দ্রনাথের নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া উঠিল, ললাটে শিরায় রচিত ত্রিশূল-চিহ্ন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল—কারণ, সেকেণ্ড প্রাইজ নেওয়া আমি বিনীথ মাই ডিগ্‌নিটি ব'লে মনে করি।

চন্দ্রনাথের দাদা ক্ষোভে যেন কাঁপিতেছিলেন, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, কথাটা বলতে তোমার লজ্জায় বাধল না? ডিগ্‌নিটি! একে তুমি ডিগ্‌নিটি বল? তোমার

অক্ষমতার অপরাধ!

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, তুমি জান না দাদা।

কি জানি না? জানবার এতে আছে কি?

স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো ফার্স্ট হয়েছে, সে আমারই সাহায্যে হয়েছে। আর ওর যে প্রাইভেট মাস্টার—স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার—তিনি, কি বলব, প্রশ্নপত্র ছাত্রটির কাছে গোপন রাখেননি। তারও ওপর উত্তর বিচারের সময় ইচ্ছাকৃত ভুলও করেছেন তিনি এবং আরও দু'একজন।

চন্দ্রনাথের দাদার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। ভদ্রলোক নির্বিরোধী শান্তপ্রকৃতির মানুষ। তিনি অবাক হইয়া চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রনাথ বলিল, অঙ্কের পরীক্ষার দিন সে আমায় মিনতি করলে, আমি তাকে তিনটে অঙ্ক আমার খাতা থেকে টুকতে দিলাম। মাস্টার পূর্বে ব'লে দেওয়া সত্ত্বেও সে সময় তার মনে ছিল না। আর বাংলা বা ইংরেজীতে যে সে ফার্স্ট হয়েছে—সে তো বললাম, ক'জন মাস্টারের ইংরেজীতে ইচ্ছাকৃত ভুল, কিংবা তাঁদের অক্ষমতা, ভাল মন্দ বিচার করতে পারেননি তাঁরা।

চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তার মানে, তুমি বলতে চাও যে, মাস্টারদের চেয়েও বাংলা ইংরেজীতে তুমি বড় পণ্ডিত, তোমাকে তাঁরা বুঝতে পারেননি?

চন্দ্রনাথ বলিল, সম্ভবত। আরও একটা কথা শোন, আমি এখানে কারও পেছনে প'ড়ে থাকতে পারি না। ওই ধনীর দুলালটির স্থান যোগ্যতা-হিসাবে আমার চেয়ে নীচে।

চন্দ্রনাথের দাদা গম্ভীর এবং ধীর কণ্ঠস্বরে বলিলেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফল নেই। তুমি ঐ পত্র প্রত্যাহার ক'রে ক্ষমা চেয়ে হেডমাস্টার মহাশয়কে পত্র লেখ, বুঝলে?

চন্দ্রনাথ বলিল, না।

কঠোরতর-স্বরে চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমায় করতে হবে।

না।

না? চন্দ্রনাথের দাদা যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন এবার।

না।

করবে না?—ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর এবার কাঁপিতেছিল।

না।

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমার বউদি বলত, আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তুমি এতদূর স্বাধীন হয়েছ? ভাল, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব রইল না। আজ থেকে আমরা পৃথক।

অবিচলিত কণ্ঠস্বরে চন্দ্রনাথ বলিল, বেশ।

চন্দ্রনাথের দাদা নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি নিশ্চয়ই এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ এমন সংযত নিরুচ্ছ্বসিত কণ্ঠের উত্তর। আমি বেশ বুঝিলাম, ভদ্রলোক আত্মসম্বরণের জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, চোখের দৃষ্টিতে বেদনা ও ক্রোধের সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এমন বুকে দাগ কাটা দৃষ্টি আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এক মুহূর্তেও যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দাদা মুখ তুলিয়া সম্মুখের জানালার ভিতর দিয়া আখড়ার তমালগাছটার দিকে চাহিলেন। কাকের কোলাহল চলিয়াছে সেখানে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। আজও এই অন্ধকারের মধ্যে আমি চোখ মুদিলাম।

চিত্ত ক্রমশ ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রনাথের দাদা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমিও উঠিবার জন্ত সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, বলিলাম, আমি যাই চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ অপরিবর্তিত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলিল, আচ্ছা।

চন্দ্রনাথের ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া নিশানাথবাবুর সন্ধানে চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। নিশানাথবাবুর স্ত্রী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া রান্না করিতে করিতে আপন মনেই বকিতেছিলেন, ধন্য মানুষ বাবা, এমন সাধু-মহাত্মার চরণে প্রণাম। রাগ হ'ল তো জপে বসলেন, দুঃখ হ'ল তো জপে বসলেন, কোন একটা সুখের খবর এল তো জপে বসলেন! এসব মানুষের ঘরসংসার করতে নেই, বনে গিয়ে তপস্যাই করতে হয় মুনি-ঋষির মতো।

বুঝিলাম নিশানাথবাবু জপে বসিয়াছেন। নিশানাথ ঐ এক বিচিত্র ধারার মানুষ। ধর্মে অপরিসীম নিষ্ঠা, ক্রোধ দুঃখ এমন কি কোন আনন্দের অনুভূতি প্রবল হইলেও নিশানাথ তাঁহার ঠাকুর-ঘরে গিয়া জপে বসেন।

মনে-মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

বোর্ডিঙে আসিয়া মাস্টার মহাশয়কে সংবাদটা দিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সেই তেমনই একা চিন্তাকুল নেত্রে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, কি হ'ল নরু, সে কি বললে?

তাঁহাকে অকপটেই সমস্ত বলিলাম। তিনি হুঁকাটি হাতে ধরিয়াই নীরবে বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ ডাকিলেন, কেষ্ট, কেষ্ট!

কেষ্ট বোর্ডিঙের চাকর। কেষ্ট আসিয়া দাঁড়াইল, মাস্টার মহাশয় বলিলেন, আর একবার তামাক দাও তো।

এই তো এখুনি দিলাম।—বলিয়া কেষ্ট কল্কেটা লইয়া ফু দিতে আরম্ভ করিল। তামাকের সুগন্ধে স্থানটা ভরিয়া উঠিল। বৃদ্ধের ধূমপানে বিলাস ছিল। কেষ্ট আবার হুঁকাটি তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাস্টার মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, আমি একবার যাব নরেশ? কি বল তুমি? চন্দ্রনাথের কাছে? না না, পৃথক হবে কেন? নাঃ, ছি!

আমি বলিলাম, না স্যার, আপনি যাবেন না। যদি কথা না শোনে?

শুনবে না, আমার কথা শুনবে না? মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি উত্তর দিলাম না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মাস্টার মহাশয় বলিলেন, আমারই অন্যায় হ'ল চন্দ্রনাথের দাদাকে না জানালেই হ'ত। না, ছি ছি ছি!

আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আবার ডাকিলেন, তুমি বলছ নরেশ, আমার যাওয়া ঠিক হবে না, চন্দ্রনাথ আমার কথা শুনবে না?

আমি নীরবেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

দিন দুই পর শুনিলাম চন্দ্রনাথ সত্যই দাদার সহিত পৃথক হইয়াছে। চন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিলাম, সে বলিল, পৃথক মানে কি? সম্পত্তি তো কিছুই ছিল না, মাত্র বাড়িখানা আর বিঘে কয় জমি, কিছু বাসন। সে ভাগ হয়ে গেল। আমাকে তো এইবার নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হ'ত, এ ভালই হ'ল।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বোধ হয় সেদিন সে সময়ে ভাবিয়াছিলাম, চন্দ্রনাথের সহিত

সংস্রব রাখিব না। মনে মনে সংকল্পটা দৃঢ় করিতেছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, হীরু এসেছিল আজ আমার কাছে। বলে, কাকা বলছেন তোমাকে তিনি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেবেন।

হীরুই সেবার ফার্স্ট হইয়াছিল—আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কি বললি তুই?

চন্দ্রনাথ বলিল, তার কাকাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠালাম, আর ব'লে দিলাম, একান্ত দুঃখিত আমি, সে গ্রহণ করতে আমি পারি না। এই প্রস্তাবই আমার পক্ষে অপমানজনক।

চন্দ্রনাথের মুখের দিকেই চাহিয়াছিলাম। সে আবার বলিল, হেডমাস্টার মশায়ও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকেও উত্তর দিয়ে দিলাম, গুরুদক্ষিণার যুগ আর নেই। স্কুলের সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার মিটে আছে, দু'তিন মাসের মাইনে বাড়তি দিয়ে এসেছি আমি। সুতরাং যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার।

সেই মুহূর্তে উঠিয়া আসিলাম।

দুই

ইহার পরই আমি চলিয়া গেলাম মামার বাড়ি। পরীক্ষার খবর বাহির হইলে হীরুর পত্র পাইয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম, চন্দ্রনাথের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। হীরু কলিকাতা হইতে দীর্ঘ পত্রে সমস্ত ফলাফল জানাইয়াছে। দেখিলাম, দশটি ছেলে ফেল হইয়াছে, আমি তৃতীয় বিভাগেই কোনরূপে পাস হইয়া গিয়াছি, চন্দ্রনাথও পাঁচ-শো-পঁচিশ পায় নাই। কিন্তু একটি শুধু মেলে নাই—হীরু চন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। হীরু লিখিয়াছে, সে স্কলারশিপ্ পাইবে। মনে মনে দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না, সত্য বলিতে কি, চন্দ্রনাথ ও হীরুতে অনেক প্রভেদ! চন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বে আমার অন্তত সন্দেহ ছিল না। অপরাহ্ণে পাঁচটার ট্রেনে মামার বাড়ি হইতে ফিরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হীরুর বাড়িতে প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। হীরু স্কলারশিপ পাইবে, তাহারই প্রীতি-ভোজ।

আমি কিন্তু প্রথমেই গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ি। নির্জন বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, শয়নঘরখানারও দুয়ার বন্ধ, কড়ায় একটা অতি সামান্য দামের তালা ঝুলিতেছে।

অল্পদিন-পূর্বে-অর্ধবিভক্ত বাড়িখানার মধ্যের প্রাচীরের ওপাশে নিশানাথবাবুর ছেলেমেয়েরা কাঁদিতেছে। কে যেন কিছু একটা কঠিন বস্তু দিয়া কোন ধাতুপাত্রে ঘর্ষণ করিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘুরিয়া নিশানাথবাবুর বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। নিশানাথবাবুর স্ত্রী একখানা ঝামা ইঁট একটা পোড়া কড়াইয়ের উপর সজোরে ঘষিতেছিলেন। আমি গিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, এস ভাই, নরু ঠাকুরপো এস। বন্ধুটি চ'লে গেল, তোমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হয়নি?

সবিস্ময়ে বলিলাম, চ'লে গেল! কে? চন্দ্রনাথ? কোথায়?

বউদিদি বলিলেন, কি জানি ভাই, তার অর্ধেক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না। তবে তার জমি-ঘর-বাসনপত্র সব বেচে ফেলে এখান থেকে আজই দুপুরে চ'লে গেল। কি

সব বললে—আহা, কথাটি বেশ! হ্যাঁ—বিশাল সংসার—নিজেকে প্রতিষ্ঠা—; দাঁড়াও হ্যাঁ—তারই মণিমন্দির গড়তে হবে। তার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর বরং, সব শুনতে পাবে।—বলিয়া কড়ার উপর ঝামাটা আবার সজোরে ঘষিতে আরম্ভ করিলেন।

আবার ঝামা ঘষা বন্ধ করিয়া বলিলেন, আমার অদৃষ্টের কথা ব'ল না ভাই, এ অদৃষ্ট যেন বিধাতাপুরুষ নিরালায় ব'সে গড়েছিলেন। চন্দ্রনাথ যদি চ'লে গেল তো ইনি সেই যে জপে বসলেন ওবেলায়, এবেলা পর্যন্ত এখনও উঠলেন না।

নিশানাথবাবু জপে বসিয়াছেন! একবার ইচ্ছা হইল, তাঁহার ধ্যানমগ্ন মূর্তিখানি দেখি। দিব্যচক্ষু থাকিলে দেখিতাম, তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে কে—ঈশ্বর, না চন্দ্রনাথ!

বউদিদি বলিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, বলিলেন—নরু, আমাদের বউ-জাতটারই এই অদৃষ্ট, বুঝেছ! দেবর যেন আমাদের চক্ষুশূল ছাড়া, আর কিছু হয় না। দেবর দেশত্যাগী হ'লে বউদিদির যেন আনন্দ হতেই হবে।

চন্দ্রনাথের বউদি চন্দ্রনাথকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, কিন্তু তাঁহার সেদিনের বেদনা কৃত্রিম নয়, আমার মনকে সে বেদনা স্পর্শ করিয়াছিল।

সন্ধ্যায় হীরুর বাড়ি গেলাম। উৎসবের বিপুল সমারোহ সেখানে। হীরু ধনীর সন্তান, অর্থের অভাব নাই; চীনা লণ্ঠন ও রঙিন কাগজের মালার নিপুণ বিন্যাসে তাহাদের বাড়ির পাশের আম-বাগানটার সে শোভা আজও আমার মনে আছে। হীরুর কাকা সৌখিন ধনীসন্তান বলিয়া জেলার মধ্যে খ্যাতি ছিল, তিনি নিজে সেদিন বাগানটাকে সাজাইয়াছিলেন। বিশিষ্ট অতিথিও অনেক ছিলেন, জনদুয়েক ডেপুটি, ডি. এস. পি. স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার, থানার দারোগা, তাহা ছাড়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোকজন সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন।

হীরুকে স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, লাবণ্যময় দেহ, আয়ত কোমল চোখে মোহময় দৃষ্টি। হীরুর কথা মনে করিয়া আকাশের দিকে চাহিলে, মনে পড়ে শুকতারা। অমনই প্রদীপ্ত, কিন্তু সে দীপ্তি কোমল স্নিগ্ধ।

হীরু পরম সমাদর করিয়া আমাকে বসাইল। নানা কথার মধ্যে সে বলিল, কাকা বলছিলেন, এখন থেকে আই. সি. এস.-এর জন্যে তৈরী হও। বিলেতে যেতে হবে আমাকে। বিলেতে যাবার আমার বড় সাধ, নরু।

আমার কিন্তু বারবার মনে পড়িতেছিল চন্দ্রনাথকে। কিন্তু সেদিন সেখানে তাহার কথা আমি তুলিতে পারি নাই। হীরুই বলিল, আজই দুপুরে সে চ'লে গেল। আমি তার আগেই তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, তবুও সে চ'লে গেল! একটা দিন থেকে গেলে কি হ'ত?

চকিতে একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম, চন্দ্রনাথের দাদাকেও তো কই দেখছি না, তিনি—তাঁকে কি—

প্রশ্নটা যে কি, সে হীরু বুঝিয়াছিল। সে বুদ্ধিমান ছেলে, বলিল, বলা নিশ্চয়ই হয়েছে তাঁকে। গ্রামের প্রত্যেক লোকের নাম ধ'রে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তিনি আসেননি। কাল কাঙালী—মানে আমাদের গ্রামের কাঙালীদের খাওয়ান হবে কিম্বা একখানা ক'রে কাপড় দেওয়া হবে।

আমি ভাবিতেছিলাম চন্দ্রনাথের দাদার কথা। চন্দ্রনাথের আচরণের লজ্জাই কি আজ তাঁহাকে আসিতে দেয় নাই, না চন্দ্রনাথের ব্যর্থতার বেদনা তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাকে

পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে? এখনও কি তিনি জপে নিযুক্ত?

হীরু বলিল, মাস্টার মশায়—মাস্টার মশায়।

সচেতন হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, শীর্ণকায় দীর্ঘাকার মানুষটি এণ্ডির চাদরখানি গায়ে দিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হাসিয়া মাস্টার মহাশয় বলিলেন, আজই এলে নরেশ?

মাস্টার মহাশয়ের ওইটুকু এক বিশেষত্ব, ছাত্র তাঁহার অধিকারের গণ্ডি পার হইলেই সে আর 'তুই' নয়, তখন সে 'তুমি' হইয়া যায় তাঁহার কাছে।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি পড়বে নিশ্চয় নরেশ। কিন্তু সাহিত্য-চর্চাটা পড়ার সময় একটু কম ক'র বাবা। তবে ছেড়ো না, ও একটা বড় জিনিস। জেনো, Shame in crowd but solitary pride হওয়াই উচিত ও বস্তু।

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। হীরু বলিল, নরুর লেখা যে কাগজে বেরিয়েছে এবার স্যার।

হ্যাঁ? বেশ, বেশ। আমাকে লেখাটা দেখাবে তো নরেশ, পড়ব আমি।

তারপর আমাকে প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্রনাথ কোথায় গেল, কাউকে ব'লে গেল না? তোমাকেও কি কিছু জানিয়ে যায়নি—পত্র-টত্র লিখে?

বলিলাম, না স্যার, কাউকেই সে কিছু জানিয়ে যায়নি।

লাঠির উপর ভর দিয়া মাস্টার মহাশয় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি যেন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। আমরাও নীরব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাস্টার মহাশয় নীরবেই চলিয়া গেলেন, আমরা আবার বসিলাম।

হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। দেখবি?

চিঠিখানা দেখিলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয়বরেষু, (প্রিয়বরেষু কাটিয়া লিখিয়াছে) প্রীতিভাজনেষু,

> আজই আমার যাত্রার দিন, সুতরাং থাকিবার উপায় নাই, আমাকে মার্জনা করিও। তোমার সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু একটা কথা বারবার মনে হইতেছে, এ উৎসবটা না করিলেই পারিতে। স্কলারশিপটা কি এমন বড় জিনিস! ভালবাসা জানিবে। ইতি—
>
> চন্দ্রনাথ

চিঠিখানা হীরুকে ফিরাইয়া দিলাম। হীরু বলিল, চিঠিখানা রেখে দিলাম আমি। থাক, এইটেই আমার কাছে তার স্মৃতি-চিহ্ন।

সে আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোথায় গেল সে? করবেই বা কি?

সে যেন নিজেও এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিতেছিল!

উত্তর দিয়াছিলাম, জানি না।

কিন্তু কল্পনা করিয়াছিলাম, কিশোর চন্দ্রনাথ কাঁধে লাঠির প্রান্তে পোঁটলা বাঁধিয়া সেই রাত্রেই জনহীন পথে একা চলিয়াছে। দুই পাশে ধীর মন্থর গতিতে প্রান্তর যেন পিছনের দিকে চলিয়াছে, মাথার উপরে গভীর নীল আকাশে ছায়াপথ, পার্শ্বে কালপুরুষ নক্ষত্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

* * *

অকস্মাৎ চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। মনোমধ্যের প্রিয়জন সব—যাহারা এই নির্জন

অন্ধকার ছায়াপথে কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা মনোকন্দরে গিয়া লুকাইয়া বসিল।

চাকরটা দুয়ারে আঘাত করিয়া ডাকিতেছিল, বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে। মা ডাকছেন।

বিরক্তিভরে বলিলাম, নাঃ, খাব না আজ! বিরক্ত করিস নি আর।

ক্রমে আমার কণ্ঠধ্বনি অন্ধকারের তরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া গেল। ঘরের নির্জনতা আবার প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রী আসিয়া দুয়ারে আঘাত করিয়া বলিলেন, আজ কি সমস্ত রাত্রি কাজ করবে নাকি? তা না-হয় কর, কিন্তু খাবে না কেন?

উঠিয়া গিয়া বলিলাম, আজ আমায় মাফ কর।

তিনি বলিলেন, ধন্য মানুষ তুমি! খেলেও কি—

হাতজোড় করিয়া মার্জনা চাহিলাম, তিনি বোধ হয় অভিমান করিয়াই চলিয়া গেলেন। সেদিকে মনোযোগ দিবার প্রবৃত্তি ছিল না। ফিরিয়া আসিয়া ছিন্ন চিন্তার সূত্র আবার জোড়া দিতে বসিলাম।

হাঁ, হীরুদের বাগানে বসিয়া চন্দ্রনাথের কথা কল্পনা করিতেছিলাম। সে কল্পনা আমার অলীক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনায় আর বাস্তব সত্যে আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যেন বিধাতার খাতার মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়। আমার মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি সেদিন এই অধিকারই পাইয়াছিল। এই দিনটির বারো বৎসর পর একদিন চন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিল, সে রাত্রে আমি বিশ্রাম করিনি, সমস্ত রাত্রি হেঁটে চলেছিলাম। অন্ধকারের গাঢ়তা আমার দৃষ্টিশক্তির কাছে লঘু হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত কিছু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। দু-ধারের প্রান্তর পেছনের দিকে চলছিল। অন্ধকার রাত্রি, অজানা পথ। মনে কিন্তু একবিন্দু ভয় ছিল না, দেহে ক্লান্তি অনুভব করিনি। সেদিনের মত মনের গতি একদিনও আর আমি অনুভব করলাম না, নরু। সে অন্ধকারের মধ্যে ঠিক যেন চোখের সামনে ভবিষ্যৎ আমাকে আহ্বান ক'রে নিয়ে চলেছিল।

যাক্, স্মৃতির সুরবিন্যাস ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

তিন

আবার সব মনে পড়িতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই নিশানাথবাবুর ওখানে গেলাম। কৌতূহলকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার মর্মলোকের বেদনা আমাকে সেদিন স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। নতুবা সঙ্কোচ আমার গতি রুদ্ধ করিত। অসঙ্কোচেই গিয়াছিলাম। নিশানাথবাবুর তখন স্নান এবং পূজা-উপাসনা শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রসন্ন হাসিমুখেই আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এস, নরু এস। কাল তুমি এসেছিলে শুনলাম।

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সব গোলমাল হইয়া গেল, অকস্মাৎ সঙ্কোচ যেন গুপ্ত শত্রুর মত অতর্কিতে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিল। বার বার শুধু মনে হইল,

কেন আসিলাম, না আসিলেই ছিল ভাল। নিশানাথবাবু নিজেই বলিলেন, চন্দ্রনাথ কালই চ'লে গেল, কোথায় যে গেল তাও ব'লে গেল না। হয়তো সেও ঠিক করতে পারেনি কোথায় যাবে। আর, কোথায় যে তার কর্মস্থল, তা সেই কি জানে! তবু মনটা কাল বড় উতলা হয়ে পড়েছিল ভাই, সমস্ত দিন ভগবানকে ডেকেছি যে, মন আমার শান্ত ক'রে দাও দয়াময়। বহুকষ্টেই মন শান্ত হ'ল, তাই কি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় মন! ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। তারপর আবার বলিলেন, মনের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর নেই। পৃথিবীর নশ্বরতার কথা মানুষের চেয়ে বেশি তো কোন প্রাণী বোঝে না, তবু তার চেয়ে শোকে বিহ্বল আর কোন জীব হয় না। নশ্বর সম্পদ দিয়ে শূন্যে প্রাসাদ রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষেরই সব চেয়ে বেশি। অথচ নশ্বর তুচ্ছ সম্পদ দিয়ে যিনি মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছেন, সেই অবিনশ্বরকে পাবার একটুকু আকাঙ্ক্ষা তার আছে? যুধিষ্ঠিরের 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্' উক্তির চেয়ে সত্য উক্তি আর কেউ কখনও করেনি।

আমার বিরক্তি বোধ হইতেছিল, ধর্মের বক্তৃতা শুনিবার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কেহ ফুল দেখিয়া গাছের মূলের কথা ভাবে না। মানুষ তখন দেখে ফুলের রূপ। অপরূপ যে রহস্যে বৃক্ষসঞ্চারী মৃত্তিকার রস বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুরভিতে রূপকথার মায়াবিনীর মত মনোহারিণী হইয়া ওঠে, সে রহস্যের কথা চিন্তা করিবার তখন তাহার অবসর থাকে না। আমারও তখন সেই বয়স। চন্দ্রনাথের দেশত্যাগের বেদনাই তখন আমার নিকট প্রত্যক্ষ, সে বেদনাটা যে মায়া, এ কথা বুঝিতে তো প্রবৃত্তি ছিলই না, এমন কি শুনিতেও বিরক্তি বোধ হইতেছিল।

আমি কথাটা এড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি তাকে বারণ করলেই ভাল করতেন।

নিশানাথবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভাল করতাম বলছ নরু? কিন্তু—

তিনি নীরব হইয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি নীরবেই রহিলাম। নিশানাথবাবু আবার বলিলেন, না, আমার সে অধিকার ছিল না নরু। মনে কর, ভগবান, যিনি জীবকে সৃষ্টি করেন, তিনিও চেতনা-শক্তিতে জীবকে সচেতন ক'রে দেওয়ার পর আর জীবের ইচ্ছামত কর্মে কখনও নিষেধ করতে আসেন না। আমি চন্দ্রনাথকে সুস্থ সবল যুবায় পরিণত ক'রে দিয়েছি, তাকে যথাসাধ্য শিক্ষালাভে সাহায্য করেছি, এখন তার ইচ্ছামত কাজে বাধা দেবার বা নিষেধ করবার অধিকার আমার তো নেই।

অদ্ভুত মানুষ, পাগল ছাড়া কিছু বলা চলে না। কিন্তু পাগলের পাগলামির মধ্যে পড়িয়া আমি যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম। নিশানাথবাবু নীরব হইতেই আমি উঠিয়া পড়িলাম, বলিলাম, আমি যাচ্ছি তা হ'লে এখন। চন্দ্রনাথের খবর পেলে আমাকে জানাবেন দয়া ক'রে।

তিনি বলিলেন, বেশ।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিশানাথবাবু তখন আপন মনে বেশ স্পষ্টকণ্ঠেই বলিতেছিলেন—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্র।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র॥

চন্দ্রনাথের জন্য বেদনা বোধ করিলাম, মনে মনে বলিলাম, হতভাগ্য চন্দ্রনাথ! বেশ

করিয়াছে সে চলিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথের সহিত যোগসূত্র চন্দ্রনাথই ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার এই সময়েই হীরু ও নিশানাথবাবুর সহিতও আমার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

আমি পড়িতে চলিয়া গেলাম আমার মামার বাড়ির সুবিধায় পাটনায়। হীরু ভর্তি হইল কলিকাতায় প্রেসিডেন্সিতে। নিশানাথবাবু গ্রামেই ধ্রুবনক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ঋষিমণ্ডলের নক্ষত্রের মত আপন দেবতার তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া গেলেন।

তারপর ?

আজ এই নির্জন ক্ষণে জীবনের প্রথম বৃহত্তর জগতের রসাস্বাদনের স্মৃতি মনে জাগিতেছে। কত আশা, কত কামনা! উঃ, সে আশা আকাঙ্ক্ষার আজ পরিমাণ করিতে গিয়া মনে হইতেছে—এত রাশি রাশি কামনা, কল্পনা আমার ক্ষুদ্র এতটুকু বুকের মধ্যে ধরিয়াছিল কেমন করিয়া! এ যে স্তূপীকৃত করিয়া সাজাইলে ধরিত্রীর বক্ষ হইতে আকাশ স্পর্শ করে; ধরণীর বক্ষময় বিস্তীর্ণ করিয়া দিলে ধরিত্রীবক্ষ আবৃত হইয়া যায়! লেখক হইব, কবি হইব! বেশ মনে পড়ে, কিশোর মনের গোপন আকাঙ্ক্ষার নিকট 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' আকাঙ্ক্ষা তখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে মনের আকাঙ্ক্ষা সেদিন 'আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে'। হয়তো লক্ষ বর্ষ পরের পৃথিবীর সৌধ-বাতায়নের পার্শ্বে মুগ্ধ বিভোর একখানি কিশোরীর মুখও কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলাম। আমার কণ্ঠের জয়মাল্য রচনা করিতে পৃথিবীর পুষ্পরাশি নিঃশেষিত হইয়া যাইতেও বোধ হয় দেখিয়াছি।

আজও বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। গোপন করিব না, এ দীর্ঘনিশ্বাস আশা-ভঙ্গের, ব্যর্থতার।

যাক, আজ আর নিজের কথা ভাবিব না, যাহাদের কথা স্মরণ করিতে বসিয়াছি, তাহাদিগকেই স্মরণ করিব। কই, কোথায় চন্দ্রনাথ, কোথায় হীরু, নিশানাথবাবুই বা কই ? স্মৃতির খাতা পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিয়াছি, তাহাদের কাহাকেও পাইতেছি না। পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়াও কাহারও সহিত দেখা হইল না। চন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ, হীরু পূজাতেও বাড়ি আসে নাই, নিশানাথবাবু তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। হীরুর মা মারা গিয়াছেন, তাহার পর হীরু আর বাড়ি আসে নাই। সপ্তমী-পূজার দিন বউদিদি, নিশানাথবাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা হইল। প্রাতঃকাল। আগমনীর ঘট ভরিবার জন্য তখন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। দলে দলে বালক বৃদ্ধ যুবা বসনে-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া দেবীর নবপল্লব-বাহিত দোলার পিছনে চলিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা গলিপথ ধরিয়া শোভাযাত্রার অভিমুখে চলিয়াছিলাম। গলিপথটার একটা বাঁক ঘুরিয়াই আমাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। পথের ধূলায় একটি শিশু গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিল। আর ছেলেটির দিকে নির্নিমেষ অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন নিশানাথবাবুর স্ত্রী, পাথরের মূর্তির মুখের মত ভাবান্তরহীন মুখ, নিষ্পলক দৃষ্টি। ছেলেটিকে চিনিলাম—নিশানাথবাবুরই শিশুপুত্র।

ডাকিলাম, বউদি!

আহ্বানের শব্দে বৌদিদির যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তিনি মুহূর্তে নিদারুণ কঠোর আকর্ষণে ছেলেটাকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ছেলেটার মর্মভেদী চীৎকার থামিল না। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, জামা নোব। শারদীয়া সপ্তমীর সমস্ত উৎসব যেন হীনপ্রভ হইয়া গেল, আমি সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর মন স্থির করিয়া ছুটিলাম দোকানে। একটা রঙিন সাটিনের জামা

লইয়া ফিরিয়া নিশানাথবাবুর বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া সেটা ভিতরের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া আসিলাম।

বউদিদি কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, কে এমন কাজ করিয়াছে। অপরাহ্নে তিনি আমাদের বাড়ি আসিলেন, সঙ্গে সেই ছেলেটি, ছেলেটির গায়ে নীল সাটিনের জামাটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। আমি লজ্জায় তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই হাসিমুখে ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, নরুর আজকাল বড় লজ্জা হয়েছে দেখছি!

তাঁহার প্রসন্ন কণ্ঠস্বরে আশ্বাস পাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, ভাল আছেন বৌদি?

ভাল না থাকলে উপায় কি ভাই! বিধাতার যেন ঐটুকু বিবেচনা আছে দেখতে পাই। এর ওপরে রোগ থাকলে ছেলেগুলো সত্যি সত্যিই ম'রে যেত।

চন্দ্রনাথ কোন খবর-টবর দেয় নি বউদি?

বউদিদির চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, না। সেই যে গেল, আর কোন খবর নেই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, এরা দুটি ভাই অদ্ভুত। মায়া নেই মমতা নেই, কেন যে এরা মাটির পৃথিবীতে এল, তাই এক-এক সময় ভাবি। তোমার দাদাকে কতবার বললাম, ওগো, খোঁজখবর কর। উত্তর কি জান? উত্তর হ'ল—এ সংসারে কে কার? সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গেলে সীতা-হরণ হতেই হবে। নিজের ছেলেপিলের ওপরেই যার মায়া নেই, তার কথাই ভিন্ন ঠাকুরপো।

চুপ করিয়া রহিলাম, কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বউদিদি বলিলেন, জামাটার কত দাম ভাই ঠাকুরপো? কোন রকম ক'রে দেব তোমায় আমি, কিন্তু সবুর ক'রে নিতে হবে?

আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম, বেশ, তাই দেবেন। আর একটা কথা বউদি, যদি আর কিছু কাপড়-চোপড় দরকার হয়—। কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না। বউদিদিও নীরবে স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, দাম পরে দেবেন। আমি তো পর নই, যেন মনে কিছু করবেন না।

ম্লান হাসি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, না ভাই মনে কিছু করিনি। ভাবছিলাম, দেনা তো ঘাড়ে চাপবে।

না না, তার জন্যে ভাববেন না! সে যখন হোক দেবেন!

তা হ'লে ভাই, আমার জন্যে একখানা ধোলাই শাড়ি আর খুকীর জন্যে একটা জামা তুমি এনে দাও। কিন্তু দাম তোমায় নিতে হবে।

তখনই দোকানে বাহির হইয়া গেলাম। কাপড় পাইয়া বউদিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আনন্দে যেন তিনি বালিকার মত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, দাঁড়াও ভাই ঠাকুরপো, কাপড়টা প'রে আসি, দেখ তো কেমন মানায়!

নববস্ত্রে সজ্জিতা বউদিদিকে সত্যই মানাইয়াছিল বড় চমৎকার, সুশ্যামা হৃষ্টপুষ্ট বউদিদিকে লালপেড়ে শাড়িতে যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত মনে হইতেছিল।

বলিলাম, চমৎকার মানিয়েছে বউদি, যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটি।

খুশি হইয়া বউদিদি বলিলেন, ব'স ভাই, একটু জল খেয়ে যাও, পুজোর দিন।

নারিকেল-নাড়ু চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, দাদা কত দিন হ'ল বেরিয়েছেন, কবে

ফিরবেন ?

ভগবান খুঁজতে বেরিয়েছেন ভাই, কখন ফিরবেন কেমন ক'রে বলব ? গেছেন ভাদ্র মাসে, ব'লে গেছেন ফিরবেন ফাল্গুন মাসে। কার্তিক মাসে হবে সংকল্প ক'রে গঙ্গাস্নান, মাঘ মাসে করবেন কল্পবাস। আবার আমার যা কপাল, যদি ভগবান মিলেই যায়, তবে হয়তো আর ফিরবেনই না।

সংকল্প করিলাম, নিশানাথবাবুর সহিত দেখা হইলে প্রশ্ন করিব, এই সৌরজগৎটা কত বড় জানেন ? কল্পনা করতে পারেন ? কত কোটি সৌরজগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, আর কত কোটি এখনও অনাবিষ্কৃত, ধারণা করতে পারেন ?

সোনার হরিণ! সোনার হরিণের পিছনে পিছনে যে নিজে উন্মাদের মত ছুটিয়াছে, সেও বলে— সোনার হরিণের পিছনে ছুটিও না!

বউদিদি আমার মনের মধ্যে কল্পনার কেন্দ্রস্থলে অপরূপ হইয়া দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। বউদিদিকে লইয়া কাহিনী রচনা করিবার ইচ্ছা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শস্যপরিপূর্ণা বসুন্ধরার মত মেয়েটির অবহেলিত জীবন, তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, শস্যশীর্ষগুলির অপচয়ে অনাদরে তাহার নীরব বেদনা, ব্যর্থ রোষ—এই লইয়া কাহিনী রচনা করিব। একটি রচনাই আমাকে অমর করিয়া রাখিবে। লক্ষ্মীরূপিণী বউদিদি আমার জয়ধ্বজা মাথায় করিয়া গরবিনীর মত মনের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাসেন। তাঁহার বেদনায় ধরণী বেদনাপ্লুতা হইবে।

* * *

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহেই মামা বলিলেন, তুই একবার এলাহাবাদ থেকে ঘুরে আয় না দেখি। শ্যামার মেয়ের বিয়ে, তুই-ই এখান থেকে যা।

শ্যামা আমার মাসতুতো বোন। সানন্দেই রাজি হইলাম। দেশ-দেশান্তরে আমার কল্পনার পটভূমি বিস্তৃততর হইবে, এই কল্পনাতেই আনন্দের আমার সীমা রহিল না।

শ্যামাদিদির মেয়ের বিবাহের মধ্যে আবার এক বিচিত্র রূপ আমার চোখে পড়িল।

দেখিলাম, যাহার বিবাহ সে-ই এ আনন্দ-উৎসবের মধ্যে অবহেলিত, সে হইয়াছে গৌণ ; মুখ্য হইয়াছে সংসারের প্রত্যেক জনটির আপন আপন আনন্দ কামনা। শ্যামাদিদির শাশুড়ী আপনার কন্যাদের লইয়া ব্যস্ত ; কন্যারা ব্যস্ত আপন আপন সাজসজ্জা, ছেলেমেয়েদের সাজ-সজ্জা লইয়া। এক কন্যা দর্জিকে আপনার কন্যার ফ্রকের জন্য বরাত করিলেন—সে জামাটার কলার হইবে একজনের জামার মত, হাতের ফ্যাশান হইবে অন্য একটি জামার মত, গলা হইতে কোমর পর্যন্ত আর এক রকম, সেটুকু স্বাধীন কল্পনা। নিম্নভাগ হইবে আর একটি জামার মত। দর্জি অবাক হইয়া গেল। একদল মেয়ে রোশনচৌকির জন্য ব্যস্ত, একদল ব্যস্ত বাসরঘরের ব্যবস্থা লইয়া। বিধবারা আচার-আচরণ লইয়া ব্যস্ত। শ্যামাদিদির বড় ছেলে দুইটি মাকে অহরহ খোঁচাইতেছে, আমাদের জামা ভাল হ'ল না মা।

সকলের মধ্যে ভাবী বধূটি শুধু সকলের কাছে ধমক খাইয়া ফিরিতেছে।

বেদনা বোধ না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু তবুও পুলকিত হইলাম, নতুন একটি কাহিনীর উপাদান পাইয়াছি।

কাহিনীটিকে গুছাইয়া লইবার জন্য সেদিন অপরাহ্নে যমুনার ঘাটে আসিয়া একখানা নৌকা করিয়া ত্রিধারা সঙ্গমের দিকে বেড়াইতে গেলাম। তরঙ্গময়ী গঙ্গার শক্তির প্রতিরোধে

গভীর নীলসলিলা যমুনা ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। নৌকাখানা ধীরে ধীরেই ভাসিয়া চলিয়াছিল। সম্মুখে সঙ্গমস্থলের উপর বিশাল কেল্লা। একেবারে মাথার উপরে একটা বারান্দায় গোরা সৈন্যেরা ব্যাণ্ড বাজাইতেছিল। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, কেল্লার দিকেই ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। হিন্দুর প্রতিষ্ঠান দুর্গ, মুসলমানের এলাহিবাদ কেল্লা, ইংরেজের এলাহাবাদ ফোর্ট। সকলের চেয়ে ভাল লাগিল গঙ্গার ঘাটের উপর দুর্গ-প্রবেশের ঢালু পথটি ও ফটকটি। এ দুইটি মুসলমানদের রচনা। মনে পড়িতেছে, কয় লাইন কবিতাও যেন সেদিন রচনা করিয়াছিলাম—

ওই সে ল�ৌহদ্বার,
বীর ছাড়া নাই কাপুরুষের প্রবেশেতে অধিকার।
হূনের আঘাত, পাঠানের অসি,
মোগলের ছুরি আছে হেথা বসি,
বর্গীরা ভীম বর্শা-আঘাত
হানিল বারংবার।

বাকিটা ভুলিয়া গিয়াছি, আর মনে পড়ে না। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, নৌকাটা ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার তীরভূমি ধরিয়া শহরের দিকে চলিতেছিলাম। রাস্তার দুই পাশে সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঁড়েঘর; কেহ কেহ বা অনাবৃত সিক্ত বালুভূমির উপরেই খোলা গায়ে বসিয়া আছে। অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন!

কে, নরু না?

ঈষৎ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখি—নিশানাথবাবু। গঙ্গার তীরভূমির উপর ছোট একটি খড়ের কুঁড়ের মধ্যে খড় বিছাইয়া বসিয়া আছেন নিশানাথবাবু। বিশৃঙ্খল বড় বড় চুল-দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে।

তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিলাম, আপনি? কিন্তু এই ঠাণ্ডায় এখানে, এই গঙ্গার ধারে—আর এ কি চেহারা হয়েছে আপনার?

কল্পবাসের যে এই নিয়ম। কল্পবাস করছি কিনা। কামানো নিষেধ, তেল মাখতেও নেই, কাজেই—। বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল বৌদিদির কথা, আমার মনের সংকল্পের কথা

বলিলাম, কিন্তু এ কি করছেন আপনি? আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী—তাদের ব্যবস্থা কি ক'রে এসেছেন?

হাসিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া নিশানাথবাবু কহিলেন, ব্যবস্থার মালিক যিনি, তিনিই করবেন নরু। আমি যদি ম'রে যাই—

ঈষৎ রূঢ়ভাবেই বলিলাম, ম'রে তো যাননি।

না, যাইনি। কিন্তু তাতেও প্রভেদ কিছু হয় না। কারণ আমার যখন কোন বিষয়েই হাত নেই, তখন আমার থাকা না থাকায় কি যায় আসে? মানুষের ব্যবস্থা চিরদিন যিনি করেন, তিনিই করবেন। মানুষের ওটা অনধিকার-চর্চা।

অন্তরে বিরক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বলিলাম, আপনি বলেন—সংসারে মায়া হ'ল স্বর্ণমৃগ। কিন্তু আপনি যার পেছনে ছুটেছেন, সেটা কি? সে যে মৃগতৃষ্ণিকা।

নিশানাথবাবু শুধু হাসিলেন।

আবার বলিলাম, বলতে পারেন, ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি কত বড়? জানেন,

ঐ একটি সূর্য কত বড়? কত তার দীপ্তি, কত তার তেজ? এমনই কোটি কোটি সূর্য আবিষ্কৃত হয়েছে, আরও শত শত কোটি এখনও অনাবিষ্কৃত। যার তেজের কণামাত্র অংশে এমনই কোটি কোটি সূর্য, সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্মুখীন হবার কল্পনা করতে পারেন আপনি? সে বিরাট শ্রেষ্ঠকে দেখবার দৃষ্টি আছে আপনার?

এবার তিনি বলিলেন, সমুদ্র দেখেছ নরু? কতটুকু অংশ তার দেখা যায় আমাদের দৃষ্টিতে? যদি জাহাজে ক'রে সমগ্র সমুদ্রটাও দেখে থাক, তবুও কি তাকে সমগ্র অখণ্ডরূপে দেখা হয়? হয় না, সেই খণ্ডই দেখা হয়। কিন্তু মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখ, সেখানে ওই অসীম বিশাল সমুদ্র সম্পূর্ণ অখণ্ডরূপে ধরা দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, কিন্তু মনকে ক্ষুদ্র ভেবো না। ঈশ্বর কি রূপ ধরে আসেন? অরূপরতন মনের মধ্যে স্পর্শ দিয়ে যান, দেখা কি, বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, তা হ'লে আমি যাই।

পিছন হইতে তিনি আবার ডাকিলেন, একটা কথা শোন তো একবার।

বলুন।

আমাদের বাড়ির, মানে ছেলেগুলো—

ভালই আছে। বউদিদিও ভাল আছেন।

সে বোধ হয় খুব রাগরোষ করে আমার ওপর?

উত্তর দিলাম, না না, তাই কি হিন্দুর মেয়েতে কখনও পারে?

অদ্ভুত মানুষের মন, বউদিদির ও তাঁহার সন্তানদের দুঃখদুর্দশার কথা বলিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল না।

চার

মাস কয়েক পর। গরমের ছুটির ঠিক পূর্বেই হীরু একখানা পত্র লিখিয়াছিল। সে কাশ্মীর যাইবে, আমাকেও তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে; চিঠি পাইবার পরদিনই পাঞ্জাব মেলে উঠিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া স্টেশনে উপস্থিত থাকি।

চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, স্টেশনেও গেলাম না। ধনকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ধনের দম্ভকে আমি ঘৃণা করি, এবং ধনীর মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই দাম্ভিক। তাহারা তো ধনকে আয়ত্ত করে না, ধনই তাহাদের জয় করে, ক্রয় করে। হীরুকে আমি ভালবাসি, কিন্তু হীরু তো ধনীর সন্তান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে যদি ধনের কাছে মাথা হেঁট করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জীবন সে আমার কাশ্মীর ভ্রমণের খরচের অঙ্কটা আমার কাছে অক্ষয় পাওনারূপে জমা করিয়া রাখিবে। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের মধ্যে হীরুর মত সুন্দরকে হারাইব না।

মাসখানেক পরই কিন্তু হীরু নিজে আসিয়া আমার কাছে হাজির হইল। ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, মামাতো ভাই আসিয়া বলিল, দাদা, একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তোমায় খুঁজছেন। উঃ, কি সুন্দর দেখতে তিনি, আর কত জিনিসপত্র তাঁর সঙ্গে!

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম হীরু। কলিকাতা-প্রবাসী শৌখিন ধনীপুত্র হীরু। বেশভূষা

ও প্রথম যৌবনসমৃদ্ধ হীরুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

হীরু বলিল, দাঁড়া, তোর এই বিস্ময়বিমুগ্ধ অবস্থার একটা ছবি তুলে নিই।

ক্যামেরা তাহার কাঁধে ঝোলানই ছিল। সত্য সত্যই সে আমার একটা ছবি তুলিয়াই লইল। তারপর হাসিয়া বলিল, এই একখানা ফিল্মই বাকি ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্যের পটচ্ছবির শেষে আমার মত কৃষ্ণাঙ্গকে দিয়ে কি পূর্ণচ্ছেদ টানলি ?

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, তারপর বলিল, তোর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রণাম করি। সত্য সত্যই এ হ'ল পূর্ণচ্ছেদ। এমন সুশোভন অর্থপূর্ণ পূর্ণচ্ছেদ আর হয় না নরু।

কেন ?

সে বলব পরে।—বলিয়া ঘরে সমাগত আমার আত্মীয়স্বজনদের দিকে চাহিয়া দেখিল।

মামা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, চা জলখাবার নিয়ে এস নরু। তাই বা কেন, তোমার বন্ধুকে বাড়ির মধ্যেই নিয়ে যাও।

বাড়ির মধ্যে মাকে প্রণাম করিয়া হীরু বলিল, আপনাকে দেখলেই নরুর ওপর আমার হিংসে হয়।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা কি চিরদিন থাকে বাবা, তার জন্যে দুঃখ ক'রে বাড়ি ছাড়ে কে ? তুমি শুনলাম বাড়ি পর্যন্ত ছেড়েছ ; পূজোয় বাড়ি যাওনি !

হীরু হাসিয়া বলিল, মায়ের আঁচল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘুরে বেড়াবার পথে পেয়ে বসেছে মা। বেড়িয়ে যেন আশ মিটছে না। দেখেছেন তো ছোট ছেলের হাঁটবার ক্ষমতা হ'লে তার ছুটে বেড়াবার সাধ, ধুলো মাখার বহর ?

অপরাহ্ণে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়া তাহাকে বলিলাম, তারপর কাশ্মীরের রূপ কেমন লাগল বল।

সে বলিল, কাশ্মীরের রূপের চেয়ে কাশ্মীর-রূপসীর রূপ আমার বেশি ভাল লেগেছে। তাদের চোখের স্বচ্ছ শোভার কাছে হ্রদের শোভা ম্লান হয়ে গেল, ননীর মত দেহবর্ণের লাবণ্য থেকে তুষার-শোভার দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ হ'ল না।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার বলিল, তখনকার পূর্ণচ্ছেদের কথাটায় তখন পূর্ণচ্ছেদ টানতে দ্বিধা হ'ল। তোর গুরুজন ছিলেন অনেক। আমার ক্যামেরাটার পটধারার প্রত্যেকটি হ'ল রূপসীর ছবি ; সর্বশেষে ছবি হ'ল তোর। তাই তখন বললাম, এমন সুশোভন অর্থপূর্ণ পূর্ণচ্ছেদ আর হয় না।

আমিও এবার হাসিলাম, তারপর প্রশ্ন করিলাম, শুধু দেখেই এলি ?

হীরু বলিল, না, প্রেমও হয়েছিল ; হ্রদের বুকে হাউস বোটের মাঝি মেয়ে একটি, কিশোরী অপরূপ রূপসী, সে মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। একদিন সে ফুলও আমায় উপহার দিয়েছিল। সে ফুল নিয়ে খেলা করছিল, আমি তাকে বললাম, আমায় দাও না ফুলগুলো। সে চারিদিকে চেয়ে হেসে ফুলগুলো আমায় দিলে। আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি, সাহস হয়নি। শুধু তারই ছবিতে পরিপূর্ণ ক'রে এনেছি ক্যামেরাটা।

সে পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া ছোট ছোট ছবিগুলি আমায় দেখাইল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম। হীরু বলিল, ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবতাম কি জানিস ? ভাবতাম, কেন আমি ভারতের সম্রাট নই, অন্তত কাশ্মীরের অধিপতিও নই ! তা হ'লে আমার কাশ্মীর হ্রদের পদ্মপুষ্প আহরণের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারত না। তার

মুখের দিকে চেয়ে কল্পনা করতাম, পূর্বজন্মে আমি ছিলাম সম্রাট আলমগীর, আর সে ছিল নীলনয়না কাশ্মীরী বেগম।

ছবিগুলি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, একখানা ছবি আমায় দিবি ?

সে বলিল, না। ওর প্রত্যেক ভঙ্গির ছবিটি আমি রাখব।

হাসিয়া বলিলাম, কেন, মনে মনে রেখে দে।

মন কি এত সহজ ক্ষেত্র বন্ধু ? বনের চেয়েও সে জটিল। বনে আজ যে মহীরুহ বনস্পতি, দশ বছর পরে অপরের আবির্ভাবে সে হয় অকিঞ্চিৎকর, শুষ্ক হয়ে তার জীবনান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।

তা হ'লে সম্রাট আলমগীরকে আর দোষ কেন ? কাশ্মীরী বেগমের নীলনয়নের মোহ যদি সময়ক্ষেপে ঘৃণায়ই পরিণত হয়ে থাকে, তবে তাতে অপরাধ কি ?

না, দোষ আমি তাঁকে দিই না। শুধু তাঁকে কেন, যে শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে ক'রে উন্মত্ত হয়ে ফিরছিলেন, তাঁর গৌরীর প্রেমে আত্মবিক্রয়েও আমি তাঁকে দোষ দিই না।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ধনীর দাম্ভিক দুলাল বলে কি !

সে বলিল, একে শুধু মোহই বল কেন ? চেকভের ডার্লিং-এর মধ্যে যে বস্তুটা ছিল, সেটা কি মোহ, না প্রেম-স্নেহ-মমতা ? ওই একই বস্তু বন্ধু, একই বস্তু ; শুধু প্রকারান্তর। শুধু নারী নয়, নারী পুরুষ সবার মধ্যেই আছে চেকভের ডার্লিং !

এবার আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, রাগ করিস নি হীরু, তোর উপর আমার ঘৃণা হচ্ছে। আলো এবং অন্ধকার চেনবার ক্ষমতা পর্যন্ত তুই হারিয়েছিস !

সে হাসিয়া বলিল, কিন্তু মিথ্যেই রাগ করছিস। কারণ গাঢ় অন্ধকার আর অত্যুজ্জ্বল আলো দুইয়েরই কার্যশক্তি এক। দুয়ের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি হয় নিষ্ক্রিয়। সুতরাং দুটো বস্তুর মধ্যে আসলে প্রভেদ কিছু নেই ! আসল প্রভেদ তোর ও আমার মধ্যে।

আর তাহার সহিত তর্ক করিলাম না। হীরু পরদিনই চলিয়া গেল।

কিছুদিন পর সংবাদ পাইলাম, হীরু বিলাত চলিয়াছে।

বৎসরখানেক পর তাহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। বেশ মোটা পত্রখানি, দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে বোধ হয়। চিঠিখানা খুলিয়া পাইলাম, ছোট একখানা চিঠি আর কতকগুলি ফোটো। ফোটোগুলির একখানা তুলিয়া দেখিলাম, সেই কাশ্মীরী সুন্দরীর ছবি। সবগুলিই তাহার ছবি। চিঠিখানা পড়িলাম—

"নরু, কাশ্মীর-রূপসীর একখানা ছবি তুই একদিন চেয়েছিলি। সেদিন দিতে পারি নি, আজ সবগুলো তোকে পাঠালাম। বন্ধু, মন-অরণ্য যে লতার জালে আচ্ছন্ন ছিল, সে লতা-জাল বিগতায়ু হয়েছে, শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে। শুষ্ক লতা বহ্নিমুখে সমর্পণ না ক'রে তোর কাছে পাঠালাম। লেখকের কাজে লাগতে পারে। অরণ্যে নতুন যে লতাজাল দেখা দিয়েছে, তার পরিচর্যায় আমি ব্যস্ত। বেশি লেখবার অবকাশ নেই। ইতি।"

হীরু যাহা করিতে পারে নাই, আমিই তাহা করিলাম। সমস্ত ছবিগুলি একে একে বহ্নিমুখে সমর্পণ করিলাম। তাহাকে লইয়া যে কাহিনী রচনা করিলাম, তাহার উপসংহারেও তাহাই লিখিলাম। লিখিলাম—"কাশ্মীরী মৃতদেহ চিতায় পুড়িতেছে ; তাহার প্রণয়ী শ্মশানে পর্যন্ত আসে নাই। আমি তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছি। অপরূপ রূপ ছাই হইয়া আসিতেছে, আমি নির্নিমেষ নেত্রে তাহাই দেখিতেছি।"

কাশ্মীর-রূপসীর ভস্মাবশেষ কিন্তু আমার ললাটে জয়তিলক হইয়া ফুটিয়া উঠিল। গল্পটার

প্রশংসা হইল খুব।

ইহার পরই আমার দেশের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল।

কার্যোপলক্ষ্যে মা দেশে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেশ হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম—"মায়ের কলেরা হইয়াছে, শীঘ্র এস।"

সমস্ত শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সমস্ত কিছু যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পৃথিবীর বৈচিত্র্য, উজ্জ্বল দিবালোক সমস্ত এক মুহূর্তে অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইল। সেদিন সে মুহূর্তে মৃত্যু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতাম।

কোন সন্তানের কাছেই নিজের মা অপরের মায়ের চেয়ে খাটো হয় না—স্নেহে তো নয়ই! আলেকজাণ্ডারের মা নগণ্যতম দীনদুঃখীর মায়ের চেয়ে অধিক স্নেহময়ী নন; এ কথার চেয়ে বড় সত্য কথা আর নাই। কিন্তু তবু বলিব, গুণে—যে গুণ থাকিলে নারী উপযুক্ততম জননী হইতে পারে, সে গুণে সে শক্তিতে মায়ের আমার তুলনা ছিল না। হয়তো একথা অপরে বলিবে মিথ্যা, অতিরঞ্জন; কিন্তু আমার কাছে এ সর্বোত্তম সত্য। পাগলের মত দেশে ছুটিয়া গেলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিতে পা উঠিতেছে না। নিষ্ঠুরতম সংবাদ মনে বার বার অবাঞ্ছনীয় অবাধ্য কল্পনায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, তবু মানুষের প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া সে সংবাদ পাছে শুনি—এই আশঙ্কায় বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া সারা হইলাম।

গ্রামেই বা মানুষ কই? অপ্রশস্ত দীর্ঘ পল্লীপথ জনশূন্য, দুই পাশের গৃহদ্বার সমস্ত রুদ্ধ। শুধু দুই একটা পথচারী কুকুর আমাকে দেখিয়া কয়েকবার চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। মনে হইল, গ্রামখানার সর্বাঙ্গে যেন একটা কালো ছায়া কে মাখাইয়া দিয়াছে।

বাড়ির দরজায় ঢুকিয়া ডাকিলাম, মা!

ঘরের বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন, খুড়ীমা আর নিশানাথবাবুর স্ত্রী—বউদিদি।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আমার মা?

ম্লানমুখে খুড়ীমা বলিলেন, এস, এই ঘরে রয়েছেন।

ঘরে ঢুকিয়া মাকে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার সেই মা এমন হইয়া গিয়াছেন!

চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, মা—মাগো!

ইশারা করিয়া মা কি যেন নিষেধ করিলেন। তারপর অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, আমায় নাড়াঘাঁটা ক'র না বাবা। রোগটা বড় ছোঁয়াচে।

চোখের জল আর বাঁধ মানিল না, অশ্রু-আবেগ-পীড়িত কণ্ঠে বলিলাম, তোমার সেবা করতে পাব না মা?

মা বলিলেন, তুমি স্থির হও, মনকে শক্ত কর; ছোঁয়াচ নিবারণ করবার উপায় যা পড়েছ, সেইমতো তৈরি হয়ে এস। সেবা করবে বইকি, তোমার সেবা নেবার জন্যেই বেঁচে আছি এখনও।

বহু কষ্টে কতবার থামিয়া থামিয়া কথাগুলি তিনি শেষ করিলেন ও চাহিলেন, জল!

স্বর তখন অনুনাসিক হইয়া আসিয়াছে।

সে রাত্রির স্মৃতি সমস্ত জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। দুর্যোগময়ী অন্ধকার রাত্রিপথে কাটাইয়াছি, প্রকৃতির বিপ্লব মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই রাত্রির উদ্বেগ, কষ্ট এবং

ভীষণতার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। মৃদু আলোকে আলোকিত কক্ষের মধ্যে মৃত্যুপথ-যাত্রিণী মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমি আর খুড়ীমা।

সন্ধ্যাতেই বউদিদি বিদায় লইলেন, কত যেন অপরাধীর মত বলিলেন, আমার যে না গেলে নয় ঠাকুরপো, ছেলেগুলো আছে, জান তো তোমার দাদার কথা!

চোখ দুইটি তাঁহার ছলছল করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, না না, আপনি যান বউদি; এই যা করলেন তাই আমার চিরদিন মনে থাকবে।

বউদিদি বোধ হয় স্থান-কাল সব ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন, দাঁড়াও না, মা ভাল হয়ে উঠুন, তারপর এর জবাব দোব। 'চিরদিন মনে রাখা' করাব।

মুহূর্তের অসাবধানতায় বোধ হয় তাঁহার আনন্দ-ভুখারী প্রকৃতিটি চঞ্চল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

মৃত্যু মায়ের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বোধ করি সকলেরই শেষ-মুহূর্তে সে এমনই করিয়া দাঁড়ায় কিন্তু যেখানে জীবনের কোলাহল প্রবল, মৃত্যুপথযাত্রীকে ঘেরিয়া জীবনের জনতা যেখানে 'হায় হায়' করে, সেখানে এমনভাবে সে আপনার অস্তিত্ব প্রকট করিতে পারে না। এ যে সমস্ত ঘরখানা তাহার নিশ্বাসে, দেহগন্ধে ভয়াতুর হইয়া উঠিয়াছিল।

স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়াছিলাম।

ও কেঁ, মাঁথার শিঁয়রে—মা বলিয়া উঠিলেন।

চমকাইয়া উঠিলাম, ভয়ে সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল। বলিলাম, কে মা? কেউ তো নেই।

যন্ত্রণার মধ্যেও মা হাসিয়া বলিলেন, তুমি দেখতে পাবে না, আমি পাঁচ্ছি। তারপর আবার বহুকষ্টে বলিলেন, আমার কামনা ছিল নরু, আমি বড়লোঁক বিঁখ্যাত লোকের মা হব। তুমি চেষ্টা ক'র।

শেষরাত্রে মায়ের জীবন-দীপ নিবিয়া গেল।

দুই দিন পর গেলেন খুড়ীমা।

গ্রামে মহামারী প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আগুনের মত জ্বলিতেছিল। প্রায় ঘরে ঘরে করুণ বিলাপের আর্তনাদ। দলে দলে লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। শুনিলাম, প্রথমেই রাক্ষসী প্রবেশ করিয়াছিল হীরুদের সংসারে। সংসারটা একরূপ শেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। হীরুর ছোট ভাই, তাহার খুড়ার সমস্ত সংসার—স্ত্রী পুত্র সব গিয়াছে। এত বড় বাড়িটার মধ্যে বাঁচিয়া আছে শুধু হীরুর বৃদ্ধ খুড়া, আর বিদেশে বংশের উত্তরাধিকারীরূপে হীরু।

আশ্চর্য মানুষের মন, আমার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া প্রসঙ্গক্রমে হীরুদের সংসারের এই বিপর্যয়কে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল, হীরুর ভাগ্যি বটে! সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল একা।

অন্য একজন বলিল, ও কি বলছ ভাই, এই তোমার রাজারামপুরের রায়-বাড়ির সম্পত্তি পেলে এক দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। আমি দেখেছি হে, শীতে ব্যাটার গায়ে কাপড় জুটত না। বুঝেছ, ওসব হ'ল পাতাচাপা কপাল, আমাদের মত কি আর পাথরচাপা!

একজন আসিয়া সংবাদ দিল, নিশি চাটুজ্জের কাণ্ড শুনেছ?

বিরক্ত হইয়া একজন বলিল, ও ভণ্ডটার কথা ছাড়ান দাও হে। সমস্তই লোকটার ভণ্ডামি, দেখ না কিছুদিন বাদে শিব-টিব একটা তুলে দেবাংশী হয়ে না বসে।

সংবাদ যে আনিয়াছিল, সে কিন্তু ছাড়িল না। বলিল, চাটুজ্জে রোজ পাঁচটা করে হোম ক'রবে আজ থেকে। পঞ্চতপা না কি বলছে।

মরবে তারই আয়োজন হচ্ছে আর কি! এই বৈশাখ মাস, আর এই কলেরার সময়; মরবে, ভণ্ডামি বেরুবে। আঃ তাই যদি পারতাম হে, তা হ'লেও যে কাজ হ'ত! যাকে বলে—পাথরে পাঁচ কিল, খাও না কত খাবে!

অদ্ভুত মানুষের মনের কলুষিত কাহিনী। নিশানাথবাবুকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা মুছিয়া ফেলিলাম। আমার বিয়োগ-ব্যথাতুর উদাসীন চিত্র সংসারের উপরেই বিরূপ হইয়া উঠিল।

হীরুর কাকা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লজ্জিত হইয়াই গেলাম। সর্বহারা এই মানুষটির সংবাদ আমার পূর্বে লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ শেষ করিতে পারে নাই, কিন্তু হীরুর কাকার জীবনের ভবিষ্যৎ সে মুছিয়া দিয়াছে। পথে যাইতে যাইতেই মনে পড়িল, একটা গাছের কাহিনী। গাছটার শাখা-প্রশাখা সমস্ত কে কাটিয়া লইয়াছিল, দাঁড়াইয়া ছিল শুধু কাণ্ডটা। ছিন্নমুখ হইতে শুকাইয়া শুকাইয়া দীর্ঘ দিনে গাছটা মরিয়াছে। হীরুর কাকার ঠিক সেই অবস্থা।

হীরুর কাকা বলিলেন, তোমার মা খুড়ীমা দুজনেই গেলেন!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার দুঃখের যে পার নেই, কি যে বলব খুঁজে পাই না।

ভদ্রলোক বলিলেন, সবই অদৃষ্ট, উপায় কি?

চোখ দুইটি তাঁহার সজল হইয়া উঠিল, ঠোঁট রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সান্ত্বনার বাক্য খুঁজিয়া পাইলাম না, নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন, তার ওপর যন্ত্রণা দেখ, সব হারিয়েও বিষয়ের চুপড়ি মাথায় ক'রে বসে আছি। আজ একটা তামাদি, কাল একটা মামলার দিন, উপায় কি? করবেই বা কে?

বললাম, হীরুকে আসতে লিখলেন না কেন?

লিখেছি, কিন্তু আবার সাতপাঁচ ভাবছি। পড়াটা মাটি হবে; তা ছাড়া এই যুদ্ধের সময়, চারিদিকে জাহাজ ডুবছে।

তখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এম্‌ডেনের আক্রমণে ভারতসাগর ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

তারপরই তিনি বলিলেন, একটু কাজের জন্তেই তোমাকে ডেকেছি। সাগ্রহে বলিলাম, বলুন।

তুমি বোধ হয় জান, হ্যাঁ, তুমিও তো কয়েকবার টাকা দিয়ে গেছ। মানে—তোমার বাবা যে তমস্থকে টাকা ধার করেছিলেন, সেইটের কথা বলছি। অবশ্য তামাদি নয়, তবে অনেক টাকা হয়ে গেল। দিন তো নায়েববাবু, নরেশ মুখুজ্জের হিসাবটা।

নায়েব আসিয়া হিসাবটা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল, হিসাব প্রস্তুত হইয়াই ছিল। দেখিলাম, বাবা লইয়াছিলেন আট-শো টাকা, আজ পর্যন্ত বাবা ও বাবার মৃত্যুর পর মা দিয়াছেন বারো-শো-পঁচাত্তর টাকা; এখনও বাকি চোদ্দ-শোর অধিক।

বিস্ময় একটু হইয়াছিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি সেটুকু অনুমান করিয়া

কহিলেন, সুদটা চক্রবৃদ্ধিহারে আছে কিনা, মানে—বৎসরান্তে সুদ আসলে গণ্য হয়।

আমি বলিলাম, বেশ, আমায় কিছু সময় দিন।

তা বেশ তো, সময় তুমি নাও না। তবে আমি বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে ঐ যে চকরাঘবপুর মহলটায় তোমার অংশ রয়েছে ওইটে তুমি বেচে ফেল। তুমি হীরুর বন্ধু, আমি ওতেই দেনাটা শোধ ক'রে নোব। সামান্য মহল, তা হোক; জানব যে ওটা ষোল-আনা আমার হ'ল ঐ সুবিধেয় দামই দিলাম কিছু বেশি।

মুহূর্তে সমস্ত সংসারটা বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাই হবে। কিন্তু আরও একটা কথা আমার রাখতে হবে। মায়েরও সংকল্প ছিল, আমারও তাই সংকল্প যে আমি পাটনায় গিয়ে বাস করি। তা হ'লে যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি, মানে—জমি জমা, পুকুর-বাগানগুলোও আপনি নেন—

তা তোমার যদি সুবিধে হয়, তা হ'লে—তা বেশ, তাই নোব আমি। বাড়িটাও বেচবে নাকি?

না, ওটা থাক, যদি কখনও আসি, পৈতৃক ভিটে—থাক ওটা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। তা হ'লে সেই কথা রইল। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাক, তার পর তাই হবে।

ফিরিবার পথে ভাবিলাম, সে গাছটা নাই, তাহার শিকড়গুলো তো এখনও মাটির নীচে আছে, সেগুলো বোধ হয় এখনও মাটির রস শোষণ করে। এইজন্যই নিশানাথবাবুর কাছে অনুরোধ করিতে যাই নাই।

বউদিদি আসিয়া বলিলেন, তুমি নাকি সব বেচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছ ঠাকুরপো?

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে যেন আবার সুন্দর মনে হইল, বলিলাম, বাড়ি থাকছে, আসব বউদি মাঝে মাঝে। আপনাদের কি ছাড়তে পারি?

বউদিদির চোখ দিয়া তবুও ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, তোমার মত আপনার জন আমার কেউ এ গাঁয়ে নেই ভাই। সেবার পূজোর কথা—

বাধা দিয়া বলিলাম, আপনার জনই যদি ভাবেন, তবে সে কথাটা ভুলেই যান।

হাসিয়া তিনি উত্তর দিলেন, ভোলা কি যায় ভাই? ওটা মনে গাঁথা হয়ে আছে ব'লেই তো তোমায় আপনার জন ভাবতে পারি।

কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়েই বলিলাম, দাদা আবার পঞ্চতপা না কি করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন শুনলাম।

এবার পুলকিত হাস্য বউদিদির অধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, না, সে বন্ধ করেছি।

সবিস্ময়ে বলিলাম, বলেন কি? মানা শুনলেন দাদা? শোনালেন কি ক'রে?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমাদের কি কম ভাব নাকি? তোমার দাদা আমার নতুন নাম দিয়েছেন কি জান? বলেন—মায়াবিনী।

প্রশ্ন করিলাম, কি মায়ায় দাদাকে ভোলালেন, শুনতে ইচ্ছে হয় যে!

মুখে কাপড় চাপা দিয়া বউদিদি উত্তর দিলেন, সে তোমার বউকে শিখিয়ে দোব। তোমায় ব'লে দিয়ে আমাদের গুমোর মাটি করব কেন?—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া বলিলেন, তোমার দাদার তপোভঙ্গ হয়েছে।

পরমুহূর্তে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েক দিন পরেই সংবাদ পাইলাম, হীরু আসিতেছে। আমি দেশত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, হীরু হয়ত আমার সংকল্পে বাধা দিবে। বন্ধুত্বের দাবি লইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়া ছাড়িবে। কয়েক দিনের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ফেলিলাম।

চলিয়া আসিবার পূর্বদিন গেলাম বউদিদির ওখানে। দেখিলাম, নিশানাথবাবু ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া গান গাহিয়া আদর করিতেছেন।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া স্বামীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলেন, দেখ।

বউদিদির বিজয়ের কাহিনী লিখিবার সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। নাম দিব স্থির করিলাম—'বিজয়িনী'।

ট্রেনে চাপিয়া চোখে জল আসিল।

এতকালের লীলাভূমি পিছনে পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ হারাইয়া গিয়াছে, আজ হীরুকে হারাইলাম, সে ফিরিবে কিন্তু আমার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হইবে না। নিশানাথবাবুকে লইয়া আমার ঔৎসুক্য নাই, নারী-কক্ষের শান্তি-কলসের বারিতে তিনি শান্ত হইয়াছেন।

আমার চিত্তাকাশের সমস্ত নক্ষত্রগুলি একে একে অস্ত গেল।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলাম। অন্ধকারের মধ্যেও দেওয়ালের আয়নাটায় সিগারেটের আগুনের আরক্ত দীপ্তি ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে।

পাঁচ

পাইয়াছি।

দীর্ঘকালের পর আমার মনোগগন-প্রান্তে আবার কালপুরুষ নক্ষত্রের উদয় দেখিতেছি। চন্দ্রনাথের দেশত্যাগের বারো বৎসর পর, আমার দেশত্যাগের নয় বৎসর পর, সহসা একদিন চন্দ্রনাথের সংবাদ পাইলাম।

তখন আমি সত্য সত্যই লেখক হইয়াছি। দারিদ্র্যকে গ্রাহ্য করি নাই, প্রশংসার প্রলোভনও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে, 'আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে' এই স্বপ্ন লইয়া যাহা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে বস্তু আজ আমার সাধনার সামগ্রী। কিন্তু কেন যে এ সাধনা জানি না। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, সত্যই কি সাধনা, অথবা কামনারই এ রূপান্তর বা নামান্তর? কতবার মনকে প্রশ্ন করিয়াছি, কি এর মূল্য? কোটি কোটি বৎসর পরে পৃথিবীরই তো একদিন জীবনান্ত হইবে, তখন কোথায় থাকিবে এসব? আবার তখনই ভাবি, হয়তো আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। জীবনের জন্য আয়োজনের যে প্রয়োজন আছে! জীবন তো তুচ্ছ নয়, মৃত্যুই যদি অমৃতলোক হয়, তবে জীবনই তো সে অমৃতলোকের সেতু।

কি ভাবিতেছি! আজ তো নিজের কথা ভাবিতে বসি নাই। তাহার অবসর অনেক পাইব। আজ যাহাদের কথা মনে করিয়া স্মৃতিতর্পণ করিতে বসিয়াছি, তাহারাই আজ এই অন্ধকার ঘরের ছায়াপটে কায়া গ্রহণ করিয়া আসুক।

তখন পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আমার পুস্তকপ্রকাশকের নিকট হইতে

একদিন একখানা পত্র পাইলাম। আমার হাতে পত্রখানা দিয়া তিনি বলিলেন, আপনার চিঠি, আমার ঠিকানায় এসেছে। কোন ভক্ত পাঠকের হবে।—বলিয়া তিনি হাসিলেন।

খামের চিঠি, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নামটা আগে দেখিয়া লইলাম ; দেখিলাম, লেখক চন্দ্রনাথ ! মুহূর্তে তাহাকে মনে পড়িয়া গেল,—সেই মোটা নাক, সেই দীপ্ত চক্ষু, কপালে কালো শিরায় রচিত সেই ত্রিশূলচিহ্ন, সে যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ! এত দীর্ঘ দিনের অদর্শনে তাহার সমগ্র অবয়বের এক তিল স্থানও অস্পষ্ট হয় নাই। পত্রখানা পড়িলাম, চন্দ্রনাথের পুত্রের অন্নপ্রাশন, সে যাইতে লিখিয়াছে !—

"আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে তোকেই প্রথম মনে পড়িয়া গেল, তাই নিমন্ত্রণ করিলাম। দাদাকেও নিমন্ত্রণ করি নাই, করিবার প্রয়োজনও নাই। তুই আসিলেই সুখী হইব। ইতি—চন্দ্রনাথ"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল আর একজনকে, সুন্দর সুকোমল তনু হীরুকে। শুনিয়াছি, সে আবার বিলাতে গিয়াছে, ফিরে নাই। সেও কোথায় হারাইয়া গেল ; বহুদিন তাহার সংবাদ পাই নাই। যাক, চন্দ্রনাথকে পাইয়াছি, সে-ই আজ আমার যথেষ্ট।

নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কানপুর রওনা হইলাম। পত্রের ঠিকানায় দেখিলাম, চন্দ্রনাথ কানপুরে থাকে। ঠিকানা অনুযায়ী গাড়োয়ান আনিয়া তুলিল শহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একখানা বাংলোর সম্মুখে। খানিকটা বাগান, বারান্দায় কয়খানা চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, দেওয়ালে ঝুলানো একখানা আয়না, দরজার পাশেই একটা হ্যাট-র‍্যাক। আর কি আছে, বাহির হইতে দেখিতে পাইলাম না। তবুও বুঝিলাম, চন্দ্রনাথ সুখেই আছে। তাহার বউদিদির কথাটা মনে পড়িল, 'মণিমন্দির' না কি।

বাগানের ফটক খুলিতে গিয়া কিন্তু ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম, একি, ফটকের গায়ে পিতলের ডোর-প্লেটে লেখা—সি. সিং ! সিং কে ? চন্দ্রনাথ তো চাটুজ্জে, বুঝিলাম ঠিকানা ভুল হইয়াছে। গাড়োয়ানকে বহুকষ্টে বুঝাইলাম, এখানে এক বাঙালী বাবু কোথায় থাকেন সন্ধান করিতে হইবে। সেই সময় বাংলোর ভিতর হইতে পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এক ভদ্রলোক। তাহাকেই অভিবাদন করিয়া ইংরেজীতে বলিলাম, দেখুন—

পরক্ষণেই শিখ ভদ্রলোক তাঁহার বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া বিপুল আগ্রহে বলিলেন, আরে নরেশ, তুই ! নরু, সত্যিই তুই এসেছিস !

বিস্মিত হইয়া তখনও আমি তাহাকে দেখিতেছিলাম। দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখের মধ্যেও সেই স্ফীত নাসা, সেই দৃপ্ত চক্ষু, প্রসারিত ললাটে সেই শিরায় রচিত ত্রিশূলচিহ্ন ! সবই চিনিলাম, কিন্তু সে কিশোর চন্দ্রনাথের সঙ্গে কত প্রভেদ !

আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, চিনতে কষ্ট হচ্ছে ? কিন্তু আমি যে শিখ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে উপাধিটাও পাল্টে দিয়েছি। মীরা মীরা, বাইরে এস, কে এসেছে দেখ।

বাহির হইয়া আসিলেন একটি তরুণী, অপূর্ব রূপ, মুখ দেখিয়া পশ্চিমদেশীয়া বলিয়াই মনে হইল। বেশভূষাও শিখ মহিলার মতই, পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে চুড়িদার আস্তিন পাঞ্জাবি, মাথায় ওড়না। আমি যেন মোহগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। অপূর্ব রূপ, বর্ণে সুষমায় দেহের গঠন-ভঙ্গিতে সে যেন তিলোত্তমা ! এই সময়েও ঘরের অন্ধকার আমার চোখের সম্মুখে নাই, বিদেশিনী রূপে সব যেন আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে।

মহিলাটি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিলেন, নমস্-কা-র।

আমার চেতনা হইল। লজ্জিতভাবে প্রতি-নমস্কার করিয়া ত্রুটিটা সংশোধন করিয়া লইলাম। চন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়া দিল, আমার স্ত্রী—মীরা। আর মীরা, ইনিই আমার

বন্ধু—নরু, নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লেখক নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অনেক খ্যাতি, বহুবার তো নাম শুনেছ, বই প'ড়ে গল্পও তোমাকে বলেছি। জানিস নরু, তোর বই পড়বার জন্যে মীরা বাংলা শিখতে চায়। তোর বই প'ড়ে আমি ওকে গল্প বলি, মীরার ভাল লাগে।

হাসিয়া আমি বলিলাম, আমার সৌভাগ্য। বাংলা শিখলে আরও অনেক ভাল জিনিসের সঙ্গে পরিচয় হবে আপনার, আমার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ লেখকের বই কত পাবেন।

মৃদু হাসিয়া মীরা উত্তর দিলেন, তাঁরা তো আমার দোস্ত্ নন।

উত্তর দিলাম, আমার বহুভাগ্য যে, আপনি আমার দোস্ত্। পৃথিবীর সব লোক যদি আমার দোস্ত্ হ'ত, তা হ'লে আমিই হতাম সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

মীরা বলিলেন, না না, সত্যিই আপনার লেখা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে। আপনার দোস্ত্‌কে জিজ্ঞাসা করুন।

চন্দ্রনাথ যেন ইহারই মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। সে সম্মুখের রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিল, তোর লেখা পড়ি, অতীত জীবনের সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় হয়। কাগজে তোর সুখ্যাতি পড়ি, আনন্দ হয়, হিংসে হয়। কোথায় প'ড়ে থাকলাম—

চন্দ্রনাথের কথাটা শেষ হইল না, মুহূর্তের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। বাংলোর ভিতর হইতে ছোট একটা পুতুলের মতো কুকুর নাচিতে নাচিতে আসিয়া চন্দ্রনাথের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্তে চন্দ্রনাথ যেন পাগল হইয়া গেল, বজ্রমুষ্টিতে সে কুকুরটার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিল।

ক্ষুদ্র নিরীহ জীবটা বার কয় পা চারিটা ছুঁড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। তাহার একটা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মুখটায় আঘাত লাগিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি হতবাক হইয়া গিয়াছিলাম। চন্দ্রনাথের স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তিনিও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন; চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রনাথের মুখের নিদারুণ কঠোরতা ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, জানোয়ারের হাসপাতালে দিয়ে আয় কুকুরটাকে।—বলিয়াই তাহার কি খেয়াল হইল, সে নিজেই কুকুরটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কপালের শিরা-রচিত ত্রিশূল যেন উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।

মীরা অপরাধিনীর মত ম্লানমুখে ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে বলিলেন, বদন আর হাঁতে জল দিন, আমি চা তৈয়ারী করি।

আমি বলিলাম, চলুন আগে আপনার খোকাকে দেখে আসি।

মীরা আমাকে তাঁহার সন্তান দেখাইলেন। সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ শিশু, মায়ের বর্ণ-সুষমা ও চন্দ্রনাথের আকৃতির প্রশংসনীয় সমাবেশ। দোলনায় শুইয়া স্বাস্থ্যবান শিশু আপন মনে হাত দুইটি মুঠি বাঁধিয়া মুখে পুরিয়া লেহন করিতেছে, পা দুইটি শিশুদের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটুর কাছে ভাঁজিয়া জড় করিয়া রাখিয়াছে। আমি গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিলাম, বাঃ, বাঃ, সুন্দর খোকা! খোকন খোকন!

আদর পাইয়া শিশু পা দুইটি ছুঁড়িয়া দোলনাটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

মীরা বলিলেন, বলুন তো দোস্ত্, ববুয়া আমার কেমন আদমি হবে? খোকন যখন বড় হবে তখন দুনিয়া ওকে ভালোবাসবে, না ভয় করবে?

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, ক্ষণপূর্বের সজল চোখে জল তখনও ছলছল

করিতেছে। কিন্তু সে জলের নীচে প্রত্যাশার দীপশিখা জ্বলিতেছে। সজল নীল চক্ষুতারকা দুইটি প্রত্যাশার আনন্দে সত্যই দীপশিখার মতই উজ্জ্বল। তিনি সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সেই তথ্যের সন্ধান করিতেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন অধিকার ছিল না, শিশুর মুখ দেখিয়া ভবিষ্যৎ-চরিত্র নির্ধারণের শক্তি নাই, তবু বলিলাম, ভালোবাসবে, দুনিয়া ওকে ভালোবাসবে মীরা দেবী। প্রকৃতি ওর আপনার মত হবে ব'লে মনে হচ্ছে।

মীরা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ওর নাম রাখব কি জানেন? নাম রাখব কুমারকিশোর সিং, শৌর্যে বীর্যে কার্তিকের মত বীর, আর তারই মত কিশোর. চিরদিন বালকের মত স্নেহ-ভিখারী।

মীরা নিজহাতে চা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। চা পান করিতেছিলাম। চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিল এবং আমারই পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। আমি মীরাকে বলিলাম, চন্দ্রনাথকে এক কাপ চা দিন। একসঙ্গে চা খাই আর গল্প করি।

মীরা স্বামীর দিকে চাহিল। চন্দ্রনাথ বলিল, ও, আজ বুঝি চা খাব না বলেছিলাম? তা দাও, নরু বলছে!

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

হাসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, ও আমার খেয়াল।

বলিলাম, খেয়াল! অদ্ভুত খেয়াল তোর চিরদিনই কতকগুলো থাকবে? আর কতগুলি এমন খেয়াল আছে, শুনি?

সে উত্তর দিল, অনেক। যে কোন রকম নিয়মানুবর্তিতা, সে যার জন্যেই হোক, শরীর-ধারণের জন্যেই বল বা জীবনের উন্নতির জন্যেই বল, ও আমি মানি না।" যেদিন বেশি ক্ষিদে পায়, আমি সেদিন উপবাস করি; ও-ও এক ধারার দাসত্ব।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, চিরদিনই অদ্ভুত থাকলি তুই!

চন্দ্রনাথ এ-কথার কোন উত্তর দিল না। সে যেন অকস্মাৎ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। মীরা চা প্রস্তুত করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, চন্দ্রনাথ ব'স, চা তৈরি।

হুঁ।—বলিয়া আবার কটা পাক মারিয়া সে বসিল। দুই চুমুক চা খাইয়াই আবার সে উঠিয়া পড়িল, বলিল, বিশ্রী চা!

আমি কিন্তু পরম পরিতৃপ্তির সহিত চা খাইতেছিলাম, এমন সুন্দর চা আমি অনেক দিন খাই নাই।

বুঝিতে পারিলাম না, কিসে সহসা চন্দ্রনাথের সমস্ত বস্তু এমন বিস্বাদ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ কি আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই?

বেয়ারাটা আসিয়া বলিল, হুজুর মালী এসেছে। কি ফুল চাই?

অকারণে বিরক্তিতে ক্রোধে আগুন হইয়া চন্দ্রনাথ বলিল, না, ফুল চাই না।

আমি নিজেকেই যেন অপরাধী বোধ করিলাম।

কিছুক্ষণ পর তাহাকে খুশী করিবার জন্যই রহস্য করিয়া বলিলাম, কিন্তু তুই শিখ কেন হতে গেলি? ওইরকম একমুখ দাড়ি গোঁফ—নাঃ, ভাল লাগে না।

সে দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, কেন, বেশ তো, কেমন ভ্রমরকৃষ্ণ না কি বলিস তোরা?

বলিলাম, নাঃ, ভ্রমরকৃষ্ণই বলিস আর যাই বলিস ও আমার ভাল লাগছে না। মীরার মত সুন্দরীর পাশে—

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট, অ্যাঁ?—বলিয়াই সে উঠিয়া দেওয়ালে আয়নায় আপনার মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল, না, আজই এখুনি কামিয়ে ফেলব দাড়ি। ঠিক বলেছিস তুই।

সত্যই সে কামাইবার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া গেল।

কামাইতে কামাইতেই বলিল, শিখধর্মের মধ্যে একটা বিক্রম আছে বোধ হয় সেইজন্যেই ওই ধর্ম তখন নিয়েছিলাম। নইলে বিবাহ তো অন্য যে-কোন ধর্ম অনুসারে হতে পারত। দাড়িগোঁফহীন ধর্মের তো অভাব নেই।

ছয়

তারপর?

দ্বিপ্রহরের কথা ভাল মনে পড়ে না। অপরাহ্ণের স্মৃতি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

গঙ্গার তীরভূমির উপর আমি ও চন্দ্রনাথ বসিয়াছিলাম। চন্দ্রনাথের বাংলোর পিছনেই গঙ্গা। বেয়ারাটা সেখানে চেয়ার পাতিয়া দিল। শীতের গঙ্গা, জলে মালিন্য নাই, প্রবাহে উচ্ছ্বাস নাই। ওপারের চরে ফসল পাকিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

চন্দ্রনাথ আবার যেন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রনাথ একসময় বলিল, তোর খ্যাতি, তোর প্রতিষ্ঠা কতখানি নরু?

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

সে আবার বলিল, বোধ হয় বাঙালীর মধ্যেই আবদ্ধ, নয়? অন্য জাতে তো—মানে অন্য ভাষাভাষীরা তো তোর নাম জানবে না!

বলিলাম, না, তবে বই তো অন্য ভাষাতে অনুবাদও হচ্ছে।

সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রশ্ন করিলাম, কেন, এ কথা কেন?

চন্দ্রনাথ বলিল, আজ জীবনের অপব্যয়ের জন্যে আমার আক্ষেপ হচ্ছে নরু। তোর খ্যাতি, তোর প্রতিষ্ঠার জন্যে আমার হিংসে হচ্ছে। সকালে বোধ হয় এই জন্যেই আমি হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। ওই নিরীহ কুকুরটার ওপর পর্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছিলাম।

সে চুপ করিল। আমিও চুপ করিয়াই রহিলাম।

চন্দ্রনাথ আবার বলিল, অথচ এটুকু খ্যাতি, এটুকু প্রতিষ্ঠা আমার গ্রহণযোগ্যই নয়। আই. সি. এস. হবারও চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু নিই নি। দাসত্ব—সে যত বড়ই হোক সে দাসত্বই।

সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। অনর্থক কয়টা ঢেলা লইয়া গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। শেষে গোটা মাটির বুকেই আছড়াইয়া ফেলিয়া সে আবার বসিল।

আমি ওয়ারে গিয়েছিলাম, জানিস?

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কই, না! আর জানবই বা কি ক'রে বল? আজ বারো বছর

তুই দেশছাড়া, দেশের লোকে ভাবে—তুই হয়তো ম'রেই গেছিস। তোর দাদা—

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, দাদার কথা থাক।

আমি বলিলাম, জন্মভূমির সঙ্গেও তো কোন সম্বন্ধ রাখলি না।

সে বলিয়া উঠিল, জন্মভূমি আমার ওই গ্রামখানি নাকি? তা হ'লে তো যেটুকু মাটির ওপর প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, সেই মাটিটুকুই আমার জন্মভূমি হওয়া উচিত। ওই গ্রামটুকুর মধ্যে আমার জীবনের পরিধি ধরত কোথায়?

একটুখানি নীরব হইয়া থাকিয়া সে আবার বলিয়া উঠিল, পৃথিবীর বিপুলতা অনুমান করতে পারিস নরু—কত বিশাল, কত বিচিত্র?

মধ্যপথেই সে নীরব হইল। দেখিলাম, দৃষ্টি দূরে গঙ্গার বুকে নিবদ্ধ আর চেয়ারের হাতলটায় বার বার সে সজোরে মোচড় দিতেছে। সেটাকে যেন সে ভাঙিয়া ফেলিতে চায়।

সেদিনও মনে হইয়াছিল, আজও এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্মৃতির তপস্যা করিতে করিতে শুধুই মনে হইতেছে, চন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া আমার উচিত হয় নাই, ভাল করি নাই। ঘুমন্ত ক্ষুধাতুরকে জাগাইয়া দিয়া শুধু অশান্তিরই সৃষ্টি করা হয়। বেশ বুঝিলাম, চন্দ্রনাথের অন্তঃস্তলের ঈর্ষা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকা পথে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলাম, বলিলাম, ওসব কথা আজ থাক চন্দ্রনাথ। আজ তোর কথা বল। যুদ্ধে গিয়েছিলি বলছিলি না?

সে বলিয়া উঠিল, মিলিটারী লাইফ অদ্ভুত। ঐ একটি লাইন, যার শৃঙ্খলা আমার দাসত্বের মধ্যেও বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু হত্যাকাণ্ড—সে চরম বর্বরতা! 'সেলফ' ব'লে কিছু নেই সেখানে—মানুষ নেই, মনুষ্যত্ব নেই; আছে শুধু শৃঙ্খলা, ডিসিপ্লিন। কিন্তু আশ্চর্য, তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব মুহুর্মুহু আকাশস্পর্শী মিনারের মত রূপ গ্রহণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রত্যেক সৈনিকটির মৃত্যু এমনই এক একটি টাওয়ার। গিয়ে আমার আক্ষেপ হয়েছিল অপচয় দেখে,—পৃথিবীর জনবল, শিল্প—উঃ, বড় বড় শিল্প, কত শিল্পীর সাধনার ধন, জ্ঞান, বিজ্ঞান—সমস্তের অপচয়।

আমি বাধা দিলাম, বলিলাম, না ওভাবে নয়, দেশ ছাড়ার পর থেকে তোর কাহিনী আমায় গুছিয়ে বল।

হাসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, লিখবি নাকি? আচ্ছা—

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম মনের মধ্যে বিপুল একটা ক্ষোভ নিয়ে। হীরুর ওপর হিংসে প্রাণের মধ্যে ছিল, আর সেইটেই বোধ হয় সেদিন শক্তির কাজ করেছিল আমার মধ্যে।

আমি গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুনিতেছিলাম। সুদীর্ঘ প্রবাহিনী। বহুদূরে দিগ্বলয়রেখার কোলে আকাশে গঙ্গায় যেন মেশামেশি হইয়া গিয়াছে। সেখানে কতকগুলা পালতোলা নৌকা চলিতেছিল, মনে হইতেছিল, গঙ্গার বুক ঘেঁষিয়া যেন এক ঝাঁক বক উড়িয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে সব যেন অর্থহীন হইয়া চন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে।

চন্দ্রনাথ বলিতেছিল—

রাত্রেও সেদিন বিশ্রাম করিনি। অন্ধকার রাত্রি, নির্জন পথ—দুধারে পাথুরে প্রান্তর। তারই মধ্য দিয়ে নক্ষত্রের আলোয় পথ হেঁটে চলেছিলাম আমি। বড় একটা কিছু করব—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার বুকের মধ্যে। তারপর বর্ধমান জেলায় এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—

আমি যেন স্পষ্ট সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। পারিপার্শ্বিক হারাইয়া গেল, আমার

মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলাম, বর্ধমান, মানভূম, হাজারিবাগের বিচিত্র পটভূমির উপর দিয়া কিশোর চন্দ্রনাথ চলিয়াছে। কাঁধে লাঠির প্রান্তে ঝোলানো বোঁচকা, শ্রমিকের মত বেশ। উর্বর শস্যক্ষেত্র, রক্তরাঙা অসমতল প্রান্তরের মধ্যে কলিয়ারির গিয়ার-হেড চিমনি, ধোঁয়া—তাহারই মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তারপর হাজারিবাগের অরণ্যভূমি। দূরে দূরে আকাশের কোলে কোলে পাহাড়ের নীলাভ তরঙ্গ-বিন্যাস। সমস্ত পার হইয়া আমার কিশোর চন্দ্রনাথ আসিয়া উঠিল সিংভূমে।

চন্দ্রনাথ বলিল, টাটানগর যাব ব'লেই বেরিয়েছিলাম। টাটানগর থেকে দশ বারো মাইল দূরে একটা গ্রামে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত্রের মত গ্রামটায় আশ্রয় নিলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কিন্তু আকাশ আলো হয়ে উঠেছে—আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় যেন আগুন লেগে গেছে। শুনলাম, টাটার কারখানায় ব্লাস্ট-ফারনেসের শিখার দীপ্তি। রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। সুবর্ণরেখার তীরে এসে দাঁড়িয়ে একবার ওদিকে তাকালাম, মনে হ'ল বিরাট বিস্ময়! সারি সারি চিমনি, যন্ত্রের শব্দ, দিনের সূর্যালোকে ফারনেসের আগুনের আভা দেখা যায় না; দেখা যায় বকের পাখার মতো সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর অনুভব করা যায় তার উত্তাপ। যেদিন প্রথম কারখানায় ঢুকলাম, সেদিন মনে মনে প্রণাম করলাম মানুষকে—জেমসেদজীকে। তখন সবে লড়াইয়ের আরম্ভ। কারখানা হু হু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। উঃ, সে কি বিরাট, আর সে কি শব্দ! ইলেক্‌ট্রিক ক্রেনের শব্দে সমস্ত নার্ভ যেন শিউরে ওঠে। কাদার মত লোহার তালকে ইচ্ছামত গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। গলিত লোহা গল গল ক'রে জলের মত ফায়ার-ক্লের পয়োনালী বেয়ে চলেছে। ঢুকে পড়লুম ডে-লেবারার হয়ে সেখানে। সে কাজ ক'রে গৌরব আছে নরু। ওই এতবড় বিপুল শক্তি, মানুষ তাকে ইচ্ছামত চালনা করছে। উঃ! স্টীল ফারনেসের ভিতর গলিত স্টীলের তাল, সে যেন সূর্যের একটি ভগ্নাংশ, ফারনেসের ঢাকনা খুলে দিয়ে তারই মধ্যে 'শভেল'-এ ক'রে কেমিক্যালস দিতাম আমি। অদ্ভুত, অদ্ভুত কাজ!

এই সময় একজন পাঞ্জাবী আসিয়া তাহাদের ভাষায় চন্দ্রনাথকে কি বলিল। চন্দ্রনাথ সেই ভাষায় তাহার সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কে?

ও আমার কারখানার মিস্ত্রী।

কারখানা!—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, এখানে আমার একটা মোটর মেরামতের কারখানা আছে। ওই আমার এখন জীবিকা। যাক, একটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে আমার উন্নতির পথ সেখানে খুলে গেল। রোলিং-মেশিন হাউসে একটা কাজে আমি গিয়েছিলাম। রোলিং-মেশিন অবিরাম ঘুরছে, তারই বেগে আগুনের মত রাঙা স্টীলের বীম এগিয়ে চলেছে, মধ্যে মধ্যে মেশিনে পিটে কেটে ইচ্ছামত আকার ক'রে নিচ্ছে। সেইখানে মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিক ক্রেনে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল আর একটা জ্বলন্ত লোহার বীম; হঠাৎ বীমটা ক্রেন থেকে খ'সে নীচে পড়ে গেল। সেখানে কাজ করছিল একটা পাঠান লেবারার, তারই ওপর পড়ল। সে একবার মাত্র চীৎকার করেছিল, কিন্তু মর্মান্তিক চীৎকার—জান বাঁচা-ও! একজন ছোকরা বাঙালী ভদ্রলোক, ওভারম্যান তিনি, সুইচের চার্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাগলের মত ছুটলেন ওই লোকটাকে বাঁচাতে। আমি কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারতাম, যদি তাঁকেই ধরতাম; কিন্তু ওদিকে তখন সুইচ যদি বন্ধ না করি তবে রোলিং-মেশিনে ভয়ানক ক্ষতি হয়। নীচে রোলিং-মেশিনে হয়েছে কি,—একটা

বীম কেমন করে বেঁকে, দুটো রোলারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি ছুটে গেলাম সুইচের কাছে। আর এ ভদ্রলোক—নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁর, একটা লোহার পাতে জুতো পিছলে তিনি এসে পড়লেন সেই জলন্ত বীমটার ওপর। দুজনেই মারা গেল। আমি সুইচ অফ ক'রে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। চমক ভাঙল সাহেবের পিঠ-চাপড়ানিতে। বললে, আশ্চর্য নার্ভ তোমার! চান্স পেয়ে গেলাম, কিছুদিনের মধ্যেই একটা পরীক্ষা দিয়ে ওভারম্যান হলাম।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, লোকটাকে না বাঁচিয়ে যন্ত্রটাকে বাঁচাতে গেলি তুই?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, ওই যন্ত্রটার কোন অংশ, কি যন্ত্রটাই যদি অচল হ'ত তবে কত ক্ষতি হ'ত সে তুই অনুমান করতে পারবি না। তুই শুধু ভাবছিস, ওই একটা যন্ত্র; কিন্তু আমার চোখে মনে হয়, ব্রহ্মলোকের একটা অংশ প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হয় সেখানে।

আমি কিন্তু তখন চোখের উপর দেখিতেছিলাম, অর্ধদগ্ধ বাঙালীর ছেলেটিকে, যন্ত্রণায় সে যেন ছটফট করিতেছে। চন্দ্রনাথ চুপ করিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সচেতন হইয়া বসিলাম। মনের মধ্যে দৃশ্যান্তর কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ওপারের দিকে তাকাইলাম। সূর্য ঢলিয়া পাটে বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়খানা দেশী নৌকা ওপারের চর হইতে ফসল বোঝাই লইয়া এপারে আসিতেছিল। এপারে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া একজন মাঝি মাঝগাঙের একখানা নৌকাকে ডাকিতেছিল, আ—হো!

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলাম, তারপর?

চন্দ্রনাথ বলিল, আমাকে আটকাবার শক্তি কারও ছিল না। আমি ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে স্পেশ্যাল ট্রেনিং-এর জন্যে বিলেত বা আমেরিকা পাঠাবার সংকল্প করছিলেন। এমন সময় পড়ল বাঙালী পল্টন রিক্রুটের সাড়া। মনে হ'ল, দি প্লেস ফর মি, দি ওয়ার্ক ফর মি! ছেড়ে দিলাম চাকরি। রিক্রুটিং অফিসার আমার দেহ দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যিই তুমি বাঙালী? খাঁটি বাংলায় জবাব দিলাম, হ্যাঁ সাহেব।

গঙ্গার ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে আবার আরম্ভ করিল, সেদিনের অনুভূতি, মনের কল্পনার পরিধি আজ স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে। সেদিন কল্পনা করেছিলাম কি জানিস, কি হবে এ কারখানায় পাঁচ-শো সাত-শো কি হাজার টাকা মাইনের চাকরি ক'রে? আর এ বিপুল একটা বাহিনীর শীর্ষে বসব আমি, সম্মুখে টেবিলের ওপর থাকবে ফিল্ডের ম্যাপ, আশেপাশে সারি সারি টেলিফোন। সংবাদ আসছে, আর ছোট ছোট আলপিনের পতাকাগুলি তুলে তুলে বসাচ্ছি। কবিতা কি সাহিত্যে আমার খুব প্রীতি ছিল না, সে তুই জানিস, কিন্তু সেদিন বার বার রবীন্দ্রনাথের কটা লাইন আমার মনে পড়ছিল, আজও মনে পড়ছে—

> হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
> হাতে ল'য়ে জয়তুরী
> জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
> রাজ্য ও রাজ্য ভাঙিয়া গড়িতে
> অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
> হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

সে চুপ করিল।

এই সময় চন্দ্রনাথের স্মৃতির সহিত সম্বন্ধহীন একটি ঘটনা সেদিন ঘটিয়াছিল; সেটুকুও আজ মনে পড়িতেছে। কেমন করিয়া মালার সঙ্গে যেন বাড়তি একটি ফুল গাঁথিয়া উঠিয়াছে।

আকাশে সেদিন পাতলা স্তরের মেঘ ছিল। অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মি সে স্তরমেঘের উপর যেন আবীর ছড়াইয়া ছিল। মধ্য-আকাশ পর্যন্ত রঙিন। ওপারের ক্ষেতে রক্তসন্ধ্যার আভা, গঙ্গার বুকে যেন গলিত সোনার ঢল নামিয়াছে।

চন্দ্রনাথের বাংলোর পাশেই কানপুর ওয়াটার ওয়ার্কসের পাম্পিং স্টেশন। ছোট একটি বাঁধানো ঘাট, ঘাটের উপরেই বাগান, রাঙা গোলাপের সমারোহ শুধু তাহার উপর রক্তসন্ধ্যার আভায় রাঙা রঙ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। বেশ দেখিতেছি ঘাসে বসিয়া আছেন এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক, আর তাঁহার শিশুকন্যা—বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে। সহসা মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিল, এক আঁচল জল তুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া ফেলিয়া দিল। আবার এক আঁচল তুলিল, আবার ফেলিয়া দিল। আবার তুলিল।

ভদ্রলোক মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, কি করছ তুমি?

হাতের অঞ্জলির জল দেখিতে দেখিতে মেয়েটি সকরুণ স্বরে বলিল, জলের সোনা কোথায় গেল বাবা?

জলের স্বর্ণবর্ণও ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সূর্যের একফালি মাত্র তখন আকাশে ছিল।

সাত

এই সময়ে বোধ হয় মীরা আসিয়াছিলেন। হ্যাঁ, বেয়ারাটা আসিয়া টী-পয় পাতিয়া দিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল, তারপরই মীরা আসিলেন কতকগুলি খাবার লইয়া। আসিয়াই পুলকিত হাস্যমুখে চন্দ্রনাথকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিলেন, বল দেখি, আজ কি খাবার করেছি?

চন্দ্রনাথ বলিল, পাঞ্জাবী।

সকৌতুকে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া তিনি বলিলেন, না না না।

তবে, পেশোয়ারী, কি মাড়োয়ারী।

হ'ল না, হ'ল না। মীরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

তারপর আমাকে বলিলেন, নিন্দে করতে পাবেন না আপনি। আমি আজ বাংলা দেশের খাবার করেছি। তিনি টেবিলের উপর নামাইলেন কতকগুলি পিঠা চন্দ্রপুলি।

চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে একখানা চন্দ্রপুলি মুখে পুরিয়া বলিল, বাঃ!

আমি মুগ্ধ হইয়া মীরাকে দেখিতেছিলাম। এ বেলায় তাঁহার পরনে ছিল শাড়ি, হিন্দুস্থানী ধরনে পরা গাঢ় লাল রঙের শাড়ি, গায়েও তাঁহার লাল-রঙের ব্লাউজ, যেন অগ্নিশিখার মধ্যে অগ্নির প্রিয়তমা দীপ্তি সে। আর তাঁহার ঠিক সম্মুখে পশ্চিম দিগ্বলয়ে তখনও রক্তাভার রেশ। এ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া উপায় ছিল না।

আমি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, বসুন।

মীরা হাসিয়া চন্দ্রনাথকে বলিলেন, বসব আমি?

চন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বসবে? কিন্তু খাবারগুলো তো আজ নিজ হাতে তোমাকে করতে হবে। রাত্রে বেস্ট পাঞ্জাবী ডিশ খাওয়াতে হবে নরুকে।

মীরা বলিলেন, তবে আমি যাই।

তিনি পিছন ফিরিতেই আমার চমক ভাঙিল। আমি বলিলাম, না না না, আপনি বসুন, আপনি বসুন। আপনি নিজে হাতে রান্না করবেন সে হবে না। তার চেয়ে আপনি এখানে বসুন, তাতে ঢের বেশি আনন্দ হবে আমার।

মীরা স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ কিন্তু খুশি হইল বলিয়া মনে হইল না। সে বলিল, আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মীরা? বসতে বললে তোমাকে, তুমি ব'স।

মীরা বসিলেন। আমি বলিলাম, আপনাদের এই কাপড় পরবার ধরনটি আমার বড় ভাল লাগে। আর আপনাদের কাপড়ের রঙের বাহার! বর্ণ-বৈচিত্র্যের ওপর আপনাদের একটা স্বাভাবিক প্রীতি আছে, চমৎকার আপনার শাড়ির রঙটি! লাল অনেক দেখেছি কিন্তু এমন গাঢ় লাল—আপনাকে দেখাচ্ছে বড় সুন্দর!

চন্দ্রনাথ বলিল, ফতেপুরসিক্রির মেলাতে কি এই কাপড়খানাই তুমি পরনি মীরা?

মীরার মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। মনে আছে তোমার আজও?

চন্দ্রনাথ বলিল, ও পোশাক তুমি পাল্টে এস। ও পোশাক প'রে তুমি আমি ছাড়া আর কারও সামনে এসো না।

মীরা অপরাধিনীর মত নত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও উঠিয়া পড়িল।

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, চন্দ্রনাথ এত দুর্বল! অনাবৃত বাল্যজীবনের মধ্যে কোথায় কোনখানে লুকাইয়া ছিল তাহার দুর্বলতা! গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াও ক্রমশঃ দূরতর হইয়া বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম, মীরা চলিয়া গেলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে বলিষ্ঠ পায়ের ভারী জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, চন্দ্রনাথ মীরার অনুসরণ করিতেছে। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, মীরার উপর দুর্ব্যবহার করিবে না তো? পর্দার অন্তরালে আলোকিত কক্ষ-মধ্যে মীরা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পর্দার বুকে তাঁহার ছায়া আমি দেখিতেছিলাম, কিন্তু ছায়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির গতিহীন। চন্দ্রনাথও পর্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সবল ভ্রূক্ষেপহীন গতিবেগে এবার পর্দাটা একদিকে সরিয়া গিয়া জড় হইয়া গেল। আমার চোখের সম্মুখে আলোকিত কক্ষটার একাংশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ দুর্ব্যবহার কিছু করিল না, মীরাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। মীরার মুখের উপর তাহার মুখ নামিয়া আসিতেছিল। আমি উদ্বেগ অপসরণের আনন্দে সুস্থ হইয়া গঙ্গার বক্ষস্পর্শী অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইলাম। দিগ্বলয় হইতে অন্ধকার আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিয়া বলিল, মানুষের মনের সিংহদ্বারের পাশে অসংখ্য ভিক্ষুকের বাস। এক একটি আকাঙ্ক্ষা—যশের আকাঙ্ক্ষা, মানের আকাঙ্ক্ষা, ধনের আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই মানুষের। এরা যেন এক একটি ভিক্ষুক। না, ভুল বলছি, প্রত্যেকে তারা আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, নাদিরশাহের মত এক-এক অভিযানের নেতা। এক-এক জন এক-এক সময় এসে মনের সিংহাসন দখল ক'রে বসছে। যেদিন বাঙালী-পল্টনে নাম লেখালাম, সেদিন পর্যন্ত আমার মনের সিংহাসন দখল ক'রে বসে ছিল বিপুল প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

আমি হাসিয়া বলিলাম, ছেলেবেলার ধারণায় আমি মনে করতাম তুই খুব প্র্যাক্‌টিকাল, কিন্তু আসলে দেখছি, তুই খুব সেন্টিমেণ্টাল।

চন্দ্রনাথ বলিল, পাথরের ওপরে ফুলের গাছ হয় না, লোকে বলে তাকে মৃতমৃত্তিকা; কিন্তু পাথরে সবুজ শেওলার স্তর দেখা যায়। কোন্ মানুষ সংসারে আছে, যে সেন্টিমেণ্টাল নয় নরু? চোখের জল যে শরীরযন্ত্রের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে ব'সে আছে। যতই মন শক্ত পাথরে পরিণত কর, চোখের জলের পয়োনালীতে বাঁধ দাও, সে শেষে ওই পাথর-মনকে আবৃত ক'রে সবুজ শেওলার মত আত্মপ্রকাশ করবে। যাক্ গে শোন। ফিল্ডে গিয়ে আবার আঘাত পেলাম। সেখানে দেখলাম, ওপরে ওঠবার পথ নেই। কালো রঙের আমাদের স্থান চিরদিন নীচে, বরফের মত আমাদের মাথায় চেপে থাকবার কায়েমী আসন সাদা জাতের। তবু আশা করলাম যুদ্ধশেষে একটা বড় চান্স পাব। কিন্তু আশ্চর্য, মন যেন ধীরে ধীরে বৈরাগী হয়েই উঠতে লাগল। ও মরণের মহা-মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে যেন শিউরে শিউরে উঠতাম। মৃত্যুভয়ে নয়, সৃষ্টির অপচয় দেখে। নিজের জীবনের নশ্বরতার জন্যে একদিন একতিলও আক্ষেপ হয়নি আমার। কিন্তু মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখে, তার পৈশাচিকতা দেখে দুঃখের ক্ষোভের আর সীমা থাকত না। স্বার্থপর মানুষ স্বার্থের বর্বরতায় সৃষ্টির যে ক্ষতি করলে, কতকাল যাবে সৃষ্টির বিধাতার সে ক্ষতি পূরণ করতে!

অবসর-সময়ে মেসোপটেমিয়ার খর্জুর কুঞ্জের তলে বসে বসে তাই ভাবতাম। মনে হ'ত, এমন বাণী, এমন মন্ত্র সংসারে প্রচার করব, যার ঝঙ্কারে মানুষ ক্ষুদ্র যা-কিছু সব ভুলে যাবে। যুদ্ধশেষের ঠিক আগেই একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যাতে মনে আর দ্বিধা থাকল না, সংকল্প দৃঢ় ক'রে ফেললাম। মনের মধ্যে যশ ও প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা সম্রাট হয়ে বসে ছিল, তার সিংহাসন টলে গেল। সেই সিংহাসনে এসে বসল এক বাউল। অবাক হয়ে আজও ভাবি, সে কোথায় ছিল আমার মনের মধ্যে! একটা টার্ক প্রিজ্‌নার, তার প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত শান্ত; সেইজন্য তাকে আমাদের লেবারারদের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু একদিন, কে জানে কেন, হঠাৎ একটা ছোট কথায় ক্ষেপে উঠে মারতে গেল আমাদের লেবার-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে। সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তি হয়ে গেল কি জানিস? তার হাত পা বেঁধে তাকে রেললাইনের ওপর শুইয়ে তার পায়ের ওপর দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হ'ল। অবশ্য কর্তৃপক্ষের অগোচরে এটা হ'ল, কিন্তু আমার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠলো। দৃঢ় সংকল্প করলাম, সন্ন্যাস গ্রহণ করব আমি। পৃথিবীর জন্যে শান্তির বাণী বহন করে আনব—অমৃত-লোক থেকে। যুদ্ধশেষে আমার সার্ভিসের জন্যে আমাকে ইংলণ্ডে যে কোন ট্রেনিঙের জন্যে পাঠাতে চাইলে। ইচ্ছে করলে তখন আমি আই, সি, এস,-ও হতে পারতাম কিন্তু সে সমস্ত আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার অফিসার আশ্চর্য হয়ে বললেন, ইয়ংম্যান, এ তুমি করছ কি?

আমি বললাম, কি করছি সাহেব?

সাহেব বললেন, এ চান্স তুমি ছেড়ে দিচ্ছ?

বললাম, হ্যাঁ সাহেব।

বাউল বৈরাগীর প্রজা তখন আমি—বেরিয়ে পড়লাম, সম্বল এক লাঠি। এই লাঠি নিয়েই দেশ থেকে বেরিয়েছিলাম, আর খান-দুয়েক কম্বল আর লোটা—ব্যস।

•

বাউল চন্দ্রনাথের মূর্তি আমি কল্পনা করতে পারি না। সেদিনও পারি নাই, আজও পারিতেছি না। বার বার মনে হইতেছে, চন্দ্রনাথও তাহার এ জীবনের প্রতিবিম্ব কোন দিন নিজের চোখে দেখে নাই। আমি কল্পনার চোখে দেখিতেছি, বিপুল প্রতিষ্ঠালিপ্সু যুবা,

সম্বলহীন, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে পৃথিবীর মাথার উপরে বসিবে, সে বুদ্ধ নয়, খ্রীষ্ট নয়, ধর্মগুরু—রোমের পোপ হইতে চায় সে। তাহার ক্ষুধিত বৈরাগ্য প্রাপ্তির জন্য উন্মাদ!

চন্দ্রনাথ বলিল, সত্যই নয়, দেশে এসে দিন কতক বাউল হয়ে ঘুরলাম। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরলাম, একবার নয়—দুবার। সমুদ্রের তীরে, বনে হিমালয়ের ওপরে, মন্দিরে, মসজিদে, কবরে; কত জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু যা চাই আমি, তা পেলাম না।

সে চুপ করিল। তাহার মনশ্চক্ষে কি যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি, ধ্যানমগ্নের মত চোখের দৃষ্টি দেখিয়া তাহাই মনে হইল। চন্দ্রনাথ বলিল, এই সময় একদিন এক বাঙালী বুড়ীর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়—বদরীনাথের পথে দেখা। যাত্রীরা সব ফিরছে তখন। আমায় দেখে আমার মুখে বাংলা কথা শুনে বুড়ী কেঁদে আকুল। বলে, তুই যে বাবা নদের নিমাই, কোন্ হতভাগীকে কাঁদিয়ে পালিয়ে এসেছিস, বল! কোথায় তোর বাড়ি বল!

আমি প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেউ নেই আমার। সে কিছুতেই বুঝবে না। আমার সঙ্গে থাকতে গিয়ে তার সঙ্গীরা এগিয়ে চলে গেল। বুড়ী কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। বলে, কেউ যদি নেই তোর, আমার সঙ্গে চল তুই। দেশে আমার ছেলের দু-হাজার টাকা আয়ের জমিদারি, তোকে বাড়িঘর ক'রে দেবে, বিয়ে দিয়ে দেবে। সে এক মহাবিপদ! অবশেষে বুড়ীকে ঠকিয়ে চ'লে আসতে হ'ল। কিন্তু আসবার সময় কেঁদেছিলাম আমি।

আমিও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলাম না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইবার জন্য দেশলাই জ্বালিয়া দেখি চন্দ্রনাথের চোখে আজও জল দেখা দিয়াছে। বলিলাম, সত্যিই যে চোখে জল এল!

হাসিয়া যেন লজ্জিত হইয়াই চোখ মুছিয়া সে বলিল, বাঙালী মেয়ের মত মা হ'তে কোন জাত পারবে না। মা যশোদা গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইবেন, তাই কত চিন্তা—কত কান্না। অনেকে হাসে, বলে লুডিক্রাস, কিন্তু আমার বড় ভাল লাগে। বুড়ীর কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

একটুক্ষণ পরে সে আবার বলিল, এক-এক সময় ভাবি, বুড়ীকে না ঠকিয়ে যদি তার সঙ্গেই যেতাম, তবে থাকতাম হয়তো ভালোই। বুড়ীকে মা পেতাম, বেশ একটি গোলগাল শ্যামবর্ণা মেয়ে বিয়ে করতাম, তার মুখঝামটা খেতাম, আর দাওয়ায় বসে তামাক টানতাম। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মুহূর্তে সে কথা আমার প্রায় মনে হয়।

আমার মনে পড়িয়া গেল বউদিদিকে।

পরমুহূর্তে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দূর দূর, এক-এক সময়ে মানুষ ইডিয়ট হয়ে ওঠে। যাকগে, তারপর শোন—

শেষে সংকল্প করলাম, আর একবার যাব হিমালয়ে—আমার পাওনা আমাকে পেতে হবে। রওনা হলাম। ঘুরতে ঘুরতেই চলেছিলাম। হঠাৎ একদিন ঘোরার ওপরেও বিরক্তি ধরে গেল। ঠিক করলাম, সটান গিয়ে উঠব হিমালয়ে। পথে ফতেপুর সিক্রিতে গিয়ে দেখি, লোকের ভিড় জমেছে, ও-সময় সেখানে মেলা। ভাবলাম, মেলাটা দেখে আগ্রায় গিয়ে ট্রেন ধরব। মেলার মধ্যে গিয়ে কিন্তু মেলাটা না দেখে যেতে পারলাম না। সে মেলা তুই দেখিস

নক্ষ। বড় বড় এক্‌জিবিশন, শোনপুরের মেলাও দেখেছি, কিন্তু এ অপরূপ, অতি সুন্দর।

সে মেলা আমিও দেখিয়াছি; সত্যই সে মেলা অপরূপ, অতি সুন্দর; আজও স্মরণ করিলে চোখে দেখিতে পাই। সেদিনও চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, আমি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম, কানপুরের গঙ্গাগর্ভের অন্ধকারের মধ্যে সে মেলার দৃশ্য যখন ভাসিয়া আসিল। অপরূপ দৃশ্য—কবরের চারিপাশে জীবনের কোলাহল, সেলিম চিস্তির স্মৃতিকে ঘেরিয়া যেন নওরোজের মেলা। রঙ রঙ আর রঙ, চারিদিকে যেন রঙেরই খেলা। বিচিত্র বর্ণের—ফিকা লাল, গাঢ় লাল, গোলাপী সবুজ, গাঢ় সবুজ, বাসন্তী, চাঁপা, হলুদ, রামধনুর মত সপ্তবর্ণে অনুরঞ্জিত শাড়ি ও কাঁচুলি পরিয়া সুন্দরীরই মেলা। দলে দলে তাহারা চলিয়াছে। সঙ্গে পুরুষ আছে, মেলাতেও পুরুষ আছে; কিন্তু তাহারা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, চোখে পড়ে না। সূর্যকরবিম্বিত পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় আবরিত সাগরের ঢেউয়ের মত রঙিন-শাড়ি-পরা মেয়েরা যেন ফেনা, পুরুষেরা জল। ফেনার বর্ণচ্ছটাই আগে চোখে পড়ে। মেয়েরা আছেন দলের আগে। কয়টি ভিখারিণী মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের অঙ্গেও বিবর্ণ জীর্ণ রঙীন কাপড়। গাছতলায়, পান্থশালায়, বড় বড় পুরাতন পরিত্যক্ত প্রাসাদসমূহের বারান্দায় আপন আপন স্থান করিয়া লইয়া তাহারা যেন ওই গঙ্গাবক্ষের অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট আমার চোখের সম্মুখে বসিয়া আছে। পথ বাহিয়া আবার কত দল চলিয়াছে, ঠিক ওই ঢেউয়ের মতই, খানিকটা আসে আবার দাঁড়ায়, তত্ক্ষণে পিছনের দল তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, আবার ইহারা চলে। গঙ্গায় জলতরঙ্গ-ধ্বনির মধ্যে নূপুর বাজিতেছে, বাঈজীর দলে যেন গানবাজনা চলিতেছে।

চন্দ্রনাথের বাড়ির পাশেই কোন গৃহস্থ বাড়িতে মেয়েদের বাদানুবাদ চলিতেছিল, আমার মনে হইল, সেই মেলায় কোন গৃহস্থের দলে যেন কি রান্না হইবে তাই লইয়া তর্ক চলিয়াছে। বাদানুবাদ থামিয়া হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, রান্না লইয়া মতভেদ মিটিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, বাজারে বাজারে মেয়েরাই দর করছেন। হরেক রকমের জিনিস, রঙিন কাঠের খেলনা, পিতলের মূর্তি, কাঁসার সামগ্রী, জয়পুরী, মীনা-করা শখের জিনিস, শ্বেতপাথরের পুতুল ও বাসন, সুর্মা, জর্দা, আতর, রঙিন কাপড়, ফুলের গাছ, ফলের গাছ, পাখা, চামর, গালার চুড়ি, সত্যিই সে যেন নওরোজের বাজার, রূপের হাট। আমি যেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম, আমার মনের বাউলের গৈরিক উত্তরীয়তে যেন মুহুর্মুহুঃ চারিদিক থেকে টান পড়ছিল। মনকে কঠিনভাবে বাঁধলাম।

আমি হাসিয়া বলিলাম, বৈরাগীকে ওই রূপের হাটে সমাধি দিয়ে দিলেই হ'ত। তারও হ'ত অক্ষয় স্বর্গবাস, তোর জীবনেও কাব্য মূর্ত হয়ে উঠত।

চন্দ্রনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, উচ্চ হাসি চন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক। তাহার পুলকিত উচ্চ হাসিতে আমিও পুলকিত হইয়া উঠিলাম, বুঝিলাম, তাহার মনের গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ, কি বলিস! শোন তারপর। একখানা এক্কা ভাড়া ক'রে মেলাটা ঘুরে আগ্রা গিয়ে ট্রেন ধ'রে যোশীমঠের দিকে রওনা হব সংকল্প ছিল। মেলাটা অর্ধেকটা ঘুরেই এক্কাওয়ালাকে বললাম, আর না, মেলা থেকে বেরিয়ে পড়। তার মেলাটা ঘোরবার ইচ্ছা ছিল; সে বললে, আমীর, ওপাশটা দেখবেন না? ওদিকে সব 'বড়ঘরনা' জেনানা লোক রান্নাবান্না ক'রে খাচ্ছে। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, ও পাজী, চল

চল, জলদি চল। মেলার শেষ দোকানটায় জর্দা-সুরতি বিক্রী হচ্ছিল, খানিকটা নস্যির জন্যে দোকানটায় ঢুকলাম, নস্যি কিনে নিয়ে রওনা হলাম। জনকোলাহল পেছনে পড়ে রইল। এক্কাটা ঝুনঝুন ক'রে চলছিল। বেশ মনে আছে নরু, মনের বাউলকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি দেবে তুমি আমাকে? মনে মনে কল্পনা করছিলাম, অমৃতলোকের বাণী নিয়ে ফিরব, শীর্ণ শরীর, কিন্তু জ্যোতির্ময়! পথের মধ্যে লোক ছিল না, কেবল একদল শেঠ, শেঠ বলেই মনে হ'ল তখন, মেলার দিকে চ'লে গেল। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী, ছেলেও রয়েছে। তারা বোধ হয় স্নান ক'রে ফিরছিল। ওই পথের ধারে আর একটু আগে একটা 'তালাও' আছে, বেশ নির্জন। ভদ্রমহিলারা অনেকে নির্জন স্থানের সুবিধায় আর পুকুরে অবগাহন-স্নানের সুখে, ওখানে স্নান করতে যান। পেছনে তারা প'ড়ে রইল, জোর সংকল্প ক'রে দৃষ্টিকে সম্মুখে নিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু একখানা শাড়ির রং আমায় মুহুর্মুহুঃ পেছনের দিকে আকর্ষণ করছিল। গভীর লাল রঙের শাড়ি। শাড়ির অধিকারিণীকে লক্ষ্য করি নি, কিন্তু ওই রঙ, গাঢ় লাল রঙ, বড় ভাল লাগল। আমি ফিরে তাকাতে বাধ্য হলাম। কিন্তু তাদের আর দেখতে পেলাম না। মনের দ্বন্দ্বে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছিল; তাদের দেখতে পেলাম না, কিন্তু খেয়াল হ'ল, আমার ছড়িগাছটা তো নেই! এক্কার চারিপাশ খুঁজলাম, কোথাও না, ছড়ি নেই। এক্কাওয়ালাটাকে বললাম, থামাও এক্কা। সে গাড়ি থামালে। তাকে বললাম, আমার ছড়ি কোথায় ফেললি বেকুব? সামান্য ছড়ি, মূল্য দিয়ে আমি কিনিইনি। ওহো, তুই তো জানিস, মনে আছে তোর, আমরা দুজনে একসঙ্গে দুগাছা ছড়ি কেটেছিলাম? সেই ছড়ি নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, দীর্ঘদিনের সঙ্গী সে আমার।

ছড়িটার কথা স্মরণ হইল, স্কুলে পড়িবার সময় আমরা দুইজনে দুইগাছা বাঁশের ছড়ি কাটিয়েছিলাম। আমার লাঠিগাছটি কোন্ দিন হারাইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, ভাবলাম, অনেক মমতা জড়িয়ে আছে ছড়িগাছটায়। ওটা আজ এই যাওয়ার পথে হারিয়ে যাওয়াই ভাল। নিঃশেষে মমতা মুছে যাক। কিন্তু মন মানলে না। এক্কাওয়ালাটা বললে, মায়-বাপ, আমি সামনে ব'সে গাড়ি হাঁকাচ্ছি, আমি কেমন ক'রে ছড়ির খবর জানব? কথাটা সত্যি। সে আবার বললে, হুজুর আমার বেশ মনে আছে, আপনি যখন মেলাটার শেষ দোকানে নেমে সওদা করলেন, তখনও আপনার ছড়ি এক্কার ওপরে ছিল। তা হ'লে ছড়ি আপনার মেলার পর থেকে এই রাস্তাটুকুর মধ্যে প'ড়ে থাকবে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বললাম ঘুমাও এক্কা। ফিরলাম, মেলায় এসে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু কোথায় ছড়ি? ছড়ি মিলল না। মেলার মুখে দাঁড়িয়ে ছড়িগাছটাকেই ভাবতে লাগলাম। বহুদিনের জীবনপথের দোসর আমার। আমার দেহের ভার বয়েছে, আমার মোট বয়েছে, কত পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছে, কখনও বেইমানী করেনি, বিপদের সময় দূরে স'রে দাঁড়ায়নি।

বাবুজী! এক্কাওয়ালাটা বললে, বাবুজী, একজন শেঠ শুধু এই পথ ধরে গিয়েছে, আর কেউ যায়নি। তালাও থেকে তারা মেলায় এসেছে। আমার মনে হচ্ছে, তারাই ছড়িগাছটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

আমার মনে প'ড়ে গেল, গাঢ় লাল রঙের শাড়ি; সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চল মেলার মধ্যে, বের কর তাদের খুঁজে।

বেশ মনে আছে, নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়াছিলাম। চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছিল, কি

রকম ? গল্প জ'মে উঠেছে বুঝি ?

হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম, তাই তো মনে হচ্ছে—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, আমায়ও একটা দে।

বলিলাম, তোর ধর্মে তো ধূমপান নিষেধ।

সে বলিল, ধর্ম আমি মানি না। আমার ধর্ম আমার নিজস্ব।

সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল, তা হ'লে আর এক কাপ ক'রে চা খাওয়া যাক। মীরা! মীরা!

মীরা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

চন্দ্রনাথ উঠিয়া গিয়া সাদরে বলিল, মেহেরবানি ক'রে আর দু কাপ চা ফরমায়েস যদি ক'রে দাও মীরা।—বলিয়া তাঁহার গালে একটি টোকা মারিয়া দিল। মীরা হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ আসিয়া বসিয়া আবার আরম্ভ করিল, কোথায় সে শেঠের দল ? মেলার মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে তাদের বের করতে পারলাম না। সে রঙের শাড়িও আর চোখে ঠেকল না। তখন খুঁজতে আরম্ভ করলাম গাছতলা আর বড় বড় প'ড়ো বাড়িগুলো। যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, একদল শেঠ—সঙ্গে মেয়েছেলে আছে—একজনের তার মধ্যে 'বহুত জিল্লাদার লাল রঙকা শাড়ি', কোথায় তাঁরা আছেন সন্ধান দিতে পারেন ? সবাই একটা সন্ধান দেয় ; কিন্তু সব ভুল। একটা বাঈজীর সারেঙ্গীদার, সে আমায় নিয়ে গিয়ে তুললে তার বাঈজীর আস্তানায়। যাকগে, শেষে হতাশ হয়ে ফিরলাম। হঠাৎ পথের পাশের একটা বড় বাড়ির বারান্দায় যেন দেখলাম সেই শাড়ির রঙ। নেমে পড়লাম। সন্ধান নিয়ে জানলাম একদল শেঠ সেখানে আছে, ওপরে দোতলায়। লাল শাড়িও আছে, 'হারাও' আছে—সব রকম রঙের শাড়িই সে দলে আছে ! অনেক ভেবে এক্কাওয়ালাটাকে ওপরে পাঠালাম। বহুত আদব-কায়দা পাখীর মত শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম। বললাম, হাতজোড় করে বলবি, অবশ্য যদি তাঁরাই হন—আগে ঠাওর ক'রে দেখে নিবি। বলবি, এক বাঙালীবাবুর একগাছা ছড়ি—অতি সামান্য একগাছা ছড়ি—ওই রাস্তায় গির গিয়েছে। যদি আপনাদের চোখে প'ড়ে থাকে—অতি সামান্য জিনিস—কোন 'কিম্মৎ' নেই তার—তবে তাঁর সেটাতে দরদ খুব বেশি। কথাটা অর্ধসমাপ্ত ভাবেই শিখিয়ে দিলাম।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মীরাও আসিলেন। তিনিই চা করিয়া দিলেন। চন্দ্রনাথ উঠিয়া মীরাকে একান্তে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি বলিয়া দিল। দৃষ্টি ছিল কিন্তু আমার দিকে। পুলকিত হাস্যমুখে সে আসিয়া বসিল। মীরা চলিয়া যাইতেছিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, দেখ, একটা হেজাক বাতি দিতে বল বেয়ারাকে।

চন্দ্রনাথ আবার আরম্ভ করিল, এক্কাওয়ালাটা গেল, আমি নীচে অপেক্ষা ক'রে রইলাম। কিছুক্ষণ পরই নারীকণ্ঠের উচ্চ-হাসির আওয়াজ সেকালের গড়া বাড়িটার খিলেনে খিলেনে বেজে বেজে ফিরতে লাগল। একখানা হাসি যেন দশখানা হয়ে উঠেছিল। আমার মনের মধ্যে বাউল বৈরাগী থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। এক্কাওয়ালাটা ফিরে এসে বললে, হুজুর, আপনাকে তাঁরা সেলাম দিয়েছেন, আপনি উপরে যান। আমি কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। বেশ বিরক্ত হয়েই এক্কাওয়ালাকে বললাম, তুই কি বেয়াদবি ক'রে এলি

বল তো ?

সে জোড়হাত ক'রে বললে, মায়-বাপ, কুছ না, কুছ না। আপনি যা বলতে ব'লে দিয়েছেন তাই বলেছি। আর তাঁরা তো 'গোসসা'ও করেননি। তাঁরা খুব হাসতে লাগলেন। বললেন, বাবুজীকে এখানে পাঠিয়ে দাও তুমি।

এই সময় বারান্দা থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আলসের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, আস্থন বাবুজী, মেহেরবানি ক'রে ওপরে আস্থন।

তবু আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। ভদ্রলোক নীচে নেমে এসে আমায় নিয়ে গেলেন। প্রথমেই তাঁর পরিচয় পেলাম, তিনি আগ্রা কলেজের প্রফেসার। ওপরে গেলাম। পা কাঁপছিল, ভয়ও হচ্ছিল, কি মনে করেছেন এঁরা! প্রশস্ত ঘর, ঘরের মধ্যে ফরাশ পেতে সব বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আবার সেই হাসি। ওপাশে জন-ছুই পুরুষ বসেছিলেন, তাঁরাও মুচকে মুচকে হাসছিলেন। কয়েকজন বয়স্কা মহিলা সামনে প্রকাণ্ড বারকোশের ওপর প্রচুর ফল ছাড়িয়ে কেটে সাজিয়ে রাখছিলেন। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি মহিলা, তাঁর পরনে রক্ত-রাঙা সেই শাড়ি। আমি ওপরের দিকে দৃষ্টি তুলতে পারিনি, পায়ের ওপর শাড়ির প্রান্তভাগ দেখে শাড়িটাকে চিনলাম।

চন্দ্রনাথের কথায় বাধা পড়িল। বেয়ারা একটা হেজাক বাতি আনিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিল।

অত্যুজ্জ্বল আলোকের রূঢ় আঘাতে স্থানটার অন্ধকার যেন মন্ত্র-তাড়িতা মায়াবিনীর মত দূরে সরিয়া গেল। গঙ্গাবক্ষের স্বল্প-পরিসর স্থানও আলোকিত হইয়া উঠিল। চঞ্চল জল-তরঙ্গের মধ্যে ঝিকমিক করিয়া আলোকচ্ছটার প্রতিচ্ছটা নাচিতেছিল। বলিতে গেলাম, আলোটা সরাইয়া দাও, কিন্তু মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিলাম—মীরা, সন্ধ্যার সেই রাঙা শাড়ির সজ্জায় সজ্জিতা মীরা। তখনকার অস্ফুটালোকে যাহা লুকানো ছিল, এই ভাস্বর আলোকের মধ্যে তাহা সুপরিস্ফুট। মনে মনে উপমা খুঁজিয়া পাইলাম না।

চন্দ্রনাথ বলিল, এই সেই শাড়ি আর এই সেই নারী। ব'স মীরা, ব'স তুমি, তোমার আমার প্রথম দেখার কথা বলছি নরেশকে।

মীরা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথ বলিল, শোন নরু, রক্তাম্বরধারিণীই আমায় প্রশ্ন করলেন। হাসি-চাপা কণ্ঠস্বরে বললেন, বলুন তো বাবুজী আপনার কি হয়েছে, আমরা কিছু করতে পারি কি না দেখি!

বলতে বলতেই তিনি কলহাস্যে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও।

আমি যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। তবু কোন রকমে বললাম, আমার একগাছা ছড়ি, নিতান্ত তুচ্ছ, অতি অল্পমূল্যের জিনিস, তবে আমার বহুদিনের সাথী—

লাল শাড়ির অধিকারিণী ব'লে উঠলেন, আপনি তো বহুত দরদ আদমী বাবুজী। এই ছড়ি, কি কিম্মৎ এর, কি বাহার এর, এরই ওপর আপনার এত দরদ ?

অপর মেয়েরা হেসে ভেঙে পড়ল। এ মেয়েটি তখনও বলছিল, তার কণ্ঠস্বরে পরিহাসের কণামাত্র রেশ ছিল না। সে বললে, তা হ'লে না জানি প্রাণের মানুষের ওপর আপনার কত দরদ!

আমি এবার মুখ তুলে চাইলাম। সম্মুখে দেখলাম—এই রূপ! কুমারী, কিশোরী, মুখে

চোখে তার অপরিসীম বিস্ময়, শ্রদ্ধা, আরও কত কিছু যেন ছিল! মুহূর্তে কি যেন হয়ে গেল! আমার বাউলের সমাধি হয়ে গেল। তোর কথাই ঠিক, কবরের পাশে সেই রূপের হাটে তার সমাধি, সে তার অক্ষয় স্বর্গবাসই বটে। কিন্তু মনের সিংহাসনে তখন যে এসে বসেছে, সে আমার অপরিচিত। কোথায় আমার মনের মধ্যে ছিল নীড়প্রিয় পাখী, গৃহকামী আদিম মানব, সেই হ'ল আমার রাজা। সেইখানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর পানে চেয়ে কল্পনায় রচনা করলাম ঘরবাড়ি, সন্তান-সম্পদ, দাস-দাসী, সমস্ত নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব আমি আর মীরা।

প্রফেসরটি বললেন, ইনি আমার মেয়ে—মীরা।

চন্দ্রনাথ নীরব হইল, দেখিলাম, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে মীরার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

মীরাও তাহারই দিকে চাহিয়া আছেন। আমি একটা সিগারেট ধরাইয়া গঙ্গার দিকে চাহিলাম।

কিছুক্ষণ পর মীরা বলিলেন, খাবার তৈরী হয়ে আছে, এখন কি—

চন্দ্রনাথ সচকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। তারপর কি হইল, প্রশ্ন করিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। জীবনে আপন জনের সঙ্গে প্রথম দেখা এবং প্রথম পরিচয়ই তো বাস্তব সংসারে কল্পকথা, শুভ দৃষ্টির মঙ্গলময় লগ্ন। তারপর যাহা কিছু সবই তো রূঢ়তার আঘাতে মলিন। কি হইবে সে কথা জানিয়া?

উঠিয়া পড়িলাম।

আট

পরের কথাটুকু সংগ্রহ করিয়াছিলাম মীরার নিকট হইতে। কৌতূহলী মন শিল্পী-জীবনের রীতি লঙ্ঘন করিল।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রনাথ বোধ হয় কার্যোপলক্ষে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মীরাকে বলিলাম, গৃহস্বামী যখন নেই, তখন গৃহস্বামিনীই অতিথি-আপ্যায়ন করুন। বসুন, একসঙ্গে বসে চা খাই।

শান্ত-হাসি হাসিয়া মীরা বসিলেন। প্রভাতালোকে আবার তাঁহাকে দেখিলাম—অপূর্ব রূপ! বোধ করি ক্ষাত্রযুগ হইলে, এ নারীর জন্য একটা যুদ্ধ হইয়া যাইত। চন্দ্রনাথের মনের বাউলের মৃত্যু, সৌভাগ্যের মৃত্যু; এই রূপের ছটায় তাহার মৃত্যু, তৃপ্তির মৃত্যু। বার বার কামনা করিলাম, যেন তাহার অক্ষয় স্বর্গবাসই ঘটে, সে যেন প্রেত হইয়া আর ফিরিয়া দেখা না দেয়।

শান্ত, অতি শান্ত রূপ সর্বদাই যেন একটা শঙ্কিত আচ্ছন্নতার মধ্যে ম্লান; তাহার সংস্পর্শে আসিয়া ব্যথিত না হইয়া উপায় নাই। বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সন্ধান করিলাম, কোথায় সেই জীবন-তরঙ্গময়ী নারী, যে একদিন অপরিচিত চন্দ্রনাথের মত পুরুষের সম্মুখেও দাঁড়াইয়া কলহাস্য তুলিয়া কৌতুক-প্রশ্ন করিয়াছিল, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিল, না জানি প্রাণের মানুষকে আপনি কত ভালোবাসেন!

মীরা বলিলেন, আপনি অদৃষ্ট মানেন?

কেন বলুন তো? আশ্চর্য হইয়া প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নই করিয়া বসিলাম।

আমি মানি। আগে মানতাম না, এখন মানি।

কিসে আপনার অবিশ্বাস ভেঙে বিশ্বাস জন্মাল? চন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ কি?

হ্যাঁ। বাবা আমার শেঠ, কিন্তু ব্যবসা কখনও করেননি। সমস্ত জীবনে লেখাপড়াই ছিল তাঁর কাজ। আমাকেও তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন নাস্তিক, আমিও ছিলাম নাস্তিক। কিন্তু বলুন তো আপনি, মেলার পথে সামান্য একগাছা ছড়ি, যার কোন বাহার নেই, কিম্মৎ নেই, সেটাকে পথের ওপর থেকে খেয়ালের বশে কেন কুড়িয়ে নিলাম! এমন তো কত প'ড়ে থাকে পথে! আর কি আশ্চর্য, আমিই সে গাছা কুড়িয়ে নিলাম! কি যে মনে হ'ল, কেন যে নিলাম, তার কোন জবাবদিহি আমি করতে পারি না।

তারপর মীরা যাহা বলিলেন, তাহা এই—চন্দ্রনাথ একদিনে তাহাদের সংসারের সহিত কত আপনার হইয়া গেল। মীরার পিতা ছিলেন উদার মানুষ, শেঠ হইয়াও লক্ষ্মীর সহিত সদ্ভাব তাঁহার ছিল না, সরস্বতীর উপাসক ছিলেন তিনি, চন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

মীরা বলিলেন, দোস্ত্, যখন শুনলাম যে উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, তখন কান্না পেয়েছিল। বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে কেঁদে এলাম। তারপর এসে আমি তাঁকে জোর ক'রে ধরলাম, না না, আপনি আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন। এত দরদ আপনার বুকে, সে দরদ আপনি মানুষকে না দিয়ে পাথরকে দেবেন, শূন্যের আরাধনায় ধূপের মত পুড়িয়ে ফেলবেন?

মীরার পিতা নাকি বলিয়াছিলেন, মেয়ে আমার ঠিক বলেছে বাবুজী।

মীরা বলিলেন, তারপর বাবা বললেন, আপনি বাঙালী, আপনাদের কবির কাব্য তো তা বলে না। তিনি তো বলেছেন—। এখানে কি একটা কবিতা বাবা আবৃত্তি করিলেন, তার অর্থ বৈরাগ্যের মধ্যে যে মুক্তি—

আমি হাসিয়া বলিলাম, ও, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!"

মীরা বলিলেন, হ্যাঁ।

প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

তারপর?

মীরার দৃষ্টি যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। যৌবনে মানুষ যে দৃষ্টিতে বাল্য-জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকায়, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়াইয়া যে মমতা লইয়া যৌবনের স্বপ্ন দেখে, সেই মমতামাখা দৃষ্টি মীরার চোখে।

মীরা বলিলেন, তারপর আপনার দোস্তের সঙ্গে কত প্রগাঢ় পরিচয় হয়ে গেল। কেমন ক'রে যে এক বিদেশী আমার জীবনে আনন্দের 'রোশনাই' হয়ে উঠল, জানি না, বলতে পারি না।

তারপর চন্দ্রনাথ নাকি একদিন তাঁহার পিতার কাছে মীরাকে প্রার্থনা করিল।

মীরার পিতা উদার এবং আধুনিক হইলেও এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারিলেন না। চন্দ্রনাথ আসিয়া মীরার নিকট বিদায় চাহিতেই মীরা তাহার হাত ধরিয়া নিঃসঙ্কোচে গৃহত্যাগ করিয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

মীরা বলিলেন, তামাম দুনিয়া, ইহকাল পরকাল, সমস্ত সেদিন আমার প্রিয়তমের তুলনায় ছোট হয়ে গেল, দোস্ত!

সহসা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ভদ্রতার, বোধ করি শীলতারও, সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিলাম। প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, আজ? আজও কি তাই?

মীরা যেন চমকিয়া উঠিলেন, অন্তত এতক্ষণে তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তারপর কহিলেন, হ্যাঁ, আজও তাই, হ্যাঁ।

তাঁহার নিজের কথাটা তিনি যেন নিজেই পরখ করিয়া দেখিলেন। কথা শেষ করিবার পরও তিনি বার দুই সায় দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

আমি বুঝিলাম, সে নারী আর নাই! জীবনের তরঙ্গ সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাগরের বুকে নদীর মতো সে নিঃশেষে লীন হইয়া গেল, না কোন গিরি-গহ্বরের পাষাণ বেষ্টনীর ভিতরে পড়িয়া সে হারাইয়া গেল, বুঝিলাম না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

মীরা বলিলেন, তারপর তাঁর খেয়াল হ'ল, শিখ হবেন তিনি। আইনমতে রেজেস্ট্রি ক'রে বিবাহে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। আমার তো 'দোসরি' ইচ্ছা ছিল না। গুরু-দোয়ারায় আমরা শিখ হয়ে গেলাম, শিখমতেই আমাদের বিবাহ হয়ে গেল।

আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর?

উস্‌কে বাদ?

শুধু আমার প্রশ্নটির পুনরুক্তি করিয়াই মীরা নীরব হইলেন। দেখিলাম, সুদূর-প্রবাহিণী গঙ্গা যেখানে দিগন্তরেখায় আকাশের বুক চিরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সেইখানে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

আর প্রশ্ন তুলিতে পারিলাম না।

নীরবেই উভয়ে বসিয়াছিলাম, এমন সময় ভিতরে চন্দ্রনাথের শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন।

ছেলেকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনাদের 'দুষ্টু' কথাটি ভারী মিষ্টি!

দুষ্টু, আমার দুষ্টু!—বলিয়া ছেলেকে তিনি আদর করিলেন।

আমি বলিলাম, ছেলে দুষ্টু না হ'লে ভাল লাগে না!

শিশু চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, মীরা বলিলেন, ছেলে নিয়ে কিন্তু বড় হাঙ্গামা। এক-এক সময় মনে হয়, ছেলে মানুষের না হওয়াই ভাল।

তিনি ছেলেটিকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক মিনিট পরেই চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিল। মোটর বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিয়া অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতার সহিত ফটকটা পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিল। লঘু দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া উঠিল। টেবিলের উপর এক প্যাকেট সিগারেট ফেলিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

নিজেও একটা সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া সে চঞ্চল পদবিক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করিল। যেন অনাবশ্যক একটা গতির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে সে।

শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, আর একবার চা আমাদের দাও তো মীরা। আর, ববুয়ার নাম ঠিক ক'রে ফেললাম, নাম হবে জিঞ্জির সিং।

মীরার বিস্মিত কণ্ঠের উত্তর শুনিলাম, জিঞ্জির সিং!

হ্যাঁ, কিম্বা বন্ধন সিং।

আমিও বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। মীরার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইলাম না। চন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া আমার পাশে বসিল, বলিল, আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করব নরু—এ নিউ স্টার্ট।

উত্তর কি দিব, নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, এখানকার কারখানা আমি বেচে ফেলছি। এইবার এমন একটা কিছু করব; প্রকাণ্ড বড় একটা কিছু—এ বিগ স্কিম। বড় কিছু রচনা করব আমি, মস্তবড় এক মধুচক্র, যাকে কেন্দ্র ক'রে গুঞ্জন করবে হাজার হাজার মানুষ মধুমক্ষিকার মত।

আমি বলিয়া উঠিলাম, না না না। চন্দ্রনাথ, এমন কাজ করিসনি। একটা প্রতিষ্ঠিত কারবার—

চন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, সে হয় না নরু, আমি অনেক ভেবে এ করছি। এত বড় সুন্দর পৃথিবী, বিধাতার প্রতিবিম্ব হয়ে এখানে এলাম, আমি কিছু সৃষ্টি করব না? কিছু রেখে যাব না? আমি এই ভাবে প'ড়ে থাকব নরু, এ কি তুই কল্পনা করতে পারিস?

তারপর একটু হাসিয়া বলিল, তোরা হয়ত সবই পারিস, কারণ এইখানেই নাকি জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মীরা চা লইয়া আসিলেন, নীরবে চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, চন্দ্রনাথ বলিল, এখানকার কারখানা বেচে ফেলছি মীরা।

মীরা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, বেশ।

তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিল, মীরা অদ্ভুত! বিবাহের পূর্বে মীরা প্রগল্‌ভা ছিল, চঞ্চলা ছিল, কিন্তু বিবাহের পর থেকে আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কোন অভিমান নেই, বিরোধিতা নেই, চাঞ্চল্য নেই। অথচ ও যদি বিরোধিতা করত, তবে হয়তো—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, জানিস নরু, বহুদিন থেকে অন্তরে আমার বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে। বিবাহের পর ছোট একখানি বাড়িতে মীরাকে নিয়ে নীড় বেঁধেছিলাম। কর্মজীবনের আর দৈনিকজীবনের কিছু সঞ্চয় ছিল, ভেবেছিলাম, তাই দিয়ে জীবন বেশ কেটে যাবে। সেদিন মনে আর কোন কামনা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে মন অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল, ক্ষুদ্র একটুখানি গণ্ডির মধ্যে একটি নারীর মুখ চেয়ে ব'সে থাকব? টাটার স্মৃতি, যন্ত্ররাজ্যের গর্জন, যুদ্ধের বাজনা—মনে পড়তে লাগল। ঠিক এই সময় থেকেই মীরার এই পরিবর্তন আমার চোখে পড়ল। আমি যত অশান্ত হয়ে উঠছি, ও হয়ে উঠছে তত শান্ত। ও যদি মুখরা হ'ত, চঞ্চলা হ'ত, লঘু হ'ত, আমি ওকে ফেলে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু মীরার দ্বন্দ্বকৌশল অদ্ভুত। কোনও দিন মীরাকে পরাজিত করতে পারলাম না।

আমি বললাম, দেখ, মীরার ইচ্ছা ছিল—খোকার নাম থাকবে কুমারকিশোর। নামের মধ্যে কোন অর্থ না থাকাই ভাল চন্দ্রনাথ, কি বলিস?

চন্দ্রনাথ ডাকিল, মীরা, মীরা!

মীরা আসিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রনাথ বলিল, বস তুমি মীরা।—বলিয়া সে নিজেই একখানা চেয়ার নিজের চেয়ারের সম্মুখে পাতিয়া দিল। তারপর মীরার হাত ধরিয়া বলিল, খোকার নাম রাখতে চাও তুমি—কুমারকিশোর?

মীরা বলিলেন, জিঞ্জির নামও বেশ, সোনেকা জিঞ্জির—স্বর্ণ-শৃঙ্খল জীবনে।

চন্দ্রনাথ বলিল, না, কুমারকিশোরই ভাল।

পুলকিত হইয়া মীরা বলিলেন, উ নামও বহুত আচ্ছা নাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, শোন মীরা, এখানকার কারখানা বেচে ফেলছি, ঘরই যখন বেঁধেছি, তখন প্রাসাদের মতো ঘর গ'ড়ে তুলব, প্রতি কোণে তার ঐশ্বর্য থাকবে। প্রকাণ্ড বড় কারখানা করব, হাজার হাজার লোক যেখানে প্রতিপালন হবে, এমনই এবার কিছু করব। তুমি কি বল?

শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মীরা বলিলেন, সে খুব ভাল হবে।

আমি বার বার নিজেকে অপরাধী মনে না করিয়া পারিলাম না।

কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, চন্দ্রনাথ আর অস্বাভাবিক গম্ভীর নয়, সে চঞ্চল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম, তাহার কল্পনানেত্রে আকাশে ফুল ফুটিতেছে। পরদিন প্রভাতে বাহিরে বসিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিলাম। চন্দ্রনাথ ছেলেকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, কাল রাত্রিটা বড় সুখের গেছে নরু; বহুদিন আমরা এমন গাঢ় মিলন-রাত্রি উপভোগ করিনি।

আমি বলিলাম, সুখ তো মনেই চন্দ্রনাথ। আর একটা কথা, সহজ স্বাভাবিক জীবনেই সুখ কেবল পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক জীবনই অশান্তির মূল। এই শিশু আর মীরার মত স্ত্রী, এদের কেন তোর জীবনের অশান্তিতে দগ্ধ করবি?

শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, আমার ববুয়া, আমার মীরাকে সুখে রাখবার জন্যেই তো আমার আয়োজন।

ঘাড় নাড়িয়া বার বার অস্বীকার করিয়া বলিলাম, না না। হয় তুই আমাকে প্রতারণা করছিস, নয় তুই নিজেকে নিজে প্রতারণা করছিস!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ছেলেটিকে তাহার মায়ের কাছে দিয়া আসিয়া বলিল, প্রতারণা কাউকেই আমি করিনি। আমি তো বলেছি, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি কিছু সৃষ্টি করব না? কিছু রেখে যাব না? আর যা রেখে যাব, সে তো আমার ববুয়ারই থাকবে।

সে আবার যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না।

ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। হিন্দুমতে বাঙালীর অনুষ্ঠান পালন করিয়া সমাপ্ত হইল। ছেলের মামা সাজিতে হইল আমাকে। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিলাম বাজারে। থালা, বাটি, গ্লাস, আসন, খোকনের জামা, পোশাক, সোনার গহনাও কিছু কিনিয়া আনিলাম, তবুও মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, কোমরপাটা ও তক্তি পাইলাম না।

চন্দ্রনাথ দেখিয়া আমার কান ধরিয়া টানিয়া বলিল, আমার শালা সাজবার সেলামি নাকি? এ কিন্তু তুই ভারী অন্যায় করলি।

আমিও তাহার কান ধরিয়া বলিলাম, ভগ্নীপতির অনধিকার-চর্চার এই হচ্ছে পুরস্কার।

আমাদের কাণ্ড দেখিয়া মীরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সে বাঙালী মেয়ের মত শাড়ি পরিয়া আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

আমি মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া আশীর্বাদ করিলাম, ধরিত্রীর মত সহনশীলা হও তুমি, মৃত্যুর মত শক্তিশালিনী হও, তুমি বিজয়িনী হও।

নয়

ইহার পর চন্দ্রনাথ আবার নিরুদ্দেশ। মনের আকাশ পাতিপাতি করিয়া খুঁজিয়াও আমার কল্পলোকের কালপুরুষ নক্ষত্রের সন্ধান মেলে না।

ফিরিয়া আসিয়াই চন্দ্রনাথকে পত্র দিলাম। উত্তর দিল মীরা। সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরেজীতে পত্রখানি লিখিয়াছিল। জানিলাম, চন্দ্রনাথ কানপুরের কারখানা বেঁচিয়া ফেলিয়াছে। কোন এক বিশিষ্ট মাটির জায়গা দেখিবার জন্য সে কোথায় গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। আমাকে নাকি মীরার প্রায়ই মনে পড়ে।

সে লিখিয়াছিল, আমার রক্তের সম্বন্ধের আত্মীয়স্বজনকে ভুলিয়াছি; কিন্তু যে দোস্তকে বিধাতা ভাই সাজাইয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না।

উত্তরে আবার পত্র দিলাম, লিখিলাম, বহিন, আমাকে রাখী পাঠাইয়া দিও এবার। কিন্তু সে পত্র ডেড-লেটার অফিস হইতে ফিরিয়া আসিল। সেদিন আমার চোখে জল আসিয়াছিল। মীরা চন্দ্রনাথ হারাইয়া গেল ধরণীর জনারণ্যে; কিন্তু আমার চিত্তলোকে তাহারা হইয়া উঠিল প্রধান।

মীরা ও চন্দ্রনাথের কাহিনী রচনা করিবার জন্য আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। এক কাহিনী তিনবার লিখিলাম, কিন্তু মনোমত হইল না। মেসের বন্ধুরা বলিত, ভদ্রলোক এইবার পাগল হয়ে যাবে।

পরিণতি কল্পনা করিতে না পারিয়া চন্দ্রনাথের কাহিনী রচনার চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। প্রত্যক্ষের অপেক্ষা করিয়া আছি।

আঃ, আবার জানালাটা খুলিয়া গেল। এক ঝলক তীক্ষ্ণ-শীতের বাতাস দেহটাকে কাঁপাইয়া দিল। চিন্তাসূত্রও ছিন্ন হইয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া পথ-প্রদীপের আলো আসিয়া আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রহস্যময় ছায়াপটখানি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

জানালাটা ছিটকিনি আঁটিয়া বন্ধ করিবার সংকল্প লইয়া উঠিলাম। খোলা জানালাটা দিয়া চোখে পড়িল, শহরের ধোঁয়া ও আলোর আবরণের নৈশ আকাশ অস্পষ্ট। কোটি কোটি বৎসরের তপস্যার মত কত অসংখ্য নক্ষত্র যে আলোকের বার্তা পৃথিবীর বুকে পাঠাইয়াছে সে আলোক ঐ আলোকিত ধূমচন্দ্রাতপের আড়ালে হারাইয়া গিয়াছে। শুধু পশ্চিম-গগন-প্রান্তে ঐ চন্দ্রাতপ বিদীর্ণ করিয়াও ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—ভেনাস, শুকতারা। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম—স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়, ঈষৎ নীলাভ জ্যোতি। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কক্ষ, মনের ছায়াপট যেন কায়া গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

কালো ও সাদা রঙের পক্ষপুটে ভর করিয়া কাল উড়িয়া চলিয়াছে। দুই বৎসরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে আমার মন-বনস্পতির শীর্ষদেশে বিশ্রাম করিল।

ও কে? ছায়াপটের রহস্য যে ঘন হইয়া উঠিল।

পুষ্পিত বসন্ত-দিবসের মত বর্ণে সুষমায় উজ্জ্বল লাবণ্যময় তনু, বহুমূল্য -পরিপাটি কোঁচানো ধুতি পরনে, গায়ে গিলা-করা পাঞ্জাবি, গলার চাদর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ঘাড়টি ঈষৎ

বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে—ও যে হীরু। হীরু আসিয়াছে! হীরু! হীরু! উঃ, বহুকাল পরে দেখা তোর সঙ্গে হীরু! বিলেত থেকে কবে ফিরলি তুই?

এমনই অকল্পিত রহস্যের মতই হীরু সেদিন আমার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে ওই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

সে নারীর মত মধুর হাসিয়া বলিল, আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা। তবে রাজার বাগানের বকুলের সংবাদ জানি না বন্ধু।

সে আমার সেই মেসের ঘরে ময়লা বিছানার উপর চাপিয়া বসিল।

আমি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, তাহার উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বলতর হইয়াছে, পরিচ্ছদ হইতে সুমিষ্ট পুষ্পসারগন্ধে সমস্ত ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

হীরু বলিল, বহুকাল পরে এল যে অতিথি, তাহাকে মর্মরসে যদি অভিষিক্ত করতে না-ই পারিস নরু, তবে বস্তুজগতের মিষ্টরসেও তো আপ্যায়ন করা উচিত। চা আনতে বল।

তাহাকে এবার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, অবাক হয়ে গেছি ভাই; কিন্তু কতকাল পর বল তো? এ হ'ল উনিশশো—

হীরু বলিল, কি হবে সে হিসেব ক'রে? হিসেব আমার নেইও। পৃথিবীর বুকে আমি একান্তভাবে অতিথি, যাওয়া-আসার তিথির সংবাদ না মেনে চলাই আমার নিয়ম।

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু এবং ঘটনাকে একান্ত লঘুভাবে গ্রহণ করার এক ধারার দার্শনিকতা প্রচলিত আছে, এই ধারাকে নিজের জীবনে খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার মধ্যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন বলিতে পারি না, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নাই, তবুও হীরুর কথাটার মধ্যে বেদনার আভাস পাইলাম।

হীরুর বেদনার কথা মনে করিতেই আমার নিজের বেদনা ঘনায়িত হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল মাকে। তবুও আজ তাহার বেদনাকেই বড় করিলাম, বলিলাম, সবই জানি, সে সময় তোর আসবার কথাও শুনে এসেছিলাম, সেই সময়েই কি তুই এসেছিস?

একটা সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল, এসেই চলে গিয়েছিলাম। বললাম তো, আমি একান্তভাবে অতিথি। অতিথি শুধু তিথির নিয়ম লঙ্ঘন করেই চলে না, কালের বন্ধনই সে শুধু মানে তা নয়, স্থানের বন্ধনও তার পক্ষে নিষেধ। দেশ ভালো লাগেনি, চ'লে গেলাম ফের। আবার এই কিছুদিন ফিরেছি। নে, সিগারেট নে।

বহুমূল্য সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া বলিলাম, এইবার একটি পরম শুভ তিথি এবং লগ্ন দেখে জগতে অতিথি নামটা খণ্ডন ক'রে ফেল হীরু, রূপসীর রূপের মধ্যে ও রূপের তোর অবসান হোক।

হীরু হাসিয়া বলিল, রূপকে আমি পূজা করি, রূপসীর প্রতি আমার মোহ আছে। তবে ভয় করি তাদের মমতাকে; তাদের ললিত ভুজলতার বন্ধন খোলা যায়, কিন্তু তাদের জীবনের কোমলতার বন্ধন ছিঁড়ে না ফেললে আর উপায় নেই। তাদের কায়াকে ভয় তো করি না নরু, ভয় করি তাদের মায়াকে। কিন্তু তুই চা দিবি না মনে হচ্ছে, উঠি আমি।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্টোভটা ধরাইয়া ফেলিলাম। কেটলিতে জল ভরিয়া সেটা চড়াইয়া দিয়া চায়ের সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিলাম।

বলিলাম, কেন, তোর মনের বনে যে লতা সযত্নে রোপণ ক'রে পরিচর্যা করছিলি,

তাতে কি ফুল ধরল না ?

সে বলিল, তোর মনে আছে সে কথা? সে তো একটি লতা নয়, সে যে লতার দল, কিন্তু আমার মন-বনস্পতি যে, দিন দিন ঊর্ধ্বে উঠে চলেছে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। তারা নাগাল পেলে না, তাই লজ্জায় খ'সে পড়ল। উপস্থিত মনের গহন লতাশূন্য। নাঃ, আর ও বীজ বপনই করব না। তোর অঙ্গও তো অনাবৃত শুনেছি, তুইও তো বিয়ে করিস নি।

হাসিয়া বলিলাম, না। কিন্তু তোর কাকা যে তোর বিয়ে না দিয়ে ছাড়লেন? কেমন আছেন তিনি আজকাল ?

অভ্যাসমত ভঙ্গিতে হীরু উত্তর দিল, কাল তাঁর নাগাল পায় না, মহাকালের দরবারে তিনি এখন জমিদারিই করছেন বোধ হয়। না না, তার জন্যে মিথ্যে আক্ষেপ করিস নি নরু। তিনি রেহাই পেয়েছেন ভাই। তাঁর দিকে চাইলে আমারও দুঃখ হ'ত। দেশের লোকের কাছে তিনি অমানুষ ছিলেন ; কিন্তু আমার কাছে—

আর সে বলিতে পারিল না। কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া আবার সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল, আমার সঙ্গে তোকে একবার দেশে যেতে হবে নরু। চল, কিছুদিন হৈ হৈ ক'রে আসা যাক। একটা মেলা বসাচ্ছি দেশে, খুব বড় মেলা করব, কলকাতা থেকে থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস নিয়ে যাব।

প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যাপার, মেলা হঠাৎ, উপলক্ষ্য কি ?

গাজন—বর্ষশেষের উৎসব। দেবদেবীকে শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই, কিন্তু মৃত্যুতে আমার শ্রদ্ধা আছে। বর্ষের অবসান উপলক্ষ্যে মৃত্যুকে অভিনন্দিত ক'রে একটা উৎসব করবার অনেক দিন থেকে আমার সংকল্প।—মৃত্যুর উপাসনা।

হাসিয়া বলিলাম, সেই উপাসনা ক'রেই তো আমাদের আজ এই অবস্থা।

আচার্যদের বুলি আওড়াচ্ছিস ? কিন্তু আমাকে বাদ দে ভাই। কেন জানি না, মৃত্যুর প্রতি আমার একটা মোহ আছে। নিজে মরতে পারি না—শুধু মৃত্যুর লীলার বহু রূপ প্রত্যক্ষ করতে চাই। যাকগে, আর একটা কথা শোন, আমি একটা ফিল্মের ব্যবসা করব ভেবেছি। একটা স্টুডিও হাতে এসে পড়েছে, কিন্তু ছবির উপাখ্যান আমার মনোমত হচ্ছে না। তুই লিখে দিবি ? মিহিরকুলকে নিয়ে অদ্ভুত দৃশ্য হবে রে, যেখানে পাহাড় থেকে হাতীগুলোকে একে-একে ফেলে দিয়ে তাদের মরণ-চীৎকার শুনে মশালের আলোয় মিহিরকুল নাচছে।

চা তৈয়ারী করিয়া তাহাকে একটি কাপ আগাইয়া দিয়া বলিলাম, বিলেতে থেকে কি এই সস্তা জিনিসগুলো নিয়ে এলি তুই ?

আবার চায়ের জল বসাইয়া দিলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া সে বলিল, সস্তা জিনিসের একটা যে বড় মূল্য নরু, তার পেছনে হার-জিতের অনুশোচনা নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে মুড়ি খেয়ে যদি শরীর না-ই সারে, তবে আক্ষেপ হয় না। কিন্তু সিমলে পাহাড়ে গিয়ে আঙুর-বেদানার রসে—

উপমা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, যাকে বলে—বিলিতী ফক্কড়, তাই হয়ে এলি তুই !

হীরু বলিল, যাকগে। ফিল্মের কথা পরে হবে। এখন আমার সঙ্গে দেশে যাবি কি না বল্ ?

দেশে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু মেলায় আপত্তি আছে আমার। কেন বাজে অনেকগুলো অর্থ অপব্যয় করবি বল ?

হীরু বলিল, অপব্যয় কথাটায় আমার আপত্তি আছে, ব্যয় বল। কিন্তু আমার টাকা যে অনেক জ'মে আছে নরু। জানিস তো, মামার বাড়ির সমস্ত সম্পত্তিও আমি পেয়েছি ?

চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, কেন ? তোর তো তিন মামা ছিলেন, তাঁদের ছেলেপিলেও ছিল—

হ্যাঁ, কিন্তু মৃত্যু-দেবতার আমি উপাসক ব'লেই নাকি তিনি তাঁদের আমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কলকাতার সম্পত্তি যথেষ্ট, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল নগদ টাকা। হপ্তাখানেক আগে হিসেব দেখলাম, আঠারো লাখ টাকা তাঁদের মজুত। আর আমার পৈতৃক মজুত, তাও লাখ তিনেক হবে। টাকাটা তো ব্যয় করতে হবে !

আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, হতভাগ্যের ভাগ্যের কথা। সে আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরাইয়া-লীলাচ্ছলে ধোঁয়ার রিং ছাড়িতে আরম্ভ করিল। আমি অবশেষে বলিলাম, ব্যয় করতেই হবে, তার মানে কি হীরু ? তোর পর তোরও উত্তরাধিকারী কেউ না কেউ থাকবেই, এ যে তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

সে বলিল, ভুল বলছিস তুই। আলোর উত্তরাধিকারী অন্ধকার, জন্মের উত্তরাধিকারী মৃত্যু, লালসার উত্তরাধিকারী বৈরাগ্য, সে হিসাবে সঞ্চয়ের উত্তরাধিকারী হচ্ছে ক্ষয়, এবং সেইজন্যেই আমার হাতে এসে পড়েছে এত বৈভব।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার কথা বলিতে কেমন দ্বিধা হইল। কথাটা একটু ঘুরাইয়া পাড়িলাম, বলিলাম, বেশ তো, ঐ টাকা দিয়ে বড় একটা কিছু গ'ড়ে তোল না।

সে হাসিয়া বলিল, এবার কাকার মৃত্যুর পর দেশের লোকে ধরেছিল একটা শ্মশানাশ্রমের জন্যে, কিন্তু দিইনি। শ্মশানে আবার গৃহকোণের সৃষ্টি করা কেন ?

বুঝিলাম, সে বুঝিয়াও আমার কথাটা এড়াইয়া যাইতেছে। বলিলাম, ওরে, তোর চালাকি আমি বুঝি। তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস আমাকে। আমি বলছি, কোন একটি উৎপাদনকারী শিল্পের কারখানা, বড় একটা কিছু, তোর ফিল্মের ব্যবসার চেয়ে অনেক বড় কিছু গ'ড়ে তোল না।

তাচ্ছিল্যভরে সে বলিল, দূ-র ! ঝঞ্ঝাট পোয়াবো না। কে এত পরিশ্রম করে ! দেখ দেখ, চায়ের জল প'ড়ে যাচ্ছে।

কেটলিটা স্টোভের উপর হইতে নামাইয়া ফেলিলাম। আবার চা তৈয়ারি করিয়া তাহাকে এক কাপ দিয়া নিজেও এক কাপ লইয়া বসিলাম।

তারপর বলিলাম, চন্দ্রনাথ এমনই বড় একটা কিছু গ'ড়ে তোলবার জন্যে পাগল। তুই তাহাকে সাহায্য কর না, মূলধন দিয়ে অংশীদার হয়ে যা।

সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, চন্দ্রনাথ ! কোথায় সে, সে আজও বেঁচে আছে ?

বলিলাম, তার চরিত্র অনুযায়ী সে দুর্দান্তভাবেই বেঁচে আছে। কিছুদিন আগেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ধীরে ধীরে চন্দ্রনাথের কাহিনী হীরুকে বলিয়া শেষ করিলাম।

হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ ব্রিলিয়াণ্ট ! কিন্তু যুদ্ধ তার ভাল লাগল না কেন ? চন্দ্রনাথ এত দুর্বল !

এ কি দুর্বলতা হীরু ? জীবনের অপচয়, সৃষ্টির অপচয় ক'রে যে ধ্বংসলীলা, সে কি মানুষের ভাল লাগে, না লাগা উচিত ?

কে জানে ! কিন্তু আমার মনে হয়, এ ভাল না লাগার মূলে হ'ল মানুষের মৃত্যুভয়, নিজের জীবনের মৃত্যুভয় ।

তাহার সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি আমার হইল না। কথাটা এড়াইয়া গিয়া বলিলাম, যাকগে ও কথা, কিন্তু যা বললাম, তার কি হ'ল ? কিছু মূলধন দিয়ে চন্দ্রনাথের অংশীদার—

বাধা দিয়া সে বলিল, পোষাবে না। অংশীদার হওয়া, কি ঋণ দেওয়া—ও হ'ল ঝঞ্ঝাট বাড়ানো, অঙ্কশাস্ত্রে অধিকার আমার চিরদিনই কম। সুদ কষা, কি লাভ-লোকসানের হিসেব করা আমার বিদ্যেবুদ্ধির অতীত নরু। তার চেয়ে চন্দ্রনাথকে বন্ধুর উপহার ব'লে—

বাধা দিয়া বলিলাম, থাক হীরু, কথাটা আর উচ্চারণ করিসনি ।

হীরু হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস কেন তুই ? যাকগে, ও কথা না হয় ছেড়েই দে। কারণ, আমি যা বলছি সে তোর পছন্দ হচ্ছে না, আর তুই যা বলছিস, সে আমার পছন্দ হচ্ছে না। এখন আমার সঙ্গে যাবার কথা কি বলছিস, বল ?

কি বলিব, সম্মতি দিয়াই বলিলাম, বেশ, যাব, চল !

কালই। কালই আমি যাচ্ছি।

কয়েকটি জরুরী কাজ ছিল। বলিলাম, কাল তো আমি যেতে পারি না হীরু। আমার যে কাজ রয়েছে।

সে হাসিয়া বলিল, কাজ তুলে রাখবার শিকে এখনও তৈরী করতে পারিসনি রে ? বেশ, আমি কাল যাই ; তুই পরে আয়, কেমন ?

বলিলাম, বেশ।

হীরু উঠিয়া বলিল, সঙ্গে যাবি এখন—পানীয়-বিশেষ পান করতে ? আপত্তি আছে ?

হাসিয়া বলিলাম, না, আপত্তি নেই ; কিন্তু অবসর হবে না আজ।

দিন সাতেক পর, হাঁ, সাত দিন পরই হীরুর নিমন্ত্রণে দেশে গিয়াছিলাম। স্টেশনে হীরুর মোটর ছিল। পরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া বিপুল গতিতে যেন আমিই ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। সে পারিপার্শ্বিক আজও এই অন্ধকারের মধ্যে হু-হু করিয়া পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

জাম ও সজিনার ঘনপল্লবছায়ান্বিত পল্লীপথ, জাম ও সজিনার নীচে ঘেঁটু ও ভাঁটি ফুলের জঙ্গল। রতনহাটি গ্রামখানা পার হইয়াই পদ্মফুলে ভরা শঙ্খপতির বিস্তৃত বিল, চারিপাশের ধারে ধারে তাহার কলমি পানাড়ি ও পদ্মদলের ঘের। কতকাল আগে নাকি এখানে কোন শঙ্খপতি নামে সওদাগরের বাস ছিল, এই ছিল নাকি তাহার বাণিজ্যতরী-বহরের বন্দর। ইহার পরই আসে রাণীপাড়া, গ্রামে ঢুকিতেই টোপরের মত বাগান-ঘেরা মোহান্তের আখড়া। আখড়ার ঈশান কোণের নারিকেল-কুলের গাছটি এখনও আছে কিনা কে জানে। আর সেই লাল কাঞ্চনের বাগানখানি ! ইহার পরই আমাদের গ্রাম। প্রথমেই আসিল বাজিকরদের পাড়া। রহস্যময় যাযাবরদের ভাঙাচোরা ঘরগুলির চালের বাতায় ঝোলে সাপের হাঁড়ি ; দুয়ারে প্রহরা দেয় বড় বড় কুকুর। এই গাজন ওই বাজিকরদেরই উৎসব !

ওই যে একটা বাজিকরের মেয়ে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাজিকরপাড়া পার হইয়া গেল। এইবার একটা বাঁক ঘুরিলেই প্রথমে নজরে পড়িবে, গ্রামের প্রান্তে বাগান-ঘেরা

হীরুদের বাড়ির চিলেকোঠা। প্রকাণ্ড বড় বাড়িখানা চারিদিকে বহু মূল্যবান আম-কাঁঠালের বাগান দিয়া ঘেরা। কাঁচামিঠে আমের গাছগুলা আমাদের চিহ্নিত করা আছে। সুনিবিড় বৃক্ষপল্লবের আবরণের মধ্যে হীরুদের প্রাসাদতুল্য বাড়িখানার নীচের দিকে কিছু দেখা না, দেখা যায় শুধু বাগানের মাথার উপরে সাদা চিলে কোঠা, যেন আকাশের গায়ে একখণ্ড সাদা মেঘ। গাড়ি মোড় ফিরিল। এ কি! হীরুদের বাড়ি মাঠের মধ্যে বসাইয়া দিল কোন্ যাদুকর? বাগানের ঘের মুছিয়া দিল কে?

মনে আছে, হঠাৎ একটা মড় মড় শব্দে চকিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিয়াছিলাম, এ কি, কিসের শব্দ?

ড্রাইভারটা বলিয়াছিল, বাগানের গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে।

কেন?

বাবুর হুকুম।

দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ ছিল বাগানের দিকে। এ পাশের বাগানের চিহ্ন নাই, ও পাশের বাগানের গাছগুলির মাথা দুলিতেছে, যেন কাঁপিতেছে। মানুষের কুঠারাগ্রে বনস্পতির মৃত্যু শাণিত হাসি হাসিতেছে। সেই হাসির সংঘাতে যেন গাছ কাঁপিয়া মরিতেছে। মনে মনে বেদনা বোধ না করিয়া পারিলাম না। আজ চন্দ্রনাথকে মনে পড়িল, সে হইলে এমন কাজ করিতে পারিত না।

গাড়িখানা আসিয়া হীরুর দরজায় থামিল। হীরু সেখানে ছিল না, সে নিজে দাঁড়াইয়া গাছ কাটাইতেছে। সেখানে গেলাম।

সেই মুহূর্তেই একটা গাছ মরণার্তনাদ করিয়া মাটির বুকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

হীরুকে বলিলাম, কি করলি? পূর্বপুরুষের হাতের তৈরী গাছগুলো কেটে ফেললি? এক হিসেবে ওরা তোর জ্ঞাতি।

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হীরু বলিল, মিথ্যে বলিস নি, জ্ঞাতির মতই ওরা আমার চারিদিকের আলো ও বায়ুর ভাগ নিয়ে ব'সে ছিল। ভাগ কেন, সমস্তই আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছিল। বিনা উচ্ছেদে সূচ্যগ্র পরিমিত পথও ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। তাই উচ্ছেদই ক'রে ফেললাম।

তাহার কথায় আশ্চর্য হইলাম না, বলিলাম, ভাল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে এসে কটি গাছ সৃষ্টি করেছিস বল তো? এমন সুন্দরী পৃথিবীতে এসে তার রূপের পূজায় তুই কি দিলি?

সে হাসিয়া উত্তর দিল, রুদ্র-প্রিয়া সতী যখন দক্ষালয়ে যাচ্ছেন, তখন কুবের এসে রত্নালঙ্কারে তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নন্দীর সে পছন্দ হ'ল না। সে দেবীর অঙ্গ থেকে রত্নভূষা খুলে ফেলে তাঁকে সাজিয়ে দিলে বিল্বদল আর জবাফুলে, হাড়ের মালায়, রুদ্রাক্ষের কঙ্কণবলয়ে। পট্টবাসের পরিবর্তে গৈরিক-বসনে সে তাঁকে সাজিয়ে দিলে ভৈরবী। রুচিভেদ নিয়ে বিরোধ করিস নি ভাই, ও শুচিবাইয়ের মত নিতান্ত একটা মানসিক ব্যাধি।

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। হীরু ইঙ্গিতে আমার ও তাহার মধ্যে একটা অধিকারের গণ্ডিরেখা টানিয়া দিল। সে গণ্ডিরেখার ওপারে পদার্পণ করিলে আমার নিজের অপমানই আমি করিব।

নীরবে হীরুর পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাছের পর গাছ কাটা হইতেছিল। আজও এই ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন আলোড়িত হইতেছে। মনে হইতেছে, গাঢ় রঙের পল্লবঘন গাছগুলা

কাঁপিতেছে।

বিপুল ধ্বনিতে ছায়াপট মুখর হইয়া উঠিল যে। গাজনের ঢাক বাজিতেছে। ভক্তের দল আসিয়া হীরুর বাগানে প্রবেশ করিল। সিন্দূরলিপ্ত 'বাণ গোঁসাই' কাঁধে করিয়া বাজিকর-জাতির ভক্তদল ধ্বনি দিয়া উঠিল, ব—লো—শি—বো—হর—হর—বোম—হর—হর—বোম! আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম বাজিকরদের। এই জাতিটি আমার চিরদিনের বিস্ময়। যাযাবর জাতি, ভাঙাচোরা ঘরগুলি পিছনে ফেলিয়া বৈশাখেই দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইবে, বর্ষায় ভাঙা ঘর ভূমিসাৎ হইবে, আবার ফিরিয়া নতুন ঘর তুলিবে। সে ঘরও আবার ভাঙে, আবার উহারা আসিয়া নতুন গড়ে। এই শিব, এই গাজন ওই বাজিকরদেরই নিজস্ব।

পুরুষে দেখায় ভেল্কিবাজি, নারীরা সাপ বাঁদর লইয়া নাচায়, নিজেরাও নাচে—নাগিনী-নৃত্য। অপূর্ব সে নৃত্য—স্থির চরণে দেহ হিল্লোলিত করিয়া, সে নৃত্যের নাম নাগিনীনৃত্য ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।

ব—লো—শি—বো—হর—হর—বোম—হর—হর—বোম!

চিন্তায় বাধা পড়িয়াছিল, ভক্তদল 'বাণ গোঁসাই' কাঁধে বাহির হইয়া গেল।

ঢাকের মাথায় পালকের ভূষা ও চামর দুলিয়া নাচিতেছিল। ভক্তদলের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর নাচিতেছিল ফুলের মালা।

কিন্তু প্রধান ভক্তের গলায় আছে হাড়ের মালা। সে আছে মন্দিরদুয়ারে নন্দীর মত।

এ কয়দিন তাহার মন্দিরদ্বার ত্যাগ করিবার উপায় নাই।

সন্ধ্যায় ছিল বহ্ন্যুৎসব। বারুদের আতস-বাজি পুড়িতেছিল। অপব্যয়ের বিলাস হইলেও বেশ লাগিল। পৃথিবীর মানুষ যেন গ্রহ-গ্রহান্তরের অধিবাসীদের উদ্দেশে আলোকের বার্তা প্রেরণ করিতেছে। হাউইগুলো ঊর্ধ্বলোকে শব্দ করিয়া ফাটিয়া লাল নীল সবুজ নানা বর্ণের আলোকবিন্দুতে বিভক্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন কল্পবৃক্ষের ফুল ঝরিতেছে। দূরে বোম-বাজি বিপুল শব্দে ফাটিতেছে। ফানুস উড়িয়া চলিয়াছে চলন্ত তারার মত।

বেশ মনে আছে, ভাবিতেছিলাম, বিচিত্র মানুষের অকারণ প্রমোদাভিলাষ! আনন্দ-ভিখারী মানুষ আগুনের মধ্যেও ফুল ফুটাইতে চায়। সাপ লইয়া খেলা করে সে, বাঘ লইয়া বাজি দেখায়।

ধ্বংস করিতে পারে যে শক্তি, তাহাকে আয়ত্ত করার অভিলাষের মূলে কি মানুষের মৃত্যুজয়ের অভিলাষ, না, মৃত্যু লইয়া বিলাস? জয়ের অভিলাষ ও বিলাসে প্রভেদ আছে, যাহাকে মানুষ ভয় করে তাহাকেই করিতে চায় সে জয়, সেখানে আছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু বিলাস যে কামনাময় অনুরাগ ভিন্ন হয় না, বিলাসের যে বস্তু-বা পাত্র তাহার প্রতি উন্মত্ত লালসা থাকা চাই।

হীরু আমার পাশে দাঁড়াইয়া আগুনের খেলা দেখিতেছিল, তাহার মুখে কথা ছিল না, সিগারেট টানিতেছিল শুধু।

অকস্মাৎ দূরে একটা টিলার উপর সাঁওতাল-পল্লীতে আকাশের আগুন নামিয়া আসিয়া শতমুখী হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। আতস-বাজির আগুন লাগিয়া পল্লীটা জ্বলিয়া উঠিল। নরনারীর আর্ত কোলাহলে রাত্রির অন্ধকার ভয়ানক হইয়া পড়িল।

জল জল জল!

হীরুর হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া ছুটিয়া নামিয়া গেলাম। চৈত্র শেষের রৌদ্রে শুষ্ক

চালাঘর দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছিল। গরু বাছুর কলরব করিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। মুর্গীগুলা প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া জ্ঞানশূন্যের মত উড়িতেছিল। এঃ, একটা মুর্গী শিখার উপর দিয়া যাইতে যাইতে নাগিনীর বিষ-নিশ্বাসে আকৃষ্ট পক্ষুর মত আগুনেই পুড়িয়া গেল।

জল জল জল!

আগুন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল।

হীরুকে খুঁজিলাম, পাইলাম না, সে বোধ হয় আসে নাই। ফিরিবার সময় ভাবিলাম, এইখানেই আগুনে মানুষে দ্বন্দ্ব, এইখানে আছে তাহার জয়ের অভিলাষ। আর ওই যে আতস-বাজির খেলা, ওখানে ছিল বিলাস-কামনা।

যে শক্তির মধ্যে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বসতি, তাহাকে লইয়া বিলাসের ফল আজ ফলিয়া গেল। অথবা হয়তো এ হীরুরই স্পর্শদোষ। জীবনের রাজ্যে সে অস্পৃশ্য—এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

হীরুকে তিরস্কার করিবার জন্য তাহারই সন্ধানে চলিলাম।

বাড়ি সে ছিল না। শুনিলাম মেলার দিকে গিয়াছে সে, কাহাকেও সঙ্গে লয় নাই, একাই গিয়াছে।

মেলার দিকে চলিলাম।

আমাদের দেশের চিরাচরিত যে ধারায় মেলা হইয়া থাকে, সেই ধারায় মেলা। কোথাও এতটুকু সংস্কারের চিহ্ন নাই। উগ্র তীব্র আলোকপ্রদীপ্ত পথে প্রমত্ত আনন্দ-সন্ধানী মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। কলরব-কোলাহলে, উচ্ছল হাসির উচ্ছ্বাসে মনের সুষুপ্ত বর্বর গর্জন করিয়া হিংস্র পশুর মত জাগিয়া উঠে। সিগারেট বিড়ি মদ ও খারাপ ঘি আর তেলের গন্ধ মিশিয়া সমগ্র বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া উঠিয়াছে।

বহুকষ্টে হীরুকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তখন গভীর রাত্রি, লোকজনের ভিড় কমিয়া আসিয়াছে। জুয়ার আড্ডায় তাহাকে পাইলাম। তাহার কোলের কাছে নোট ও টাকার রাশি।

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পরিস্ফুট ঘৃণার সহিত বলিলাম, জুয়ো খেলছিস তুই?

সে হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ।

বোধ হয় তিরস্কারের ভাষা খুঁজিতেছিলাম।

হীরু বলিল, চল, মন্দিরে যাই। ফুলখেলার সময় বোধ হয় হয়ে এল।

ফুলখেলার নামে শরীর আমার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। হীরুর আকর্ষণে নয়, বাল্যকালের ফুলখেলার স্মৃতির আকর্ষণে নির্বাক হইয়া হীরুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

বর্ষ-শেষের রাত্রিতে গাজনের ভক্তের দল নাচিতেছিল। বোলান গান হইতেছে, বৃত্তাকারের নৃত্যরত ভক্তদলের মধ্যে নরকপালের স্তূপ; নাচিতে নাচিতে তাহারা নরকপাল লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। কেহ নরকপাল শূন্যে ছুঁড়িয়া দেয়, অন্য একজন লুফিয়া লয়। অন্য একজনে ছুঁড়িয়া দেয়, অপরে সেটা ধরে। শূন্যে নরকপাল যেন ভাসিয়া ভাসিয়া ফেরে, কেহ বা মাটির উপর শুইয়া পড়িয়া নরকপালের শূন্য মুখগহ্বরে মুখ দিয়া নিম্ন তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠে।

ওদিকে ঢাক বাজিয়া উঠিল, এ খেলা থামিয়া গেল। এইবার হইবে ফুলখেলা, ভক্তদল শিবের মাথায় ফুল চড়াইবে।

ফুল, বৃক্ষজাত পুষ্পদল নয়, বহ্নিপুষ্পের অঞ্জলি। শিবমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে স্তূপীকৃত জলন্ত অঙ্গাররাশি উত্তাপে জ্যোতিতে নিশীথ অন্ধকারের বুকের মধ্যে ভয়াল মূর্তিতে জাগিয়া আছে। তাহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ ভক্তদল।

ব—লো—শি—বো—শঙ্কর—হর—হর—বোম—হর—হর—বোম।

প্রধান ভক্ত দ্রুতপদে দুই করতল পূর্ণ করিয়া সেই বহ্নিপুষ্পের অঞ্জলি লইয়া ছুটিল মন্দির-পানে। শিবলিঙ্গের মস্তকে সে অঞ্জলি দিয়া আসিল। তারপর দলে দলে ভক্তদল ওই অঞ্জলি লইয়া—

হীরু! হীরু!

হীরুও ছুটিয়াছে ওই অঞ্জলি লইতে।

হীরু! হীরু!

আমিও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম।

দশ

হীরুকে একরূপ জোর করিয়া এই ভীষণ ভয়াবহ খেলা হইতে নিরস্ত করিলাম। এদিকে ভক্তের দল সেই স্তূপীকৃত জলন্ত অঙ্গাররাশির উপর ভক্ত-নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। অদ্ভুত সে নৃত্য। বর্ষাবসানে বর্ষের শেষ রাত্রি, শেষ প্রহরের অন্ধকারের মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের উপর ভক্তদলের সে নৃত্য যেন সমস্ত চেতনাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

হীরু হাতজোড় করিয়া কাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আয়।

দোতলার বারান্দায় বসিয়া বলিলাম, ঘুমিয়ে কাজ নেই, মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়যাত্রা দেখব আজ। নববর্ষের সূর্যোদয় দেখব ব'সে ব'সে।

আমাকে একটা সিগারেট দিয়া হীরু নিজেও একটা ধরাইয়া বসিল। শেষরাত্রির তিমির তরল হইয়া আসিতেছে।

দূরে মেলাটা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যেন ঘুমঘোরে ঢুলিতেছে। অদূরেই কিসের একটা ক্ষুদ্র জনতা তখনও বিকৃত রসোল্লাসে কোলাহল করিতেছিল।

সহসা হীরু বলিল, চৈত্র-সংক্রান্তির শেষরাত্রি, বৎসরের এটা মৃত্যুলগ্ন। তার প্রভাব যে এড়াতে পারছি না নরু, চোখের পাতার ওপর তার অঙ্গুলি-স্পর্শে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি যে। তোর আপত্তি না থাকে তো বিষে বিষক্ষয় করি, নীলকণ্ঠ না হ'লে তো মৃত্যু জয় করা যায় না। বলিস তো বোতল গ্লাস নিয়ে আসি।

হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, আনবি আন, কিন্তু নীলকণ্ঠের দোহাইটা তুই মিথ্যেই দিলি। কণ্ঠে থাকিলে প্রতিবাদ করতাম না, কণ্ঠে তো থাকে না, সরাসরি যকৃতের ওপর গিয়ে প্রেমস্পর্শে তাকে পাকিয়ে তোলে যে!

উঠিয়া হীরু বলিল, উপায় কি? যকৃত যোগী হয়ে হন যকৃতানন্দ, দেহের মায়া-বন্ধন তখন তার ছিন্ন করবার প্রচেষ্টা যে স্বাভাবিক। বৈরাগ্য আসবে ভয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা করব না—এ তো হতে পারে না নরু।

সুরা তরল বহ্নির মত কণ্ঠনালীতে, শিরায় শিরায়, মস্তিষ্কে যেন আগুন জালিয়া দেয়।

হীরু অদূরে জনতার দিকে চাহিয়া বলিল, ওটা কি হচ্ছে বল তো?

বলিলাম, অন্যায় প্রশ্ন বন্ধু, দেহের অন্তরালে মন বরং আমরা দেখতে পাই, কিন্তু জনতার অন্তরালে কোন্ জন কোন্ অঘটন ঘটাচ্ছে, তা আমরা দেখতে পাই না।

হীরু ডাকিল, দারোয়ান!

দারোয়ানটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। হীরু বলিল, ওখানে কি হচ্ছে দেখ তো। নিয়ে এস এখানে, যা হচ্ছে।

অল্পক্ষণ পরেই দারোয়ানের পিছন পিছন আসিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে। দেখিয়াই চিনিলাম, বাজিকরের মেয়ে—যাযাবরী।

হীরু আলোটা বাড়াইয়া দিল। পিঙ্গলবর্ণা তরুণী যাযাবরী, সুগঠিত দীঘল দেহ, পরনে পশ্চিমা মেয়েদের মত রঙিন ছিটের কাপড়, হাতে একহাত কাঁচের চুড়ি, গলায় বেলের খোলার একরাশ মালা—বেলফুলের কুঁড়ির মালার মত শুভ্র মহিমায় পিঙ্গলবর্ণ দেহের উপর যেন ঝলমল করিতেছে। তাহার কাঁকে একটা ঝুড়ি, ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সে হাসিয়া বলিল, গান শোনবা বাবু, নাচ দেখবা?

মেয়েটার কণ্ঠস্বরের সুরে, ভাষার মিষ্টতায়, উচ্চারণের বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিতে দেহে যেন রোমাঞ্চ দেখা দিল। অদ্ভুত মিষ্টভাষী এই যাযাবর জাতিটি। এমন মিষ্ট কথা আমি জীবনে কোন জাতির মুখে শুনি নাই। আর মোহময় একটা রহস্য যেন এই অনাবৃতদেহ জাতিটির সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মাখানো আছে। বর্বরা যাযাবরীরা মোহময়ী, সর্বাঙ্গে যেন মোহ জড়ানো। দীর্ঘ সবল দেহ, ক্ষিপ্র গতি, হাতে ভেল্কি, মুখে হরেকরকম বোল, কাঁধে ঢোল আর ঝুলি—যাযাবর রহস্যময়! পূর্বে তাহারা নাকি আপন ছেলে কাটিয়া বাজি দেখাইত, আবার বাঁচাইত। আর একটা রহস্য—আজও এদের নারীর স্বাধীন জীবন, সে আপনাকে স্বেচ্ছায় বিলাইয়া দেয়, বাপ দাবি করে শুধু টাকা।

বিচিত্র যাযাবর জাতির ক্ষুদ্র একটি যূথ কেমন করিয়া কোন্ যুগে যে আমাদের এই গ্রামপ্রান্তে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল জানি না। বর্ষের প্রারম্ভে জাতিটা পথে বাহির হয়। একবার ফেরে দুর্গোৎসবের সময়। বাজিকরদের দুর্গোৎসব আছে। আর আসে গাজনের সময়। ওই শিবটি এই বাজিকরদেরই। তাহারা আসিয়া চৈত্র মাসের পনেরোই শিবকে জল হইতে তুলিয়া মন্দিরে স্থাপন করিবে, অন্য কাহারও শিব তুলিবার অধিকার নাই। গাজনের প্রধান ভক্ত ওই বাজিকরদেরই একজন। সে-ই রুদ্রদেবতার মাথায় প্রথম তুলিয়া দেয় বহ্নিপুষ্পের অঞ্জলি। আবার নববর্ষের প্রথম দিনে মহাকালকে জলের মধ্যে শীতল শয়ানে শায়িত করিবে ওই বাজিকরেরাই। তারপর আবার উহারা বাহির হইয়া পড়িবে।

যাক।

হীরুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে সবিস্ময়ে যাযাবরীকে দেখিতেছে। আর সেই বন্য বর্বর মেয়েটাও অসীম বিস্ময়ে হীরুর দিকে চাহিয়া আছে।

হীরুকে বলিলাম, কি দেখছিস?

সে উত্তর দিল, যাযাবরীর রূপ।

আমি হাসিলাম। হীরু সেটা লক্ষ্য করিল বোধ হয়। সে বলিল, অপরূপ নয়, কিন্তু রূপের মধ্যে উন্মাদনা আছে। ওর হাতে গলার বাহুবন্ধনে যদি কেউ পরিয়ে দেয় পদ্মবীজের মালা, তবে ওকে মৃত্যুর প্রতিবিম্ব ব'লে মনে হবে। মহাভারতের শান্তিপর্বে মৃত্যুর রূপের কথা মনে আছে তোর?

যাযাবরী বলিয়া উঠিল, এত সোন্দর কি ক'রে তুমি হল্যা বাবু? এত সোন্দর রঙ তোমার?

আমি ঈষৎ রূঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলাম, নাচ দেখাবি গান করবি, তাই দেখা। এসব কথা—

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অদ্ভুত সে হাসি, দেহ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সে হাসি তাহার আর শেষই হয় না।

আবার বলিলাম, হাসছিস কেন তুই?

সে আরও হাসিয়া উঠিল। এবার হাসিতে হাসিতেই বলিল, তুমার রাগ দেখে গো।

সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই বলিল, উ বাবুটিকে দেখ্যা আমার ভাল লাগছে, তাই তুমার হিংসে হচ্ছে নাকি গো?

বর্বরা বলে কি! কিন্তু না হাসিয়াও পারিলাম না।

বলিলাম, দাঁড়া, তোদের মোড়লকে ব'লে দেব আমি।

সে বলিল, কি বলবা বাবু? ওই বাবুটি যদি আমার বাবাকে টাকা দিয়ে কিনে লেয় তো দিয়ে দিবে বাবা।

হীরু গ্লাস দুইটা ভর্তি করিয়া বলিল, কই, নাচ তুই।

যাযাবরী বলিয়া উঠিল, কি বটে বাবু, মদ নাকি? আমাকে টুকচা দিবে না? খেয়ে হরষ ক'রে নাচ দেখাই।—বলিয়াই সে আপনার ঝুড়ি হইতে একটা পাত্র বাহির করিয়া বসিল। উজ্জ্বল আলোকে ভ্রম হইবার নয়, দেখিলাম নরকপালের পানের পাত্র সেটা।

হীরু বলিল, ও পাত্রটা আমাকে দিবি?

সে মধুর কণ্ঠে বলিল, বালাই, মরণ হোক আমার, তুমার, ওই চাঁদপারা মুখে মড়ার খুলি তুলে দিব কি বল্যা গো!

হীরু পাত্রটার কানায় কানায় সুরায় পরিপূর্ণ করিয়া দিল। মেয়েটা নিঃশেষে সেটুকু পান করিয়া বলিল, উঃ! কিন্তু বড় মধুর জিনিস গো বাবু, বুকটা জলজ্বলিয়ে দিলেক গো।

হীরু নিজের গ্লাসটা তুলিয়া বলিল, মৃত্যু-প্রতিবিম্বময়ী ওই যাযাবরীর রূপশিখা পান করছি নরু। প্রার্থনা করি, তুইও তাই কর।

আমি বলিলাম, না, আমি কামনা করছি, ওই যাযাবরীর মোহে তোর যাযাবরত্বের অবসান হোক, ওই যাযাবরীর পদাঙ্কে পদাঙ্কে চরণপাত ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন পুরলক্ষ্মী।

হীরুর উত্তর দিবার অবসর হইল না, তাহার পূর্বেই যাযাবরী গান ধরিয়া দিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব গান, নিজস্ব সুর, নিজস্ব ভঙ্গি। বাংলার সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে সঙ্গীতে সে রূপ এখনও ধরা পড়ে নাই।

সে আরম্ভ করিল—

উ-র-র—জাগ—জাগ জাগিন ঘিনা—জারঘিনিনা।

সঙ্গে সঙ্গে দেহে যেন নৃত্য অপরূপ ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। চরণ দুইটি তাহার স্থির, কিন্তু পদপ্রান্ত হইতে একটা বঙ্কিম হিল্লোল ক্রমশ দেহ বাহিয়া উঠিয়া আসিল।

সে গাহিতেছিল—

উ-র-র—পান চিরি চিরি—কথা কও ধীরি ধীরি—
প্রাণের কথা হায় কি বঁধু, উড়িয়ে দেবে আসমানে
হায় গো বল, কেমন ক'রে বাঁচব পরাণে।

উ-র-র—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জারঘিনিনা।
উ-র-র—জাতি কি হীন বঁধু, জাতি কি হীন,
বঁধুর তরে পান সাজি রাত্রি ও দিন।
উ-র-র—সে পান আমার শ্যাম ছুঁলে না, মরি অভিমানে।
হায় গো বল, কেমন ক'রে বাঁচব পরাণে।
উ-র-র—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জারঘিনিনা।
উ-র-র—এ বঁধু কুঞ্জবনে—খেলা করব দুজনে,
ডালিম ফুল বানায়ে ফাগে শ্যামকে রাখব যতনে।
উ-র-র—হায় রে কাপাল, ডালিম গাছের চিরুল চিরুল পাতা—
ফল তুলিতে ডাল ভাঙ্গিলাম, শ্যাম রইল কোথা!

সঙ্গে সঙ্গে নূপুরহীন স্তব্ধ চরণে তাহার দেহ বাহিয়া সেই তরঙ্গায়িত নৃত্য—যেন নাগিনীর নৃত্য। সুরার বহ্নিশিখা বুকের মধ্যে যে ভঙ্গিতে জ্বলিতেছিল, যাযাবরী যেন সেই ভঙ্গিতে নাচিয়া চলিয়াছে! সুরার আবেশে চক্ষু দুইটি তাহার অর্ধনিমীলিত বিহ্বল, রুক্ষ পিঙ্গল কেশপাশ তাহার শিথিল, এলোখোঁপা বুকে পিঠে ঝাপিয়া পড়িয়াছে। গান শেষ হইয়া গেল, তবু নৃত্য যেন ফুরায় না। আমরা বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলাম।

আজও অন্ধকারের মধ্যে আমার মনের ছায়াপটে যাযাবরী নাচিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে ছায়াপটের এই অংশটুকু দীর্ঘ, সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী দীর্ঘ হউক।

আজ এই মুহূর্তে মনে হইতেছে, যাযাবরী তাহার পিঙ্গল নয়নের দৃষ্টিতে সত্য দেখিয়াছিল। হীরুর রূপের প্রশংসা করায় আমার ঈর্ষাই জাগিতেছিল। যাযাবরী আমাকে মোহগ্রস্তই করিয়াছিল। কিন্তু অনুশোচনা হইতেছে না। জীবনরসে উচ্ছল যাযাবরী রহস্যময়ী।

হীরু অর্ধনিমীলিত নেত্রে যাযাবরীর নৃত্য দেখিতেছিল। যাযাবরীর নৃত্য শেষ হইল, সে শ্রান্তক্লান্তভাবে মাটির উপর যেন এলাইয়া পড়িল।

হীরু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

সে যাযাবরীর স্তবগান করিল।

মেয়েটা হাঁপাইতেছিল। হীরু বলিল, নিয়ে আয় তোর পাত্রটা।

যাযাবরী যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া আসিয়া পাত্র সম্মুখে ধরিল। আমাদেরও পাত্র পরিপূর্ণ সুরায় টলমল করিতেছিল।

পাত্রটা শেষ করিয়া মেয়েটা যেন ঈষৎ সুস্থ হইল।

হীরু বলিল, বাড়ি যা এবার। কাল সকালে আসিস, বকশিশ নিয়ে যাস।

যাযাবরী বলিল, টুকচা বসি বাবু, তুমাকে দেখি। চোখের সার্থক ক'রে লিই গো চাঁদপারা বাবু।

হীরু আমাকে প্রশ্ন করিল, তোর কাছে টাকা আছে ? একটা দে তো।

টাকাটা লইয়া সে যাযাবরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এইবার যা।

মুহূর্তে যাযাবরী উঠিয়া চলিয়া গেল। টাকাটা পড়িয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তাড়িয়ে দিলি ? অসীম প্রান্তরের মধ্যে অবাধে ছুটে চলে যে মন, সে মন তোর রূপসাগরে ডুবে মরছিল, তাকে অপমানের তরঙ্গাঘাতে কঠোর মাটির বুকে ফিরিয়ে দিলি ?

হীরু বলিল, তোর কাছে গোপন করব না নরু, আমারও মোহ জাগছিল, মায়াবিনীর মায়াতে যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলছিলাম।

পূর্বদিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, নববর্ষের সূর্যোদয় হইতেছিল।

প্রভাতেই হীরু বলিল, চল শিকারে যাই।

শিকারে গেলাম সেই শঙ্খপতির বিলে ; বিস্তৃত বিল, চারিপাশে উলুখড় ও কাশবনের গুল্মগুলি তখন সেই বৈশাখে পত্রকাণ্ডহীন, বিশুষ্ক। বিলের জলের কোলে কোলে পদ্মলতার কোমল কিশলয় দুই চারিটি করিয়া সবে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলের জল নির্মল কাকচক্ষুর মত কালো, উপরের আকাশেরই মত নিষ্কম্প, স্থির। নানাজাতীয় জলচর পাখীর দল কলরব করিয়া ফিরিতেছিল। বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র কলস্বর ! মাথার উপর কত দল পাক দিয়া ঘুরিতেছে ! এক দল বসে, একদল উড়ে। চারিপাশে জল ও তীরভূমির সংযোগস্থলে দীর্ঘপদ শুভ্রপক্ষ বকগুলি মাছের প্রতীক্ষায় তপস্বীর মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

হীরু বলিল, হংসবলাকার দল দেখেছি মানসের সন্ধানে যাত্রা করেছে। মরাল আর ডাহুক ছাড়া বড় কিছু নেই।

আমি বলিলাম, কিংবা হয়তো তারা পূর্ব হতেই ব্যাধের আগমনবার্তা পেয়েছে।

বাধা দিয়া হীরু বলিল, ভুল বন্ধু, ভুল। ব্যাধিনী সংসারে এক, সে হ'ল মহাকালের প্রেয়সী মৃত্যু, তার বার্তা তো পাবার নয়, পায়ও না কেউ। অহরহ সে তো পশ্চাতে পশ্চাতে রয়েছে, যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে, যে কোন শস্ত্রে জীবনকে শিকার সে করতে পারে। আমরা হলাম মাংসলোভী বাজপাখী, কি সারমেয়ের দল, জীবন নিলে তবে আমরা পাই তার শবদেহ।

অদ্ভুত দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম থাক তত্ত্বকথা এখন।

হীরু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, চল, ওপাশের তীরে যেতে হবে।

আঁকা-বাঁকা তীরভূমির ঘাসের উপর সন্তর্পিত পদক্ষেপে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া চলিয়াছিলাম। কাশ ও উলু বনের ধারালো শুকনা পাতায় পায়ের স্থানে স্থানে কাটিয়া জ্বালা করিতেছিল ; আমার কিন্তু জ্বালার অপেক্ষা কৌতুক অধিক পরিমাণে জাগিয়া উঠিল। বলিলাম, উদরের জ্বালা পায়ে অনুভব করছিস হীরু ?

হীরু মৃদুস্বরে বলিল, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্রমন্থনে উঠল যে সুধা, সে আত্মসাৎ করলে দেবতা, তারপর উঠল গরল, সে পান করলেন নীলকণ্ঠ, মানুষের ভাগ্যে পড়ল বিক্ষুব্ধ বারিধির শূন্য উদরের বিক্ষোভ, সেই হ'ল ক্ষুধা। ক্ষুধার তাড়নায় পৃথিবী অস্থির। উপায় কি ? উদরের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা—উঃ, গন্ধ কিসের উঠছে, বল তো ?

সত্যই একটা দুর্গন্ধ—যেন দগ্ধ দেহের গন্ধ নাকে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল।

হীরু বলিল, ওখানে ঝোপের মধ্যে কে ?

অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। একটা লোক অর্ধদগ্ধ কোন

পশুশিশুর দেহ টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। নিতান্ত পশুর দেহ। লোকটাকেও চিনিলাম, পেশাদার চোর ছিল একদিন, এখন দুইটি পা-ই তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে। চুরি করিতে গিয়াই উচ্চ প্রাচীর হইতে পড়িয়া পা দুইটি হারাইয়া হতভাগ্য এখন চীৎকার করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কিন্তু পঙ্গু নয়, ওই হাতের উপরে ভর দিয়াই ক্রোশের পর ক্রোশ সে ঘুরিয়া আসে। শুধু শিহরিয়াই উঠি নাই, লালসার কদর্য রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াও গিয়াছিলাম সেদিন। আজও এই অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সমগ্র দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। লোকটা ধরা পড়িয়া বিহ্বলের মত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হীরু বলিল, ওটা কি ?

লোকটা মিথ্যা বলিতে পারিল না, বলিল, ছাগলের ছানা।

নির্বাক বিস্ময়ে আমরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা ভীত অনুনয়ের সহিত বলিল, অনেক দিন মাংস খাই নাই বাবু—

হীরু বলিল, কিন্তু তুই ধরলি কেমন ক'রে ওটাকে ?

আজ্ঞে, এইখানে ছানাটা একলা চীৎকার করছিল, তাই চুপিচুপি এসে—

সে বুঝেছি, কিন্তু ধরলি কেমন ক'রে খোঁড়া পায়ে ?

সে বলিল, এতেই আমি দৌড়ে যাওয়ার মত জোরে যেতে পারি বাবু। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

তাহাকে তিরস্কার করিতে পারিলাম না, ঘৃণা করিতেও পারিলাম না। নীরবেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া দুইজনে চলিয়া গেলাম। খানিকটা অগ্রসর হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, খঞ্জ দ্রুতবেগে হাতের উপর ভর দিয়া পলাইয়া যাইতেছে। অনুমান করিলাম, অর্ধদগ্ধ পশুদেহটাও সে নিশ্চয়ই ফেলিয়া যায় নাই, হয়তো কুকুরের মতই মুখে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

বেশ মনে আছে, আমি নতশিরে হীরুকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম। অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলাম বন্দুকের শব্দে। দেখিলাম হীরুর বন্দুকের ঊর্ধ্বমুখ নলের প্রান্তে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেশ। আকাশের বুকে সঞ্চরমাণ একঝাঁক মরালের মধ্য হইতে গোটা কয়েক শিথিলপক্ষ নিম্নমুখ হইয়া ধরিত্রীর বুকে ঝরা পাতার মত নামিয়া আসিতেছে। হীরু আবার টোটা পুরিতেছিল। সে আমাকে বলিল, ফায়ার কর, ফায়ার কর।

মুহূর্তে ভুলিয়া গেলাম খঞ্জের মধ্যে লালসার সেই ভয়ঙ্কর রূপ। বন্দুকটা উঁচু করিয়া ধরিয়া পলায়নপর বিহঙ্গমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিলাম।

হীরু আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, বিউটিফুল! সুন্দর! সুন্দর!

উত্তেজনায় আনন্দে রক্তে যেন জোয়ার ধরিয়া গেল। হত্যায় যে এমন উন্মত্ত আনন্দ সে আমি জানিতাম না। ইচ্ছা হইতেছিল, গুলির পর গুলি চালাইয়া বিলের সমস্ত পাখীর দল উজাড় করিয়া দেই। উপরে মরণ-ভীত বিহঙ্গমের দল ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠিতেছিল, বিলের জলে যাহারা খেলা করিতেছিল, তাহারাও বিপরীত মুখে ভয়ার্ত কলরব করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

হীরু আমার চেতন আনিয়া দিল, কহিল, তারপর ?

প্রশ্ন করিলাম, কি ?

হীরু বলিল, কিছু না, চল। পাখীগুলো জলের ওপর পড়েছে। তা যাক, মা ফলেষু কদাচন—শাস্ত্র বাক্যটা স্মরণ করতে করতে চ'লে যাই।

মন কিন্তু আমারই মানিল না, জীবনে হত্যাকাণ্ডের প্রথম পুরস্কার এই শবদেহগুলি ছাড়িয়া

যাইতে কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম আমিই বিলের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি।

আকাশ থেকে ফুল পাড়ল্যা গো বাবু, ফুল পড়ল জলে? হায় হায় হায়!

পিছন ফিরিয়া দেখি, সেই বাজিকরদের মেয়েটা পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। দিনের আলোকে হীরু তাহাকে প্রখর দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। আমি বলিলাম, আরে মর, তুই কোত্থেকে এলি?

সর্বাঙ্গে একটি হিল্লোলের সঞ্চার করিয়া সে বলিল, বিলের কূলে সাপ ধরতে আইছিলাম গো বাবু, তুমাদের বন্ধুকের রজ শুনে এলম, তা হায় হায় বাবু, শেষে জলে পড়ল গো? তুল্যে দিব আমি?

আমি বলিলাম, পারবি তুই?

সে হাসিয়া বলিল, ওই চাঁদপারা বাবুটি যদি বলে, তবে আমি পারি, লইলে লারব।

হীরু এবার প্রশ্ন করিল, পারবি তুই?

যাযাবরী বলিল, মরি তোমার লেগ্যে মরব। তুমি টুকচা কাঁদবা আমার লেগ্যে?

বলিয়া সে কাঁকালের ঝুড়ি নামাইয়া কাপড়ের আঁচলে গাছ-কোমর বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ঝুড়িটার মধ্যে সাপের ঝাঁপিতে সাপ গর্জন করিতেছিল। ঝুড়ির দিকেই চাহিয়াছিলাম। অকস্মাৎ বিলের বুকে মেয়েটা চীৎকার করিয়া উঠিল, ডুবলুম গো।

চমকিয়া উঠিলাম, মেয়েটা জলে ডুবিতেছে। হীরু তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। আমিও কাপড় সাঁটিয়া নামিবার উদ্যোগ করিলাম; কিন্তু নামা হইল না। দেখিলাম, যাযাবরী স্বচ্ছন্দে জলের উপর ভাসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

হীরু ফিরিয়া আসিয়া সিক্ত-দেহে তীরে বসিয়া যাযাবরীর জলখেলা দেখিতে বসিল। বুকে হাঁপাল দিয়া জলে তরঙ্গ তুলিয়া পায়ের আঘাতে বিলের জল ফোয়ারার ধারার মত চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে সে চলিয়াছিল।

আমি বলিলাম, অদ্ভুত জাত! কেমন ক'রে ওরা এখানে এল, তুই কিছু জানিস?

হীরু কোন উত্তর দিল না।

আমি আবার বলিলাম, বোধ হয় তোদের পুরানো খাতাপত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে।

যাযাবরী উঠিয়া আসিয়া পাখীগুলি সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই লাও গো বাবু, কি বকশিশ দিব্যা দাও। কেমন রাঙাপারা হাত পেত্যেছি দেখ।

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে জলসিক্ত কেশভার এলাইয়া জল নিঙড়াইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।

হীরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি বকশিশ চাস, বল?

কৌতুকময়ী মেয়েটা বলিল, টুকচা ব'স তুমি বাবু, সাপের খেলা দেখ, তবে তো বকশিশ দিব্যে।

হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিলাম, আরে, বিষ গেলেছিস ওর?

বাঁ হাতে ছোট একটা লাঠি লইয়া সে তখন ঝাঁপি খুলিয়া দিয়া গান ধরিয়াছে—

> মাথায় পশরা লয়্যা—গোয়ালিনী হাঁকে পথে
> দধি—লে—ওগো—তুরা দধি—লে!

আমি বলিলাম, ওরে তুই সাপ বন্ধ কর বাপু, বিষদাঁত এখনও ভাঙিস নি।

গান শেষ করিয়া অবলীলাক্রমে উদ্যতফণা বিষধরকে ধরিয়া সে বলিল, মন্তর আছে গো বাবু জড়ি আছে। এই দেখ কেনে!

ঝাঁপিতে সাপ বন্ধ করিয়া যাযাবরী বলিল, আমাকে ওই বন্দুক ছুঁড়তে দিব্যা বাবু একবার ? পরাণে বড় সাধ হয় গো।

হীরু তৎক্ষণাৎ বন্দুকটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, নে, তোর স্পর্শে মারণাস্ত্র আমার ধন্য হোক। তোর নাম দিলাম আমি চিত্রাঙ্গদা।

বড় বড় পিঙ্গল চোখ দুইটি তুলিয়া সে বলিল, কি নাম দিল্যা ?

হীরু বলিল, চিত্রাঙ্গদা। সে এক রাজার মেয়ে, কিন্তু তোরই মত বনে বনে দুর্দান্ত সাহসে ঘুরে বেড়াত।

সে একবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বড়া মিঠ্যা নাম গো বাবু, কিন্তুক আমার নাম যে মুক্তকেশী।

হীরু বলিল, তা হোক, আমি তোকে চিত্রাঙ্গদা ডাকব। আয়, এইবার তোকে বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিই।

যাযাবরীর হাতে হাত ধরিয়া কপোলে কপোল স্পর্শ করিয়া হীরু লক্ষ্য স্থির করিবার পদ্ধতি বুঝাইয়া দিয়া বলিল, নে, এইবার আঙুল দিয়ে টান এই ঘোড়াটা, দেখবি, ওই বকটা পড়বে।

সে বলিল, তুমি ছেড়ে দাও, তবে তো মারি।

না, তোর ভুল হবে।

না গো বাবু, না ; মন ভুল হল্যেই ভুল হব্যে। চোখেও তখন ভুল দেখব যে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, মন ভুল হবে কেন রে ?

বন্দুক ছাড়িয়া দিয়া সে বলিল, ওই চাঁদপারা বাবুটির কাছে মন আমার ভুল হচ্ছ্যে গো বাবু। দেখ, তুমি যেন আবার রাগ ক'র না। হেই দেখ, আমাদের গোটা জাতটা মন হারায়্যা হেথায় ঘর বাঁধলে।

কৌতূহলী হইয়া বলিলাম, বল তো কি শুনি ?

সে বলিল, এই দেখ, অ্যানেক দিন আগে—সি আমরা জানি না কত দিন—তখন আমরা ছিল্যাম হাঘর্যা, পথে পথে ঘুরতাম। একদিন হেথাকে এসে দল লিলেক বাসা। আধার রাত, দুবার শ্যাল ডেক্যে গেল। তখন দুটি বুড়া বুড়ী এসে মোড়লকে ডেকে বললে, দেখ বাপু, এই আমরা হলাম শিব আর দুগ্গা। আমাদের এই গাঁয়ে তুমাদের পূজা করতে হবে। মোড়ল বললে, তা কি করো্য হবে বাবা, আমরা হলাম হাঘর্যা, ঘর আমাদের বাঁধতে নাই যে। শিব দুগ্গাও ছাড়ে না, মোড়লও রাজি হয় না। তখন শিব দুগ্গা চলে গেল। চ'লে গেল না, কাছেই লুকিয়ে রইল। তারপর যখন রাতের শেষ পহর সবাই যখন ঘুমিয়েছে তখন শিব দুগ্গা এস্যে আমাদের মন চুরি ক'রে নিয়ে হেথাকার মাটির তলায় পুঁতে দিলে। তাথেই আমরা দুগ্গা-পূজো আর শিব-পূজো করি গো বাবু।

সে নীরব হইল। হীরু অস্থির হইয়া বলিল, যাক তোর মন-চুরি। বন্দুক ছুঁড়বি আয়।

আবার তেমনই হীরুর বাহু-বন্ধনের মধ্যে দাঁড়াইয়া যাযাবরী লক্ষ্য স্থির করিল।

হীরু বলিল, টান ঘোড়া।

মুহূর্তে অগ্ন্যুদ্গার করিয়া বন্দুকটা গর্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়টা বক অত্যন্ত আর্তভাবে ঝটপট করিয়া জলে পড়িয়া গেল।

বন্দুকটা হীরুর হাতে ছাড়িয়া যাযাবরী আনন্দে করতালি দিয়া আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এগারো

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর উঠিয়া হীরুকে দেখিতে পাইলাম না। বিশেষ সন্ধানও করিলাম না। অবকাশ পাইয়া বউদিদিকে দেখিতে চলিলাম। শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিলেন গৌরী; শুধু তপোভঙ্গ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া মহাকালকে আপন দুয়ারে ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। বউদিদিকে আজ এই বলিয়া রহস্য করিব স্থির করিলাম।

দরজার প্রবেশ-মুখেই বলিয়া উঠিলাম, জয় হোক গো অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, আপনার জয় হোক।

বিরক্তিপূর্ণ নীরস কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, কে রে মুখপোড়া ভিখিরী, আমায় ঠাট্টা করতে এসেছ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বউদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, মুখপোড়াই বটে বউদিদি, তবে লেজ নেই।

সবিস্ময়ে তিনি বলিলেন, কে, নরু ঠাকুরপো। ওমা, কোথা যাব আমি! কি বললাম! ছি ছি! ব'স ব'স।

বসব বইকি। কিন্তু আপনাকে অন্নপূর্ণা সম্বোধনটা তো ঠাট্টা নয়, ওটা যে সত্যি। জানেন তো, গৌরী মহাযোগীর তপোভঙ্গ ক'রে তাকে ভিক্ষুক সাজিয়ে নাম নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা। তাই তো অনেক হিসেব ক'রে আপনার নামটা ঠিক করেছি। আপনার ভিক্ষুকটি কই—আমার দাদা? এ কি বউদি, কি হ'ল?

বউদিদি যেন বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেলেন, চোখের কোল ভরিয়া জল ছলছল করিয়া উঠিল।

শঙ্কিত হইয়া আবার প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল বউদি?

আঁচল টানিয়া চোখের জল মুছিয়া অল্প একটু হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, হয়নি কিছু। কিন্তু সেই কথাটা তুমি আজও মনে রেখেছ?

সে আমি কখনও ভুলব না বউদি; চিরদিন মনে থাকবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বউদিদি বলিলেন, কথাটা ভুলেই যেও ভাই, আমার অহঙ্কার ভেঙে গেছে।

চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, ভেঙে গেছে! সে কি, তা হ'লে দাদা কি—? প্রশ্ন শেষ করিতে পারিলাম না।

বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, আবার তাই। লজ্জার কথা ঠাকুরপো, কিন্তু তুমি আমার ভাইয়ের অধিক, তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই, আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। হাতে হাতে জিনিস পর্যন্ত নেন না।

নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম, বউদিদির মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছিল।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, একটু জল খাও ঠাকুরপো. এত বড় নামটা যখন দিলে তুমি, তখন আমার মানটা রাখ।

হাত দুইখানি পাতিয়া ভিক্ষুকের মত বলিলাম, দিন, সত্যিই ক্ষিদে পেয়েছে।

তিনি বলিলেন, হাত নামাও তা হ'লে, অন্নপূর্ণার দান ওইটুকু হাতে কি ধরে? থালা

ভ'রে মুড়ি দোব।

মুড়ি বাহির করিয়া তিনি নামাইয়া দিয়া বলিলেন, এখুনই খেতে আরম্ভ ক'র না যেন, আমি ওদের বাড়ি থেকে একটু তেল আর আদা নিয়ে আসি।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, পলাইয়া যাই। কিন্তু পারিলাম না, তাহাতে আমার লজ্জার চেয়ে বউদিদির লজ্জাই হইবে অধিক। কিন্তু নিশানাথবাবুর জীবনের এ কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! স্নেহের সিঞ্চনে নিভে না প্রেমের অমৃতধারা, শীতল হয় না যে কামনা-বহ্নি, সে কি তাঁহাকেই নিষ্কৃতি দিবে!

বউদিদি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া মুড়িতে তেল মাখিতে মাখিতে বলিলেন, বেশ বলেছ কিন্তু ঠাকুরপো!—অন্নপূর্ণা! সেই পড়েছিলাম, 'পিতামহ দিলা মোর অন্নপূর্ণা নাম, ভগবানে মতি দিয়ে পতি মোর বাম!' পথে আসতে শেষটুকু নিজেই পালটে দিলাম।

মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, আবার এ রকম হ'ল কতদিন?

ঠিক মাস ছয়েক পরেই। মাস ছয়েক বেশ ছিলেন। তার পরই হ'ল কি জান, অহরহ যেন চিন্তাই করছেন, চিন্তাই করছেন। আমি কিছু বললেই একেবারে রেগে আগুন! তারপর চৈত্র-সংক্রান্তিতে গেলেন গঙ্গাস্নানে। গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে এলেন, আমি তাড়াতাড়ি পা ধুতে জল দিলাম, পা ধুলেন। আমি গামছা দিতে গেলাম হাতে, অমনই হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, হুঁ হুঁ, ছুঁয়ো না। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? না—পঞ্চতপা করব সংকল্প করেছি, স্ত্রীলোক স্পর্শ নিষেধ। তারপর পঞ্চতপা হ'ল, সমস্ত দিন পাঁচ দিকে পাঁচটা হোম জ্বেলে তার মধ্যে ব'সে জপতপ। সন্ধ্যেবেলায় মানুষ উঠতে, যেন সেদ্ধ করা শাকগাছটা। তবু আমার ছোঁবার হুকুম নেই, যত্ন করবার অধিকার নেই। যাকগে ভাই, সে পঞ্চতপা শেষ হ'ল, কিন্তু আমায় আর ছোঁয়ার ইচ্ছে হ'ল না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিলাম, কোথায় তিনি?

গুরুদর্শনে পদব্রজে গেছেন কাশী। আমার প্রহার দেখ, মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ছেলের নাম কেটে দিয়েছে ইস্কুল থেকে মাইনের জন্যে। বলব কি ঠাকুরপো, এক এক দিন উপোস যাই। যাকগে, আমার দুঃখের কথা থাক, এখন তোমার কথা বল, বউ কেমন হ'ল?

বিয়ে করিনি বউদি।

ওমা সে কি?

আমি হাসিতে আরম্ভ করিলাম। বউদিদি আবার বলিলেন, না, সে বেশ করেছ ভাই, একটা অবলাকে কষ্ট দিয়ে আর কি ফল হ'ত! তুমিও তো শুনেছি লেখা-লেখা ক'রে মেতে আছ, চাকরি-বাকরিও কর না ওই জন্যে। তোমার হাতে সেও হয়তো এমনই কষ্ট পেত!

সেই তো, সেই জন্যেই বিয়ে করিনি। কই আপনার মেয়েকে ডাকুন, আমি তার জন্যে পাত্র খুঁজব বরং।

আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে নক্ষ? মেয়ে আমার সুন্দরী, আর বড় ভাল মেয়ে।

বলিলাম, না বউদি, আমি তার জন্যে খুব ভাল পাত্র খুঁজে দোব।

আমার মুখের দিকে চাহিয়া বউদিদি বলিলেন, তুমি তো অনেক বই-টই লিখেছ, জ্ঞানী বিদ্বান্ মানুষ তোমরা, একটা কথার জবাব দিতে পার? স্ত্রীলোকই কি পাপের ঘর? তাদের মধ্যেই কি পাপ বাসা বেঁধে থাকে?

তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, যাঁদের থেকে মানুষ এ দেহ পায় বউদি, তারা কি কখনও পাপের ঘর হতে পারে? তবে আপনারা হলেন মহামায়ার অংশ, আপনাদের মায়ার

মানুষ আপনাকে ভুলে যায়।

তিনি বলিলেন, মিথ্যা কথা। তা হ'লে আমার দশা এমন হ'ত না। এই যে, এই আমার মেয়ে, ঠাকুরপো। নিরু, প্রণাম কর, কাকা তোমার। বই লিখেছেন অনেক, সেই যে সেদিন বলছিলি—নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই ইনি।

জলের কলসী কাঁখে লইয়া মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যই সুন্দরী মেয়ে, তবে অপরূপ কিছু নয়, কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি দেখিয়া মনে হইল, শান্তি ইহার সর্বাঙ্গে। এ মেয়েকে যে বিবাহ করিবে, সে শান্তিবারিতে অভিসিঞ্চিত হইয়া জুড়াইয়া যাইবে। মনে মনে সংকল্প করিলাম, হীরুকে ধরিব। তাহার মনের গহনে স্নেহলতা রোপণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়া দিব। কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ যে, এই তো কৈশোরের প্রারম্ভ! তবুও বলিব। উঠিয়া বলিলাম, আমি ভাল পাত্র দেখে দোব বউদি, ভাববেন না আপনি।

ফিরিয়া আসিয়াও হীরুকে পাইলাম না।

কেহ কোন সন্ধানও দিতে পারিল না।

সন্ধ্যায় দেখা হইল। সিঁড়ির মুখেই দেখিলাম, হীরু যাযাবরীকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র বলিল, যাযাবরী আমায় জয় করলে নরু! ওর বাপকে যৌতুক দিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে এলাম, মনের বনে রোপণ করলাম বন্য শ্যাম-লতা। এখন সমস্যা ওকে পুরপ্রবেশ করিয়ে বন্দিনী করি, না আমিই গৃহত্যাগ ক'রে মুক্তি নিই!

স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনের কথা মনেই থাক, সে কথা হীরুর কাছে উচ্চারণ করিলে স্নেহময়ী বউদিদির অপমানই আমি করিব।

ছায়াছবির এইখানেই শেষ। পরদিন আমি হীরুকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। যাযাবরীর প্রেমোন্মত্ত হীরুর সহিত আসিবার সময় দেখাও করি নাই।

চিন্তায় ছেদ পড়িল। একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলাম।

বারো

তারপর, কই? মনে মনে জীবন-ইতিহাসের পাতা—পাতার পর পাতা—উল্টাইয়া চলিয়াছি। চন্দ্রনাথ, মীরা, হীরু কাহারও দেখা পাইতেছি না। দুই বৎসর পর, চন্দ্রনাথের সঙ্গে কানপুরে সেই সাক্ষাতের বোধ হয় চার বৎসর পর, আবার চন্দ্রনাথের সন্ধান পাইলাম।

অকস্মাৎ একখানা চিঠি পাইলাম ধানবাদের এক উকিলের নিকট হইতে।

ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, "আপনার বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ সিংহ বিশেষ বিপদগ্রস্ত। আমি তাঁহার উকিল; যাঁহার সুপরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, এমন বন্ধুর এখন তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার স্ত্রী আপনার নাম করিলেন। আপনি আসিলে হয়তো তিনি রক্ষা পাইতে পারেন। কোনরূপে যদি আসিতে পারেন, তবে বড়ই ভাল হয়।"

পরিপাটি ইংরেজীতে নিখুঁত কায়দায় চিঠিখানি লেখা।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম। ভাবিতেছিলাম, কি এমন বিপদ! কিন্তু বিপদ যাহাই হউক, সুপরামর্শ দিবার জন্য আমাকে প্রয়োজন। কিন্তু চন্দ্রনাথ কি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিবে? কিছুতেই আশা করিতে পারিলাম না। তবুও রওনা হইলাম, মীরাকে মনে করিয়া না গিয়া

থাকিতে পারিলাম না।

মানভূম জেলার একটা স্টেশন, নাম কি মনে নাই। তবে ধানবাদের নিকটেই। কোথায় কানপুর, আর কোথায় মানভূমের একটি অজ্ঞাত প্রদেশ। ভাবিতেছিলাম এখানে কোথায়, কেমন করিয়া—! অর্ধপথেই চিন্তাটিকে ত্যাগ করিলাম। কালপুরুষের কক্ষপথের মানচিত্র কত বিচিত্র রেখায় বঙ্কিম ভঙ্গিতে চলিয়াছে, তাহা লইয়া চিন্তা করিয়া কি হইবে?

ভদ্রলোক স্টেশনেই ছিলেন, রওনা হইবার পূর্বেই তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। তাঁহার কথা আজ বার বার মনে হইতেছে, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না।

শীর্ণকায়, পরিপাটি সাহেবী পোশাক পরিয়া ওই অন্ধকার ছায়াপটের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া কে ফুটিয়া উঠিলেন? মনে হইতেছে, তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছে, গুড ইভনিং। চিনিতে পারেন আমাকে? গুড আফ্‌টারনুন, লেট মি, মানে, নিজেকে নিজেই পরিচিত ক'রে নিতে হচ্ছে, মার্জনা করবেন। আমি ধানবাদে প্র্যাক্‌টিস করি। মিস্টার সিন্‌হা আমারই ক্লায়েণ্ট। হ্যাভ ইউ গট ম্যাচেস? থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি সিগারেট বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া বলিলেন, খাব? আচ্ছা, আপনি দিচ্ছেন, বেশ। থ্যাঙ্ক্‌স।—বলিয়া একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া ধরাইয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, আমি অবশ্য বিড়ি খাই, মানে, সিন্স লাস্ট মুভ্‌মেণ্ট। তবে ডিফিকাল্‌টি কি জানেন, এই যেমন আজই ধরুন আপনি অফার করলেন, আমি কি রিফিউজ করব? প্রথম সাক্ষাতেই? অ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ সে?

কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথম সাক্ষাতে তাঁহার কথাকেই সমর্থন করিয়া বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ভদ্রলোক বলিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

চারিদিক চাহিয়া বলিলাম, তারপর চন্দ্রনাথ কোথায়? কি বিপদ তার?

বাধা দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েট প্লিজ। দিস ইজ নট দি প্রপার প্লেস, ইউ সি।

বললাম, তা হ'লে কোথায় যাওয়া যাবে?

ওয়েল, লেট মি থিঙ্ক। কোথায় যাব একটু ভেবে নিই। ওয়েল, মানে বুঝতে পারছেন তো, মক্কেলের কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে জানিতে দেওয়া আমাদের প্রফেশনে ভব্যতার বাইরে। কিন্তু ইউ সি, নিরুপায় হয়ে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ইয়েস, আমি নিরুপায়, ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাই ডিফিকাল্‌টিস্, অ্যাঁ?

ভদ্রলোকের কায়দাকানুনের চাপে আমি হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম, বলিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে—

ওয়েল, ইউ সি, আমি একটা নির্জন জায়গা খুঁজছি। নো থার্ড ম্যান।

চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, নির্জনতার অভাব নাই, চারিদিকেই জনহীন প্রান্তর, আর পরিচ্ছন্ন বসিবার স্থানেরও অভাব নাই। দেশটাই পাথরের, চারিদিকে শুধু পাথর, পাথর আর পাথর। পাথরের শুধু স্তূপই নয়, ধরণীর বুকে এখানে ওখানে সমতল পাথরের অঙ্গন যেন কে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে, তাহারই আশেপাশে পাথরের স্তূপ। যেন কোন চঞ্চলা মেয়ের দল এখানে খেলা করিতে আসে, তাহারা খেলাঘর সাজাইয়া রাখিয়া ঘরে গিয়াছে। সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলাম, বসবার জায়গার অভাব কি, বলুন না, ওই একটা বাঁধানো জায়গায় গিয়ে বসি।

ভদ্রলোক ঘন ঘন বার দুই ভুরু তুলিয়া বলিলেন, ওয়েল, খুব ভাল বলেছেন, কথাটা মনেই হয়নি আমার। ওয়েল, কুলি, কুলি!

ছোট স্টেশন, কুলি ছিল না, ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, ন্যাস্টি স্টেশন, একটা কুলি নেই। আপনার লগেজ দুটো—

বাধা দিয়া বলিলাম, এইজন্যে কুলি খুঁজছেন আপনি? চলুন, এ আমার দুহাতেই দুটো যাবে। সামান্য জিনিস, কুলি কি হবে?

সত্যই সামান্য জিনিস, ছোট একটা সুটকেস ও ছোট্ট একটা বিছানা।

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, দিন দিন, আমাকে একটা দিন। না না না, সে হবে না, লেট আস শেয়ার। না না, দিন, নইলে আমি দুঃখিত হব।

অগত্যা ভদ্রলোককে সুটকেসটাই দিলাম। ভদ্রলোক সুটকেসটি হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন, বিউটিফুল, সুন্দর জিনিসটি তো। অভদ্রতা মাপ করবেন, কত দাম মশায় এটার?

দাম মনে ছিল না, বলিলাম, ঠিক মনে নেই, তবে বেশি নয়, পাঁচ টাকার মধ্যে।

ভদ্রলোক তখন সুটকেসটা দেখিতেছিলেন, বলিলেন, রঙটি খুব সুন্দর, ফিনিশও খুব ভাল। সত্যিই জিনিসটি ভাল। কিনব আমি একটা।

একটা প্রস্তর-অঙ্গনে বসিয়া বলিলাম, এবার বলুন তো, ব্যাপার কি? চন্দ্রনাথ এখানে কোথা থেকে এল?

ভদ্রলোক বলিলেন, যতদূর আমি জানি, কানপুর থেকে।

আমি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম আরও শুনিবার জন্য, কিন্তু ভদ্রলোক আর একটি কথাও বলিলেন না। আমি অগত্যা আবার প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

তিনি উত্তর দিলেন, ওয়েল, কি জানতে চান বলুন?

বলিলাম, সে এখানে কি করে?

এখানে চন্দ্রপুরা ফায়ার-ব্রিক্স অ্যাণ্ড পটারীজ ওয়ার্কসের মালিক তিনি।—বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, ভদ্রলোক অস্থিমজ্জায় ঘরে-বাইরে খাঁটি উকিল, বাজে কথা তিনি বলেন না।

বহুকষ্টে তাঁহার নিকট সংগ্রহ করিলাম, চন্দ্রনাথ এখানে আসিয়া এক ফায়ার-ব্রিক্সের কারখানা খুলিয়াছে। প্রায় বৎসর পাঁচেক পূর্বে সে এখানে আসিয়া এক অনুর্বর জনহীন প্রান্তর বন্দোবস্ত লইয়া সেইখানে এই কারখানা পত্তন করে। চন্দ্রনাথের অমানুষিক পরিশ্রমে এবং শক্তিতে সে কারখানা এক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সেই সময়েই ভদ্রলোকের সহিত চন্দ্রনাথের আলাপ হয়। বলিতে বলিতে এতক্ষণে যেন ভদ্রলোকের একটা উচ্ছ্বাস দেখা গেল। তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি কথা এবার বলিলেন, হি ইজ এ জিনিয়াস! ওয়াণ্ডারফুল ম্যান! এ রকম লোক আমি চোখে দেখিনি। আমি তাঁকে দেখেছি, বিশ্বাস করুন আমাকে, নিজের হাতে তিনি ভাটা গেঁথেছেন, ওই সমস্ত ডার্টি লেবারারদের সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী, সি ইজ এ বিউটি, স্বর্গের দেবীর মত রূপ, তিনি সুদ্ধ নিজে পরিশ্রম করেছেন। আর তিনি নিজে আবার সেই কারখানা হারাবার জন্যে যেন পণ করে বসেছেন। এ যেন তাঁর ডিটারমিনেশন।

তিনি দুই কাঁধই বার দুই ইংরেজী ধরনে ঝাঁকি দিয়া উঠিলেন। তারপর আবার তিনি নীরব।

আমি প্রশ্ন করিলাম, হারাবার জন্য পণ করেছেন মানে? কি বলছেন আপনি?

আবার বার দুই কাঁধ-ঝাঁকি দিয়া তিনি বলিলেন, ওয়েল, সেই তো হ'ল কথা। নাউ ইউ হ্যাভ কাম, মানে এতক্ষণে আপনি আসল কথায় এলেন।

বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, সেই তো জানতে চাচ্ছি আমি।

তিনি উত্তর দিলেন, ওয়েল, সেই তো আমিও বলছি।

বহুকষ্টে অনেক প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, চন্দ্রনাথ এখনও কারখানা বাড়াইবার জন্যে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য চক্রবৃদ্ধিহারে উচ্চ সুদে সে ওই কারখানা মর্টগেজ দিতে উদ্যত হইয়াছে। মহাজন একজন মাড়োয়ারী। উকিলবাবুর ধারণা, এই মর্টগেজ হইলে আর রক্ষা নাই, কারখানা মাড়োয়ারীর হাতে চলিয়া যাইবে।

তিনি বলিলেন, ওয়েল, ইউ সি, চন্দ্রনাথবাবু ফকির হয়ে যাবেন, যাকে বলে রুইন্‌ড্ ম্যান। মহাজন দয়া করবে না।

ভাবিয়া দেখিলাম, উকিলবাবুটির কথা সত্য। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, আমাকে কিন্তু মিথ্যে আনালেন উকিলবাবু, সে কারও পরামর্শ নেবার লোক নয়। সে তো আপনি নিশ্চয় জানেন।

অভ্যাসমত কাঁধে ঝাঁকি দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল লেট আস্—

তিনি নীরব হইলেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে অকস্মাৎ আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, দেখুন, এ আপনাকে পারতেই হবে। তাঁর সঙ্গে যে কত লোকের সর্বনাশ হবে—

তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। এই সময়ে একখানা গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল, তা হ'লে আসুন আপনি।—বলিয়া আমার হাতটা ধরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ওয়েল গুড্ লাক। কাল সকালেই আমি আসছি।

গাড়িতে জিনিসপত্র উঠাইয়া দিলাম, নিজে উঠিলাম না। সুন্দর রাস্তা, সুন্দর দেশ। চড়াইয়ে উতরাইয়ে অতিকায় তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে শাল ও পলাশের বন দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যে মধ্যে সাঁওতালদের পল্লী। সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল না, অস্তগামী সূর্যের আলোয় চারিপাশে পরেশনাথ গিরিশ্রেণী পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠিয়া চোখে পড়িল, বাঁ পাশে দূরে প্রান্তরের উপর সারি সারি ধূমায়মান চিমনি, বাড়িঘর, শাল-পলাশ বন-বেষ্টনীর মধ্যে সে যেন একখানি ছবির মত মনে হইতেছিল। গাড়িখানা বাঁ-পাশেই একটা পরিচ্ছন্নতর ছোট রাস্তায় মোড় ফিরিল। রাস্তার ধারে একটা বড় কাঠের প্লেটে লেখা—ওয়ে টু চন্দ্রপুরা ফায়ার-ব্রিক্‌স্ ওয়ার্কস্—প্রাইভেট রোড। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, পথ আর ভাল দেখা যায় না, মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিলাম। কতক্ষণ পর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর রে বাবা?

গাড়োয়ানটা বলিল, হুই যি বাবু, আলো দেখাইছে।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সম্মুখে সারি সারি আলো অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছে, উপরে আকাশের বুকে অন্ধকার চিরিয়া চিমনির মুখে আগুনের শিখা নাচিতেছে, যেন সারি সারি কম্পমান ধূমকেতু।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কারখানায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। ডান পাশে পশ্চিম দিকে কারখানার প্রাঙ্গণে সারি সারি গোলাকার ভাটাগুলার ফায়ার-প্লেসে দাউদাউ করিয়া কয়লা জ্বলিতেছে। মিল-হাউসের বিপুল ঘর্ঘর শব্দে স্থানটা মুখরিত।

সংবাদ লইয়া জানিলাম, সাহেব আছেন মিল-হাউসে, এঞ্জিনে কি গোলমাল হইয়াছে, তাহা লইয়া তিনি ব্যস্ত।

মীরা আমাকে দেখিয়া আনন্দে যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আজ পরিষ্কার বাংলায় বলিল, আপনি, সত্যি আপনিই!

হাসিয়া বলিলাম, দেখুন লক্ষ্য ক'রে, মাটিতে আমার ছায়া পড়েছে, অশরীরী আমি নই। জীবন্ত আমিই আপনার সম্মুখে।

মীরা সলজ্জভাবে বলিল, তাই কি আমি বলছি? কিন্তু আপনার শরীর যে বড় খারাপ।

মুগ্ধভাবেই তাহাকে দেখিতেছিলাম। উত্তর দিয়া বলিলাম, আপনি কিন্তু উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল—দীপ্তি!

সবল হৃষ্টপুষ্ট বছর পাঁচেকের একটি শিশু স্থানটাকে কলহাস্যে মুখরিত করিয়া বাগানের ফটকটাকে সজোরে ঠেলিয়া খুলিয়া ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুমানে চিনিলাম, চন্দ্রনাথের শিশু। তাহার হাতে বেশ ভারী ফায়ার-ক্লের তৈয়ারি বল।

মীরা বলিল, প্রণাম কর জিঞ্জির, তোমার মামা উনি।

তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, নাম থাকবে ঠিক হয়েছিল কুমারকিশোর, কিন্তু জিঞ্জির হ'ল কেন আবার?

মীরা বলিল, আপনার দোস্ত বলেন কুমারকিশোর, আমি ওকে বলি জিঞ্জির।

শিশু কিন্তু কোলে থাকিতে চাহিতেছিল না, সে ঝুলিয়া মাটিতে নামিয়া পড়িয়া মায়ের দিকে ছুটিল।

মীরা বলিল, যাও, শুয়ে পড়গে যাও। না না, এখন কোলে না—যাও, যাও।

আয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। আমি এবার বাড়ির চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, প্রাসাদের বনিয়াদ আরম্ভ হইয়াছে। সুন্দর সুগঠিত সুদৃঢ় পাথরে গড়া একতলা বাংলো।

পাশে চাহিয়া দেখিলাম, মীরা নাই। সে তখন চলিয়া গিয়াছে; বোধ হয় আমারই পরিচর্যার ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বেয়ারাটা আমাকে একটা কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল। কক্ষের মধ্যেও দেখিলাম, বিপুল না হউক, ঐশ্বর্য যাহা আছে তাহা পর্যাপ্ত, মূল্যের দিক দিয়াও তুচ্ছ নয়।

একখানা চেয়ারে বসিয়া ডাকিলাম, মীরা দেবী!

মীরা আসিয়া নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিরুচ্ছ্বসিত মৃন্ময় মূর্তি যেন সে। আমাকে দেখিয়া যে দীপ্তি তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। রজনীর শেষ মুহূর্তের আকাশের মত সে স্তিমিত, একটি নক্ষত্রও আর সেখানে ফুটিয়া নাই।

নষ্ট করিবার মত সময় আমার ছিল না, তাড়াতাড়ি আমি কাজের কথা আরম্ভ করিলাম। মীরাকে সকল কথা বলিয়া বলিলাম, আপনি নিষেধ করেছেন?

প্রশান্তভাবে মীরা বলিল, না।

বলিলাম, আমি বলব, আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিন।

মীরা আবার বলিল, না।

প্রশ্ন করিলাম, আপনার কি মনে হয়, এতে ভাল হবে?

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মীরা বলিল, জানি না।

আর কথা অগ্রসর হইতে পাইল না, চন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সর্বাঙ্গে

তেলকালি মাখা, পরনে শুধু খাকী হাফপ্যাণ্ট, ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত, পায়ে বুট। সেই দুই হাতে আমাকে টানিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, তুই, নরু! কেমন ক'রে জানলি আমার ঠিকানা?

আমি বলিলাম, কিন্তু আমি যে মরে যাচ্ছি তোর পেষণে।

হাসিয়া সে আমায় ছাড়িয়া দিল। আমার জামাকাপড় তখন তেলকালিতে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

সেই রাত্রেই সে আমায় কারখানা দেখাইয়া ছাড়িল।

আগুন লইয়া খেলা, ভাটাগুলার ফায়ার-প্লেসের আগুনের উত্তাপ ভাটার ভিতর দিয়া নীচের ফ্লোরের মধ্য দিয়া হু হু শব্দে জলের স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে, উপরে চিমনির মাথায় তাহারই শিখা নাচিতেছে। কালো মাটি পুড়িয়া দুধের মত সাদা হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সমস্ত সে আমাকে বুঝাইয়া দিতেছিল।

মিল-হাউসে মাটি গুঁড়া হইতেছে, মাখা হইতেছে। ব্রিক মেশিনের মধ্যে আসিয়া সুন্দর ইটের আকার লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি সে আমাকে দেখাইয়াছিল, কিন্তু আজ সে সমস্ত স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় যন্ত্র-রাজ্য চোখে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মনের দৃষ্টি সবিস্ময়ে দেখিয়াছিল ওই যন্ত্র-রাজ্যের রাজাকে।

চন্দ্রনাথের সেই কথাই মনে পড়িতেছে, বাড়ি ফিরিয়া সে বলিল, এই কারখানা আরম্ভ করেছি নরু, আমি আর মীরা। দু'জনে নিজে হাতে কাজ করেছি—আদিম কালের মানব-দম্পতির মত। মীরা ছিল আমার সাহায্যকারিণী। মনে পড়ে তোমার মীরা, একদিন, কাদা আনতে আনতে উল্টে প'ড়ে তোমার সমস্ত মুখ কাদায় ঢেকে গিয়েছিল!—বলিয়া হা হা করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তারপর হাসি থামাইয়া আমাকে বলিল, নরু, তোর কেমন লাগল কারখানা?

আমি বলিলাম, সুন্দর, চমৎকার হয়েছে। প্রত্যেক বন্দোবস্তটি সুন্দর হয়েছে চন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে এত উপাদান রয়েছে—

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, এত ছোট এতটুকু একটা জিনিস, একে আরও বাড়াচ্ছি আমি, আর একটা মিল-হাউস, আরও কিল্‌ন্‌, একদিকে করব পটারীজ, পুতুল-জার-ব্র্যাকেট-এর একটা শাখা খুলব, আর সিলিকা-ব্রিক্‌সেরও ডিপার্টমেণ্ট্‌ খুলব। তারপর, এরই পাশে খুলব এক লোহার কারখানা, চন্দ্রপুরা আয়রন ওয়ার্কস্‌। সাইট, জমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি, প্ল্যানও করেছি। কাল সে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দোব। মাইলের পর মাইল বিরাট কারখানা এইখানে দেখতে পাবি, আয় আয়, ঘরগুলো সব দেখাই তোকে।

চন্দ্রনাথ আমাকে প্রতিটি ঘর দেখাইল। তাহার ঘরের প্রতি কোণের তুচ্ছতম বস্তুটির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। একটা ঘরে দেখিলাম, চারিপাশের আলমারীর মধ্যে রাশি রাশি বই। সবই প্রায় বিজ্ঞানের বই। একটা আলমারীর মধ্যে কতকগুলি বাংলা বই রহিয়াছে দেখিলাম, তাহার মধ্যে দেখিলাম, আমার বইগুলি প্রায় সবই রহিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, তোর বইগুলো সবই আমি পড়ি। মীরা প'ড়ে আমাকে শোনায়। বেশ লাগে রে, অনেক পুরোনো লোককে মনে পড়ে।

একটু নীরব থাকিয়া সে বলিল, আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কি জানিস? প্রিয়তম বই আমার, ন্যুট হ্যাম্‌সুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল'। পাঁচখানা বই কিনেছি, আগেরগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে।

মীরা আসিয়া প্রশান্তভাবে বলিল, খাবার জুড়িয়ে গেল।

চন্দ্রনাথ মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, চল চল। বাগানের মধ্যে টেবিল পাততে বল।

তিনজনে বাগানের মধ্যে বসিলাম, বাবুর্চি খাবার পরিবেশন করিতেছিল। সহসা কি একটা যন্ত্রের ঘণ্টা ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেখিয়া শুনিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া ফোন করিতে বসিল। কারখানার সঙ্গে ফোনের সংযোগ রাখা হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, এক্ষুনি তাড়াও ওকে, এক্ষুনি চার্জ কেড়ে নাও। কাল আমি ব্যবস্থা করব। অন্য লোক দাও ওখানে। অমনোযোগী লোক, যে কাজে ফাঁকি দেবে সে ক্রিমিন্যাল, তার চেয়েও সে শয়তান।

আমি অন্যমনস্কভাবেই আকাশের দিকে চাহিলাম। সেখানে দেখিলাম, ছায়াপথের পাশেই কালপুরুষ আপন কক্ষপথে চলিয়াছে—সেই দীপ্তি, সেই ভঙ্গি, সেই আকৃতি।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ ই হইল। আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালেই, 'আর্লি মর্নিং'এ উকিলবাবুটি আসিয়া হাজির হইলেন।—সেই নিখুঁত সাহেবী পোশাক, সেই গম্ভীর মুখ।

চন্দ্রনাথ বলিল, গুড্ মর্নিং।

হাতটা বাড়াইয়া দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, গুড্ মর্নিং। তারপর আমার দিকে অপরিচিতের মত চাহিয়া বলিলেন, ওয়েল, মিস্টার সিন্‌হা, একে তো চিনতে পারলাম না?

চন্দ্রনাথ বলিল, ভাল, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আমার বন্ধু এবং সুলেখক, মানে, আপনি বাংলা বই পড়েন তো?

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল, ভেরি রেয়ার, খুব কম, তবে ওঁর বই ভালই হবে, বেশ বেশ। এবার আমার পরিচয়টা শুনে নিন। মিস্টার সিন্‌হা বলুন ওঁকে আমার পরিচয়টা।

চন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, উনি ধানবাদের উকিল—

ভদ্রলোক বলিলেন, মিস্টার সিন্‌হার লিগাল অ্যাড্‌ভাইসার।

তারপরই তিনি কাজের কথা আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার সেই এক উত্তর, আপনার সুদের ক্যালকুলেশন যেমন ম্যাথম্যাটিক্যাল, আমার প্রোগ্রেসের হিসেবও তেমনই ম্যাথম্যাটিকাল।

ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল, তবু আপনি একবার সুদের হিসেবটা দেখুন। দিন তো সার, একবার আপনার কলমটা।

আমার দিকে তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন। তারপর খসখস করিয়া একখানা কাগজে হিসাব করিয়া চন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিলেন, ইউ সি—

কাগজটি লইয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, কেন বাধা দিচ্ছেন আপনি? কারখানার এক্সটেন্‌শন ফেলে রাখতে আমি পারি না। যদি যায়, আমার মালিকানা যাবে। কারখানা থাকবে।

এই সময় মীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিছনে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। মীরা নিজে চা প্রস্তুত করিয়া হাতে হাতে আগাইয়া দিতেছিল। উকিলবাবুটি অতিমাত্রায় ভদ্রতা প্রকাশ করিতে গিয়া প্রায় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। মীরা চায়ের পেয়ালা আগাইয়া ধরিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কাপসুদ্ধ উল্টাইয়া ভদ্রলোকের কোটের উপর পড়িয়া গেল। মীরা অপ্রস্তুত; ভদ্রলোক যেন বিবর্ণ হইয়া গেলেন। চন্দ্রনাথ

বলিল, খুলে ফেলুন, কোটটা খুলে ফেলুন আপনি, এক্ষুনি ওটাকে সাবান দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিক, ঘরে আমার ইস্ত্রিও আছে।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না না, থাক থাক, না না না।

কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিবার লোক নয়, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া নিজে জোর করিয়া কোটটা খুলিয়া লইল। তারপর সে এক শোচনীয় দৃশ্য, আমি জীবনে ভুলিব না। ভদ্র-লোকের কোটের নীচে শতছিন্ন এক সৌখিন ছিটের কামিজ যে কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিল, তাহার আঘাতে সকলে নতমস্তকে নির্বাক হইয়া রহিলাম। ভদ্রলোক নিজেই কোটটা গায়ে দিয়া বলিলেন, ছিটটা বড় সুন্দর, ওটার মমতা আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

আমরা তবুও নির্বাক।

তারপর আবার তিনি বলিলেন, ওয়েল মিসেস্ সিন্‌হা, আপনি বুঝিয়ে বলুন মিস্টার সিন্‌হাকে, এ হচ্ছে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা।

আমি বলিলাম, মীরা দেবী, আপনি চন্দ্রনাথকে অনুরোধ করুন। আমাদের ধারণা এতে ভবিষ্যতে ভাল হবে না।

মীরা বলিল, উনি তো বলছেন, ভাল হবে।

উকিলবাবু অবাক হইয়া গেলেন, হতাশ হইয়া তিনি বিদায় লইলেন।

মীরা চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ বলিল, আশ্চর্য! মীরা কোন দিন চঞ্চল হয় না! ও যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আমার অজ্ঞাতসারেই যেন ঝরিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে পড়িল আমার ফাউণ্টেন-পেনটার কথা। উকিলবাবু ভুলিয়া লইয়া গেলেন নাকি?

চন্দ্রনাথ শুনিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ভুলে সৌখিন জিনিস প্রায়ই উনি নিয়ে যান। ওটার আশা তুই ছেড়ে দে।

আমি একটা রূঢ় আঘাত পাইলাম, এমন মানুষ, অথচ—

চন্দ্রনাথ বলিল, অত্যন্ত গরীব ভদ্রলোক। ওই ধরনের কথাবার্তার জন্যে প্র্যাক্‌টিস একেবারে নেই। আমি ওঁকে উকিল নিযুক্ত ক'রে রেখেছি, চল্লিশ টাকা ক'রে দেই মাসে, তাইতেই কোন রকমে চলে। কিন্তু ওই একটি স্বভাব, লক্ষ টাকার তোড়া তুমি ফেলে রাখ, কিছু যাবে না। অথচ সামান্য সৌখিন জিনিস, তার লোভ উনি সম্বরণ করতে পারেন না।

নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম, চন্দ্রনাথও নীরব।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ উঠিয়া বলিল, ব'স তুই, আমায় বেরুতে হচ্ছে।

বাধা দিয়া বলিলাম, কয়েট মিনিট অপেক্ষা কর। তোর দাদার কথা, বউদির কথা কিছু বলব তোকে।

সে বলিল, থাক নরু, জীবনে নিজের স্ত্রী-পুত্রই ক্রমশ আমার কর্মপথে বাধা ব'লে মনে হচ্ছে। আবার দাদা বউদি—এদের নিয়ে চিন্তা করতে আমি পারব না। যদি দুর্দশা অভাব ঘটে থাকে, কিছু টাকা আমি বরং দিতে পারি।

অত্যন্ত আহত হইয়া বলিলাম, থাক ব'লে আবার কেন কথা বাড়ালি চন্দ্রনাথ, কথাটা সত্যিই থাক।

সে বলিল, কিন্তু অবিচার তুই আমার ওপরেই করছিস।

বাধা দিয়া বলিলাম, বিচার করবার আমার অধিকার নেই, মিথ্যে তুই অনুযোগ করছিস।

রাগ করিসনি, ফিরে আসি আমি।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আর আমি সে কথা উত্থাপন করিলাম না। আশ্চর্য, সেও আর কোন প্রশ্ন করিল না।

বিদায় লইবার সময় চন্দ্রনাথের সহিত দেখা হইল না, সে ঋণ করিবার ব্যাপার লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, স্নান-আহারেরও অবসর নাই। মীরার নিকট বিদায় লইলাম, আসি মীরা দেবী।

নিস্পৃহ শান্ত ভাবেই মীরা বলিল, আসুন।

প্রশ্ন করিলাম, খোকা কই, তাকে তো দেখলাম না খুব বেশি ?

মীরা বলিল, সে তো এখানে থাকে না।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কোথায় থাকে সে ?

পাশের ছোট অত্যন্ত সাধারণ একটি বাংলোর দিকে আঙুল দেখাইয়া মীরা বলিল, ওই বাংলোটায় থাকে সে। আয়া তাকে মানুষ করে, মাস্টার আছেন একজন।

আমি বলিয়া উঠিলাম, না না না। এমনভাবে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না আপনি, ছেলেকে কাছে রাখবেন।

মীরা বলিল, ভাল লাগে না আমার। অত্যন্ত চঞ্চল, বড় দুর্দান্ত, আমার কেমন ভাল লাগে না।

আমি মীরার কথা ভাবিতে ভাবিতেই গাড়িতে উঠিলাম। অন্ধকার রাত্রি, চোখের সম্মুখে আকাশের পূর্বপ্রান্তে সপ্তর্ষিমণ্ডল ট্রেনের সমগতিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। সপ্ত তারকার ঈষৎ পার্শ্বে আর একটি তারা ঝিকমিক করিয়া স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না।

মনে মনে মীরার নাম দিলাম অরুন্ধতী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুমঘোরে সেদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম হেড মাস্টার মহাশয়কে। চন্দ্রনাথ যেন তাঁহার সম্মুখে দৃপ্ত বিদ্রোহের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, আর মাস্টার মহাশয় তাহাকে শাসন করিবার জন্য ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিতেছেন, কেষ্ট, কেষ্ট, আমার বেত নিয়ে এস।

চন্দ্রনাথ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

মাস্টার মহাশয় করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, নরু, চন্দ্রনাথ আমার কথা শুনলে না!

নিদ্রা ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া অনুভব করিলাম, আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে।

বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন তুলিয়া ট্রেন ঝড়ের গতিতে ছুটিয়াছে। বাতাসের সঙ্গে ধূলা কাঁকর আসিয়া চোখে পড়ে। চোখ ফিরাইয়া ওপাশের দূরবর্তী জানালাটার দিকে চাহিলাম। ওপাশের আকাশের প্রান্তে জ্বলিতেছিল ভোরের শুকতারা।

তেরো

আর চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতে হইতেছে না, স্মৃতি যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

ইহার পর-বৎসরই আবার একবার চন্দ্রনাথের ওখানে গিয়াছিলাম। উল্লেখযোগ্য কিছু

ঘটে নাই। চন্দ্রনাথ সেই তেমন ভাবেই জীবনকক্ষপথে চলিয়াছে। মীরাও সেই স্তিমিত-প্রায় অরুন্ধতীর মত চলিয়াছে। মীরার কিন্তু একটা রূপ আমাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল, মীরার বাহ্য রূপ। জীবনের দীপ্তি যতই স্তিমিত হউক, তাহার বাহ্য রূপের দীপ্তি ক্রমশ যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সেও মীরাকে অষ্টাদশী-তরুণী বলিয়া বোধ হয়।

হীরুর সংবাদ রাখি না; সে নাকি সেই বর্বরা মেয়েটাকে লইয়া তাহার জমিদারির কোন জঙ্গল-মহলের মধ্যে ঘর বাঁধিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু অবসর এবং সুবিধা হয় না। সে নাকি এক সাঁওতালের দেশ। বনে বন্যজন্তুরও অভাব নাই। যাওয়া-আসারও নাকি অনেক অসুবিধা। আমি মনে মনে ওই যাযাবরীকে আশীর্বাদ করি, দূর হইতেই মুগ্ধ দৃষ্টির আরতি তাহাকে নিবেদন করি, ধন্য যাদুকরীর যাদু! ধন্য বন্য শ্যামলতার শক্তি! হীরুর মন-বনস্পতিকে সে ঘনপল্লবে আচ্ছাদিত করিয়াছে।

নিশানাথবাবুরও সংবাদ পাই নাই। বউদিদিকে পত্র লিখিতেও লজ্জা হয়, নিরুর পাত্র সন্ধান করিতে পারি নাই। পারি নাই নয়, চেষ্টাও তেমনি করি নাই। স্বার্থপরতা মানুষের স্বভাব। চন্দ্রনাথকে, নিশানাথকে দোষ দিই কেন, আপন স্বার্থের ভিড়ে আমিও যে পাগল। বইয়ের পর বই লিখিয়া চলিয়াছি, কাগজের উপর কালির আঁচড় যখন টানি, তখন সমস্ত যেন ভুলিয়া যাই। একটা গভীর বিয়োগান্ত গল্প লিখিয়া মনটা কেমন অবসাদগ্রস্ত হইয়া উঠিল। মুক্ত প্রান্তরের নিষ্কলুষ বায়ুর জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, হীরুকে আর যাযাবরীকে দেখিয়া আসি। কিন্তু এতখানি ঝঞ্চাট পোহাইতে মন ভয় পাইয়া গেল। বাহির হইয়া পড়িলাম চন্দ্রনাথ আর মীরার উদ্দেশে।

মীরা এবার বলিল, এবার আপনি খুব শিগগির শিগগির এসেছেন।

হাসিয়া বলিলাম, জানেন মীরা দেবী, আমাদের দেশে বলে—অরুন্ধতী না দেখতে পেলে জানতে হবে, ছ-মাসের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। আমি অরুন্ধতী দেখতে আসি।

মীরা আমার দিকে চাহিয়া রহিল শুধু, বিস্ময় তাহাতে ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের মধ্যে থাকে যে ঔৎসুক্য, সে ঔৎসুক্য ছিল না। কারণ দৃষ্টির যে ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, সে ভঙ্গি তো কই দেখিলাম না। আমিও কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মীরাও প্রশ্ন করিল না। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বলিলাম, আমি আপনার নাম দিয়েছি কি জানেন? নাম দিয়েছি অরুন্ধতী।

এবার মীরা প্রশ্ন করিল, কেন?

বলিলাম, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখেছেন কোন দিন আকাশে?

দেখেছি।

আমাদের পুরাণে বলে, সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্ত মহর্ষির মধ্যে আছেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী পতিপরায়ণতার জন্যে বশিষ্ঠের পাশে স্থান পেয়েছে। ওই নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে সে ঘোরে ফেরে, অতি স্তিমিত তার আলোক। তার অসাধারণ পুণ্যজ্যোতি স্বামীর প্রভাকে পাছে ম্লান করে দেয়, তাই সে সযত্নে সে জ্যোতি লুকিয়ে রেখেছে।

মীরা বহুক্ষণ ধরিয়া নীরব থাকিয়া অবশেষে আমাকে বলিল, আপনি কি আমাকেই দেখতে আসেন?

বলিলাম, হ্যাঁ, মীরা দেবী, আপনার অনুচ্ছ্বসিত শান্ত-জীবন আমার বড় ভালো লাগে, রহস্য ব'লে মনে হয়।

মীরা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সম্মুখের বনভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল, সে যেন আপনার জীবনের সঙ্গে আমার কথাগুলি মিলাইয়া দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দোস্ত, ওই যে নদীর ওপারে দেখছেন ঘন বন, এখান থেকে মনে হয় কত নিবিড়, কত রহস্য ওখানে। কিন্তু আমি ওখানে গিয়েছি, দেখেছি, অরণ্যভূমির কোন রহস্যই ওখানে নেই, অরণ্যও ওটা নয়, নিতান্ত বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত অপরিপুষ্ট কতকগুলি শাল ও পলাশ গাছের মেলা।

আমি উত্তর দিলাম, রহস্য নিশ্চয় আছে মীরা দেবী, নইলে সীমান্ত থেকে যে দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়, তাকে হাতছানি দিয়ে ডাঁকে কে? কাছে গিয়ে তাকে ধরতে পারি না, দেখতে পাই না, সেই তো রহস্যের ধর্ম, কৌতুক করা যে তার স্বভাব। আপনার এই অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত রূপময় দেহ, তার অন্তরালে নিতান্ত আবেগহীন শীতরাত্রির মত শীতল মন, এ যে সত্যই রহস্য।

মীরা নীরবে বসিয়া রহিল, যেন কত চিন্তা করিতেছে।

প্রথম মাঘের দ্বিপ্রহরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে তখনও স্বল্প মেঘসঞ্চার ছিল। সম্মুখে পশ্চিম দিকে পরেশনাথ গিরিশ্রেণী রক্ত-সন্ধ্যার আভায় অতি পরিস্ফুট দেখা যাইতেছিল। বৃষ্টিধৌত নীলাভার উপর রক্ত-সন্ধ্যার গাঢ় লালের আবরণী অঙ্গে দিয়া সে যেন নবরূপ ধরিয়াছে। যেন দীর্ঘকালের পর আজ এক বিরাট ব্যাধ স্নানান্তে গৈরিক উত্তরীয় অঙ্গে দিয়া বিলাস-বেশ করিয়াছে। এ পাশে দক্ষিণ দিকে বনভূমির পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, রিক্ত শাখার ধূসরতায় বনভূমি উদাসিনীর মতো আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। আমি ভাবিতে-ছিলাম, আবার বনভূমে কিশলয় দেখা দিবে, ফুল ফুটিবে; এখনই হয়তো ওই তপস্যাক্লিষ্ট শীর্ণ দেহের রস সঞ্চারিত হইয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বমুখে চলিয়াছে, হয়তো শাখার প্রান্তে প্রান্তে মঞ্জরীর অদৃশ্য মুঞ্জরণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মীরার রিক্ত উদাসীন জীবনে নবমঞ্জরী কবে কি ভাবে দেখা দিবে? হয়তো দিবে না।

সহসা মীরা প্রশ্ন করিল, কি ভাবছেন আপনি?

সম্মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলাম, বড় সুন্দর দৃশ্য, বড় ভালো লাগে আমার।

মীরা বলিল, পারেন যদি আসবেন কোন বসন্তকালে। শালে পলাশে মহুয়ায় তখন যে কি হয়ে ওঠে চারিদিক! অপরূপ, সে অপরূপ! সব লাল, সমস্ত রাঙা হয়ে ওঠে। তখন আমি একদিনও ঘরে থাকতে পারি না, বনে গিয়ে ব'সে থাকি আমি।

অনুরোধ করিলাম, চলুন না আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

মীরা বলিল, না, ভাল লাগছে না। আর কারও সঙ্গে বেড়াতে আমার কেমন ভাল লাগে না।

চন্দ্রনাথ আসিয়া ব্যস্তভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, খবর পেলাম তুই এসেছিস। কি ভয়ানক ব্যস্ত আমি; লোহার কারখানা আরম্ভ হয়ে গেছে। চল, তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। মীরা, চা, জলদি আমাদের জন্যে চা হুকুম ক'রে দাও।

আমার দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ ছিল উত্তর দিকের শস্যক্ষেত্রের দিকে। ঢালু জমির উপর ক্ষেত্র-গুলি ক্রমশ নীচে নামিয়া গিয়াছে, ক্ষেত্রগুলিতে রবিশস্য পাকিতে শুরু করিয়াছে। শস্যশীর্ষভারে গাছগুলি মাটিতে গতায়ু হইয়া বিলুণ্ঠিত। এগুলির এ জীবনের মুঞ্জরণ শেষ হইয়া গেল, উহাদের

জাগরণ হইবে আবার পুনর্জন্মে।

সহসা মনে হইল, মীরার জীবন কি ওই শস্তজন্মের মত? মনটা বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল।

শস্তলিপ্সু কৃষকের মত চন্দ্রনাথ মীরার জীবনটাকে ছাঁটিয়া নাড়িয়া তাহার জীবনের ফসলে নিজেকে সমৃদ্ধ করিল। নবজন্মে তাহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া তাহাকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম।

চন্দ্রনাথ তখন আপন মনেই বলিতেছিল, তিন স্কোয়ার-মাইল এখন আমার কারখানার পরিধি, কিন্তু লোহার কারখানা সম্পূর্ণ হ'লে আয়তন প্রায়—

অকস্মাৎ তাহার বোধ হয় খেয়াল হইল, আমি অন্তমনস্ক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছি না। সে বলিল, কি ভাবছিস বল তো তুই?

ঈষৎ হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিলাম, কিছু না।

সে আবার আরম্ভ করিল, এবার এসে বোধ হয় কারখানা তুই চিনতেই পারবি না। নতুন কল্পনা আমার চমৎকার হয়েছে।

ইহার পর বৎসর তিনেকের জীবনেতিহাসের মধ্যে চন্দ্রনাথের সন্ধান মেলে না। এ সময়-টুকুর জীবনেতিহাস শুধু কর্মজীবনের ইতিহাস। একখানা দৈনিকের সম্পাদক-মণ্ডলের মধ্যে একটা চাকরি পাইয়া গিয়াছিলাম। তবে ইহার মধ্যে চন্দ্রনাথের কারখানার সংবাদ পাইয়াছি; দ্বিতীয়ত বৎসরের প্রথমেই আমাদের কাগজে চন্দ্রপুরা ওয়ার্কসের কয়েকখানা ছবিসহ একটা বিবরণ ছাপা হইয়া গেল। বিবরণে দেখিলাম, কারখানা আয়তনে অনেক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

আমি চন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম, এবং চন্দ্রপুরা ওয়ার্কসের স্রষ্টার জীবনী ছাপিবার অনুমতি দিবার জন্য লিখিলাম। কয়েক ছত্রের একখানা উত্তরও পাইলাম, "ধন্যবাদ, কাজের চাপে মুহূর্ত অবসর নাই। তোমাদের কাগজে কারখানার বিবরণ দেখিলাম, কিন্তু অনেক ভুল আছে; আমার জীবনী এখনও ছাপিবার সময় আসে নাই, জীবনের এই সবে প্রারম্ভ। তোমার নতুন বই কিনিয়াছি, শেষ করিবার অবসর পাই নাই; অল্প অল্প করিয়া পড়িতেছি।"

মাত্র এইটুকু। মীরার কথা কিছু লেখা নাই। তাহার সম্বন্ধে নানা কল্পনা আমার মনে জাগিল। থাকিতে না পারিয়া মীরা ও খোকার কুশল-সংবাদ চাহিয়া আবার একখানা পত্র লিখিলাম। উত্তর পাইলাম, মীরা তেমনিই আছে। কুমারকিশোর এখানে নাই; তাহাকে স্কুলবোর্ডিঙে দেওয়া হইয়াছে। সে সেখানে ভালোই আছে।

চৌদ্দ

আর এক বৎসর পর।

কাগজের কাজেই গিয়াছিলাম এলাহাবাদ। ফিরিবার সময় ফিরিতেছিলাম তুফান মেলে। ঝড়ের মত ট্রেনখানা চলিতেছে। ভাবিলাম, সার্থক সেই ব্যক্তির রস-কল্পনা, যে ট্রেনখানার নামকরণ করিয়াছিল—'তুফান মেল'। এই নামটিই আজ হাওড়া হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়াইয়া

গেল, অথচ সে হয়তো একজন কুলি।

ট্রেনেই কাগজপত্র খুলিয়া বসিলাম, কাগজের রিপোর্টটা জরুরী। কাগজপত্র বন্ধ করিয়া মনে মনে খসড়া করিতে বসিলাম। চিন্তাভারগ্রস্ত মন, পথপার্শ্বের ছবি চিত্তদ্বারে কোন আবেদন আনিতে পারিতেছিল না, সমস্ত যেন অজ্ঞাত কোন ভাষায় লেখা বইয়ের মত মনে হইতেছিল। যেন বাতাসের বেগে বইখানার পাতার পর পাতা পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে—মেঘ, পাহাড়, নদী, ক্ষেত, গাছ, নগর, গ্রাম, রেল-লাইনের পাশের পথের পথিক, মাঠের উপর দণ্ডায়মান বিস্মিতনেত্র উলঙ্গ শিশু, অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়া পল্লীবধূ, গরু, মহিষ, টেলিগ্রাফের তারের উপর পুচ্ছ দোলাইয়া নৃত্যরত ফিঙে পাখী—আমার নিবিষ্ট চিত্তের কাছে ভিন্ন ভাষার পুস্তকের মত নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্তের মত। দেশের পর দেশ পার হইয়া চলিয়াছি, নদীর ব্রীজের উপর গাড়ির শব্দে মাঝে মাঝে চকিতের মত চিত্ত সজাগ হইয়া উঠে, গাড়ি ব্রীজ পার হইয়া যায়, শব্দ কমিয়া আসে, মন আবার চিন্তায় ডুবিয়া যায়।

অকস্মাৎ ঝলকে ঝলকে মিষ্ট গন্ধে আমার নিশ্বাস ভরিয়া বুক চঞ্চল হইয়া উঠিল। চিত্তের ধ্যান ভাঙিয়া গেল—সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, ট্রেন চলিয়াছে বনভূমির বুক চিরিয়া। লাইনের দুই পাশে রক্তিম ঘন অরণ্য। মনে পড়িল, এটা ফাল্গুনের শেষ, অরণ্যভূমে বসন্ত দেখা দিয়াছে। শালের শাখায় শাখায় সুরক্তিম কিশলয়ে সৃষ্টির পূর্বরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও কোথাও ফুলও দেখা দিয়াছে। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া ছিলাম। ট্রেন আসিয়া থামিল হাজারিবাগ রোডে।

আবার ট্রেন চলিল। অরণ্যের গভীরতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু শোভা কমে নাই, যেন বাড়িতেছে। শালের সঙ্গে পলাশ দেখা দিল। রাঙা রং গভীর হইয়া উঠিল। পত্ররিক্ত তরুর শাখা-প্রশাখার প্রান্তে প্রান্তে স্তবকে স্তবকে রাঙা রং যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। ধানবাদের পর লাইনের পাশে পাশে কলিয়ারিগুলি পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সহসা নজরে পড়িল সুবিস্তীর্ণ কারখানা, ট্রেনের মধ্য হইতেই টিনশেডের গায়ে লেখা নাম বেশ পড়া যাইতেছিল—চন্দ্রপুরা ফায়ার-ব্রিক্স। আপনা হইতেই জানলা হইতে দেহ বাহির করিয়া খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িলাম। মিনিট-খানেকের মধ্যেই সে ভূখণ্ড পিছনে পড়িয়া গেল, সম্মুখে নাচিতেছিল পলাশ ও শাল তরুর শাখাপ্রান্তাবলম্বী গভীর রক্তরাঙা বসন্তশোভা।

মনে পড়িয়া গেল মীরার নিমন্ত্রণের কথা। বসন্ত দেখিবার জন্য সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। গাড়ি আসিয়া থামিল আসানসোলে। আসানসোলে নামিয়া আবার ফিরিলাম, আজ এই অনুরাগময় বসন্তের এমন একটি লগ্নক্ষণে মীরার মত সুন্দরীর নিমন্ত্রণ হেলা করিতে পারিলাম না।

চন্দ্রপুরায় আসিয়া চন্দ্রনাথই চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

চিমনি, চিমনি, অসংখ্য সারি সারি চিমনি, আর সেই চিমনির উদ্গীরিত ধোঁয়ায় আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার শক্তি, তাহার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার ছবি উষার প্রান্তরের পটভূমির উপর রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে। এখনও ছবি শেষ হয় নাই। প্রান্তরের পর প্রান্তরে সে প্রাথমিক রঙের ছোপ বুলাইয়া চলিয়াছে। দুই মাইল, চার মাইল, দশ মাইল, দশ বৎসর পরে কত মাইল ব্যাপিয়া যে তাহার আকাঙ্ক্ষা এ তুলিকা বুলাইয়া চলিবে, সে-ই কি তাহা জানে! 'গ্রোথ অব দি সয়েলে'র নব সংস্করণ রচনা করিয়াছে সে!

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিতে করিতে যদি তাহার আয়ু ও শক্তিতে কুলাইয়া এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকেই তাহার যন্ত্ররাজ্যে পরিণত করিতে পারে—তারপর? তারপর সে কি করিবে? মনে মনে ইচ্ছা হইল, তাহাকে এই প্রশ্ন একবার করিব, তারপর?

জানি, চন্দ্রনাথ হাসিবে, অট্টহাস্যে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিবে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন করিব।

পথটা এবার দেখিলাম, রাজপথের মত প্রশস্ত এবং সুন্দর হইয়াছে। পথের এক পাশে সারি সারি বাংলো উঠিয়াছে, একটার ফটকে লেখা—ম্যানেজার, ফায়ার-ব্রিক্‌স; অন্যটায় লেখা—এঞ্জিনীয়ার; আর একটায় লেখা—ম্যানেজার, আয়রন-ওয়ার্কস। আরও একটু দূরে সারি সারি ছোট ছোট কোয়ার্টার্স, বোধ হয় ভদ্র কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হইয়াছে। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বাজার হাট, সারি সারি দোকানে নানাবিধ পণ্য। আরও একটু অগ্রসর হইতেই সম্মুখে লোহার প্লেটে লেখা সাইন্‌বোর্ড চোখে পড়িল—সাবধান, রেল-লাইন। ইংরাজীতে লেখা। রেল-লাইনও কারখানার ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, দূরে শ্রমিকদের বসতি। পাথরের বুক ফাটাইয়া সেখানে জলভরা পুকুর টলমল করিতেছে। পথের দুই ধারে ছায়াঘন পল্লবিত তরুশ্রেণী। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আবার একবার সমস্ত দেখিলাম, সহস্র ভ্রমরগুঞ্জনশব্দে মন ফিরিল, উপরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, গুলঞ্চ ফুলের গাছটি ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কারখানা দেখিতে ইচ্ছা হইল না, অগ্রসর হইলাম। পরিচিত বাংলোটার ফটকে এবার বিনা বাধায় প্রবেশ করিতে পারিলাম না। দুয়ারে গুর্খা পাহারা। সে কার্ড চাহিল, হাসিয়া কাগজে নাম লিখিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরই মীরা বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, মীরা দেবী, আপনি আমাকে বসন্তশোভা দেখতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই স্মিত বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে সে বলিয়া উঠিল, দোস্ত্!

কিন্তু দৃষ্টি উজ্জ্বলতর, প্রখর বলিয়া বোধ হইল; দেহের দীপ্তি যেন ভস্মযুক্ত লাবণ্যের মত ঝলমল করিতেছে। চঞ্চল লঘু পদে সে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। আমার দুইটি হাত ধরিয়া তাহার মাতৃভাষায় বলিল, তাহার গরিবখানা আজ আমার পদধূলিস্পর্শে ধন্য হইয়া গেল।

হাসিয়া বলিলাম, একি, বাংলা ভাষা আবার ছাড়লেন কবে থেকে!

মীরা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি আবার ডাকিলাম, মীরা দেবী!

মীরা ম্লান-হাসি হাসিয়া বাংলাতে এবার বলিল, দেখুন, দেশের কথা ভাবছিলাম, বেরিয়ে এসেও কেমন মনে হ'ল, আমার কোন দেশোয়ালী বন্ধু—বাল্যজীবনের সখার সঙ্গে কথা কইছি।

তারপর তাহার স্বাভাবিক শান্ত-স্বরে বলিল, আসুন, এই অবেলায় খাওয়া-দাওয়া তো হয়নি আপনার?

বলিলাম, পাঁচ-বৎসর পূর্বে তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে বসন্তশোভা দেখবার জন্যে। বেলা প'ড়ে যাবে ভয়েই তো তাড়াতাড়ি আসছি, তবুও দেখ, বেলা প'ড়ে গেল।

অসঙ্কোচে কেমন 'তুমি' বলিয়া ফেলিলাম আজ।

মীরা হাসিয়া বলিল, বেশ তো, সন্ধ্যামণি ফুল তো ফুটবে, সেই ফুলের শোভাই শুধু দেখে যাবে দোস্ত্।

সেও আমাকে আজ 'তুমি' সম্বোধন করিল।

শান্ত মৃদু পদক্ষেপে সে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল।

স্নান সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, মীরা খাবার লইয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ আবার দেখিলাম, সেই প্রখর স্বপ্নাতুর দৃষ্টি। সে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, আমি বলিলাম, কি রকম, হাসছ যে, হঠাৎ কি মনে প'ড়ে গেল?

মীরা বলিল, ভাবছিলাম, ফতেপুরসিক্রির মেলার কথা। এক বিদেশী তরুণ ফকির, সে যে কি অপরাধীর মত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল, উঃ, মুখে কথা ফোটে না!—বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মীরার এমন সরল চঞ্চল হাসি তো কখনও শুনি নাই!

তখনও সে বলিতেছিল, কিন্তু কত দরদ সে ফকিরের, যার একগাছা তুচ্ছ লাঠি, অতি তুচ্ছ তার কিস্মৎ, উঃ!

কৌতুকোজ্জ্বল মুখদীপ্তি পরিবর্তিত হইয়া বিপুল বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় স্মিত ধ্যানমগ্নার মত পবিত্র সুন্দর হইয়া উঠিল, আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, একি, মীরা প্রকৃতিস্থ তো?

অবশেষে প্রশ্ন করিলাম, খোকা কেমন আছে, আপনার খোকা?

মীরা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, জিঞ্জিরের কথা বলছেন? হ্যাঁ, সে ভাল আছে, সে স্কুলে থাকে।

আমি চকিত হইয়া বলিলাম, তা হ'লে আবার নবীন আগন্তুক কেউ এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে। সত্যি? কেমন আছে সে?

মীরা আমার প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, দেখবেন তাকে? এ বুবুয়া আমার বড় ভাল। এই আমার কুমারকিশোর, শৈশব-লাবণ্যের ক্ষয় নেই এর, দেখবেন?

সে আনন্দিত চঞ্চল ভঙ্গিতে উঠিয়া গেল। মীরার প্রসন্নতার হেতু বুঝিলাম, তাহার শান্ত বিষণ্ণতার জন্য আমার একটা গোপন বেদনা ছিল, সে বেদনা আজ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। বহুদিন পূর্বের একটা কথা মনে পড়িল, রবিশস্যের ক্ষেত্র দেখিয়া কথাটা মনে হইয়াছিল। ভাবিলাম, যে বীজ হইতে তাহার নবজন্ম হইবে সে আসিয়াছে।

পর্দা ঠেলিয়া মীরা ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার কোলে গোলাপের মত শিশু—কোমল, উজ্জ্বল, সুন্দর, নীলাভ দুইটি চোখ; কিন্তু একি! এ যে পুতুল!

মীরা বলিল, এ আমার বড় হবে না, কেমন বলুন তো?

আমার চোখে জল আসিয়া গেল, রোধ করিতে পারিলাম না।

মীরা চেয়ারে বসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আপনার চোখে জল? কিন্তু কি জানি দোস্ত, আমার কেমন বালিকা-বয়সের মত পুতুল খেলতে সাধ গেল!

আমি নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিলাম, সেই মীরা!

মীরা বলিল, নিন, শিগ্‌গির খেয়ে নিন, আজ বেড়াতে যাব। আমি পোশাকটা পাল্টে আসি।

সে চলিয়া গেল। আমি মীরার কথাই ভাবিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর মীরা বাহির হইয়া আসিল। পরনে তাহার রাঙা-শাড়ি, বহুমূল্য গাঢ় লাল-রঙে বেনারসী শাড়ি, দুইটি ভ্রূর মধ্যে লাল সিঁদুরের টিপ।

আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম।

মীরা বলিল, বনে আগুন লেগেছে বসন্তশোভায়, আমিও আগুনের মত ভূষায় নিজেকে সাজালাম। কিন্তু সে বিদেশী ফকিরকে দেখাতে পেলাম না।

সে চিন্তামগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, চলুন।

চকিত হইয়া সে বলিল, অ্যাঁ? হ্যাঁ, চলুন।

পনেরো

প্রান্তরের বুকের উপর পথিকের রচনা করা পথ।

দুই ধারে স্বল্পঘন পলাশ, শাল ও মহুয়ার গাছ। শালের গাছে রাঙা কচি পাতা, পলাশের গাছগুলি গভীর রক্তবর্ণ ফুলে আচ্ছন্ন, পত্রহীন মহুয়ার শাখাপ্রান্তে ফুলের স্তবক। শালের গাছেও কোথাও কোথাও ফুল দেখা দিয়াছে। মহুয়ার উগ্র গন্ধের মধ্যেও শাল-ফুলের হৃদ্য মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। ওপারের বনে, দূরত্ব হেতু যেখানে গাছে গাছে মেশামেশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেন আগুনের খেলা চলিয়াছে। বাতাসে গাছ দোলে, মনে হয়, আগুন নাচে। পথে একটি সাঁওতালদের পল্লী, ছোট ছোট ছবির মত ঘরগুলির নিজস্ব একটি এমন সৌন্দর্য আছে যে, মন কাড়িয়া লয়। খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল। চারদিকে খড়িমাটি দিয়া নিকানো, নীচের বনিয়াদটুকু মনে হয় যেন সিমেণ্টে গড়িয়া তুলিয়াছে। সেটুকুর রং ঠিক সিমেণ্টের মত। দেখিলাম, গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো।

পল্লী পার হইয়া চলিলাম। বন ঘন হইয়া উঠিতেছিল। প্রান্তরের বুক ঢাকিয়া শুধু শাল ও পলাশের চারা। তাহার পর আরম্ভ হইল পাথর, পাথরের পর পাথর সাজাইয়া কে যেন সিঁড়ি কাটিয়া রাখিয়াছে।

মীরা বলিয়া উঠিল, উঃ, রক্ত!

সত্যই একটা শালগাছের গোড়াটা রক্তাক্ত হইয়া আছে, গাছটার গা বাহিয়াও রক্ত ঝরিতেছে।

বলিলাম, রক্ত নয়, গাছের আঠা।

মীরা বলিল, না, গাছের রক্ত।

আমি আঠার প্রবাহটায় হাত দিয়া দেখিলাম, পুরাতন ক্ষত। আঠার ধারাও শুকাইয়া গিয়াছে। মীরাও স্পর্শ করিয়া দেখিতেছিল, সহসা তাহার কি খেয়াল হইল, সে নখ দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আঠা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

প্রশ্ন করিলাম, কি হবে?

আঠা ছাড়াইতে ছাড়াইতেই মীরা উত্তর দিল, টিপ পরব। সিঁদুর এত উজ্জ্বল নয়।

খানিকটা আঠা সে আপনার বহুমূল্য শাড়ির আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া লইল।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, অদ্ভুত নারীর মন!

কেন বলুন তো?

তোমার ওই আঁচলের কোণটুকুর দাম আর ওই আঠাটুকুর দাম তুলনা ক'রে দেখ দেখি।

মীরা হাসিয়া বলিল, জলুস দেখেই তো আমরা চিরদিন ভুলে আসছি দোস্ত্, কিন্তু যাচাই করবার অবকাশ তো কোন দিন পাইনি।

তাহার উত্তর শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, মীরার উত্তরের মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নাই।

নদীর তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। তীরের উপরই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। অপূর্ব রূপ নদীর! ওপারের ছোট পাহাড়টা যেন বাহু প্রসারিত করিয়া নদীকে সবলে আপন বক্ষলীনা করিয়াছে। পাহাড়ের ছোট একটা শাখা নদীর বুকে বাঁধ দিয়া এপার পর্যন্ত প্রসারিত। নদী কিন্তু বাধা মানে নাই, সে পাহাড়ের সাদর-প্রসারিত বুক চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই ধারের তটভূমি খাড়া সোজা, পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের ফাটল হইতে জন্মিয়াছে অজস্র কুটজকুসুমের গাছ। গাছগুলি অবনতমুখী হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বৃন্তে তাহার পুষ্পকলির স্তবক, পাহাড় যেন নদীর কেশে ফুল পরাইয়া দিতেছে।

বসন্তের শীর্ণ নদীর বুকের মধ্যে পাহাড়ের দীর্ঘ বক্ষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সে যেন পাথরের বাঁধানো একখানি অঙ্গন। কিসের ঝরঝর শব্দে জনহীন নদীবক্ষ অরণ্যভূমি মুখরিত।

মীরার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, কিসের শব্দ?

সে একটা শালগাছের কিশলয়প্রান্ত ভাঙিয়া চুলে পরিতেছিল, বলিল, আসুন দেখবেন আসুন, জলপ্রপাতের শব্দ।

পাথরে পাথরে হরিণীর মত লাফ দিয়া সে নদীর বুকে নামিয়া পড়িল, আমিও নামিয়া পড়িলাম। নদীর বক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিলাম নদীর আর এক রূপ। সম্মুখে শুধুই পাথর আর পাথর। পাথরের বুকে শত শত রন্ধ্র, অসংখ্য আঁকা-বাঁকা লেখা-জোখা—নদী ও পাহাড়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস। আর একটু আসিয়া দেখিলাম, এক পাশে পাহাড়ের বুক গভীরভাবে চিরিয়া পয়োনালী বাহিয়া নদীর জলধারা ঝরঝর শব্দে তিন চারি দিক দিয়া দশ-বারো ফুট নীচে পাহাড়ের বুকে রচা একটা হ্রদের মত গহ্বরে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেখান হইতে সম্মুখের আর একটা প্রস্তর-অঙ্গন চিরিয়া আবার নীচের হ্রদে গিয়া পড়িতেছে। তাহার পর আবার একটায়—নদী ধাপে ধাপে যেন পাহাড়ের পঞ্জরাস্থির একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মীরা ডাকিল, এখানে আসুন।

দেখিলাম, মীরা একেবারে হ্রদের ধারে গিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। অপরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অপূর্ব শোভনরূপে পরিস্থিতা মীরার সে ছবি আমি জীবনে ভুলিব না। হ্রদের বুক হইতে জলপ্রপাতের বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত শীকরকণা কুয়াশার মত তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখের দিগন্তের তির্যক রশ্মির প্রতিভাতিতে রামধনুর সপ্তবর্ণচ্ছটা মীরার মুখের উপর। পিছনে তাহার ওপারের বসন্তপুলকিত বনভূমি। রহস্যময়ী মীরা আজ যেন যথার্থরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে আক্ষেপ হইল, কেন আমি চিত্রশিল্পী নই?

মীরার পাশে গিয়া বসিলাম। মীরা গভীর মনোযোগের সহিত জলপ্রপাতের রূপ দেখিতেছিল আর কল্লোল-ধ্বনি শুনিতেছিল। আমিও প্রকৃতির শোভার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম।

মীরা বলিল, নদী নাচছে দেখছেন, শুনছেন তার ঘুঙুরের শব্দ? ঠিক তালে তালে নাচছে। দেখবেন, তাল দোব, কেমন মিলে যাবে?

সে হাতে একটি তালি দিল। আমি দ্বিতীয় তালের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মীরা বলিল, দ্বিতীয় তাল তো এখন পড়বে না। এমনই ধারা উৎকর্ণ হয়ে দিবারাত্রি শুনতে হবে, একাগ্র হয়ে দেখতে হবে, তবে সে সময়টি ধরা যাবে।

আমি কি বলিতে গেলাম। মীরা আমার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, চুপ ক'রে শুনুন। বুঝতে পারছেন, ঠিক একেবারে মিলে যাচ্ছে?

আবার আমার মনে চিন্তা জাগিয়া উঠিল, মীরা কি প্রকৃতিস্থ? মীরাকেই লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখের পাথরের উপর দুইটি ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল।

দেখিলাম, বনের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছে। বলিলাম, চল মীরা, আর নয়, রাত্রি হয়ে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে।

মীরা আকাশে মুখ তুলিয়া চাঁদের দিকে চাহিল। তারপর চাহিল নীচে জলপ্রপাতের ধারার দিকে। চাঁদ যেন সে ধারার মধ্যে গুঁড়া হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, চল মীরা।

মীরা বলিল, যাব?

সে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি আগে আগে চলিয়াছিলাম ; মীরা নীরবে আমায় অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। দূরে সাঁওতালদের পল্লীতে মাদল ও বাঁশী বাজিতেছে, তাহার সঙ্গে নারীকণ্ঠের সমবেত সুরের গান ভাসিয়া আসিতেছে।

পল্লীটার প্রবেশমুখে পিছন ফিরিয়া বলিলাম, একটু এদের উৎসব দেখা যাক, কি বল?

কিন্তু একি, মীরা কই? বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রান্তর জনশূন্য। মীরা কই? ডাকিলাম, মীরা! মীরা!

কোন উত্তর পাইলাম না। চিন্তিত হইয়া ফিরিলাম, পথেও কোথাও মীরা নাই। নদীর কাছে আসিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। জলপ্রপাতের ঝরঝর শব্দের সঙ্গে খিলখিল হাসি। পাথরে পাথরে সে হাসি হাজারখানা হইয়া বাজিয়া ফিরিতেছে।

আবার হাসি। মীরাই তো বটে। আজই তো তাহার সরল হাসি শুনিয়াছি। সেই ঝঙ্কারই প্রতিধ্বনিত হইয়া কানে বাজিতেছে। সাধ্যমত দ্রুতপদে নদীর তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চাঁদের আলোয় নদীগর্ভের পাথর ও জল ঝলমল করিতেছে। মীরা সন্ধ্যার সেই পাথরখানার উপর বসিয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকিয়া থাকিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া প্রতিধ্বনির শব্দ কান পাতিয়া শুনিতেছে। যেন জলপ্রপাতের সুরের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছে।

আমি ডাকিতে গেলাম, মীরা!

কিন্তু নিরস্ত হইলাম, যদি আকস্মিক আহ্বানে চকিত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়! সম্মুখেও অগ্রসর হইতে ভয় হইতেছিল, যদি মানুষ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠে! কি করিব ভাবিতে-ছিলাম। এই সময় আমাকে আশ্বস্ত করিয়া মীরা উঠিল। দেখিলাম, ফুলের স্তবক ভাঙিয়া সে নিজেকে সাজাইয়াছে। চুলে ফুল গোঁজা, কানেও ফুলের সজ্জা। পাথরের চত্বরটার উপর আসিয়া সে দাঁড়াইল, তারপর হাত দুইটি লীলায়িত ভঙ্গিতে প্রসারিত করিয়া দিয়া সে দুলিয়া উঠিল। একি, মীরা নাচিতেছে!

মীরার সে কি নৃত্য! সমস্ত প্রস্তর-চত্বরটায় প্রজাপতির মত লঘু গতিতে সে নাচিয়া নাচিয়া

নাচিয়া ফিরিতেছিল। নাচিয়া ফিরিতে ফিরিতে সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া পাক দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। নৃত্য-ঘূর্ণনের বেগে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল, পরনের শাড়ি ফুলিয়া উঠিল, সল্মা-চুমকির কাজগুলি চাঁদের আলোর প্রতিবিম্বে ঝকমক করিতেছিল; এও যেন আর একটা রঙিন জলপ্রপাত। আজও মনে হয়, সেদিন মীরার পায়ে নূপুর থাকিলে জলকল্লোল হয়তো লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া যাইত। সেই রাত্রেও বনমধ্যে কোন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল। তাহার আঘাত শুনিতে শুনিতে যেন তাল পড়িতেছিল।

আমি ভাবিতেছিলাম, একি, এত দীর্ঘ দিনের জীবনোচ্ছ্বাস কি আজ নীরবে মীরার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল? চোখ দিয়া আমার জল আসিল।

রাত্রি বাড়িতেছিল।

মীরা নৃত্য থামাইয়া ক্লান্ত হইয়া পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। আকাশের চাঁদের দিকে তাহার দৃষ্টি। আমি এবার ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাহাকে ডাকিলাম, মীরা দেবী, মীরা!

চাঁদের আলোর প্রতিভাতিতে চোখ তাহার ঝকমক করিতেছিল। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, বাড়ি আসুন, চন্দ্রনাথ ডাকছে।

মীরা বলিল, গান শুনবেন দোস্ত্?

বলিলাম, বাড়িতে গান শুনব, আসুন।

দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিলাম।

চন্দ্রনাথ তখনও আসে নাই। আয়াকে ডাকিয়া বলিলাম, মেমসাহেবের শরীর অসুস্থ, ওঁকে শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাওয়া কর।

গভীর রাত্রে একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, মন উৎকণ্ঠিত হইয়াই ছিল। চাঁদ তখন অস্তে চলিয়াছে, তবুও সেই মরা জ্যোৎস্নার আলোতেই দেখিলাম, বিস্রস্তবাসা মীরা বাগানের শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল। মীরা তখনও ঘুমাইতেছিল। তাহাকে বলিলাম, আমাকে আজ সকালের ট্রেনেই ফিরতে হবে। কিন্তু মীরার শরীর যে বড় খারাপ!

চন্দ্রনাথ বলিল, সে আমি লক্ষ্য করেছি। মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি হেল্‌প্‌লেস্, আমাকে সব বেচে ফেলতে হবে, এখন এক মুহূর্ত অবসর নেই।

আমি চমকিয়া উঠিলাম, সেকি?

চন্দ্রনাথ বলিল, সেই মাড়োয়ারী নালিশ করেছেন, রাশীকৃত টাকা তাঁর পাওনা হয়েছে, কয়েক লাখ, আমাকে এখন অন্য চান্স দেখতে হবে।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কোন উপায় নেই?

উকিল বলেন, অনেক উপায় আছে, এবং তাতে নিশ্চিত নাকি ফল হবে। অন্তত কম্প্রোমাইজ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সে আমি কেমন ক'রে বলব? ওরা বলে, বলুন—শেয়ার কেনবার জন্যে ও টাকা দিয়েছিল, ও লেখাপড়া সাময়িকভাবে হয়েছে, এমনই অনেক কিছু। কিন্তু সে আমি কেমন ক'রে বলব? দোষ তো আমার, সুদটা দিয়ে গেলে—। যাকগে, তোর ট্রেনের কিন্তু আর সময় নেই।

আমার বেদনার আর সীমা ছিল না। আমি বলিলাম, কিন্তু চন্দ্রনাথ—

চন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখিয়া দারোয়ানকে বলিল, জলদি মোটর আনতে বল।

আমি বলিলাম, দেখ, মীরা সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়।

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, কি করব আমি? আমার জীবন যে এখনও সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। আমার আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করতে হবে সব।

অকস্মাৎ তাহার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, আমার দিকে কেউ চেয়ে দেখলি নি তোরা, শুধু আমাকে অপরাধীই ক'রে গেলি।

মোটরটা সশব্দে আসিয়া ফটকের সম্মুখে থামিল।

কলিকাতায় ফিরিয়াই চন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলাম; উত্তর পাইলাম না।

বেশ মনে আছে, ট্রেনে উঠিয়া চোখে জল আসিয়াছিল। চন্দ্রনাথের জন্য নয়, মীরার জন্য। • চন্দ্রনাথ হয়তো আবার উঠিবে, কালপুরুষ যদি অস্ত যায়, তবে সে আবার দেখা দিবে! কিন্তু অরুন্ধতী?

মনে মনে সেদিন ভুল স্বীকার করিয়াছিলাম, মনোমধ্যের মীরাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি অরুন্ধতী নও, তুমি অরুন্ধতী নও, রক্তমাংসের নিতান্ত মানবী তুমি, শ্রদ্ধান্বিত অন্তরের নমস্কার তোমার প্রাপ্য নয়, তাই তোমার জন্য চোখে জল আসিল।

কোন উপায় কি নাই? কোন উপায় নাই? সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপানে চাহিয়া মনে পড়িল হীরুকে। যাইব, হীরুর কাছেই যাইব।

ষোল

হীরুর অর্থে চন্দ্রনাথের উপকার হয় না? গতবার সাক্ষাতের সময়েও তো তাহাকে এ কথা বলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরও মনে আছে। মনে হইল, না, যাইব না। ধনীর খেয়ালী দুলালের নিকট চন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার কোনও মূল্য নাই। তাহার নিকট চন্দ্রনাথকে খাটো করিব না।

অপ্রকৃতিস্থা মীরা ও তাহার ছেলেকে মনে পড়িল। কেতাদুরস্ত ক্ষীণকায় উকিলবাবুটিকে মনে পড়িল, তাঁহার কথা যেন ট্রেনের গতিধ্বনির মধ্যে শুনিতেছি, এ আপনাকে পারতেই হবে, নইলে তাঁর সঙ্গে যে কত লোকের সর্বনাশ হবে! সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে মনে পড়িয়া গেল—যাযাবরীকে।

মনের দিগন্তে দাঁড়াইয়া যাযাবরী যেন রহস্যের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল।

আমি যাইব, হীরুকে ধরিয়া একবার দেখিব। যদি সে দান করিয়া বড়ই হইতে চায়, আমিই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া ছোটই হইব। যাযাবরীকে আর একবার দেখিব। কলিকাতায় আসিয়া আবার পরদিনই দেশে রওনা হইয়া গেলাম, হীরুর ঠিকানার জন্য। সেখানে গিয়া শুনিলাম, হীরু সাঁওতাল পরগণার মধ্যে তাহার জমিদারী কাছারিতে রহিয়াছে।

ম্যানেজার বলিল, কি যে করছেন মশায়, তিনিই জানেন। সেখানকার জমা-খরচ যা আসছে, তাতে তো দেখছি কার্টিজ, হুইস্কি, শিকারীর বকশিশ, শুধু এই।

ম্যানেজারটি হীরুদের বাড়ির পুরাতন লোক। তাহার বাপ-খুড়ার আমল হইতেই কাজ করিতেছে।

হুইস্কি, কার্টিজ ইত্যাদি খরচের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করায় আমি বিস্মিত হই নাই। হাসিয়া তাহাকে উত্তর দিলাম, ধ'রে পেড়ে হীরুর বিয়ে দিতে পারেন কোন রকমে?

বৃদ্ধ ম্যানেজার বলিল, নরুবাবু, হাতে ক'রে যাকে মানুষ করলাম, এমন সুন্দর চেহারা, যাকে দেখে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, মনে হয় ফুলের মত নরম ছেলে, সে ছেলে যে এতখানি শক্ত, এমন একগুঁয়ে হয়, আমি জানতাম না। আমি নিরুপায়, মনিবের বংশের সব শেষ দেখেই বোধ হয় আমাকে যেতে হবে।

কৌতূহলের চেয়ে প্রবল প্রবৃত্তি বোধ হয় মানুষের আর নাই। মানবজীবনে ক্ষুধা-তৃষ্ণার পরেই এই প্রবৃত্তির বিকাশ। যে জিনিস তাহার অজানা, তাহা জানিবার প্রবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও শীলতার বিধানে হয়তো নিন্দনীয়, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সহসা আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, হীরু কি টাকাকড়ি অনেক অপব্যয় ক'রে ফেললে?

ম্লান হাসি হাসিয়া ম্যানেজার বলিল, সে হ'লেও তো জানতাম, যাক, আমার মনিবের বংশই সব ভোগ ক'রে গেল। নরুবাবু, অদ্ভুত ভাগ্য আমার হীরুবাবুর! জান তো, খুড়ো, ভাই, মামা—

বাধা দিয়া বলিলাম, জানি।

ম্যানেজার বলিল, সব জান না; সে সব তো পেয়েছেই, আবার সেদিন, হীরুবাবুর বাপের এক মামী মারা গেছেন, তিনিও তাঁর সব দিয়ে গেছেন হীরুবাবুকে।

মৃত্যু-দেবতার অনুগৃহীত হতভাগ্য হীরুকে স্মরণ করিয়া ব্যথিত না হইয়া পারিলাম না।

বহুক্ষণ নীরবেই রহিলাম। চিন্তা কিছু করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না; একটা দ্বিধায় পড়িয়া বোধ হয় নীরব হইয়াই ছিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িতেছিল যাযাবরীকে। তাহার কথা এই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে কেমন সঙ্কোচ হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম না।

হীরুদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মনে পড়িল বউদিদিকে। স্নেহময়ী বউদিদির চরণে প্রণাম জানাইয়া না গেলে আমার অপরাধের সীমা থাকিবে না। আরও ভাবিলাম, নিশানাথবাবুকে একবার ধরিয়া দেখিব, তিনি যদি চন্দ্রনাথের কাছে যাইয়া অনুরোধ করেন, তবে হয়তো চন্দ্রনাথ তাহার কথা শুনিতেও পারে। মামলা মোকদ্দমা করিলেও মাড়োয়ারী আপোস-মিটমাট করিতে বাধ্য হইবে।

আর যাই হোক, নিশানাথবাবু ধনাগমতৃষ্ণায় পাগল নন, তাঁহার ক্ষুধাকে আমি নমস্কার করি। বাড়ির সম্মুখে গিয়া আমার আর অগ্রসর হইতে পা উঠিল না।

একি, বাড়ির অবস্থা এমন হইয়াছে! ঘরের চালে খড়ের আচ্ছাদন নাই বলিলেই হয়, চারিপাশের প্রাচীর-পরিবেষ্টনী ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, মাটির কোঠার বারান্দার রেলিংগুলি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দুইখানা অতি জীর্ণ মলিন শাড়ি রৌদ্রে শুকাইতেছিল, তাই বুঝিলাম, বউদিদি আমার বাঁচিয়া আছেন, নতুবা ঘরে প্রবেশ করিতেও আমার সাহস হইত না।

অপরাধীর মত ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম, বউদিদি!

চৌদ্দ-পনরো বৎসরের শীর্ণ একটি ছেলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, কাকে খুঁজছেন?

মুখ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে নিশানাথবাবুর পুত্র। বলিলাম, তুমি নিশানাথবাবুর ছেলে?

ইতিপূর্বে তাহাকে দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, হ্যাঁ।

তোমার বাবা কোথায়? মা কোথা গেলেন?

সে উত্তর দিল, বাবা বাড়িতে থাকেন না। মা কোথায় গেছেন, আসছেন। ডাকব তাঁকে, কি বলব বলুন?

বলিলাম, বলবে নরু কাকা, আমি তোমার কাকা হই, নরেশ কাকা।

সে তাড়াতাড়ি আমাকে প্রণাম করিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনিই লেখক নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়? মা আপনার নাম প্রায়ই করেন।

আশ্চর্য মানুষের মন, ক্ষুদ্র একটি বালকের প্রশংসমান দৃষ্টি ও প্রশ্নে পুলকিত না হইয়া পারিলাম না। মুহূর্ত-পূর্বের চিত্তের বেদনা যেন দূরে চলিয়া গেল।

কে, নরু? এস ভাই, এস, কখন এলে?

বউদিদি আসিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এই সেই বউদিদি? আমার অন্নপূর্ণা, হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যময়ী শস্যপরিপূর্ণা বসুন্ধরার মত সেই নারী, এই হইয়াছে?

এ যে দারুণ অনাবৃষ্টির বিবর্ণ পাণ্ডুর নিষ্ফলা পৃথিবীর জীর্ণ শীর্ণ মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে মনে পড়িল, মীরাকে। দেহে নয় মনে, মীরাও এমনই দীনা মূর্তি।

বউদিদি বোধ হয় আমার মনের কথা অনুমান করিয়া লইলেন, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে কষ্ট হচ্ছে, না ভাই?

প্রণাম করিয়া বলিলাম, হ্যাঁ বউদি, চোখে আমার জল আসছে।

দাওয়ায় আমাকে বসাইয়া বউদিদি বলিলেন, আমার অদৃষ্ট ভাই, তুমি মিছে চোখের জল ফেলে করবে কি?

নীরবে নতশিরেই বসিয়া রহিলাম। কোন প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল, পাছে অজ্ঞাতে কোন মর্মান্তিক ক্ষতস্থানে নতুন করিয়া আঘাত দিয়া ফেলি।

বউদিদি বলিলেন, তোমাদের দাদা সন্ন্যাসী হয়েছেন, জান তো?

আশ্চর্য হইয়া গেলাম, বলিলাম, সন্ন্যাসী!

ম্লান হাসি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। আজ তিন বৎসর হয়ে গেল। শ্মশানে কুঁড়ে বেঁধে সেখানে থাকেন, প্রথম প্রথম বাড়িতে আসতেন, আজ এক বছর আর বাড়িতেও আসেন না। এক বছর আজ অন্নও ত্যাগ করেছেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, সংসার তো প্রত্যক্ষ বাস্তব রিপু; আপনার জন হ'ল এক ঈশ্বর; তাঁকে না পেলে মানব-জন্মের সার্থকতা কি?—কথাগুলো আমি মুখস্থ ক'রে রেখেছি ভাই।

আমি নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিলাম।

বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, তুমি নাকি ঠাকুরপো চন্দ্রনাথের খবর জান? সে নাকি খুব বড়লোক হয়েছে?

বলিলাম, চন্দ্রনাথের বড় বিপদ বউদি। তার লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে গেছে। সর্বস্বই বোধ হয় বিক্রি হয়ে যাবে।

বউদিদি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, লক্ষ লক্ষ!

সে দৃষ্টি, সে বিস্ময়, সে কণ্ঠস্বর জীবনে আমি ভুলিব না।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তার আর দোষ কি? সে তো আমার দেওর, স্বামীই যখন চোখে দেখলে না, তখন দেওরকে দোষ দোব কি?

আমি কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলাম, যেন উঠিয়া আসিতে পারিলে বাঁচিয়া যাই।

নিশানাথবাবুকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, বলিলাম,

আমি একবার শ্মশানে যাব বউদি, তাঁকে দুটো কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।

ম্লান হাসি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, মিথ্যাই জিজ্ঞাসা করবে ভাই। আর সত্যি বলতে দোষ তাঁরই বা কি? দোষ তো আমার ছেলেমেয়ের অদৃষ্টের, তিনি তো আপনার কাজ করছেন। অন্যায়ও কিছু করছেন না।

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, অন্যায় নয়? লক্ষবার আমি বলব, এ অন্যায়।

এ কথা ছাড় ভাই। তার চেয়ে ব'স একটু, তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কই দুটো। উঃ, কত দিন তোমাকে দেখিনি! সেই সেবারে এসে নিরুর পাত্রের কথা ব'লে গিয়েছিলে, নিরু তখন বারো বছরের, আর এখন হ'ল উনিশ বছরের। তা হ'লে সাত বছর হ'ল, নয়?

লজ্জায় আমার মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। আপনার স্বার্থপরতার উপর অভিসম্পাত দিলাম।

বউদিদি আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, লজ্জা পেলে বুঝি? না না, তোমার লজ্জা কি? লজ্জা পাবে জানলে কথাটা আমি বলতাম না। একটু জল খাও ভাই, এই সামান্য একটু মিষ্টি—একটু গুড় আর এক গ্লাস জল। অন্নপূর্ণার দোরে এসে কি অভুক্ত যেতে আছে?—বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন; আমার চোখ দিয়া কি ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল! বউদিদি সস্নেহে তাঁহার আঁচল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, না না, কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে?

মনে একটা সংকল্প জাগিয়া উঠিল, বলিলাম, নিরুর বিয়ে কি আজও হয়নি?

বউদিদি বলিলেন, বিয়ে? বিষ কি দড়ি কিনে দেবার পয়সাই জুটল না।

অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলাম, সেবার আপনি আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলেন, এবার আমি আপনাদের কাছে নিরুকে ভিক্ষে চাইছি, দেবেন নিরুকে আমার হাতে?

মুহূর্তে বউদিদি যেন কেমন হইয়া গেলেন, স্থির নিস্পন্দ অপলক দৃষ্টি, সে দৃষ্টির মধ্যে যে কত কি ছিল অনুমান করিতে পারি নাই; কিন্তু সে দৃষ্টি বিচিত্র, বিস্ময়কর! দেখিতে দেখিতে ঝরঝর করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া মায়ের মত আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করি বাবা, চিরজীবী হয়ে তুমি আমার দুঃখ ঘোচাও। সন্তানে স্বর্গ দেয় শুনেছি, তুমি আজ আমায় স্বর্গ দিলে! নরু, আজ যে আমার সব দুঃখ তুমি ঘুচিয়ে দিলে!

আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম, আশীর্বাদ করুন, আমার মনের আগুনের আঁচ যেন নিরুকে স্পর্শ না করে।

কই, সে পোড়ারমুখী গেল কোথায়? নিরু, নিরু!

খিড়কির ঘাট হইতে উত্তর আসিল, যাই মা।

বউদিদি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে শাঁখ বাহির করিয়া বাজাইয়া তাঁহার জীর্ণ সংসারের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করিলেন।

শাঁখ বাজাচ্ছ কেন মা? আজ কি?

রূপে যৌবনে পরিপূর্ণ শান্ত স্নিগ্ধ একখানি ছবির মত নিরুপমা আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমাকে দেখিয়া সে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

বউদিদি বলিলেন, তোমার মুণ্ডুপাত হচ্ছে, পোড়ারমুখী। তোমায় তাড়াবার বন্দোবস্ত হ'ল। পেন্নাম কর নরেশকে, নরেশ তোকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছে। ভাগ্যি, তোর ভাগ্যি—কত বড় বিখ্যাত লোক আমার নরেশ!

নিরু প্রণাম করিতে পারিল না, লজ্জায় পলাইয়া গেল।

আমি বলিলাম, দিন একটা দেখিয়ে ঠিক ক'রে ফেলুন বউদি।

তিনি বলিলেন, বউদি কি? মা বল!

দিন স্থির হইয়া গেল পনরো দিন পর।

নিশানাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মনে দ্বিধা ছিল না, ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম—সে কথা ভাবি নাই। সত্য বলিতে গেলে সেদিন মনের মধ্যেও চিন্তার স্থান ছিল না, কল্পনায় রচনা করিতেছিলাম আমার জীবনের ভাবী নীড়। মুহুর্মুহু নিরুর প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে অপূর্ব একটা শিহরণ উঠিতেছিল।

পুলকিত চিন্তার মধ্যে কখন যে শ্মশানে আসিয়া উঠিয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। অকস্মাৎ খেয়াল হইল, শ্মশানে আসিয়াছি।

জনহীন বালুকাগর্ভ নদীর উপরেই প্রকাণ্ড উঁচু একটা ঢিবি, চারিদিকে বাবলা ও শ্যাওড়ার জঙ্গল, নীচে ছোট ছোট গুল্ম, তাহারই মধ্যে গ্রামের শ্মশান। স্বল্প-চিহ্নিত পায়ে-চলা একটি পথ যেন বলিতেছিল, মানুষ এখানে বড় একটা আসে না। সেই পথ ধরিয়া ভিতরে গিয়া নিশানাথবাবুর কুঁড়েটা আবিষ্কার করিলাম। ছোট, অতি সঙ্কীর্ণ একখানি কুঁড়েঘর। বোধ করি, তাহার মধ্যে শুইলে দেওয়ালে পা ঠেকিবে। চারিদিকে মড়ার হাড়, মাথার খুলি ইত্যাদি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, কয়টা কুকুর গাছের ছায়াতলে অলস-বিশ্রামে শুইয়া ছিল, ওদিকে দুইটা শৃগাল আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কুঁড়েটার দরজায় গিয়া ডাকিলাম, এই যে, একা ব'সে রয়েছেন?

প্রশ্নটা আমার ভুল হইয়াছিল, কিন্তু ওই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

নিশানাথ হাসিয়া বলিলেন, না, ঐ কোণে আর একজন রয়েছেন। এস।

ভিতরে গিয়া কোণের ব্যক্তিটিকে দেখিবার জন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। একি, এ যে প্রকাণ্ড এক অজগর। পাহাড়িয়া চিতি একটা কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া ছিল।

নিশানাথ হাততালি দিয়া বলিলেন, ভয় করছে তোমার? যা যা, বাইরে যা এখন।

আশ্চর্য, সাপটা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি সভয়ে সবিস্ময়ে ভাবিতেছিলাম নিশানাথবাবুর ভবিষ্যতের কথা। সে কথা অনুমান করিয়াই বোধ হয় নিশানাথ বলিলেন, আমি হিংসা না করলে ও আমায় হিংসা করবে কেন নরু।

আমি বলিলাম, বলেন কি, সাপকে বিশ্বাস আছে?

নিশানাথ বলিলেন, যুগ-যুগান্তর থেকে সাপ আর মানুষ পরস্পরের হিংসা ক'রে আসছে, মানুষ সাপকে বধ ক'রে, সাপ মানুষকে নাশ করে। কিন্তু কেউ যদি বুঝিয়ে দিতে পারে যে, আমি তার হিংসা করব না—তবে সেও আমার হিংসা করবে না। তুমি তো চোখেই দেখলে; ও প্রায়ই আসে, বর্ষায় তো এইখানেই শুয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বলিলাম, কিন্তু হঠাৎ এ রকম—

প্রশ্নটা শেষ করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, রত্নময়ী বসুন্ধরা, নরেশ, তার মধ্যে পরম রত্ন হলেন ভগবান—তাঁকে যদি না পেলাম, তবে পেলাম কি বল?

প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম, কিছু পেলেন?

হাসিয়া তিনি বলিলেন, কিছু মানে কি নরু? অনন্ত অসীম সমুদ্র, সে তো তোমার

বাহুবন্ধনে ধরা দেবে না, তোমাকেই তার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হবে।

বলিলাম, কিন্তু সংসারের প্রতিও তো আপনার একটা কর্তব্য আছে?

তিনি উত্তর দিলেন, সেখানে আমি স্বার্থপর, সে আমি স্বীকার করি নরেশ; কিন্তু এ পথ আমার পরিত্যাগ করবার উপায় নেই, কে যেন বিপুল আকর্ষণে আমায় এ পথে টেনে নিয়ে চলেছে।

আমি নীরব রহিলাম।

তিনি আবার বলিলেন, নইলে আমি বলতাম তোমাকে, সংসারে কে কার? অবশ্য কথাটা সত্য।

এবার বলিলাম, কিন্তু আপনার কন্যা বয়স্থা হয়েছে, তার বিবাহ— অন্তত তার ব্যবস্থা তো আপনার করা উচিত। কত বয়স হ'ল তার জানেন? উনিশ বৎসর।

নিশানাথবাবু বলিলেন, সে ভারও ওই তাঁর হাতে। সে ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

আপনি কি সত্যই তাই বিশ্বাস করেন?

অন্তরে অন্তরে। এবং আমায় যতটুকু কৃপা তিনি করেছেন, তাতে বুঝতে পারছি, তিনি তার অতি শুভ ব্যবস্থাই করেছেন।

তার মানে?

আমার কন্যার বিবাহ খুব শীঘ্রই হবে এবং সুপাত্রেই হবে।

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, আমাকে মার্জনা করবেন, আমি সেই কথাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম। আমি নিরুকে বিবাহ করছি, পনরো দিন পরই, অর্থাৎ আঠারোই দিন স্থির হয়েছে।

আশ্চর্য! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখেও জল দেখা দিল। পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, মঙ্গল হোক তোমার, তুমি সুখী হও।

বলিলাম, বিবাহের ব্যবস্থা তো করতে হবে, এখন যদি কয়েকদিনের জন্যে বাড়িতে যান, তবে বড় ভাল হয়।

তিনি বলিলেন, উপায় নেই, আমার এ আসন ত্যাগ করবার উপায় নেই। সংকল্প ক'রে আসন গ্রহণ করেছি, চার বৎসরের সংকল্প। এক বৎসর হবিষ্যান্ন হয়ে গেছে, এ বৎসর ফল জল, আগামী বৎসর শুধু জল, তারপর নিরম্বু উপবাস, বায়ু মাত্র আহার ক'রে থাকব। তারপর আসন ত্যাগ করব।

আর অনুরোধ করিলাম না, উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। শুধু ভাবিতেছিলাম, নিরম্বু উপবাস! বায়ুমাত্র আহার! শিহরিয়া উঠিলাম।

চন্দ্রনাথের কথাও বলিলাম না। বোধ হয় বলিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তিনি পিছন হইতে আবার ডাকিয়া বলিলেন, বিয়ের পর নিরুকে নিয়ে একবার এসো, কেমন?

বলিলাম, আসব বই কি, আপনার আশীর্বাদ ভিন্ন নিরু নতুন জীবনে যাত্রা শুরু করবে কি নিয়ে?

তাঁর চোখ আবার ছলছল করিয়া উঠিল।

সতেরো

সেই দিনই রওনা হইয়া গিয়াছিলাম হীরুর সন্ধানে।

লুপ লাইনের রামপুরহাট স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে দুমকার পথে যাত্রা করিলাম। শুক্লপক্ষের রাত্রি, সন্ধ্যাতেই জ্যোৎস্না বিকশিত হইয়াছিল। সুদূরবিস্তৃত গৈরিকবর্ণ প্রান্তর জ্যোৎস্নালোকে রহস্যলোকের মত মনে হইতেছিল। ক্ষুদ্র এই ঘরখানির অন্ধকার গর্তের মধ্যে বিস্তৃত আলোকিত প্রান্তর যেন হু হু করিয়া দুই পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ওই যে শালবন আসিতেছে, ঘনশ্যাম অরণ্যের শিরে প্রসুপ্ত জ্যোৎস্না, যেন আকাশের প্রেম। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া বাসখানা ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা গ্রামে বাসওয়ালাটা দাঁড়াইয়া বলিল, আমার গন্তব্য স্থান আসিয়াছে। আমি নামিয়া পড়িলাম। পথের কৌতূহলী কয়েকটি গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া হীরুর কাছারীতে গিয়া উঠিলাম। সম্বর্ধনার ত্রুটি হইল না, কিন্তু হীরুকে পাইলাম না। শুনিলাম, এখান হইতে দশ মাইল দূরে গভীর শালবনের মধ্যে মাচা বাঁধিয়া সে সেখানে বাঘের পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

রাত্রে সেখানে যাইবার উপায় নাই, প্রাতঃকালে মোটর যাইবে হীরুকে আনিতে, তখন আমি যাইতে পারি।

সকল ঘরেরই অবারিত দ্বার, অন্যমনস্ক ভাবেই এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া ফিরিতেছিলাম।

চাকরটা বলিল, বিছানা হয়েছে হুজুর ; রাত্রিও অনেক হ'ল।

সত্য কথা, ঘুরিয়াই বা লাভ কি ? আর ঘুরিতেছিলামই বা কেন ?

অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল যাযাবরীকে।

যাযাবরীকেই আমি অন্যমনস্ক চিত্তে খুঁজিতেছিলাম।

প্রাতঃকালেই মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলাম।

অরণ্যপথে প্রভাতেও নিশাশেষের অন্ধকার শেষ হয় নাই, ঊর্ধ্ববাহু বনস্পতি আলোকের কামনায় আকাশলোকে যাত্রা শুরু করিয়াছে, সমগ্র জীবনেও সে যাত্রার শেষ নাই। অথচ আপনার ছায়ার অন্ধকারে আপনার নিম্নাঙ্গ আবৃত। হায় রে কামনা, হায় রে তৃষ্ণা! কামনার উগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চনার ক্ষোভ নিক্তির ওজনে সমান পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে।

শেষ রজনীর মত তরল তিমিরে খুঁজিতেছিলাম, কোথায় শুকতারা—হীরু!

ক্রমে ক্রমে তির্যক গতিতে রৌদ্ররশ্মি তীক্ষ্ণ ভল্লের মত অন্ধকারের বুক বিঁধিয়া এখানে ওখানে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

বনের মধ্যে ছোট একটি ঝরণা। এ ঝরণা উপর হইতে ঝরে না, মাটির বুক চিরিয়া ছোট একটি ডোবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। ঝরণার আশেপাশে স্যাঁতস্যেঁতে, মাটির উপর বড় গাছ নাই, খানিকটা বেশ খোলা, কিন্তু উপরে আকাশ অবারিত, চারিপাশের গাছের ডাল আসিয়া মনোরম একটি আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়াছে। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা শালগাছের গা ঘেঁষিয়া একটা উঁচু মাচান, ওপাশে আর একটা, কিন্তু হীরু কই ?

সঙ্গের শিকারীটা বলিল, বাবু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জুতার খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছে। মই বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম, দেখিলাম, বন্দুক মাথায় দিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটি কিশোর ঘুমাইতেছে, ওপাশের মাচায় দেখিলাম হীরুও নিদ্রিত। এ কিশোর আবার কে ? হাত ধরিয়া টানিতেই ভ্রম ভাঙিয়া গেল। একি, হাতে যে কঙ্কণ বলয় ! সাহেবী শিকারের পোশাক পরিয়া নারী ! কোনও ফিরিঙ্গীর মেয়ে বলিয়া বোধ হইল। হাতটা ছাড়িয়া দিলাম। ওদিকে শিকারীর আহ্বানে হীরুর ঘুম ভাঙিয়াছিল, সে মাচানের উপর হইতে বলিল, নরু !

মেয়েটিও উঠিয়া বসিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিয়া উঠিল, বন্ধু-মানুষ, কবে এল্যান গো ?

চমকিয়া উঠিলাম। যাযাবরী ! সত্যই তো যাযাবরী ! সেই রূপ, সেই কণ্ঠস্বর, সেই মিষ্টি ভাষা, কিছু সংস্কৃত হইয়াছে—এইমাত্র। রহস্য করিয়া বলিলাম, নমস্কার।

সে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ছি ছি ছি, উ কি বলেন গো, আমার যে পাপ হবে ! আশীর্বাদ করেন আমাকে।

বলিলাম, কি আশীর্বাদ করব বল ? না বললে আশীর্বাদ আমি করব না !

ও মাচায় বসিয়া হীরু ফ্লাস্ক খুলিয়া তরল বহ্নি পান করিতেছিল। পান-শেষে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, যাক, আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করব না, কিন্তু তোর কুশল তো নরু ?

বলিলাম, আমার কুশল, কিন্তু হে কুশলী শিকারী, তোমার শিকার কই ?

সে বলিল, সৃষ্টির আদি থেকে যে নারী সর্বযজ্ঞ পণ্ড ক'রে আসছে, সেই নারীই পণ্ড করলে আমার গত রাত্রির মারণ-যজ্ঞ ! গভীর রাত্রে এক বাঘিনী এল, সঙ্গে তার তিনটি শিশু, আমি বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করছি, এমন সময় চিত্রাঙ্গদা চীৎকার ক'রে উঠল, না, না, মেরো না। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে ক্ষিপ্র গতিতে বাঘিনী শিশুদের নিয়ে পালিয়ে গেল। যাযাবরী বললে কি জানিস ? আহা-হা, ওর ছানাগুলির কি হ'ত বল তো ?

চিত্রাঙ্গদা, হাঁ, যাযাবরীকে চিত্রাঙ্গদাই বলিব। চিত্রাঙ্গদা মুখ নীচু করিয়া রহিল।

মোটরে চড়িয়া বলিলাম, তোদের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আমি বিয়ে করছি।

উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিয়া হীরু বলিল, জয় হোক, জয় হোক। দাঁড় করাও গাড়ি।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কেন, নাচবি নাকি ?

যাযাবরী বলিল, সি নাচব আমি গো বন্ধুনোক। আজ রেতে নাচব বইকি।

হীরু বলিল, শুভ সংবাদে আনন্দ করব না ? সুধা পান করব না ?

মধ্যপথেই আবার সে সুরা লইয়া বসিল।

আমি একে একে সমস্ত কথা বলিয়া বলিলাম, ভালমন্দ চিন্তা করিনি—

সে বলিল, চিন্তায় আর চিন্তামণিতে অন্ধকার আর আলোর সম্বন্ধ বন্ধু। চিন্তা করতে গেলে মণি পেতে না। মণি যখন পেয়েছ, তখন চিন্তা আর ক'র না। আমি যাব, তোর বিয়েতে আমি যাব।

কাছারিতে ফিরিয়া হীরু বলিল, দাঁড়া, ব্যাধের আবরণ খুলে আসি, পরে তোর বিবরণ শুনব। এগুলো শৃঙ্খলের মত কঠোর বন্ধন ক'রে রেখেছে যেন, একটু স্বচ্ছন্দ হওয়ার প্রয়োজন। না হ'লে উৎসব হবে না।

হীরু চলিয়া গেল।

চিত্রাঙ্গদা মৃদুস্বরে বলিল, কই, আশীর্বাদ করলেন না ?

হাসিয়া আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, কি আশীর্বাদ করব, বল ?

মুখ নত করিয়া অতি মৃদু অথচ অতি দ্রুত সে বলিল, রাঙা খোকার মা হই যেন।—বলিয়াই সে চলিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া গমনশীলা নারীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মন্থর গতিভঙ্গি ; যাযাবরীর অভ্যস্ত সে চাপল্য, সে ক্ষিপ্রতা—ধীর শিথিল একটি পূর্ণতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

মনে মনে বলিলাম, তাই যদি সত্য হয়, তবে চিত্রাঙ্গদা, তুই যেন বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা হতে পারিস, আমি আশীর্বাদ করছি।

হীরু ফিরিয়া আসিল বোতল ও গ্লাস হাতে লইয়া। আমি হাসিলাম।

হীরু বলিল, বন্ধু বর্বরার সঙ্গে থেকে বর্বর হয়েছি নরু, আদি বর্বর যুগের অভ্যর্থনার প্রথাতেই বন্ধু প্রীতিভাজনের অভ্যর্থনা করব। আমার প্রীতিতে সন্দিহান হ'স নি ভাই, কিন্তু তরল সুরা প্রীতিকে করে গাঢ়, হিম যেমন জল জমিয়ে করে বরফ। কামনা করি, তুই আর নিরু জীবনে যেন জ'মে এক অখণ্ড বরফখণ্ডে পরিণত হতে পারিস।

দেখিলাম, হীরুর মস্তিষ্কে সুরা-প্রভাব ক্রিয়াশীল, তাহাকে অতিমাত্রায় মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

সুরা-পরিপূর্ণ কাচ-পাত্র তুলিয়া বলিলাম, তোদের সংসারে আসছে যে নবীন আগন্তুক—

হীরু বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, অভিসম্পাত দিস নি নরু, অভিসম্পাত দিস নি।

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সুরার মত বস্তু অধরের সম্মুখে থাকিয়াও উপেক্ষিত রহিয়া গেল। আমি শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, বহুক্ষণ পর প্রশ্ন করিলাম, যাযাবরীর প্রেম কি তোকে ধন্য করতে পারে নি হীরু ? তোর কি লজ্জা হচ্ছে ?

হীরু আমার শেষ কথার উত্তর দিল, ভুল বললি ভাই, লজ্জার আবরণ আবিষ্কারের পরে হয়েছে লজ্জার উদ্ভব। আমার জীবন অনাবৃত, লজ্জা আমার জীবনে প্রবেশে অনধিকারী। আমি মৃত্যুর উপাসক, অবশেষ রাখার আমি বিরোধী বন্ধু, আমি আমাকে নিঃশেষ ক'রে যেতে চাই।

বহুক্ষণ নীরবতার পর আমি বলিলাম, কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর তো দিলি না তুই ?

হীরু বলিল, সম্মুখে বিস্মরণী মন্দাকিনীর অমৃতধারা, সুতরাং বিস্মৃতির জন্যে তিরস্কার আমার প্রাপ্য নয়। প্রশ্ন পুনরুত্থাপিত কর বন্ধু।

চিত্রাঙ্গদার প্রেম কি তোকে তৃপ্তি করতে পারেনি ?

হীরু সহজ সরল কথায় উত্তর দিল, না, যাযাবরীতে আমার অবসাদ এসেছে।

বলিলাম, সেকি, এরই মধ্যে তৃষ্ণা মিটে গেল ?

হীরু বলিল, তৃষ্ণা মেটেনি, বিতৃষ্ণা এসেছে বন্ধু। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুই ও বস্তুটা আজ পান করবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস।

হাসিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলাম।

হীরু বলিল, হর-কোপানলে মদন ভস্ম হয়ে হ'ল অতনু। তাতে দেখছি, হরেরই হয়েছে পরাজয় ; পুষ্পতনু অতনু হয়ে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করলে। পুষ্পতনুর পুষ্পশরে দেহই হ'ত বিদ্ধ, রক্তমাংসের দেহই হ'ত জর্জর, কিন্তু অতনুর অদৃশ্য শর মনকে করে উতলা, উন্মত্ত। দেহ ক্ষুধিত হ'লে তার তৃপ্তি আছে, কিন্তু মন ক্ষুধাতুর হ'লে বিশ্ব গ্রাস ক'রেও তার পরিতৃপ্তি হয় না। আমার মন ক্ষুধাতুর হয়ে উঠেছে নরু, জীবনের ক্ষয় ভিন্ন সে ক্ষুধাকে জয় অসম্ভব।

দেখিলাম তাহার আয়ত স্নিগ্ধ সেই চোখ আজ এই প্রভাত-সময়েও অদ্ভুতরূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

আমার নিজের শূন্য পান-পাত্রটা আবার ভরিয়া লইয়া বলিলাম, জীবনকে সংযত কর, আমার অনুরোধ, তুই বিবাহ কর হীরু।

হীরু বলিল, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরল এবং অমৃত—দুইয়ের সংমিশ্রণে সুরার সৃষ্টি নরু, ওতে দেব-দানব উভয়েরই অধিকার আছে। আমার পান-পাত্রটাও ভ'রে দাও বন্ধু, শূন্য রেখো না।

হাসিয়া তাহার পাত্রটিও ভরিয়া দিলাম, সুরা তখন মস্তিষ্ককেও উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, বলিলাম, বান্ধবী যাযাবরী অনুপস্থিত কেন হীরু, তুই যাযাবর না হয়ে সে-ই কি বন্দিনী হ'ল ?

হীরু বলিল, মনে আছে নরু, যাযাবরীর সুরার প্রতি সে প্রলোভন ? সে প্রলোভনও সে ভুলেছে মাতৃত্বের মোহে। মারণ-যজ্ঞেও ওর অবসাদ এসেছে, শিকারেও আর যেতে চায় না। কাল জোর ক'রে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু যাযাবরী ব্যাধিনী অর্ধ-মাতৃত্বেই আপনাকে হারিয়ে ব'সে আছে, আর্তনাদ ক'রে মৃত্যু-সহচরী বাঘিনীকে বধ করতে দিলে না।

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম, তাকে আমি নমস্কার করি।

সে বলিল, বিতৃষ্ণার মধ্যে বোধ হয় আছে ঘৃণা। ঘৃণা বা রুচির বিকারে যে তৃষ্ণা বিগত হয়, সেই হ'ল বিতৃষ্ণা। আমার বিতৃষ্ণা এসেছে। আমি ওকে আর সহ্য করতে পারছি না। জানিস নরু, যেদিন প্রথম শুনলাম, চিত্রাঙ্গদা হবে জায়া, আমার সন্তানের জননী, সেদিন আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, হত্যার সংকল্পও মনে মনে জেগে উঠেছিল।

শিহরিয়া বলিলাম, না না না, এমন কাজ করিস নি হীরু।

হীরু উত্তর দিল, সে কথা আমিই আমাকে শতবার বলি নরু।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিল, মুক্তকেশীও যেন সে বস্তুটা অনুভব করে নরু, ও আমাকে আড়াল দিয়ে চলতে চায়। কিন্তু সে অপরাধ আমারও নয়, ওরও নয়। এ হ'ল আদিম—

হীরু নীরব হইল। চিত্রাঙ্গদা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবী জননীর মুখের পাণ্ডুরাভা বড় সুন্দর লাগিল।

সে আজ জায়ার মতই বলিল, বেলা যে অনেক হ'ল গো। খাবার যে হিম হয়ে গেল।

উঠিয়া পড়িলাম।

স্নান করিতে করিতে মনে পড়িল, চন্দ্রনাথের কথা কিছু বলা হয় নাই। মনে মনে নিজেকেই অভিযুক্ত করিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া বাহিরে আসিয়া হীরুর সন্ধানে গেলাম। ঘরে ঢুকিতে গিয়া ঢুকিতে পারিলাম না, দেখিলাম, হীরুর বাহুবন্ধনের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

তবে কি যাযাবরী সব শুনিয়াছে ?

উঃ, যাযাবরীরও সে কি উচ্ছ্বসিত কান্না! দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম, তখনও সে কান্না তাহার শেষ হয় নাই।

অপরাহ্ণে আর ভুলিলাম না, হীরুকে চন্দ্রনাথের কথা বলিলাম।

হীরু বলিল, দান ক'রে চন্দ্রনাথকে খাটো করবো না। তবে আমি আমার কলিকাতার অ্যাটর্নিকে চিঠি লিখছি, তারা যেন কারখানাটা কিনে নেয়। কিন্তু চন্দ্রনাথ কি আমার

সঙ্গে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে কাজ করবে নরু ?

আমি বলিলাম, সে ভার আমার ওপর।

হীরু বলিল, ভার কাঁধে তুলে বহন ক'রে নিয়ে গেলেই সে সার্থক হয় না বন্ধু। দেখো যেন ব্রজরাখালদের সুদূর ব্রজধাম থেকে বাহিত ফলভার যেমন দ্বারকার দ্বারে দ্বারীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তেমনই লাঞ্ছনা সার না হয়। এক কাজ কর না, তোর বিয়েতে তাকে আসতে লেখ না।

যুক্তিটা বড় ভালো লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই তাহাকে চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করিলাম, মীরা এবং খোকাকে লইয়া আসিতেই হইবে। শুধু আমার নয়, নিরুরও অনুরোধ।

তারপর ?

তারপর স্মরণেও চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। শুধু ব্যথা নয়, বিস্ময়ে, আনন্দে ধরিত্রীর রূপ সেদিন দৃষ্টির সম্মুখে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, যাযাবরী নাই।

চিত্রাঙ্গদা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

হীরু বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, বর্বরা আপন সংস্কার অনুযায়ী কাজই করেছে নরু। কাল বোধ হয় আড়াল থেকে সব শুনেছে। শুনে সন্তানের মমতায় আদিম যুগের মায়ের মতই সন্তানের পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে ; কিন্তু ভাবছি, সে নিরাপদে পৌঁছবে তো ? উঃ, কাল সে কি কান্না তার আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ? তখন বুঝিনি, বিদায়ব্যথা নিঃশেষে সে নিবেদন করছে আমার কাছে !

আমার চোখের সম্মুখে যুগ-যুগান্তরের অতীত কালের ধরিত্রীর রূপ যেন ভাসিয়া উঠিল। কল্পনায় দেখিলাম, সৃষ্টির সাধনায় ধরিত্রী নব নব রূপের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আবার কত রূপান্তর হইবে। এ কামনা ধরিত্রীর তপস্যা। এত সুখ, এত সম্পদ, হীরুর মত প্রিয়তমকে পরিত্যাগের মধ্যে যাযাবরীর সেই তপস্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। সেদিন যাযাবরীর কামনাকে প্রণাম করিয়াছিলাম, আজও অন্ধকারের মধ্যে তাহার সাধনাকে প্রণাম করিতেছি।

হীরুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সে আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সেই দিনই চলিয়া আসিলাম।

নিরুকে বিবাহ করিলাম।

নিরুর মা-ই কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; নিশানাথবাবুর আসন ত্যাগের উপায় নাই। হীরু ও চন্দ্রনাথকে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহারা কেহ আসে নাই।

চন্দ্রনাথ একখানা রেজিস্ট্রি পত্র দিয়াছিল, তাহার মধ্যে হাজার টাকার একখানা চেক। আর একখানা চিঠি, নিরুকে আশীর্বাদ।

হীরু চিঠিও দিল না, বিবাহের দিন হীরুর ম্যানেজার লইয়া আসিলেন একরাশি অলঙ্কার ও নানা উপহার। হীরু কলিকাতা হইতে পাঠাইয়াছে।

বিবাহের পর নিরুকে লইয়া নিশানাথবাবুকে প্রণাম করিতে গেলাম। নিরুর মা কিছুতেই গেলেন না। বলিলেন, না, তার তপস্যায় বিঘ্ন হবে। শুধু আজ নয়, যদি আমি মরি নরু, তবে তাঁকে আমার মরা মুখও যেন দেখানো না হয়। আমি আর অনুরোধ করিলাম না।

শুধু গোপনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম।

হায় নারী! হায় রে অভিমান!

নিশানাথবাবু সজল চক্ষে আশীর্বাদ করিলেন। ফিরিবার সময় বার বার ফিরিয়া দেখিলাম, সন্ন্যাসী আপন কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন।

নিরুর কান্নার বিরাম ছিল না।

অকস্মাৎ একদিন হীরু আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বলিল, তোর বউ দেখাবি না?

সাদরে আহ্বান জানাইলাম, আয়, আয়।

নিরু হীরুকে প্রণাম করিল। হীরু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নিরু বলিল, জল খেতে হবে কাকা। সে আপন সম্বন্ধ ধরিয়া হীরুকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করিল।

হীরু বলিল, নিশ্চয় খেতেই হবে। কিন্তু শুধু এক গ্লাস জল।

তারপর বলিল, বিদায় নিতে এসেছি।

সে কি?—বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম।

আয়ুসূর্য অস্ত যাবার সময় হয়েছে। পশ্চিম দিগন্তে অভিযান না ক'রে উপায় কি? ইউরোপ চলেছি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছে, টি. বি.।

টি. বি.?

হ্যাঁ। কিন্তু চন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে ব্যবস্থাটা ক'রে ফেল।

আমি ব্যাকুল হইয়া বলিলাম, তুই কিন্তু নিজেকে সংযত কর হীরু।

সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল—

> "বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
> ফুলে ফলে পল্লবে বিরাজে।
> যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
> মরে যায় ব্যর্থ ভস্ম মাঝে।"

বুকের বহ্নি জ্বলেছে বন্ধু, লজ্জাহীনা তার শিখা, ভস্ম যে হতেই হবে। নেভানো তাকে যাবে না।

না না, সুইজারল্যাণ্ডে গেলেই ভাল হবে। ভাল ডাক্তার দেখে—

সে আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, খুব ভাল ডাক্তার ঠিক করেছি বন্ধু—, নারী নারী নারী। আমি পশ্চিম জয় করতে চলেছি।

আমি অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে উঠিয়া বলিল, চললাম। আমি আর বসব না।

সে চলিয়া গেলে আমার চেতনা ফিরিল। তখন তাহার প্রকাণ্ড বড় মোটরখানা পশ্চাতে ধূলা ও ধোঁয়ার যবনিকা তুলিয়া দিয়া জনসমুদ্রের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ ব্যর্থ চিন্তার পর মনে পড়িল চন্দ্রনাথকে। সেই এক ক্ষ্যাপা—সারা জীবন পরশপাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

আঠারো

পরদিনই রওনা হইয়া গেলাম চন্দ্রনাথের উদ্দেশে।

যখন স্টেশনে নামিলাম, তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষায় একটা পাথরের উপর বসিয়া রহিলাম। গ্র্যাণ্ড-কর্ড লাইনে গাড়ির যাওয়া-আসার বিরাম নাই—পণ্য-সম্ভার, কয়লা, অভ্র, কাঠ, ফায়ার-ক্লে ইত্যাদি বোঝাই করিয়া মালগাড়ি একটা যায়, একটা আসে। ট্রেনের গতিবেগে পৃথিবীর বুক অবিরাম থরথর করিয়া কাঁপে। হুইসলের তীক্ষ্ণ চীৎকার বন্দুকের গুলির মত নৈশ স্তব্ধতার বুক ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলা হইতে বায়ুপ্রবাহ-স্পর্শে একটা বিরামহীন শব্দ—ক্ষুব্ধ গর্জন-ধ্বনির মত ধ্বনিত হইতেছে। সম্মুখে দূরে সারি সারি সিগ্‌নালের লাল আলো অকম্পিত জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। পিছনের দিকে চাহিলাম, সেখানেও তাই; যেন কাহার আরক্ত দৃষ্টি ধকধক করিয়া নিষ্পলক চক্ষে জাগিয়া আছে।

গাড়োয়ানটা আসিয়া চিন্তার ব্যাঘাত করিল, বলিল, হুই বাবু চাঁদ দেখাইছে, পলাশবনের হুই মাথাতে।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। মন্থর গমনে গাড়িটা চলিয়াছিল। পাশে একটা কয়লা-নিঃশেষিত পরিত্যক্ত কয়লা খনির সুদীর্ঘ চিমনিটা সদ্যবিকশিত অস্ফুট জ্যোৎস্নার মধ্যে আমার অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল; কে যেন একটা আঙুল বসুন্ধরার বুকের মধ্যে প্রখর নখ দিয়া ভেদ করিয়া বসাইয়া দিয়াছে—কোন রক্তলোলুপ দানব।

সেই দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখ-দিগন্তে প্রসারিত করিলাম। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দূর দিগন্তে সুদীর্ঘ এক অগ্নিরেখা জ্বলিতেছে, দিগন্তের আকাশ পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। গাড়োয়ানটাকে প্রশ্ন করিলাম, ওটা কিসের আলো রে?

উটা আলো লয় আজ্ঞা, আগুন; পাহাড়ের শালবনে আগুন লেগেছে আজ্ঞা।

বনে আগুন লাগিয়াছে! সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম।

গাড়োয়ানটা তখনও বলিতেছিল, দিনরাত জ্বলছে, দিনরাত জ্বলছে। খেয়ে শেষ করবেক, তবে থামবেক। দিনরাত জ্বলছে।

গাড়িটা বড় রাস্তা হইতে মোড় ফিরিল। বনের আগুন পিছনে পড়িয়া গেল। কিন্তু একি, চন্দ্রনাথের কারখানার আগুন কই? নিষ্কম্প জ্যোৎস্না মাথায় করিয়া ঘন পলাশবন অন্ধকারের মত পড়িয়া আছে। কোথায় ধূমকেতুকেতন চন্দ্রনাথের বহ্নিধ্বজা, চিমনির মুখে লেলিহান অগ্নিশিখার সারি? মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

শঙ্কা আমার মিথ্যা নয়। গিয়া দেখিলাম, কারখানাটা পরাজিত দৈত্যপুরীর মত স্তব্ধ, যন্ত্রপাতিগুলা বজ্রাহত বৃত্রাসুরের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে।

কোথায় চন্দ্রনাথ?

তাঁহার অসমাপ্ত মণিমন্দির অন্ধকার। চন্দ্রনাথ নাই, মীরাও নাই। অবশেষে দেখা হইল হীরুর অ্যাটর্নির প্রতিনিধির সঙ্গে। তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথবাবু আমরা পৌঁছিবার আগেই মাড়োয়ারীকে কারখানা বিক্রি ক'রে চ'লে গেছেন। কোথায় গেছেন, সেও কাউকে ব'লে যান নি। অদ্ভুত মানুষ! শুনলাম, ব'লে গেছেন, এ আমার অজ্ঞাতবাস!

আমি স্তব্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া খুঁজিতেছিলাম, কোথায় কালপুরুষ !

* * * *

ছায়াপট ছায়াঘন হইয়া উঠিল যে।

কে কোথায় ? চন্দ্রনাথ, মীরা, হীরু, যাযাবরী—কই, কোথায় ?

একি, অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিভীষিকার মত ওকি মূর্তি! স্পন্দনহীন, চর্মাবৃত কঙ্কাল—ও কে ?

মনে পড়িয়াছে।

বৎসর দুয়েক পর একটা টেলিগ্রাম পাইলাম, "নিশানাথবাবু মৃত্যুশয্যায়, নিরুকে লইয়া অবিলম্বে এস।"

অবিলম্বেই নিরুকে লইয়া রওনা হইলাম।

নিশানাথবাবু আপনার উগ্র কামনায় সেই ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছিলেন। হবিষ্যান্ন এক বৎসর, পর-বৎসর ফল জল, তারপর এক বৎসর সামান্য দুধ ও জল খাইয়া কঠোর উপাসনা করিয়াছেন। শুধু বায়ু মাত্র আহার করিয়া বৎসর যাপনের এই প্রারম্ভ।

নিরু কাঁদিতেছিল, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেশে গিয়া পৌঁছিলাম।

শ্মশান নগর হইয়া উঠিয়াছে। নিশানাথের উদগ্র ক্ষুধাকে বেষ্টন করিয়া মানুষ ক্ষুধার হাট গড়িয়া তুলিয়াছে। শ্মশানভূমির চারিপাশে বসিয়া গিয়াছে মেলা।

আমাদের গ্রামেরই দোকানদার ধর্মদাস আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে, আপনি এসে পড়েছেন! তা এ দেখবার জিনিস মশায়। কেউ যদি একবিন্দু জল মুখে দিতে পারলে! আর জ্যোতি কি হয়েছে দেহের!

আমি নীরবে চারিদিকের জনতার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম।

ধর্মদাস বলিল, এ আর কি লোক দেখছেন, সন্ধ্যে হ'লে লোকে লোকে পথ চলা যাবে না! দোকানদাররা সব লাল হয়ে গেল, কি বিক্রি মশায়! আরো ভেতরে যান, দেখবেন, পয়সার রাশি! বাতাসা আর মিষ্টির পাহাড় হয়ে গিয়েছে!

ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে শ্মশানের অভ্যন্তরের কুঁড়ের সম্মুখে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু কোথায় সে কুঁড়ে, কোথায় সে শ্মশান ? ফুলে পাতায়, চিত্র-বিচিত্র সামিয়ানায় সেখানে এক উৎসব-মণ্ডপ গড়িয়া উঠিয়াছে। কুঁড়েটি এখনও আছে, কিন্তু তাহার চারিপাশে আরম্ভ হইয়াছে পাকা মন্দিরের বনিয়াদ।

ভিতরে গেলাম। দেখিলাম, চর্মাবৃত কঙ্কালমূর্তি নিশানাথ স্পন্দনহীনপ্রায় নিমীলিত নেত্রে এখনও ধ্যানাসনেই বসিয়া আছেন, চোখেও বোধ করি দৃষ্টি নাই। জীবনের লক্ষণের মধ্যে বক্ষঃস্থল তখনও ধুঁকিতেছে। তাঁহার একটু দূরে বসিয়া নিশানাথবাবুর স্ত্রী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার আসন ভিন্ন।

নিরু কাঁদিয়া মায়ের কোলে লুটাইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে রব উঠিল, কেঁদো না, কেঁদো না।

একজন কে বলিল, ছি মা, তোমার মত দেবতা বাপ হয় কজনের ? দেবতার তপস্যায় কি কেঁদে বিঘ্ন করতে হয় ?

আমাকে দেখিয়া নিরুর মা এক বিষাদাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা করিয়া ইঙ্গিতে বসিতে

বলিলেন। কয় ফোঁটা জল তাঁহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

তাঁহাকেই বলিলাম, একটু কিছু মুখে দিয়ে দেখেছেন?

ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, ভগবান এসে দেখা না দিলে সে হবার নয়; আর আমার স্পর্শ করবারও উপায় নেই।

আর প্রশ্ন করিলাম না, নির্নিমেষ নেত্রে অদ্ভুত মানুষটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, ঠোঁট যেন ঈষৎ নড়িতেছে। বলিলাম, কিছু বলছেন ব'লে মনে হচ্ছে!

নিরুর মা বলিলেন, ভেতরে জ্ঞান তো রয়েছে।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিশানাথবাবুর অতি সন্নিকটে গিয়া বসিলাম। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া সে কথাটি বুঝিয়াছিলাম—অতি ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল তাঁহার ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে নিশানাথের বক্ষ-স্পন্দনটুকুও শেষ হইয়া গেল। মানুষ তবু মৃত্যুতে বিশ্বাস করিল না। তাঁহার দেহ তেমনই অবস্থাতেই সমস্ত দিন থাকিয়া গেল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল।

সেদিন মেলাতে সে কি জনতা! দোকানীরা পরমোৎসাহে কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া মহাপুরুষের জয়ধ্বনি দিতেছিল।

একেবারে মেলার একপ্রান্তে বেশ্যাপল্লীতেও উচ্ছৃঙ্খল চীৎকারের বিরাম ছিল না।

পৃথিবীর এক বিচিত্র রূপ আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

মন্দির-মসজিদ-গির্জা-স্তূপ-সঙ্ঘারামের মিনার-গম্বুজ-কণ্টকিত ধরিত্রী!—উর্ধ্বনেত্র উর্ধ্ববাহু যুগ-যুগান্তরের কোটি কোটি মানুষ শোভাযাত্রা করিয়া আকাশের পথে চলিতে চাহিতেছে।

উনিশ

তারপর?

স্মৃতির কত পাতা উল্টাইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ মীরা নাই, হীরু যাযাবরী নাই, আপনার কাজকর্মে মগ্ন হইয়া জগতের গতির সঙ্গে চলিয়াছি। আমার জীবন-তারকা অস্তোন্মুখ—সাহিত্য জগতে নামিতে শুরু করিয়াছি। খ্যাতি কমে নাই, বরং অর্থ, অভিনন্দন, সম্মান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতেছি। কিন্তু ওইখানেই তো ওই ইঙ্গিত আমি দেখিতে পাই। বিধাতা যেন আমার হিসাব-নিকাশ চুকাইতে বসিয়াছেন। পাওনা শেষ হইলেই তো হিসাব চুকিয়া গেল।

গত বৎসর হাওড়ায় একটা সভার নিমন্ত্রণ সারিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। লালদীঘির কাছে আসিয়া গাড়ির গতি মন্দ হইল। ট্রাম, বাস, মোটর, রিকশ, গৃহাভিমুখী শ্রান্ত কেরানীদলের ভিড় ঠেলিয়া গাড়িখানা চলিতেছিল ধীরে ধীরে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সম্মুখেই ফুটপাতের উপর হঠাৎ চন্দ্রনাথকে দেখিলাম। গাড়ি রাস্তার ধারে ভিড়াইতে বলিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, চন্দ্রনাথ!

ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, নরু!

বলিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে নয়, আমার গাড়িতে আয়। আমার ওখানে যেতে হবে।

নিরুর সঙ্গে দেখা করবি।

অল্প একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল, আমার এখন অজ্ঞাতবাস। এখনও নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। কিন্তু তোর ওখানে—আচ্ছা চল, নিরুকে দেখে আসব।

গাড়িতে উঠিয়া প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, মীরা কেমন ?

সে বলিল, মধ্যে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল, সূত্রপাত বোধ হয় তুই দেখে এসেছিলি, নয় !

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই তোর সঙ্গে শেষ দেখা।

চন্দ্রনাথ বলিল, তারপর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। শুধু নাচত, গান না, শব্দ না, চীৎকার না, শুধু নাচত। কখনও কখনও কাঁদত, তাও নিঃশব্দে ফুলে ফুলে। এমনও হয়েছে, নাচছে অথচ চোখ দিয়ে জলের ধারা বইছে।

ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলাম, এখন ?

সে উত্তর দিল, এখন মন্দের ভাল, এখন আর নাচে না বা কাঁদে না, বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে শান্ত হয়ে আছে। ভেবেছিলাম, অ্যাসাইলামে পাঠিয়ে দোব। কারণ, তখন আমার মুহূর্তের অবসর ছিল না। কারখানাটা বেচে ফেললাম। নতুন স্টার্ট নেবার জন্যে আমিও তখন উন্মাদ বললেই হয়। সে সময় মীরাকেও যেন সহ্য করতে পারছিলাম না। শেষে চ'লে এলাম কলকাতায়। সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র সম্বল। স্থির করলাম, যাদুমন্ত্রে তাকে অসামান্য বৃহৎ ক'রে তুলতে হবে ; শেয়ার মার্কেটে স্পেকুলেশন করব। এখানে এসে দিনকতক মার্কেটের অবস্থা এবং গতি লক্ষ্য করবার জন্যে প্রায় ছয় মাস নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে ছিলাম। শুধু খবরের কাগজ থেকে বাজারের ইতিহাস নোট ক'রে রাখতাম, মধ্যে মধ্যে বেরুতাম খবরাখবরের জন্যে। সেই সময় অহরহ মীরাকে আমার কাছে বসিয়ে রাখতাম। সেই শাসনে, আর একটা চিকিৎসাও করিয়েছিলাম, সেই চিকিৎসায় ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। এখন কাজকর্ম করে কলের মত এই পর্যন্ত। বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে।

গাড়িখানা এস্‌প্লানেডের মধ্যে দিয়া চলিয়াছিল। আমি নীরবে মীরার কথাই ভাবিতেছিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, রোখো গাড়ি।

প্রশ্ন করিলাম, কেন ?

সে বলিল, না নরু, আমি যেতে পারব না। আমার মর্যাদায় ঘা লাগছে। জানি, এ নিতান্ত অহেতুকী, কিন্তু তবুও না। তোর এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা, তোর ওখানে কত লোক থাকবেন হয়তো। কি পরিচয় দোব আমি ? শুধু তোর বন্ধু ব'লে ! না না, সেই কি আমার পরিচয় ? না !

তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, তবে চল তোর বাড়ি যাই।

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া সে বলিল, বেশ। কিন্তু মোটর ছেড়ে দাও। ট্রামে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ভাড়া দোব।

তাহাতেই রাজি হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া বলিলাম, নিউ মার্কেট হয়ে যাব কিন্তু, কিছু ফুল কিনব।

সে হাসিয়া বলিল, মীরার জন্যে ? বেশ, চল।

পদব্রজে চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিলাম, তোর নিজের বিজনেস কেমন এখন ?

চন্দ্রনাথ বলিল, এ হ'ল এক রকম জুয়োখেলা। এ ধরনের কাজ আমি পছন্দ করি না। জীবনে আমি কখনও লটারির টিকিট কিনি নি। যার জন্যে পরিশ্রম করলাম না, তার জন্যে

আবার পাওনা কি? 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর কল্পনা আমার জীবনে স্বপ্ন। কিন্তু জীবনে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই ইচ্ছে আছে, এবার শুধু লোহার কারখানা আমি করব। লোহার কারখানায় মূলধনটা বড় বেশি প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, দেখ, জীবনে দুর্বলতা আসছে ব'লে মনে হচ্ছে। এক এক সময় ভাবি, না, ওসব আর নয়। 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্ন থাক, বিরাট কর্মক্ষেত্র রচনা এ জীবনে আর হ'ল না। সময় কোথায়? শুধু কামনা করি, ঘর-বাড়ি, সুখ-সম্পদ, প্রচুর সম্পদ। কিন্তু তবু মনকে বোঝাতে পারি না। 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্নে আমার মন পাগল।

মার্কেটে আসিয়া ফুলের দোকানে ঢুকিয়া বাছিয়া বাছিয়া রক্তরাঙা ফুল ঝুড়িতে তুলিয়া রাখিতেছিলাম। ফুলের ঝুড়ি সাজাইয়া লইয়া ভাবিলাম খোকার জন্য কিছু খেলনা কিনিয়া লইব। সম্মতির জন্য চন্দ্রনাথকে সে কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু কোথায় চন্দ্রনাথ? সে সেখানে ছিল না। বেশ বুঝিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে, চোরের মত পলাইয়াছে। তাহাকে পাইব না জানিয়াও খুঁজিলাম, কিন্তু পাইলাম না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, এ ফুল লইয়া কি করিব? পথে হঠাৎ চোখে পড়িল সার্কুলার রোডের সমাধি-ক্ষেত্রটা। কি মনে হইল, সমাধি-ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকিয়া সম্মুখের একটা কবরের উপর ফুলগুলি সযত্নে সাজাইয়া দিলাম।

চন্দ্রনাথের নয়, হীরুর নয়। কল্পনা করিলাম, ওই সমাধিই মীরার সমাধি। চন্দ্রনাথ বা হীরুর সমাধি আমি কল্পনা করিতে পারি না। তাহাদের অন্তিম কল্পনা করিতে গেলেই মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে—চিতা, সেই পঞ্চকোটের শালবনটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

মন্বন্তর

উৎসর্গ

বন্ধুবর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

পরম প্রীতিভাজনেষু

এক

বিংশ শতাব্দীর বিয়াল্লিশ বছর পার হতে চলেছে ; পৃথিবীর কথা না তোলাই ভাল, এই বাংলাদেশেই কত না পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু একশ বছর আগে চক্রবর্তীরা জীবনদ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে কুস্তির আখড়াফেরত পালোয়ানের মত গায়ের ধুলোকাদা ধুয়ে, কানে আতর মাখানো তুলো গুঁজে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে, সেই যে জীবনদ্বন্দ্ব শেষ করে ঘরে কপাট বন্ধ করে শুয়েছে—আর বাইরে বের হয় নি। বাইরের হাওয়া ঘরে ঢোকে নি, ওরাও বেরিয়ে সে হাওয়া গায়ে লাগায় নি। ফলে আজও তারা সেই মধ্যযুগের মানুষ। কুস্তির চর্চার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটা পরিত্যাগ করে শুধু বাদামের শরবত খেলে—হয় ডিসপেপসিয়া ধরে—নয় ভুঁড়ি বাড়ে। দুটো রোগই সমান মারাত্মক, শক্তির যারা চর্চা করে তাদের পক্ষে, তেমনি ধনীর পক্ষেও মারাত্মক—ধনার্জনের সকল কর্ম পরিত্যাগ করে—সম্পদ-সম্ভোগ ধর্ম। এতে শুধু দোনলা চৌবাচ্চার জল আগমের নল বন্ধ করে নিগমের নলটা খুলে দেওয়ার বিয়োগান্ত ফলের মত শুধু ফলই শূন্য দাঁড়ায় না—চৌবাচ্চাটাতেও ফাট ধরে, সেখানে বাসা বাঁধে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থেকে বিছে সাপ পর্যন্ত, এবং শূন্য চৌবাচ্চাটার সর্বাঙ্গ ধুলোর সঙ্গে নানা বীজাণুতেও অনুলিপ্ত হয়ে থাকে।

সুখময় চক্রবর্তী সেকালে কর্মশক্তিতে পালোয়ান ছিলেন। কলকাতা শহরে অন্তত পঞ্চাশ বিঘে জমির ওপর বস্তি গ'ড়ে ভাড়াটে প্রজার রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন, রামবাগান, সোনাগাছি অঞ্চলে ভাড়াটে বাড়িও করেছিলেন পনেরোখানা ; কাঠাদশেক জায়গার ওপর প্রকাণ্ড দোমহলা বাড়ি ; এবং ব্যাঙ্কে লক্ষ কয়েক টাকা নিয়ে জীবনে তিনিই একদা তাকিয়া ঠেস দিয়ে নবনির্মিত বৈঠকখানায় আমিরী চালে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছিলেন—ব্যাস্ করো।

এর পরও তিনি অবশ্য ঘরের মধ্যেই দু-চারটে ডন-বৈঠকের মত জুড়ি হাঁকিয়ে মিটিংয়ে যেতেন, মজলিসে যেতেন, দেশহিতকর কর্মে চাঁদা দিতেন, গঙ্গায় ময়ূরপঙ্খী চড়তেন ; কিন্তু ছেলেরা তাও বর্জন করে কেবলই খেতে আরম্ভ করলে বাদামের শরবত। চক্রবর্তীবংশ-রূপ পালোয়ানটির এই দ্বিতীয় পুরুষে প্রায় সর্বদ্বন্দ্বতিরোহিত অবস্থা। দ্বন্দ্ব যেটুকু তাকে আত্মঘাতী বলা যেতে পারে, তিন ভাই-ই স্ত্রীকে প্রহার পর্যন্ত শাসন করত, তাসপাশা খেলত, রেসে যেত, মদ্যপান করত, বাইরের বাড়িতে নিয়মিত বাঈজী আনত, আজ ঘোড়া কিনে কাল বেচে পরদিন আবার নতুন কিনত। অন্দরের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। মেয়েরা গয়না ভেঙে গয়না গড়াত, আজকের শাড়ী বডিস্ কাল বাতিল করে নতুন কিনত, আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি গিয়ে সেই সব দেখিয়ে আসত, শনি-রবিবারে থিয়েটার দেখত, বাকী কয় রাত্রি স্বামীর প্রত্যাশায় রাত্রি জেগে বসে বসে ঢুলত। মধ্যে মধ্যে নূতনত্ব কিছু আসত বৈকি ! আসত সন্তান-শোক। সূতিকা-গৃহেই এ বংশের সন্তানগুলির অধিকাংশই মারা যেত এবং এখনও যায়। তখন মেয়েরা দু-চার দিনের জন্য কাঁদত। দুঃখের মধ্যেও তখন অনুভব করত একটা অতি গোপন আরাম। চক্রবর্তীবংশের সন্তানদের অবশ্য ভাগ্য ভাল ; তাদের মুক্তি সূতিকাগৃহেই হয়। যাদের ভাগ্য মন্দ, কোনক্রমে যারা বাঁচে, তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিচর্যার কষ্টে মায়েদের জীবনের দুঃখ হয়ে উঠত এবং ওঠে দুর্বিষহ। কঙ্কালসার কুঞ্চিতলোলচর্ম শিশু অহরহ শ্বাস টানে হাঁপানির রোগীর মত। মা থাকে মুখের দিকে চেয়ে, একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, চক্রবর্তী-বংশের রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ওরই মধ্যে।

রোগ আজ এই বংশটিরই সর্বদেহে সুপ্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাদামের শরবত হজম করবার সামর্থ্যও আজ চক্রবর্তীদের নেই, বাদামও ফুরিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার আর অবশিষ্ট কিছুই নেই, পঞ্চাশ বিঘে বস্তি জমির ওপর বহু জনের পাকা বাড়ি উঠেছে, রামবাগান সোনাগাছির বাড়ির মালিকানা অনেক দিন গেছে, দশ কাঠার ওপর পাকা দোমহলা বাড়িটায় অন্ততঃ পঁচিশটে বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে,—বৎসরে বৎসরে তাদের কাটা হয়—কিন্তু আবার গজায়, অর্থাৎ কাণ্ডে বৃহৎ না হলেও তাদের মূল-জাল বাড়িটার পাঁজরায় পাঁজরায় বিস্তৃতি লাভ করেছে; ঝড়ের বেগে বাতাস বইলে গভীর রাত্রে মনে হয়—কারা যেন শিস্ দিচ্ছে।

দ্বিতীয় পুরুষে—চক্রবর্তীরা তিন ভাই, সুখময় চক্রবর্তীর তিন ছেলে। তিনজনের মধ্যে মেজভাই মাত্র জীবিত। মেজবাবুর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি—এককালে রূপবান পুরুষ ছিলেন, এখন তাঁর মুখের এক দিকে প্যারালিসিস্—দাঁত অনেকদিন পড়ে গেছে, দেহটা বসে-যাওয়া বাড়ির মত বিকৃত হয়ে গেছে কোন রোগে, আজও তিনি বেঁচে আছেন। সে-আমলে থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন—বক্তৃতার ঢঙে কথা বলেন; হাতে একবোঝা মাদুলী—নীলা-পলা-গোমেধ-লোহা-তামা। অহরহ দেবতাকে ডাকেন, কোন্ অপরাধ করলাম দেবাদিদেব, আশুতোষ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গাল দেন—অধর্মে পাপে ছেয়ে গেছে সব। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন—আসছেন, সমস্ত ধ্বংস করবার জন্যে তিনি আসছেন। ভগবান নিজে বলেছেন,—সম্ভবামি যুগে যুগে। এখন নিত্যনিয়মিত একখানা বহু পুরনো রেশমের নামাবলী গায়ে দিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, গীতা পড়েন, চণ্ডী পড়েন; সপ্তাহে একদিন করে পুরোহিতের মুখে শোনেন—আপদুদ্ধার মন্ত্র। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে অথবা দুরন্ত গরমে বাতাস না পেয়ে ষাট বছর বয়স্কা স্ত্রীকে কোনদিন পাখার বাড়ি মারেন—কোন-দিন ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের করে দেন। ষাট বছরের মেজগিন্নীর কাছে এ এতটুকু অন্যায়ও নয়—অপমানও নয়, অচঞ্চল মানসিকতার মধ্যেই বাতরোগাক্রান্ত পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি বিস্তীর্ণ বাড়িটার একটা কোণ খুঁজে নিয়ে শুয়ে পড়েন। ভোরে উঠে বিকৃত উচ্চারণে দেবতার স্তব আবৃত্তি করেন—যার অর্থ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, তবু তার মধ্যে আছে একটি আকূতি—সে আকূতির মূল প্রেরণা প্রার্থনা—ভগবান, মঙ্গল কর, অভাব ঘুচিয়ে দাও। তারপর আরম্ভ করেন স্বামীর সেবা। গরম জল, মাজন, জিভ-ছোলা, ওষুধের শিশি, আফিংয়ের কৌটো সাজিয়ে রাখেন; চা করেন; স্নানের সময় প্রায়-উলঙ্গ স্বামীকে তেল মাখিয়ে দেন। মেজবাবু খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যান কাজে, তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন। মেজবাবু আগে নিজে গাড়ি কিনতেন, এখন কে গাড়ি কিনবে তারই খোঁজ করে ফেরেন; গাড়ির দালালী করেন মেজবাবু। সে আমলের আর আছেন বিধবা ছোটগিন্নী—মেদবহুল দেহ, বধির, শুচিবাইগ্রস্ত, জীবনে শুধু আপনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ঘোরা-ফেরা।

দ্বিতীয় পুরুষের তিন ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি—সাতটি ছেলে, চারটি মেয়ে। দ্বিতীয় পুরুষের মেজবাবুর অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই তৃতীয় পুরুষের কালই এখন চলেছে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে। ছেলেদের বউ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়েই এখন বর্তমান সংসার। বর্তমানের রূপ অতীতের চেয়েও গতিহীন—দ্বন্দ্বহীন; বংশের প্রৌঢ়ত্ব তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণ হয়ে চতুর্থ পুরুষের বার্ধক্যের জীর্ণতা ক্রমশঃ রূপ পরিগ্রহ করছে। তৃতীয় পুরুষের সাত ভাই ও চার বোনের মধ্যে পাঁচজন পাগল; বাকী কয়েকজনের জীবনের গতি—পাওনাদারের ভয়ে—

খিড়কীর পথে, আঁকা-বাঁকা গলির মধ্য দিয়ে সরীসৃপের মত ; দিনে তাদের কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না, প্রতিশোধে সন্ধ্যার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বাধে। আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের পৃথিবীর সকল ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে—অপূর্ব শক্তি এবং গুণসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করবার জন্য নিষ্করুণ শাসনের এতটুকু শিথিলতা নেই। আদরেরও সীমা নেই। ফলে একটি আঠারো বৎসরের যুবা কোন রকমে শিশু হয়ে বেঁচে আছে। একটি এগারো বছরের মেয়ে ফাঁক পেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়—আমায় একটা পয়সা দিন না ! আমার বাবার বড় অসুখ !—ফেরে সে রাত্রি দশটায়, সমস্ত পাড়াটা তার উচ্চকণ্ঠের গান শুনে জানতে পারে—দশটা বাজল।

ওরই মধ্যে কেমন করে যে বড়ছেলের বড়ছেলে সবল সহজ হয়ে উঠেছে, সে কথা এক রহস্য। এম্. এস্-সি পড়ছে। নিয়মিত কলেজে যায়, একবেলা প্রাইভেট ট্যুইশনি করে—পৃথিবীর বুকে গতি তার অসঙ্কুচিত। শুধু বাড়ির মধ্যে এলেই সে কেমন বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে ওঠে। ভয় হয়, বাড়িটার সংক্রামকতা তাকে আক্রমণ করবে। তাই সে অধিকাংশ সময় বাইরে কাটায়। রাত্রে মেজবাবুর চীৎকার শুনে, নিদ্রাহীন পাগলদের অশ্রান্ত পদধ্বনি শুনে—বিছানায় শুয়ে সে কাঁদে। এ থেকে তারও যে পরিত্রাণ নেই। তার রক্তের মধ্যেও যে সে বিষ আছে। ওই উন্মাদ রোগ, বধিরতা ব্যাধি, এ বংশের শিশুমৃত্যু, ভাগ্যক্রমে জীবিত শিশুদের গায়ের চামড়ার কুঞ্চিত শিথিলতা, নিঃশ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দে যে রোগের বিষয়ে অভিব্যক্তি—সে বিষ যে তার রক্তেও আছে ! তার পিতৃবন্ধু ডাক্তারটির কথা যে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, কেন সে এ বংশের মধ্যে এমন ব্যতিক্রম হল ? না হলে ওই স্থূলবুদ্ধি বিষাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত, ভয় অনুশোচনা কোনটাই তাকে এমন পীড়িত করতে পারত না ! আবার পরক্ষণেই ভাবে—মানুষের মধ্যে মন্দের চেয়ে যে ভাল বেশী—তাই এ বংশের অর্জিত সকল মন্দ সকল বিষকে অতিক্রম করে সে এমন হয়েছে। সমস্ত সংসারটির উপর মমতায় তার মন ভরে ওঠে। বাপ-খুড়ো, মা-খুড়ী, ভাই-বোনদের দিকে সে প্রসন্ন প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। এ যেন রূপের হাট ; তাদের বংশের মত এমন রূপ, এত রূপ সত্যিই বিরল। এদের সবার ভার তার উপর। এই কথাটা তার বেশী করে মনে হয়, যখন মায়ের সঙ্গে একান্তে বসে সে কথা কয়। সোনার মূর্তির মত রূপ তার মায়ের। হাতে দু-গাছি শাঁখা ছাড়া কোন আভরণ নেই। পরনে পুরনো মূল্যবান শাড়ী, জীর্ণ হয়েছে—তবু অতি নিপুণ যত্নে নিখুঁত রেখে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কানাই অবশ্য আশ্চর্য হয় না, কারণ তার মায়ের শৈশব ও বাল্যকালের শিক্ষার কথাটাই তার কাছে বড় কথা, তার জীবনে সকল পরিচয়ের মধ্যে ওইটিই একমাত্র গৌরবের বিষয় ; তার মা গরীবের ঘরের মেয়ে ; কোন কালে কোন পুরুষে কেউ ধনী ছিল না। আজও তাদের বাড়ির মধ্যে তার ঠাকুমা—অর্থাৎ মেজগিন্নী ছোটগিন্নী থেকে আরম্ভ করে তার খুড়ীমা সম্প্রদায় তাঁর মিতব্যয়িতার নিষ্ঠা ও মাত্রা দেখে গোপনে এবং প্রকাশ্যে বিত্তহীনবংশের সঙ্কুচিত এবং লুব্ধচিত্ততার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে থাকেন। কানাই ব্যঙ্গভরে হাসে ; পৃথিবীতে খেতে যারা পায় না, তাদের খাবার আকাঙ্ক্ষা, এমন কি লোভও অপরাধ নয়, কারণ সে আকাঙ্ক্ষা তো তাদের ক্ষুধার দাবী ! সে দাবী অতিমাত্রায় ব্যগ্র এবং ভীরু, এই পর্যন্ত। অসমর্থ দাবী মানুষ উপেক্ষা করে এও সহ্য হয়, কিন্তু ঘৃণা করে ব্যঙ্গ করে কি বলে ? অথচ তোমরা যারা ব্যঙ্গ করছ—তোমাদের যে খেয়ে আশ মেটে না ! আয়োজনের প্রাচুর্যে তোমাদের আহার্য যে পুষ্টির প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে, অস্বীকার করে—একমাত্র

আস্বাদের বিলাসবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তোমরা যে বহু এবং প্রচুর আয়োজনের একটু একটু চেখে বাকীটা ফেলে দিয়ে অপচয়ের দম্ভকে নিরাসক্তি বলে জাহির কর—সে যে অমার্জনীয়। শুধু অমার্জনীয় নয়, ভোজনবিলাসের ফলে দেহের পেশীকে মেদে পরিণত করে যে হাস্যকর রূপ তোমাদের হয়—সে যে কত কুৎসিত, কত ঘৃণাই, সে কি আয়নায় দেখেও তোমাদের উপলব্ধি হয় না? তার মায়ের দাবীর ভীরুতায় সে লজ্জা পায় না এমন নয়, তবে তার মা তাঁর বংশধারা থেকে কোন বিষ তার রক্তে সঞ্চারিত করে দেন নি, এইটেই তার কাছে মায়ের সবচেয়ে বড় দাবী। ঘৃণা করে সে মাতামহকে। রত্নগর্ভ বলে সমুদ্রের লোনা জলের মধ্যে তিনি বিসর্জন দিয়ে গেছেন সোনার প্রতিমা।

আরও একজনকে সে ভক্তি করে—তাঁর জন্যে কানাইয়ের চোখে জল আসে। সে তার প্রপিতামহী, ওই মেজকর্তার মা, এ বংশের প্রথম ধনী স্বনামধন্য সুখময় চক্রবর্তীর স্ত্রী। নব্বুই বৎসর বয়স—অন্ধ, বধির, একতাল জীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত আজও পড়ে আছেন; ওই মেজকর্তাই তাঁর নাম দিয়েছে 'নিকষা'—রাবণের মা নিকষা। সমস্ত বংশটাকে বিলুপ্ত হতে না দেখে ও যাবে না। অন্ততঃ মেজকর্তা প্রতিটি প্রভাতে মাকে জীবিত দেখে—নিজের আশেপাশে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পান—তাঁর মনের ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় যে, অন্ততঃ আরও একটি সন্তান-শোকের প্রতীক্ষাতেই—নিকষার মৃত্যু হচ্ছে না। বৃদ্ধার নামে সুখময় চক্রবর্তী সামান্য কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন, মেজকর্তা জীবিত থাকতে বৃদ্ধা মরলে সে সম্পত্তি একমাত্র জীবিত পুত্র হিসেবে তিনিই একক পাবেন। এইজন্য মেজকর্তার অধীরতার মাত্রা দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে চলেছে।

বাড়ির অপর সকলে কামনা করে মেজকর্তার মৃত্যু,—মেজকর্তার একমাত্র পুত্র মণিলাল চক্রবর্তী, কানাইয়ের মণিকাকা পর্যন্ত। কারণ, মেজকর্তার মৃত্যু হলে যেটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে—অন্ততঃ সেটুকুই সদ্য তার হাতে আসে। তাছাড়া মেজকর্তা যদি মায়ের পরমায়ু পান—তবে—! সে-কথা ভেবে মনে মনে মণিলাল এমন বিরক্ত হয়ে ওঠে যে সেদিন মণিলালের ছেলেগুলির দুর্ভোগের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। নিজের ইচ্ছে হয় মাথা ঠুকতে কিন্তু মাথা ঠোকার অবশ্যম্ভাবী বেদনাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সচেতনতার জন্য মাথা ঠুকতে পারে না মণিলাল; না পেরে, ছেলেদের চীৎকারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরই মাথাগুলো দেওয়ালে ঠুকে দেয়।

মেজকর্তা ও শাসনে খুশী হয়ে ঘর থেকেই বলেন—ঠিক হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে। ছত্রিশ কোটি যদুবংশ, শয়তানের দল, এ না হলে সায়েস্তা হবার নয়।

ভোরবেলায় উঠে কানাই দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের মহলটার খোলা ছাদে। এই খোলা ছাদটা এককালে এ-বাড়ির বিলাস মজলিসের স্থান ছিল। কাজেকর্মে এই ছাদটার ওপর হোগলার মেরাপ বেঁধে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হত। এখন ছাদটায় ফাট ধরেছে, স্থানে স্থানে খোয়া উঠে গর্তও হয়েছে; পাশের আলসের পলেস্তারা অধিকাংশই খসে গেছে। ছাদটার দক্ষিণ দিকে তেতলা অন্দরমহল, অন্দরের বারান্দার ঝিলিমিলিগুলো ভেঙেচে, কয়েকটা দরজা-জানালার কব্জা খসেছে; একেবারে পশ্চিম দিকে তিনটে তলার তিন থাক বাথরুম। ছাদের উপর ময়লা জলের প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কটা জীর্ণ, পাইপগুলোও রঙের অভাবে মরচে ধরে মধ্যে মধ্যে জীর্ণ হয়ে গেছে। ট্যাঙ্কটার পাশেই একটি সতেজ বটের চারা প্রায় তিন ফিট লম্বা হয়ে উঠেছে, তার মূল শিকড়টা প্রবেশ করেছে একটা ফাটলের মধ্যে, এবং দশ-বারোটা সরু লম্বা শিকড় ঝুলে দুরন্তবৃদ্ধিতে বেড়ে চলেছে মাটির মুখে; সকালের

বাতাসে সেগুলি দুলছিল একগুচ্ছ নাগপাশের মত। কানাই এবং তার মা ছাড়া বাড়ির আর কেউ এখনও ওঠে নি, বাইরের মহলের একতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, সেখানে থাকে দুজন ট্রাম-কণ্ডাক্টর, জনকয়েক খবরের কাগজের হকার। তারা সব এর মধ্যেই বেরিয়ে চলে গেছে। তার মা অন্দরমহলে নিজেদের অংশটায় ঝিয়ের কাজ করছেন। অন্য অংশীদারদের এখনও ঝি না হলে চলে না, তাদের ঝি নিত্যনূতন, আজ আসে, কাল মাইনে চাইলে কালই কোন অজুহাতে ঝগড়া করে তাকে গলায় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। আবার নূতন আসে। ঝিগুলি অবশ্য উঠেছে। তাদের তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে কলের জলের জন্য। নীচে কলতলায় কুঁজো বালতী রেখে তারা ভাবী দিনমানটা উপভোগের জন্য কলহের ভূমিকা রচনা করছে। উপরে দোতলা তেতলার ছাদের কিনারায় সারিবন্দী বসে ঘুরছে-ফিরছে, উড়ছে-বসছে একপাল পায়রা। পূর্বকালে ওদের পূর্বপুরুষেরা ছিল শখের সামগ্রী—নানা অভিজাত সম্প্রদায়ের খাঁটি চেহারা এবং খাঁটি রক্ত নিয়ে তারা এসেছিল এ বাড়ির মালিকদের অনেক টাকার বিনিময়ে। আজ তারা বন্য এবং অবাধ সংমিশ্রণের ফলে এক অভিনব বিচিত্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। মালিকের সঙ্গে সম্বন্ধ এখন অতি ক্ষীণ; আপনাদের আহার তারা এখন প্রায় আপনারাই সংগ্রহ করে; তবে ছোট ছেলেদের হাতে খাবার বাটি দেখলে ওদের মধ্যে পুরনো অসমসাহসীরা ঝাঁপ দিয়ে এসে মাথায় কাঁধে বসে খাবার কেড়ে খায়, আহার্যের মধ্যে কোন দানা-সামগ্রী রৌদ্রে দিলে তার ওপরেও অভিযান করে; চক্রবর্তী-বাড়ির মাংসলোলুপ ছেলেমেয়েরাও রাত্রে চেয়ারের উপর টুল রেখে তার ওপর চেপে বাসা থেকে দু-একটা পেড়ে নিয়ে ঝোল রান্না করে থাকে। মেজকর্তা এখনও দিনে মুঠো দুই ক্ষুদ ছড়িয়ে দিয়ে ওদের খাইয়ে থাকেন। তারা ঝগড়া করলে তিরস্কার করেন—কঠিন তিরস্কার। কেউ কারও কেড়ে খেলে—যে কেড়ে খায়, তাকে কঠিনস্বরে বলেন—ইউ শূয়ারকি বাচ্চা! —হত্যা করা পায়রার পালক দেখে তিনি প্রশ্ন করলে অপরাধ বেড়ালের উপর চালানো হয়, তিনি বেড়ালকে গালিগালাজ করতে করতে কানে সুড়সুড়ি দেবার উপযুক্ত ভাল পালকগুলি সংগ্রহ করে সযত্নে রেখে দেন ভাঙা ড্রয়ারে।

বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা বস্তি। নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যারা বিত্তহীন হয়ে এখন আসলে দরিদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথচ তাদের জীবনের রীতি-নীতি গ্রহণ করতে লজ্জা অনুভব করে এবং দেহে-মনেও পীড়িত হয়—তাদেরই বস্তি। খোলার বাড়ি, টিনের বাড়ি, বস্তির সকল প্রকার বঞ্চনা এবং অসুবিধা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তবু তারা ওরই মধ্যে ভদ্রতা বজায় রেখে কোন রকমে জীবন যাপন করে। কলহ-কচকচিতে তারা বিরক্ত হয়, প্রায় চারিদিকে—দরজায়, জানালায় জীর্ণ পর্দা টাঙায়; দোতলা কোঠাগুলির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় চট অথবা পুরনো ছেঁড়া চিকের আড়াল দিয়ে ঘিরে রাখে। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে বাড়িতে পর্দাগুলি জীর্ণ নয়, অতিমাত্রায় বাহারে রঙের সতেজ ঝকমকানিতে সেটা বোঝা যায়; ওই বাড়িগুলিতে অন্যবিধ সাচ্ছল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, লম্বা দড়ির আলনায় ঝুলে থাকে শুকুতে দেওয়া অপকৃষ্ট রুচির রঙ-বেরঙের শাড়ী-শেমিজ, সায়া-ব্লাউজ, কামিজ-ফ্রক প্রভৃতি। ওই বস্তিটার যত কিছু গোলমাল হৈ-হৈ সব ওই বাড়ি ক'টি থেকেই উত্থিত হয়। ওরা পূর্বে ছিল দরিদ্র, এখনও কর্মজীবনে শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত, কিন্তু ধীরে ধীরে ওরা নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীতে অভিযান আরম্ভ করেছে। ওদের বাড়ি হতেই সিগারেটের গন্ধ উঠে ছোট পাড়াটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইলসে মাছ এবং মাংস রান্নার গন্ধ ওঠে, রাত্রি দশটা-এগারটার সময় পুরুষদের মত্ত কণ্ঠের আস্ফালন শোনা যায়। ভোরবেলাতেই ওদের বাড়ির পুরুষগুলি হাফপ্যাণ্ট, খাকি

কামিজ, নূতন ফ্যাশানের মাত্র গোড়ালি ঢাকা মোজা প'রে খাবারের কৌটো হাতে কারখানায় ছুটছে। কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে। ওদের বাড়িতে জীবনযাত্রা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে, এবং শুরু হয়েছে নিম্নরুচির নৃত্যগীতমুখর ছায়াচিত্রের ঢঙে ও তালে। ওদের বাড়ির কতকগুলি ছেলে-মেয়ে এরই মধ্যে সিনেমার গান শুরু করে দিয়েছে—"এই কি গো শেষ দান", "আমি বনফুল গো"। তারস্বরে কোরাস্ গান। শুধু কোরাসেই নয়, ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত এ-বাড়িতে আরম্ভ হলেই অমনই ও-বাড়তিও আর একজন ধরে দেয়—"এই কি গো শেষ দান ?" একটা বাড়িতে একটা পুরনো গ্রামোফোনে গান শুরু হয়ে গেছে। বিকৃত সাউণ্ডবক্সের মধ্যে মনে হয় ভাঙা ধরাগলা কোন গায়কের গান। এই গান চলবে প্রায় সারা দিন, বিশেষ করে ও-পাশের নতুন বাড়িটায় রেডিও যতক্ষণ চলবে—ততক্ষণ তো চলবেই। সম্পদের প্রতিযোগিতার ঐ এক অভিনব বিকাশ।

অন্য বাড়িগুলি বিত্তহীনতার দৈন্যে নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত। মানুষগুলি মনের বিষণ্ণতা, দেহের অবসন্নতা সম্ভ্রমপূর্ণ গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশের আবরণে ঢেকে প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষেরা জেগেছে অনেকক্ষণ ; চিক ও পর্দার আড়ালে ঘুরছে ফিরছে—ধীর অর্থাৎ ক্লান্ত দুর্বল পদক্ষেপে। একটা বাড়িতে একটি শীর্ণ শিশু অশান্ত স্বরে প্রাণফাটানো চীৎকারে কেঁদেই চলেছে। বাড়িগুলোতে বাসনের শব্দ উঠছে, তাও অত্যন্ত মৃদু। একটি দোতলার বারান্দায় একজন ভদ্রলোক লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বিড়ি টানছে। অনাবৃত উঠানে যে মেয়েগুলি কাজকর্ম করছে তাদের অধিকাংশ শীর্ণ, রূপ এবং শ্রী এককালে ছিল—কিন্তু বিশীর্ণ পাণ্ডুরতায় সে রূপশ্রী অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ। এমনি একটি বাড়ির একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে অত্যন্ত শান্ত পদবিক্ষেপে মাটির দিকে চোখ চেয়ে একটি ছোট্ট ডালি হাতে বেরিয়ে এল রাস্তায় ; সে যাবে পুজোর ফুল তুলতে অদূরের বাগানওয়ালা বাড়িতে। মেয়েটি দেখতে কালো, মাথায় খাটো, পরনে ময়লা ব্লাউজ, ময়লা শাড়ী। কালো হ'লেও মুখশ্রীটি বেশ, সবচেয়ে ভাল মেয়েটির চুল—ঘন কালো একপিঠ চুল—একরাশ বললেই যেন ঠিক বলা হয়। কানাই ওকে ভাল করেই চেনে ; অনেক দিন থেকেই ওরা এখানে আছে। কানাইয়ের বোন উমার খেলার সঙ্গিনী, এখন সখী, প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসে ; বড় ভাল মেয়ে, মেয়েটির নাম গীতা। সে সস্নেহে ডাকলে—ফুল তুলতে যাচ্ছ ?

গীতা সলজ্জভাবে মুখ তুলে শুধু একটু হাসলে।

আকাশের কোন্ কোণে এরোপ্লেনের শব্দ উঠছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে। শব্দ শুনে দিক ঠিক ঠাওর করা যায় না। অনেক সময় যেদিকে শব্দ ওঠে, ঠিক তার বিপরীত দিকে হয়তো প্লেন ওড়ে। কানাই আকাশের দিকে তাকাল। চারিদিক সন্ধান করেও আকাশচারী যন্ত্র-শ্যেনকে দেখা গেল না। মুখ নামিয়ে কানাই দেখলে গীতা তখনও তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে—এরোপ্লেনটা দেখা গেল না।—বলেই সে নতমুখে আবার চলতে আরম্ভ করলে।

মা এসে দাঁড়ালেন ভিতর মহলের দরজার মুখে—কানু, চা হয়েছে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বললে—যাই।

চা খেয়েই সে ছাত্র পড়াতে বের হবে।

মা চলে গেলেন না, কানাইয়ের অতি নিকটে এসে মৃদুস্বরে বললেন—মাইনের টাকাটা কি ওঁরা এখন দেবেন না ?

কানাই এবার ফিরে চাইলে মায়ের দিকে ; মা মাথা নীচু করে বললেন—ভাঁড়ারের

জিনিস সব ফুরিয়েছে বাবা!

দুই

রাস্তার চিনির আর কেরোসিনের কণ্ট্রোলের দোকানে এরই মধ্যে সারিবন্দী লোক দাঁড়িয়ে গেছে। বাজারে এখন চিনি এবং কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে; জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিনি আসা বন্ধ হয়েছে। ব্রহ্মদেশ জাপানীদের হাতে; ওখানকার কেরোসিনের উৎসমুখ এদেশের পক্ষে বন্ধ। ময়দাও অমিল হয়ে আসছে। রোজ দাম বেড়ে চলেছে—দু আনা থেকে তিন আনা—তিন আনা থেকে চার—পাঁচ—ছয়, প্রায় লাফে লাফে। কাপড়ের বাজার আগুনের মত উত্তপ্ত। পুজোর আগেই ধুতি পৌঁছেছিল ছ টাকায়—শাড়ী সাত টাকায়: তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বরে বাজার-দর কানাই ঠিক জানে না, তবে আট-নয়ের কম নয়, একথা নিশ্চিত। এবার জানতে হয়েছে। পুজোর সময় নিজের জামাকাপড় কেনা হয় নি। মাকে, এবং তাঁর মুখ চেয়ে ব্যাধিগ্রস্ত ভাইবোনদের কাপড় কিনতেই ট্যুইশনির দু'মাসের জমানো টাকা ফুরিয়ে গেছে। বাপ চেয়েছিলেন দুটো গেঞ্জি, বলেছিলেন—দিবি তো ভাল দিস্। কম দামী আনিস নে যেন।—সাধারণ জিনিস আজও তাঁর পছন্দ হয় না। পূর্বের অপচয়ের মধ্যে থেকে যেগুলো কোনক্রমে সঞ্চয়ের মধ্যে জমা ছিল, আজকাল তাঁর তাই ভেঙে চলছে। এই ব্যয়ের জন্য তার আপসোস হয়, ক্ষোভ হয়; কিন্তু যখন রঙীন সাজপোশাকপরা ভাইবোনগুলির ছবি মনে পড়ে, তখন মন সান্ত্বনায় ভরে ওঠে। সুন্দর ভাইবোনগুলি আরও কত সুন্দর হয়ে উঠেছিল। চক্রবর্তী-বংশ আজ সকল সম্পদে দেউলে হয়ে এসেছে, কিন্তু অর্থ-কৌলীন্যের সম্মানের দাবীতে এবং শক্তিতে স্বজাতীয়া কুমারীকুল থেকে ফুল বাছাই করে পদ্ম ফুল সংগ্রহ করার মত বাছাই করে বাড়িতে এনেছিলেন—শ্রেষ্ঠ রূপ। বিজ্ঞানসম্মত জীববিদ্যার বংশগতি-বিধান-বিজ্ঞানে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও, সে বিজ্ঞানের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নি; এ বংশের ছেলেমেয়েরা জন্মায় শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর মত রূপ নিয়ে। তাই বিশেষ করে অপরূপ রূপবতী বোনগুলির দিকে তাকিয়ে সময়ে সময়ে কানাইয়ের চোখে জল আসে। ওই রূপ-লাবণ্যের অন্তরালে রক্তধারার মধ্যে বংশগত বিষ জীর্ণ ঘরে সাপের মত বাসা বেঁধে রয়েছে। তার বিষ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একদা শোণিতকণার সকল সুস্থ পবিত্র শক্তিকে জর্জর করে তুলবে। ওই অপরূপ রূপলাবণ্য এবং সুস্থ পবিত্র স্নায়ু শোণিতের সমন্বয়ে ওরা মর্ত্যে স্বর্গ রচনা করতে পারত, কিন্তু তার পরিবর্তে পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠীকে বিষাক্ত করে তুলবে।

পাশেই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা এক প্রাসাদতুল্য বাড়ি—প্রাচীন এবং জীর্ণ। কয়েক পুরুষের মধ্যে বাড়িটা বহুভাগে বিভক্ত হয়েছে; কয়েকজনের ভাগে আজ মারোয়াড়ী এসে বাসা বেঁধেছে। যারা আছে—তাদেরও অবস্থা ওই চক্রবর্তীদের বংশের মত। ওদের রক্তধারায় হয়তো বিষ আছে। পৃথিবীর প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর মধ্যে ওই একই নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে।

কম্পাউণ্ডের সামনের দিকে—রাস্তার গায়েই একটি এ-এফ-এস্-এর আড্ডা হয়েছে। নীলরঙের ইউনিফর্ম পরে, লম্বা হোস-পাইপের বোঝা নিয়ে ওরা মহড়া দিচ্ছে। এ রাস্তাটা

যেখানে গিয়ে কলকাতার অন্যতম প্রধান রাস্তায় পড়েছে, সেখানে সারবন্দী চলেছে মিলিটারী লরী ; খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় লাল টুপি, হাতে লাল অক্ষরে এম. পি. লেখা কালো ব্যাজ বেঁধে মিলিটারী পুলিস—ট্র্যাফিক বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ এবং হল্‌দে রঙে চিত্র-বিচিত্র করা নানা আকারের লরি ; তার মধ্যে বহু রকমের সরঞ্জাম ; জ্বালানি কাঠ থেকে মেসিনগান, হাল্কা আকারের দু-চারখানা ট্যাঙ্ক পর্যন্ত। ওরই মধ্য দিয়ে পথ করে চলে গেল আর-এ-এফ-এর একখানা প্রকাণ্ড এবং অতি সুদৃশ্য বাস্‌। পাশ দিয়ে দুরন্ত গতিতে প্রচণ্ড শব্দ করে মোটরবাইকে দৌত্য বহন করে চলেছে—মাথায় লোহার বাটির মত হেল্‌মেট্‌, চোখে গগল্‌সের স্বলাভিষিক্ত গাটাপার্চার চক্ষু-আবরণী। মাথার ওপর অতি প্রচণ্ড শব্দ করে উড়ে গেল চারটে ভি-এর আকারে এক ঝাঁক এরোপ্লেন। মিলিটারী লরিগুলোর সারির মধ্য দিয়েই কৌশলে কোন রকমে পথ করে এসে পৌছল দুখানা শহরতলীর বাস্‌—আকণ্ঠ বোঝাই যাত্রী। পিছনের বাম্পারে দাঁড়িয়ে ছিল জনপাঁচেক ইউরোপীয় সৈনিক। বাস থামতেই তারা লাফিয়ে নামল। গাড়ির ভেতর থেকে যাত্রীর ঝাঁকের মধ্য থেকে নামল জনকয়েক। ভারতীয় সৈনিকও জনকতক ছিল।

অকস্মাৎ একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রচণ্ড শক্তিতে আদেশের ভঙ্গিতে কে চীৎকার করে উঠল—এ—ই রো—খ্‌-খো!

সঙ্গে সঙ্গে জনতার 'গেল' 'গেল' শব্দ।

চকিতে চোখ ফিরিয়ে কানাই দেখলে—মিলিটারী লরিগুলোর গতি স্তব্ধ হয়ে আসছে। ও-দিকের চৌমাথার এক কোণে এক কৌপীনধারী আপনার সবল বীভৎসমূর্তি দেহখানাকে টান করে পিছনের দিকে ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার যে অভিব্যক্তি তাতে মনে হয়, সে-ই যেন এই বিরাট সারিবদ্ধ যন্ত্রযানগুলোর গতিশক্তি রুদ্ধ করে কষে ব্রেক ধরে দাঁড়িয়েছে প্রাণপণ শক্তিপ্রয়োগে। এ পাড়ার জগা-পাগলা বদ্ধ উন্মাদ, পথে পথে ফেরে, ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খায়। হঠাৎ জগার এ বীরত্ব কেন? পরমুহূর্তেই জগা ছুটে গেল স্তব্ধ লরির সারির প্রথমখানার সম্মুখে। তারপরই সে মাটি থেকে টেনে তুলে কাঁধের ওপর ফেললে একটা ছেলের রক্তাক্ত আহত দেহ। লরি চাপা পড়েছে। জগাকে অনুসরণ করে জনতা ফুটপাথের ওপর হৈ-হৈ শুরু করে দিলে। এম-পির হুইস্‌ল্‌ তীব্র শব্দে বেজে উঠল। হাত আন্দোলিত করে অগ্রসর হবার ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিকবাহিনী আবার অগ্রসর হ'তে আরম্ভ করলে। এই দ্রুত ধাবমান যান্ত্রিকবাহিনীর মাঝখান দিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পিছনের দোকানের ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল—পিছন ফিরে কানাই দেখলে সাড়ে সাতটা। শীতকাল—ডিসেম্বর মাস—তার ওপর নতুন সময়—ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম! তার ছাত্র পড়াবার সময় আটটা থেকে ন'টা। যেতে হবে বউবাজার। কানাই দ্রুতপদে অগ্রসর হল ট্রাম-ডিপোর দিকে। তাকে অতিক্রম করে পাশ দিয়ে চলে গেল দুখানা সাধারণ লরি—শাকসব্জী খাদ্যদ্রব্যে বোঝাই। সাধারণ লরি হলেও চালকের অঙ্গে খাকি উর্দি, মাথায় লোহার হেল্‌মেট।

কানাইয়ের কানে তখনও বাজছিল—জগা-পাগলার প্রচণ্ড আদেশধ্বনির প্রতিধ্বনি। চোখে ভাসছিল—আকর্ণ-টানে বাঁকানো ধনুকের মত সর্বশক্তি উদ্যত-করা তার সেই পেশী-প্রকটিত বাঁকানো দেহ। ট্রামে উঠে ওই কথা ভাবতে ভাবতে সে বসল। ট্রাম ডিপোতে বন্দুকধারী সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে।

দু-পাশের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে, রঙ-বেরঙের বিজ্ঞাপন।…থিয়েটারে জলসা নৃত্যগীত। থিয়েটারে 'প্রেমের ফুল'।…থিয়েটারে 'বেনামী চিঠি'।…থিয়েটারে 'হাতের নোয়া', 'বর্তমান যুগেও হিন্দু সতীর অপূর্ব মহিমা'। অদ্ভুত এবং অপূর্ব পাগলের ভূমিকায় নটসম্রাট নগেন রায়। পাশাপাশি চারটে সিনেমা হাউসের সামনে এরই মধ্যে বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে—ফোর্থ ক্লাস ফুল, থার্ড ক্লাস ফুল ; একটাতে ঝুলেছে—হাউস ফুল। আজ শনিবার। চোখের ওপর এবার ভেসে উঠল—দুটোর পরের ফুটপাথগুলোর দৃশ্য ; ট্রাম বাস, বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়। অদ্ভুত! তাদের বাড়ির সামনের ওই বস্তিটাই যেন গোটা কলকাতায় প্রসারিত হয়ে পড়েছে। কানাই একটু হাসলে। ঠিক তার পিছনে বসে দুটি প্রৌঢ় জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফল নিয়ে আলোচনা করছেন।

—এসব আমাদের জন্মান্তরের পাপের ফল। কলিতে একপোয়া ধর্ম, তাও শেষ হয়ে আসছে।

অন্যজন বললেন—চেতাবনী পড়েছেন ? এই শ্রাবণেই নাকি—

প্রথমজন তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—নাকি নয়, ওতে আর সন্দেহ নেই। এবারকার সাইক্লোন তার ভূমিকা। তুমি দেখে নিয়ো—মেদিনীপুরে যেমন হয়েছে, তাই হবে—শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প—যাকে বলে প্রলয়।

সামনের বেঞ্চে দু'টি মধ্যবয়সী তরুণ আলোচনা করছে রাজনীতি—Dear Sir John বলে চিঠি ঠুকেছেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদকে বলেছেন—শেরের বাচ্চা শের।

মেদিনীপুর! বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্ত মেদিনীপুর রাজরোষে প্রচণ্ড শক্তির পেষণে যখন পিষ্ট হচ্ছিল, তখনই অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত জলোচ্ছ্বাস এসে সমস্ত জেলাটা বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে গেছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ পশু ভেসে গেছে। লক্ষ লক্ষ শবদেহে শ্মশান হয়ে গেছে মেদিনীপুর। বাইরের দিকে তাকিয়ে এবার তার চোখে পড়ল—মেদিনীপুরের সাহায্যকল্পে—জলসা নৃত্যগীত ; মেয়র সাহায্য-ভাণ্ডার—বিজ্ঞাপনগুলো আজও বিবর্ণ হয়ে যায় নি। কাল খবরের কাগজে বেরিয়েছে—মার্শাল চিয়াং কাইশেক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ডে। আজ মাইনে পেলে সে পাঁচ টাকা অন্ততঃ পাঠিয়ে দেবে—মেয়র সাহায্য-ভাণ্ডারে অথবা আনন্দবাজার সাহায্য-ভাণ্ডারে।

গাড়িটা একটা ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়াল। একটা রিক্সাওয়ালা অসম-সাহসের সঙ্গে ট্রামখানার সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেল। স্থান-কালের সামান্য ব্যবধানের জন্য বেঁচে গেছে। ড্রাইভার গাল দিয়ে উঠল। রিক্সাওয়ালাটা মুখ ভেঙিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। রাস্তার একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে কানাই শিউরে উঠল। এদিকে শিবনারায়ণ দাসের গলি, ওদিকে সিমলা স্ট্রীট, সামনে আর্যসমাজ মন্দির। গত আগস্ট মাসে—ওইখানে— ; চোখের সামনে ভেসে উঠল রক্তাক্ত স্থানটা। কানাইয়ের চোখের উপরেই ঘটনাটা ঘটেছিল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে—উঃ, কি সময়ই গেছে! সে কথা, সেই ছবি মনে করে তার শরীর শিউরে উঠল। জানি না, কি কারণে তার মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠল—মিল্টনের বাণী—

"Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to my conscience."

দূরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে পুলিস-লরি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাইড-কার সমেত একটা

মোটরবাইকে দুজন সার্জেন্ট টহলদারীতে দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে উত্তরমুখে চলে গেল।

—উঠুন মশাই। লেডিস্ সিট। লেডি। শুনছেন?

কানাই এবার চমকে উঠে পিছনদিকে হাত দিয়ে—সিটের পিছনে আঁটা লেডিস্ লেখা প্লেটটার ওপর হাত বুলিয়ে দেখলে। অন্তমনস্কতার মধ্যে লেডিস্ সিটেই সে বসেছে।

পাশের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে কেশব সেন ষ্ট্রীটের মোড়। কিন্তু কই, মহিলা কই?

—উঠুন না মশাই!

কানাই এবার উঠে দাঁড়াল।

—আপনি?—মহিলাকণ্ঠের কথায় সে চকিত হয়ে পিছনের দিকে ফিরে দেখলে—দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলা সেন। নীলা গত বৎসর পর্যন্ত তার সঙ্গে এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছে। ছাত্রসভার উৎসাহী সভ্য ছিল নীলা। বর্তমান যুগে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসাহী সভ্য নেপী নামক ছেলেটির দিদি—নীলা।

শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি রূপবতী নয়; কিন্তু মেয়েটির চমৎকার একটি শ্রী আছে। কানাইয়ের সঙ্গে আলাপ তার যৎসামান্যই। দু-তিনবার একটা সমিতির অধিবেশনে দেখা হয়েছে মাত্র। একবার মাত্র দু'টি কথা হয়েছিল—কানাই-ই তাকে প্রশ্ন করেছিল, তার মুখে বাক্যালাপের অভিলাষের স্মিতহাস্যের আভাস দেখে—ভাল আছেন? নীলা শুধু বলেছিল—হ্যাঁ। যে হাসি আভাসে আবদ্ধ ছিল, সে হাসি প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল রাত্রির শেষ প্রহরের শিউলির মত।

—উঠলেন কেন? বসুন না।

—ধন্যবাদ। আমি এইটেতে বসছি। আপনি বরং একটু আরাম করে বসুন। কানাই ঠিক পাশের সিটটায় বসল। মাঝখানকার পথটার ব্যবধান রেখে প্রায় পাশাপাশিই বসল দুজনে। ধোয়া মিলের শাড়ীর ওপর চকোলেট রঙের গরম কোট গায়ে নীলাকে বেশ ভাল মানিয়েছে। মাথার চুল জালের ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাঁধের উপর পড়ে আছে। পাউডারের ঈষৎ আভাস মুখের শ্যামবর্ণ রঙকে চমৎকার শোভন ভাবেই উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কানাই প্রশ্ন করলে—কই, ক'দিন আপনাকে সমিতির আপিসে দেখলাম না! আমি ভেবেছিলাম, আপনি এলাহাবাদে কনফারেন্সে গেছেন।

—নাঃ। আমি যাই নি।—নীলার মুখ বেদনাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এলাহাবাদে ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে নীলার যাবার কথা ছিল। বোধ হয় অর্থাভাবে যাওয়া ঘটে ওঠে নি, অথবা সঙ্ঘ থেকে ওকে যাওয়ার অধিকার দেয় নি অর্থাৎ ওকে প্রতিনিধিরূপে নির্বাচন করা হয় নি।

কানাই তাই নীলার ভাই নেপীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কথাটা চাপা দিলে, বললে—তারপর, শ্রীমান নেপীর খবর কি?

নীলা একটু হেসে বললে—Life-এর speed তার বেড়েই চলেছে। কোনদিন বাড়ি ফেরে, কোনদিন না। কিন্তু আপনি এলাহাবাদ গেলেন না কেন? যাওয়া আপনার উচিত ছিল।

হেসে কানাই বললে—জানেন তো, "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে—", বাকিটা সে অসমাপ্তই রাখলে।

—সে কথা তো আপনি বলেন নি?—সবিস্ময়ে নীলা বললে—আপনি বলেছিলেন—কার অসুখ।

—কথাটা ঠিক মিথ্যে নয়, বাড়িতে আমাদের লোকসংখ্যা ছোটতে বড়তে অন্ততঃ তিরিশ! সর্দি হোক, নিউমোনিয়া হোক—প্রতিদিন একজনকে অসুস্থ পাওয়া যায়ই। সুতরাং কথাটা মিথ্যে নয়। তবে ওই জন্তেই যে যাওয়া অসম্ভব, সেটা সত্য নয়। কারণ যে মনোরথ হৃদয়ে উঠেই হৃদয়েই মিলিয়ে যায়, সেটা ঠিক প্রকাশের বস্তু নয়—অন্ততঃ বর্তমান সমাজে।

নীলা চুপ করে রইল। তার কথা অবশ্য সত্য। কানাই ছাত্রসমাজে ভাল বক্তা বলে পরিচিত, বাক্যধারা তার স্বত-উৎসারিত এবং বক্তব্য আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্যে অকাট্য ও তীক্ষ্ণ। বিশেষ করে কোনক্রমে তাকে আঘাত দিতে পারলে তখন ওর চেহারা পাল্টে যায়। তার বক্তব্য তখন এমন ধারালো এবং আঘাতধর্মী হয়ে ওঠে যে, প্রতিপক্ষের আর সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

—কিন্তু আপনি এত সকালে—? প্রশ্ন করতে গিয়ে কানাই মধ্যপথে আত্মসচেতন হয়ে থেমে গেল। নীলার সঙ্গে তার যেটুকু পরিচয় তাতে এ প্রশ্ন করা উচিত নয়। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল তাতেই প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, অল্প একটু হেসে নীলা উত্তর দিলে—আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি Supply Department-এ চাকরি নিয়েছি।

—চাকরি নিয়েছেন? আর পড়বেন না তা হলে?

—নাঃ। পড়ে কি হবে? কি করব?

কানাই কিছু উত্তর দিতে পারলে না। সত্যই তো, কি হবে? লেখাপড়ায় নীলার মত মাঝারি শক্তির মেয়ে এম্. এ-তে হয়তো কোন রকমে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু তাতেই বা কি ফল? বড়জোর কোন Girls' High School-এ প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হতে পারে। বেতন চল্লিশ কি পঞ্চাশ, কিন্তু খাতায় লিখতে হবে পঁচাত্তর অথবা এক শত। নীলার কোমল শ্যামশ্রীর মধ্যে মিষ্টতা আছে সত্য, কিন্তু তাতে আই-সি-এস্ অথবা বি-সি-এস যোগ্যতাসম্পন্ন কোন বাঙালী তরুণ আকৃষ্ট হবে না। সুতরাং তার এই নৈরাশ্যজনক পাঠ্য-জীবনের জের টেনে দরকার কি?

—অফিসে রাশীকৃত ফাইল জমে ম্যাট্রিকুলেশনের কোন সাবজেক্টের হেড্ একজামিনারের বাড়ির মত অবস্থা করে তুলেছে। তাই একটু ওভারটাইম খাটতে চলেছি। Most obedient and faithful servant, বুঝলেন না!—বলে এবার সে মৃদু একটু শব্দ করেই হাসলে! কানাইও হাসলে।

নীলাই আবার বললে—এখন আপনি কোথায় চলেছেন?

—ছাত্র ঠ্যাঙাতে। প্রাইভেট ট্যুইশনি আছে একটা—বউবাজারে।

—বউবাজার!—নীলা সবিস্ময়ে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে বাইরের দিকে তাকালে।

—এই মোড় ফিরেই একটু এগিয়ে গিয়ে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু জংসনের—। এ কি! এ যে ওয়েলিংটন স্কোয়ার! এটা কি ডালহৌসির ট্রাম নয়?

পিছন থেকে মৃদুস্বরে একজন সহযাত্রী বেশ একটু আদিরসাশ্রিত রসিকতা করে উঠল; কানাই পিছন দিকে মুখ ফেরালে, কিন্তু কে বক্তা তা ঠাওর করতে পারলে না, কারণ সকলের মুখেই রস-রসিকের হাসি ফুটে উঠেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখলে, নীলার শ্যামবর্ণ মুখখানা চকিতে হয়ে উঠেছে তার মায়ের নিত্য-মার্জনায় উজ্জ্বল তামার পঞ্চপাত্রখানির মত। গাড়িটা মন্থর গতিতে মোড়ের বাঁক ফিরছিল। কানাই উঠে দাঁড়াল।—এঃ, দেরি হয়ে গেল!—কথাটা

সে প্রায় আত্ম-অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললে।

—দেরি যদি হয়েছে তবে আর একটু চলুন। আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

নীলার এ অনুরোধটুকু কানাইয়ের ভাল লাগল। মনে তার একটু রঙও যেন ধরে গেল। একজন সঙ্গিনীর জন্য যদি সে একটি সকাল নষ্ট করতেই না পারে তবে সে তার আপনার জন্য পারে কি? সে বসে পড়ল; এবার সে তার সিটেরই শূন্য স্থানটাতেই বসল।

পিছনে মনে হল—নর্দমার নীল মাছির আস্তানার পাশে—গাছ থেকে খসে পড়েছে অতি সুপক্ক ফল—মাছির দল ভন্ ভন্ করে উড়ে চলেছে গন্ধের উৎস লক্ষ্য করে।

এসপ্ল্যানেডে নেমে নীলা বললে—চলুন, কফি খেয়ে আপনি ফিরবেন—আমি অফিসে যাব।

—কফি খেয়ে?—কানাইয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—তার সম্বলের কথা স্মরণ করে।

নীলা হেসে বললে—নতুন চাকরি পেয়েছি—বন্ধুবান্ধবদের বেশী খাওয়াবার তো সাধ্য নেই, বড়জোর কফি, স্যাণ্ডউইচ—এই পর্যন্ত।

এর আগে সে কখনও কফিখানায় আসে নি। ভেতরে ঢুকে তার মনে হল—বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন সাবানের রঙিন ফেনার একটুকরো ফানুষের মত এখানে ভাসছে।

তিন

প্রাইভেট ট্যুইশনি সেরে বাড়ি ফিরে কলেজ। কলেজের পর বাড়ি অথবা সমিতির অফিস। তারপর আবার চক্রবর্তী-বাড়ির বদ্ধ আবহাওয়া। এই তার জীবন। বাড়ির বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে যখন তার দম বন্ধ হয়ে আসে তখন সে অভিসম্পাত দেয় আপন বংশকে। যখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামে—রাজপথের আশেপাশে বড় বড় বাড়িগুলোকে দেখে, আর দেখে পথের ওপর নিরন্ন মানুষের মেলা—তখন তার মন অপরাধী হয়ে ওঠে আপনার বংশকে অভিসম্পাত দেওয়ার জন্য। মানুষ নিরুপায়। একা তার পূর্বপুরুষের অপরাধ কি? অহরহ একটা অস্থির জর্জরতায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে নিজে জানে, এর কারণ কি। এর কারণ নিহিত আছে তার রক্তধারার মধ্যে।

আজ কিন্তু সমস্ত দিনটা তার অনেকটা শান্তভাবে কেটে গেল। প্রাইভেট ট্যুইশনির মাইনে এনে বাড়ির বাজার করে দিয়ে চারটে টাকা সে নিজে রেখে দিল। তার মা কিন্তু এটা পছন্দ করেন না। তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আছে একটা আত্মনির্যাতনের প্রচণ্ড আবেগ। সংসারের লোকের সর্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে কষ্টভোগ করেই তাঁর আনন্দ। ওইটাই তাঁর আদর্শ। সেই আদর্শে তিনি তাঁর ছেলেকেও দীক্ষিত দেখতে চান। কানাই তাঁকে দুঃখ দিতে চায় না। আদর্শ গ্রহণ না করলেও মায়ের আদেশ সে অমান্য করে না। মা তার বলেছিলেন—চারটে টাকায় কি তোর দরকার? আমাদের সংসারে চারটে টাকার কত দাম তুই বল্!

অন্যদিন হলে কানাই টাকাটা আর চাইত না। কিন্তু আজ সে একটা অর্ধসত্য বলে টাকাটা নিজের কাছে রাখলে। বললে—কলেজে দিতে হবে।

কলেজে অবশ্য দু'টাকা লাগবে। বাকী দু'টাকা সে রেখে দিলে—নীলার আতিথ্যের প্রতিদান দেবার জন্য। কফিখানায় সেও তাকে একদিন কফি খাওয়াবে। সেটা তার উচিত। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে ওই কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শুনে সে চকিত হয়ে উঠল। কি ব্যাপার? আপনার ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে আশ্বস্ত হল, না—তাদের বাড়ীর ভেতরে নয়। গোলমাল উঠেছে রাস্তায় বস্তির সামনে। বিদেশী উচ্চারণে হিন্দীতে একটা লোক চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—মধ্যে মধ্যে ভাঙা বাংলাতেও কথা বলছে। বস্তির কোন অধিবাসীর সঙ্গে কোন বিদেশীর হাঙ্গামা বেধেছে। বিদেশীটির কথাবার্তার মধ্যে দম্ভ যেন কেটে পড়ছে। লোকটা টাকার দাবী জানাচ্ছে—ফেকো, হামারা রূপেয়া ফেকো।

তীক্ষ্ণ সরু গলায় কেউ ব্যর্থ প্রতিবাদ করছে। কি বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে একটা দুটো কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে শুধু। কণ্ঠস্বরের যেটুকু তার কানে এসে পৌঁছল—তাতেই সে বুঝলে—গীতার অর্থাৎ সেই শ্যামবর্ণা শান্ত মেয়েটির বাপের কণ্ঠস্বর। গীতার বাপের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় তার নাই, কিন্তু গীতা তার বোন উমার বন্ধু। এককালে সে তাদের বাড়ী নিয়মিত আসত উমার সঙ্গে খেলা করতে। স্কুলেও সে উমার সঙ্গে পড়েছে কিছুদিন। তখন সে মধ্যে মধ্যে তার কাছে এসে পড়া দেখিয়ে নিত। মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ শান্ত। তাদের সংসার ক্রমশঃ যত নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, মেয়েটিও তত সঙ্কুচিত শান্ত হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের পড়া ছাড়তে হয়েছে। তাদের বাড়ীতেও সে বড় একটা আসে না। যখন আসে তখন কানাই বুঝতে পারে—কোন জিনিস চাইতে এসেছে গীতা। সে যখন পথ চলে পদক্ষেপ দেখে মনে হয়—তার মাথার উপর চেপে আছে একটা প্রচণ্ডভার বোঝা। দারিদ্র্যের বোঝা, কানাই তা জানে। দারিদ্র্যের পেষণে গীতার প্রাণশক্তি মরে যাচ্ছে, খেতে না পেয়ে তত নয়। দারিদ্র্যের অস্পৃশ্যতাজনিত জীবনের সঙ্কোচনেই সে বেশী নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। সেই গীতার বাবা বলেই কানাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।

গীতার বাবাই বটে। তার হাত চেপে ধরেছে একজন কাবুলীওয়ালা। লোকটির বয়স বেশী নয়। কানাইয়ের সঙ্গে তার দুবেলা দেখা হয়। সে সকাল থেকে এসে বসে থাকে এই পাড়ার কোন বাড়ীর দাওয়ায়। মোটা সুদে টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা। সুদূর আফগানিস্থান বা পেশোয়ার থেকে এখানে এসে সুদি-কারবার ফেঁদে বসেছে। ধনীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, যারা বাপের মৃত্যুপথ তাকিয়ে আছে, তারা এদের কাছে টাকা ধার করে। আর ধার করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা দিন দিন নামছে নিঃস্ব রিক্ত অবস্থার দিকে। গীতার বাবা সরু গলায় চীৎকার করছে—রূপেয়া কি আমাকে মারলে আদায় হবে নাকি? নেই তো কাঁহাসে দেগা?

—সুদ নিকালো। সুদ। দো মাহিনা একঠো আধেলা নেহি দিয়া তুম।

কানাই এগিয়ে এসে বললে—এ সাহেব, ছোড় দিজিয়ে। এ কেয়া বাৎ, জুলুমবাজীকে মুলুক নেহি।

লোকটি হেসে কানাইকে বললে—বাবুজী, আমার শরীরে যতক্ষণ তাগদ আছে, ততক্ষণ আমার জুলুমবাজীর একতিয়ার আছে।

কানাইয়ের মাথার ভিতরটায় যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সে তবুও নিজেকে সংযত করে একটু হেসেই এগিয়ে এসে কাবুলীওয়ালার হাত ধরে বললে—ঠিক বলেছ তুমি।

তাগদই দুনিয়ার একতিয়ারের আসল কিস্মৎ বটে। তবে তাগদ সংসারে তো তোমার একচেটিয়া নয়। ছাড়, ভদ্রলোকের হাত ছাড়।

কাবুলীওয়ালাটি আশ্চর্য হয়ে কানাইয়ের মুখের দিকে চাইলে। সে কানাইয়ের চেয়ে লম্বায় অন্ততঃ এক ফুট বড়—শরীরের পরিধিতে তার দ্বিগুণ। অথচ সে-ই তাকে বলছে—তাগদ তোমার একচেটিয়া নয়!

গীতার বাপ ওদিকে এই সহানুভূতিটুকু পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে।—দেখুন! দেখুন! একবার অত্যাচারটা দেখুন! এই যুদ্ধের বাজারে আজ দু'মাস চাকরি নাই—পেটে খেতে পাই না, আর জুলুম দেখুন আপনারা!

কানাই কাবুলীওয়ালাটিকে বললে—ছেড়ে দাও।

কানাইকে ভয় করে ঠিক নয়, কিন্তু কানাইয়ের নির্ভীকতা এবং স্থানটা তার বিদেশ ও কানাইয়ের স্বদেশ বলেই তাগদ থাকা সত্ত্বেও কাবুলীওয়ালা তার খাতকের হাত ছেড়ে দিল। বললে—বেশ তো, আপনি ভদ্র আদমী—আমার টাকা আদায় করে দিন আপনি, আপনাকেই আমি সালিশ মানছি। আসল দিতে না পারে—দু'মাসের সুদ ছও রূপেয়া চার আনা আদায় করে দাও। পঞ্চাশ রূপেয়ার দো মাহিনার সুদ।

পঞ্চাশ টাকার দু'মাসের সুদ ছটাকা চার আনা! টাকায় এক আনা সুদ মাসে? কানাইয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে কি বলে প্রতিবাদ করবে, বিস্ময় প্রকাশ করবে, খুঁজে পেলে না। এ নিয়ে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কে জানে, কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ মিটে গেল। বস্তীর বিপরীত দিক থেকে এল এক প্রৌঢ়া। এসে বললে—কই কই কাবুলেওলা কই? এই নে বাবা তোর দুমাসের সুদ! এই নে।—বলে সে ছটাকা চার আনা লোকটির হাতে আলগোছে ফেলে দিলে।

কানাই এতেও একটু বিস্ময় বোধ করল। প্রৌঢ়াকে সে চেনে। এই পাড়াতে অল্প একটু দূরে সে থাকে। প্রৌঢ়া পাড়ায় বামুনদিদি বলে পরিচিত। অনেকে তাকে অন্তরালে বামুনদাদাও বলে থাকে। প্রৌঢ়ার গতিবিধি পুরুষের মত। পুরুষের ছাতা মাথায় দিয়ে চটি পায়ে সে ঘোরাফেরা করে, ট্রামে-বাসেও কানাই তাকে যেতে আসতে দেখেছে। সে ঘটকীর কাজ করে। বাড়ীতে দু'দশ টাকার বন্ধকী কারবারও করে। তার পক্ষে দয়াধর্ম কানাই কল্পনা করতে পারে না—অন্ততঃ তার সম্বন্ধে লোকে যে ধরনের কথাবার্তা বলে, তাতেও কল্পনা করা যায় না। সে এসে ছ টাকা চার আনা দিয়ে দিলে! গীতার বাবা কি মা যদি টাকাটা ধার করত, তবে টাকাটা আসা উচিত ছিল তাদের কারও হাত দিয়ে।

প্রৌঢ়া আপন মনেই বললে—পাড়াপড়শী—দুঃখী মানুষ—ভদ্দর লোকের ছেলের অপমান করছে—এ কি চোখে দেখা যায়! যাবেই না-হয় আমার টাকাটা!—বলতে বলতেই সে চলে গেল গীতাদের বাড়ীর দিকে।

গীতার বাপ ঘরে বসে আর্তনাদ করছে—কাল যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ! হে ভগবান, তুমি বিচার কর! তুমি বিচার কর!

কানাইয়ের মনের মধ্যে ফিরছিল ওই প্রৌঢ়ার কথা। সে মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছে তার আচরণে। বাড়ীতে ফিরেও সে ওই কথাটাই ভাবছিল। সঙ্গে সঙ্গে এও'বার বার মনে হল যে, টাকাটা এ ক্ষেত্রে তার নিজের দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক করলে—কাল গীতাকে ডেকে টাকা পাঠিয়ে দেবে। সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল—তাদের বাইরের মহলের খোলা ছাদে। ওখান থেকে গীতাদের বাড়ীটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলে, গীতার বাবা বিছানায় শুয়ে

হাঁপাচ্ছে। হতভাগ্য মানুষটির জন্ম মন তার ব্যথিত হয়ে উঠল। দুর্বহ ব্যাধি! বিশেষ এই. শীতকালে। সর্দির প্রকোপ শীতকালে বাড়ে।

গীতার বাবা প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের হাঁপানীটা কিন্তু সর্দির হাঁপানি নয়। কারণ রোগটা যখন তার প্রথম দেখা দেয়—তখনও প্রদ্যোত ভটচায ছিল যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থার লোক, তার উপর সে ছিল বিলাসী, গায়ে শাল থেকে চেস্টার-ফিল্ড কোট প্রভৃতির অভাব ছিল না। এখন সেগুলো অবশ্য নেই, কতক অনেক পূর্বেই বন্ধক দেওয়া হয়েছে, আর ছাড়ানো হয় নি; শাল-খানা বেচে ফেলা হয়েছে, নিতান্ত অল্প দামী যেগুলো জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে গেছে, তার দু'একটা ফালি এখনও আছে, রাত্রে তারই এক টুকরো প্রদ্যোত গলায় জড়িয়ে রাখে।

তার হাঁপ ও কাশির উৎপত্তি অজীর্ণ রোগ থেকে। ভাল পরার চেয়েও তার ভাল খাওয়ার উপর ঝোঁক ছিল বেশী। অজীর্ণতা অর্থাৎ রোগের হেতুটা কিন্তু এখন গৌণ হয়ে গেছে। বর্তমানে মুখ্য হেতু জীর্ণ করবার মত বস্তুর অভাব। অভাবের কারণে দেহ তার শীর্ণ—পেট শুকিয়ে প্রায় পিঠে ঠেকেছে; এখন প্রদ্যোত ভটাচায খালি পেটে বিড়ি টানতে গিয়ে কাশে; কাশির সঙ্গে ওঠে হাঁপানী, চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসতে চায়, শীতের দিনেও সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দেয়; মনে হয় এখনই কখন দু'চারটে হিক্কা উঠে সব শেষ হয়ে যাবে। শুধু বিড়ি টেনেই রোগ ওঠে না, শক্তির অধিক কোন উত্তেজনা উঠলেও রোগ দেখা দেয়—হাঁপায়; হাঁপানীর সঙ্গে ওঠে কাশি।

কলকাতার শহরতলির এক বিখ্যাত ব্রহ্মণ্যধর্ম-প্রধান পল্লীর অধিবাসী বংশের ছেলে প্রদ্যোত ভটচায। পূর্বপুরুষের ব্রহ্মত্র ছিল—পাকা একতলা বাড়ী ছিল—নামডাকও ছিল। প্রপিতামহ ছিলেন নিষ্ঠাবান খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে তাঁকে ডেকেছিল অধ্যাপনা করবার জন্য, কিন্তু ম্লেচ্ছের চাকরি তিনি গ্রহণ করেন নি। শুধু ম্লেচ্ছেরই নয়—শূদ্রের দানও তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁরই সে কালের প্রভাবে আজও প্রদ্যোতের বাড়ীতে পেঁয়াজের নাম 'গৌরপটল'। নামকরণটা অবশ্য তাঁর আমলে হয় নি—হয়েছে তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পুত্রের আমলে, তাঁর পৌত্র অর্থাৎ প্রদ্যোতের বাপের দ্বারা।

তাঁর পুত্র অর্থাৎ প্রদ্যোতের পিতামহ করতেন গুরুগিরি। তখন কোম্পানীর বেনিয়ানী করে কলকাতার কায়স্থ এবং বৈশ্য সমাজ বিপুল বিভব ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। সায়েবী খানা হজম করবার জন্ম আধ্যাত্মিক হজমীগুলির কদর তাদের কাছে বিভব এবং প্রভাবের অনুপাতেই ওজনে সমান ভারী ছিল। প্রদ্যোতের পিতামহ তাদের মধ্যেও তাঁর ব্যবসা প্রসারিত করে দিলেন। অবশ্য তাতে লাভবান তিনি যথেষ্টই হয়েছিলেন। একতলা বাড়ী দোতলা হয়েছিল। কিন্তু তবু তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। শিষ্য হলেও তারাই ছিল সমাজে গরিয়ান। তাই তিনি শিষ্যদের গরীয়সী বিদ্যায় দীক্ষিত করতে চাইলেন নিজের ছেলেকে। গুরুগিরিতে অজস্র প্রণাম এবং প্রণামী পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছেলেকে—প্রদ্যোতের বাবাকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মণ্যধর্মের আষ্টেপৃষ্টে যে সংযমের বাধা-নিষেধের বন্ধন, তা থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলে যতখানি তেল পুড়িয়ে আলোর সমারোহে মেতে গেল—ততখানি নাচ শিখলে না। 'গৌরপটল' নাম দিয়ে—রান্নাঘরে পেঁয়াজের জন্ম স্বতন্ত্র উনান কড়ার সৃষ্টি করলে, কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষার গণ্ডী উত্তীর্ণ হতে পারলে না। তবে অবশ্য আট-কাল না; বাপের প্রতিষ্ঠাবান শিষ্যদের অনুগ্রহে মার্চেণ্ট অফিসে একটা চাকরি তার মিলল।

মাইনে বেশী নয়। তাই সে বাপের মৃত্যুর পর সায়েবী ফ্যাশানে চুল ছেঁটেও টিকি রাখলে এবং গৃহদেবতা শালগ্রামশিলাটিকে নিয়ে পৌরোহিত্য বৃত্তি গ্রহণ করলে উপরি ব্যবসা হিসাবে।

তারই ছেলে প্রদ্যোত।

প্রদ্যোতের বাপ আপনার ছেলেকে করে তুলতে চেয়েছিল স্বাধীন ব্যবসায়ী অথবা দালাল। স্বাধীন ব্যবসায়ের ইচ্ছাটাই ছিল প্রবল। তখন বাঙালী ধনীরা চেয়ার টেবিল নিয়ে সবে অফিস ফাঁদতে শুরু করেছে। মূলধনের অভাবে প্রদ্যোতের বাপ দালালীটাকেই ভাল বলে মনে করেছিল। নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বেশ বুঝেছিল যে, দেওয়া এবং নেওয়ার মাঝখানে হাত পেতে দাঁড়াতে পারলে সে হাতে দাতা-গ্রহীতা দু'তরফ থেকেই কিছু কিছু ঝরে পড়তে বাধ্য। দালালদের কমিশন এবং সেল পারচেজ অর্থাৎ কেনা-বেচা ব্যবসায়ের লাভ দেখে সে ছেলেকে দালালীতে দীক্ষা দিতে চেয়েছিল। দালালীর অন্যতম প্রধান মূলধন মুখ, অর্থাৎ কথা বলে মানুষকে মুগ্ধ কর, সেটা প্রদ্যোতের ছিল। সে তখন গৌরপটলের পরবর্তী শব্দ রামপক্ষী আবিষ্কার করে ফেলেছে। টিকি একেবারেই ছেঁটেছে।

প্রপিতামহের নাম ছিল হরিদাস, পিতামহ খ্যাত হয়েছিলেন নবীন নামে। তাঁর পুত্রের তিনি নাম রেখেছিলেন চারুচন্দ্র, চারুচন্দ্রের পুত্র প্রদ্যোত—দালালী আরম্ভ করলে। দালালী ব্যবসায়ে প্রথমটায় বেশ সার্থকতা লাভ করেছিল, প্রতিদিনই সে কিছু না কিছু অর্থ নিয়ে বাড়ী ফিরত। তখনই তার আরম্ভ হল অতিভোজন। রোগের বীজ তখনই প্রবেশ করেছিল। ভাল হোটেলে পার্টিদের খাওয়াতে গিয়ে তাকে খেতে হত চপ কাটলেট।

দালালী থেকে ক্রমশঃ সে আরম্ভ করলে 'সেল-পারচেজ বিজনেস', তখন এই চপ কাটলেট খাওয়াটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। তারপর একদা ব্যবসায়-বুদ্ধিতে পরিপক্কতা লাভ করে—বাজারের দেনা ফাঁকি দিয়ে বাজারের পাওনাটা সমস্ত গ্রাসের প্রত্যাশায় ইন্‌সল্‌ভেন্সি ফাইল করে—পৈতৃক বাড়ী বিক্রী করে স্ত্রীর নামে কলকাতায় তুললে শৌখিন বাড়ী, এবং নূতন বাড়ীতে বসে—কেবলই ইলিশ ভেটকির ফ্রাই, মটন-মাংসের কালিয়াকোর্মা, রামপক্ষীর কাটলেট আস্বাদন করে কর্মহীন দিনগুলি যাপন করতে আরম্ভ করলে। এইবার রোগের বীজ অঙ্কুরিত হল; পেটে বায়ু হল; বসে বসে কেবলই উদ্গার তুলত প্রদ্যোত।

ওদিকে আরম্ভ হল মামলা-পর্ব। মামলায় ফাঁকি দেবার ব্যবস্থার মধ্যে কাঁচা হাতের গলদে ফাঁক বেরিয়ে পড়ল। সেই ফাঁক দিয়ে যখন সুদসমেত বাজারের পাওনা এবং মামলার খরচের দায়ে ব্যাঙ্ক শূন্য হয়ে—স্ত্রীর নামে বেনামী বাড়ীখানি পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল তখনও পথে দাঁড়িয়ে প্রদ্যোত অভ্যাসবশে প্রচুর পরিমাণে তেলেভাজা খেয়ে চপ-কাটলেটের শখ মেটাত। অঙ্কুর তখন পল্লবিত হয়েছে। বায়ু ঊর্ধ্বগত হয়ে তখন হাঁপানী কাশি দেখা দিয়েছে।

তারপরেও চাকরি একটা মিলেছিল। নিজের বাড়ী ছেড়ে ভদ্রপল্লীতে একতলায় বাসা নিয়ে—হাঁপ কাশি নিয়েও সে অফিসে যেত। তখনও তেলেভাজা চলত। সস্তার বাজারে গঙ্গার ইলিশও আনত। হয়তো তার জীবনটা ওই ভাবেই কেটে যেত। কিন্তু হঠাৎ একদা আরম্ভ হয়ে গেল ইউরোপে পোলাণ্ডের এক টুকরো জমির ওপর যুদ্ধ। দেখতে দেখতে গোটা ইউরোপ জ্বলে উঠল—অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদখানার মত! সে আগুনের আঁচ ভারতবর্ষে এল। দূরত্ব বহু সহস্র মাইল—মধ্যে সাত সমুদ্র—তবু সেখানে আগুন জ্বললে এখানকার সোনা রূপো গলতে শুরু করে। ব্যবসার বাজারে বিপর্যয় ঘটল। রিট্রেঞ্চমেণ্ট আরম্ভ হল। রিট্রেঞ্চমেণ্টের প্রথম হিড়িকেই প্রদ্যোতের চাকরি গেল। কর্মচ্যুত হয়ে সে এই বস্তীতে এসে বাসা নিয়েছে।

আজ পয়সার অভাবে তেলেভাজা আর সে খায় না; অন্নও দুবেলা সব দিন পেটে পড়ে না, কিন্তু হাঁপানী রোগটা আজ প্রায় মহীরুহে পরিণত হয়েছে, অতি-আহার থেকে যার উৎপত্তি অনাহারেও তার বৃদ্ধির বিরাম নাই, সে আজ তার শিকড় বিস্তার করেছে জীর্ণদেহের প্রতি কোষে কোষে—সেইখানে থেকে সে রস শোষণ করছে, আজ আর পাকস্থলীর অজীর্ণ রসের কোন অপেক্ষাই সে রাখে না।

গীতার মা সরোজিনী খানিকটা গরম তেল নিয়ে বুকে মালিশ করে দিচ্ছে। বারো-তেরো বছরের বড় ছেলে হীরেন পাখা নিয়ে মাথায় বাতাস করছে। গীতা জল গরম করতে ব্যস্ত। গরম জলে খানিকটা সোডি-বাই-কার্ব মিশিয়ে খেলে প্রদ্যোতের হাঁপানী কমে। আজ সোডা নেই—শুধু গরম জল, তাতেও হয়তো উপকার হবে, এই প্রত্যাশা।

প্রৌঢ়া ঘটকী বসে আছে। সে সহানুভূতির অনেক কথা বলে যাচ্ছে। আশ্বাস দিচ্ছে। প্রদ্যোতের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। প্রদ্যোত হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে—বামুনদি, তুমি যাও, তুমি যাও এখন।

প্রৌঢ়া বললে—আচ্ছা। আসব আবার। হীরেন, তুই আয়। সেরখানেক চাল আছে নিয়ে আসবি।

প্রদ্যোত হাঁপানীর আক্ষেপেই বোধ করি পাশ ফিরে শুল।

চার

পরদিন সকালে উঠে জামা গায়ে দিয়ে পকেটে হাত দিয়েই কানাই চমকে উঠলে। একি, তার টাকা? টাকা কোথায় গেল? কে নিলে? পরক্ষণেই তার মুখে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি। নেবার লোকের অভাব কোথায়? তবে ঝিয়েরা কেউ নয় এটা ঠিক। তারা ছাড়া যে কেউ হোক নিয়েছে। কে নিয়েছে এ সন্ধান করে ওঠা শার্লক হোমসেরও সাধ্যাতীত। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ঘর হতে বের হয়ে এল। ইচ্ছে হল—এই বেরিয়ে সে আর ফিরবে না এ বাড়ীতে।

—কানু!

কানাই ফিরে দেখলে—তার মা আসছেন। সে দাঁড়াল। মা কাছে এলেন।

কানাই বলল—বল।

—কাল রাত্রে এসে টাকা চারটে আমি নিয়ে গেছি!

কানাই তাঁর মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল। কোন কথা বললে না, কিন্তু দৃষ্টিতে তার নিষ্ঠুর প্রখরতা খেলে গেল।

মা বললেন—কলেজের টাকা আসছে মাসে দিবি। তুই এমন করে চেয়ে রয়েছিস কেন? সংসারটার কথা ভেবে দেখ্!

কানাই হাসলে। বললে—কিন্তু আমার কথা কে ভাববে মা?

—সংসারে স্বার্থত্যাগই সব চেয়ে বড় ধর্ম বাবা। তুই আগে তো এমন ছিলি না! এমন কেন হলি তুই?

কানাই কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

আজ রবিবার। আজ অবশ্য ছাত্রকে পড়াবার তার কথা নয়, কিন্তু ছাত্রের পরীক্ষা এসেছে সামনে, তাই রবিবারেও যাচ্ছে সে।—আজ রবিবার; একটু আশ্বস্ত হল সে। নীলার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অফিস আজ বন্ধ।

কানাইয়ের দুর্ভাগ্য। আজও নীলা—কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে। সে একা নয়—নেপীও তার সঙ্গে। নেপী নীলাকে কী আঙুল দিয়ে দেখালে—ঐ যে! পরক্ষণেই কানাই বুঝলে নেপী তাকেই আঙুল দিয়ে দেখালে। নীলা ও নেপী ট্রামে উঠেই বললে—এই যে আপনি!

কানাই শুকনো মুখে বললে—হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা চলেছেন কোথায়? আজ তো রবিবার।

—সে কি! আপনি যাচ্ছেন না?—নীলার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

হঠাৎ কানাইয়ের মনে পড়ে গেল—আজ তাদের সমিতির উদ্যোগে একটা জরুরী সভা আছে। মেদিনীপুরের সাইক্লোন-পীড়িত অঞ্চলে রিলিফ ব্যবস্থার আলোচনা—প্রতিবাদ বলাই ভাল। কানাই একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—ও! আজকের মিটিংয়ের কথা বলছেন?

—নিশ্চয়। স্পীকারদের মধ্যে আপনার নাম রয়েছে।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি? আপনি সত্যিই যাবেন না? বিজয়দা নেই আজ—কলকাতার বাইরে তিনি। আপনি যাবেন না—সে কি!—নীলা উত্তেজিত হয়ে উঠল—ট্রামে উপস্থিত যাত্রীদের কথাও সে বোধ হয় ভুলে গেল।

নেপী ব্যগ্রভাবে তার হাত ধরে বললে—না—না—কানাইদা, সে হবে না। চলুন আপনি!

—গিয়ে কি করব? খুব জোরালো একটা বক্তৃতা দিলেই কি তাদের দুঃখ দূর হবে? না, সরকার শশব্যস্ত হয়ে প্রতিকার করতে ছুটবে? এ সব আমার কাছে যাত্রার দলের ভীমের অভিনয় বলে মনে হয়।

নীলা বলে উঠল—কিন্তু প্রতিবাদের, প্রতিকারের যতটুকু অধিকার আছে—সেটুকু গ্রহণ না করার নাম কাপুরুষতা—হ্যাঁ কাপুরুষতাই। সে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

কানাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এর পর নেপীও আর কোন কথা বলবার সুযোগ পেলে না। ট্রামের যাত্রীদের মধ্যে ঘটনাকে ভিত্তি করে নানা রসালো আলোচনা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। সংযমের নামে—শ্লীলতার নামে—সমাজধর্মের অনুশাসনের শত বন্ধনে বাঁধা মানুষের মনের অবরুদ্ধ কামনা আত্মপ্রকাশ করছে সমালোচনার নামে। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষ বাঁধনে অভ্যস্ত হয়ে দাঁতে করে বাঁধনটাকে চিবুচ্ছে।

একটা কথা তার কানে এল—Politics আজকাল জমেছে ভাল। বেশ যাকে বলে রসিয়ে উঠেছে।

অপর জন বললে—বিশেষ এদের পার্টিটা। এদের পার্টিটায় নাকি বেটাছেলের চেয়ে মেয়েদের দল ভারী!

গাড়ীটা এসে দাঁড়াল গোলদীঘির পাশে। সামনেই কলুটোলা স্ট্রীট। নীলা এবং নেপী নেমে গেল। ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে সভা।

একজন বলে উঠল—বাপ্‌স্‌, পদক্ষেপে গাড়ীখানা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল!

কানাই শূন্যদৃষ্টিতেই চেয়ে বসে রইল।

গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল মেডিকেল কলেজ পার হয়ে; বাঁ দিকে শিবমন্দির, এদিকে মেডিকেল কলেজের পাঁচিলের পাশে ফুটপাতের উপর পাড়াগেঁয়ে মানুষের একটি দল। একটি মেয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে। দৃশ্যটা অত্যন্ত করুণ মনে হল কানাইয়ের। ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সে।

মেয়েটি বুক চাপড়ে কাঁদছে—ওরে আমার ধন—ওরে আমার মানিক! ওরে, আমি ঝড়ে জলে বাছাকে বাঁচিয়ে রেখেছিনু রে! ওরে বাবা রে!

লোক কয়েকটি মেদিনীপুরের অধিবাসী। ঘরবাড়ী ভেঙে মাটির ঢিবি হয়ে গেছে, গোরুবাছুর ভেসে গেছে, জলোচ্ছ্বাসে জমির বুকে চাপিয়ে দিয়েছে বালির রাশি। অন্ন নেই—এমন কি তৃষ্ণা মিটিয়ে জলপান করবারও উপায় নেই—জল লবণাক্ত হয়ে গেছে। সুদূর মেদিনীপুর থেকে এরা এসেছে অন্নের সন্ধানে। পেটের জ্বালায় সব ছেড়ে মেয়েটি ভোরবেলায় কার বাড়ীর দোরে গিয়েছিল উচ্ছিষ্ট ভিক্ষায়, দুর্বল ছেলেটা মায়ের পেছনে চলেছিল—সেই অবস্থায় রাস্তা পার হতে গিয়ে লরী চাপা পড়েছে।

একজন দোকানী বললে, ব্যাপারটা তাদের সামনেই ঘটেছে, বললে—হাঁ—হাঁ করতে করতে চাপা পড়ে গেল।

একজন দর্শক বললে—লরীটার নম্বর নেন নি মশাই?

—নিই নি? নিশ্চয় নিয়েছি। আটা মিলের লরী—ময়দার বস্তা বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। নম্বর—।

কানাই ফিরল। ট্রামের জন্যও অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হল না তার। দ্রুতপদে পথটা অতিক্রম করে এসে উঠল ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে। সভা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। নেপী ভলান্টিয়ারের কাজ করছে—ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। কানাইকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হেসে কানাই একপাশে এসে বসল। বক্তৃতা করছে বিখ্যাত কিষাণকর্মী নুরুল হক। তীব্র প্রতিবাদ করছে, আপনাদের অধিকারের কথা তারস্বরে বলছে।—"দুনিয়ায় আমরাও মানুষ—আমাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে, সকল দেশের মানুষের মত—সকল দেশের মানুষের মত আমরাও বাঁচতে চাই। আমরা কেন মরব? কেন আমরা পীড়িত হব? অন্যায়—এ অন্যায়! এর আমরা প্রতিবাদ করি।"

নীচে টেবিল ঘিরে একদিকে বসেছে পুলিস বিভাগের লোক। শর্টহ্যাণ্ড নোট নিচ্ছে। ওই সাঙ্কেতিক অক্ষর থেকে চলিত হরপে রূপান্তরিত করে এর পর পরীক্ষা করা হবে, ওর মধ্যে বক্তা তার বলার অধিকার অতিক্রম করেছে কি না! অন্যদিকে বসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার।

যে বক্তা বলছিল—তার কথা শেষ হতেই—নীলা এসে দাঁড়াল মাইকের সামনে। সে আজ অ্যানাউন্সারের কাজ করছে। সে ঘোষণা করলে—এর পর বলবার কথা ছিল আমাদের কর্মী কানাই চক্রবর্তীর। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। তাঁর স্থলে বলবেন—আমাদের অন্য কর্মী—আবদার রহমান। এই সভা করে বক্তৃতা করে কিছু হবে না জানি। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদের অধিকার আমরা ছাড়ব কেন? প্রতিবাদে ফল হবে না বলে হতাশায় নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকাটা পঙ্গুতার মত মারাত্মক ব্যধি। কাপুরুষও একদিন সাহস সঞ্চয় করে বীরের মত উঠে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই ব্যধি যাকে আক্রমণ করেছে—তার ভরসা নেই। জীবন সত্ত্বেও সে মৃত।

হলের মাঝখানের পথ দিয়ে কানাই এসে দাঁড়াল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে নীলার মুখ যেন

কেমন হয়ে গেল। পিছন থেকে সভাপতি মৃদুস্বরে বললেন—কানাইবাবু! আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি। নীলা তবুও চুপ করে রইল। সভাপতি নিজে উঠে এসে ঘোষণা করলেন—কানাইবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রোগ্রাম মত তিনিই এখন বলবেন। তারপর বলবেন—মিস্টার রহমান!

কানাই এসে দাঁড়াল মাইকের সামনে।

খুব বেশী কিছু সে বললে না। বললে শুধু এই সদ্য-দেখা ঘটনাটির কথা। আর বললে —মেদিনীপুর থেকে খাদ্যাভাবে কলকাতায় এসে ছেলেটা চাপা পড়েছে খাদ্যেরই উপকরণ আটার লরীর তলায়। ঘটনাটা দেখে মনে পড়ল—রবীন্দ্রনাথের কথা—যে কথা তিনি লিখেছিলেন—মিস্ র‍্যাথবোর্নকে। "সমগ্র ব্রিটিশ নৌবহর ইংল্যাণ্ডের বন্দরে বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছে রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে। আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আমাদের দেশের মানুষের কাছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এক গাড়ী খাদ্যও পৌঁছাবার ব্যবস্থা হয় না।"

বক্তৃতা শেষ করেই সে বেরিয়ে গেল।

নেপী দাঁড়িয়েছিল—প্রবেশপথের মুখে। সে কানাইয়ের দু'খানা হাত ধরে আবেগ-ভরে বললে—ভারি চমৎকার হয়েছে কানাইদা।—এর বেশী নেপী বলতে পারলে না। পারেও না কখনও। তার উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে, কিন্তু সে আবেগ উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে তার চোখের দৃষ্টিতে—মুখের রক্তোচ্ছ্বাসে; কিন্তু মুখর হয়ে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না বেচারা। নম্রতা বিনয় এবং মিষ্টস্বভাবত্বের আদর্শ শৈশব থেকে এমন ভাবে তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার সুপ্রচুর প্রাণশক্তি সত্ত্বেও তার প্রকাশের কলরব নাই, তার অদম্য কর্মশক্তি অক্লান্ত, গতি তার অপ্রতিহত বললেও চলে; তবু তার কর্মের মধ্যে সমারোহ প্রকাশ পায় না।

কানাই সস্নেহে বললে—তোর ভাল লাগলেই আমি খুশী।

নেপী অপ্রতিভের মত হাসলে। এটা তার স্বভাব।

—আচ্ছা, আমি চলি।

—একটা কথা বলছিলাম কানাইদা।

হেসে কানাই বললে—বল্।

নেপী বললে—পার্টি থেকে রিলিফ ওয়ার্কে একদল ওয়ার্কার পাঠাবে মেদিনীপুর। আপনি চলুন না লীডার হয়ে! আর—।

নেপী পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে রাস্তার বুকে দাগ কাটতে লাগল। স্পষ্টতঃ কানাই বুঝলে—নেপী যখন লজ্জিত হয়েছে—তখন সেটা নিশ্চয় তার নিজের কথা। এটা অনুমান করে নিতে কানাইয়ের কষ্ট হল না।

হেসে কানাই বললে—আর যদি তোমাকে পার্টির মধ্যে নেবার জন্যে বলে দিই! কেমন?

—হ্যাঁ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কানাই বললে—তোর কথা বলে দেব নেপী। কিন্তু আমার যাওয়া হবে না ভাই। আমার ছাত্রের পরীক্ষা সামনে।

কথাটা বলেই কানাইয়ের খেয়াল হল—যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। সে—আচ্ছা—বলেই অগ্রসর হল।

নেপী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লাউড স্পীকারে কমরেড রহমানের বক্তৃতা ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু কানাইয়ের শেষ কথা ক'টা বলার সুরের মধ্যে সকরুণ এমন কিছু ছিল, যার স্পর্শে সে

অন্তমনস্ক হয়ে গেছে। তার চমক ভাঙল নীলার ডাকে। তার দিদি ডাকছে।

—নেপী!

—দিদি!

—কানাইবাবু চলে গেলেন?

—হ্যাঁ।

নীলা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল—তারপর আপনাকে যেন ঝাঁকি দিয়ে সচল করে তুলে মিটিংয়ের দিকে ফিরল।

কানাইয়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নেপীর কথায়। জীবন চলেছে তার শোচনীয় বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে। একদিকে ডাকছে তাকে বাইরের ডাক—অন্যদিকে বাড়ীর সহস্র বন্ধনে সে আবদ্ধ। মা তাঁর নিজের আদর্শের বন্ধনে বেঁধে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তাঁর পথে। এ চাকরি তার কেবল বাড়ীর জন্যে। কলেজ স্ট্রীট পার হয়ে সে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে এসেই সচকিত হয়ে উঠল। এ কি! সাইরেন বাজছে? সাইরেন?

ভুল তার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙল, সাইরেন নয়, আমেরিকান মিলিটারী লরী, ওদের হর্নই ওই রকম—প্রকাণ্ড লম্বা লরী সারিবন্দী চলেছে।

সামনেই একটা কণ্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের কিউ। হিন্দু, মুসলমান, হিন্দুস্থানী, বাঙালী—স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ঝিয়ের দল। গৃহস্থঘরের বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোরখা নেই, ঘোমটা নেই, মাথার রুখু চুল ঠেলা-ঠেলিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে উড়ছে। মুখে অপরিসীম উদ্বেগ। কখন গিয়ে পৌছবে ওই দোকানের সম্মুখে! ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হয়তো বোরখা ঘোমটা এদের চিরকালের জন্যই খসে গেল! এই চরমতম দুর্গতির মধ্যেই এসে গেল আবরণ থেকে মুক্তি! কানাইয়ের মুখে হাসি খেলে গেল। ওপাশে ফুটপাতে বসে আছে নিরন্ন গৃহহীনের দল—ভিক্ষা ওদের পেশা নয়, কিন্তু ওরা আজ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।

অদ্ভুত অবস্থা! এ অবস্থা পৃথিবীতে কখনও আসে নাই। নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই। যুধ্যমান জাতিগুলি—জাতিগুলি নয়—জাতির নায়কের ইঙ্গিতে তারা পরস্পরের প্রতি হিংসায়, আক্রোশে, বাঁচবার ব্যাকুলতায়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবীর জীবনশক্তিকে। এক বৎসরে বোধ হয় বিশ-ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করে চলেছে। এক বৎসরে বিশ-ত্রিশ বৎসরের সম্পদ-শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। লোহা-তামা-সোনা-রূপা সব—সব। এমন কি বিশ বৎসরে মানুষের যে পরিশ্রমশক্তি নিয়োজিত হয়—তা এক বৎসরে ক্ষয়িত হচ্ছে। বিশ বৎসরে ধনী যে ধন উপার্জন করত—এক বৎসরে সেই ধন সে সঞ্চয় করছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরে বিশ বৎসরে বঞ্চনায় বঞ্চিত হচ্ছে দরিদ্রের দল। —বিশ বৎসরের অভাব—অন্নের বস্ত্রের, সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ুরও—অকস্মাৎ নিষ্ঠুরতম হিংস্র মূর্তিতে এসে আক্রমণ করেছে পৃথিবীর মানুষকে। বিশেষ করে এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য মানুষগুলিকে।

পাঁচ

বিশ বৎসরের পতনও বোধ করি চক্রবর্তী-বাড়ীতে আসন্ন হয়ে উঠেছে। চক্রবর্তী-বাড়ীর অবস্থান তো এই পৃথিবীর মধ্যেই। অল্পস্বল্প কয়েক টুকরো বস্তী জমি—যা ছিটেফোঁটার মত পড়ে আছে—তাই বিক্রী করবার জল্পনা-কল্পনা চলছে।

সপ্তাহ দুয়ের ভেতর কিন্তু গীতাদের বাড়ীর গতি যেন বিপরীতমুখী হবার চেষ্টা করছে। অনেকদিন ধরে সেই প্রৌঢ়া আসা-যাওয়া করছে। প্রদ্যোতের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বড় একটা শোনা যায় না। প্রৌঢ়ার ওপর শ্রদ্ধা হয়েছে কানাইয়ের। প্রৌঢ়া আসে, বসে, গল্প-গুজব করে।

কানাইয়ের বোন উমা সেদিন বললে—গীতার বোধ হয় বিয়ে হবে।

—বিয়ে হবে! কানাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

—ঘটকী প্রায়ই আসে ওদের বাড়ী।

প্রৌঢ়া যে ঘটকী এ কথাটা কানাইয়ের মনে সাড়া জাগায় নি—কারণ ঘটকী হলেই মেয়ের বিয়ে হয় না, মেয়ের বিয়েতে প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু টাকা। তবু উমার কথায় আজ মনে হল—হবেও হয়তো। বিনা পণে বিয়ে করবার মত লোকও তো আছে। মনে মনে কামনা করলে—তাই হোক, তাই হোক। দয়া করেও যদি কেউ গীতাকে গ্রহণ করে, তবে দয়া তার সার্থক হবে। গীতা দয়ার যোগ্য পাত্রী। দয়া ছাড়া অন্য কিছু দিলে ওই মেয়েটির তা গ্রহণের শক্তি নাই।

মা এসে দাঁড়ালেন। সেই মুখ—উদাসীন সকরুণ; দৃষ্টিতে আত্মত্যাগের প্রেরণা—কানু!

কানু একটু হাসলে—বল।

—এ মাসের মাইনের এখনও সময় হয়নি?

—না। আজ তো সবে মাসের পনেরো।

—কিন্তু টাকাটা যে চাই।

—টাকা চাইলে হয়তো পাব। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আমার কলেজের মাইনে বাকী আছে ও-মাস থেকে।

—তুই তো বলেছিলি—তিন-চার মাস বাকী রাখলেও চলে।

—চলে, কিন্তু তিন-চার মাসের মাইনে একসঙ্গেই বা দেব কোত্থেকে এর পর?

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—তোকেই একটা উপায় করতে হবে কানু। না-হয় সন্ধ্যের দিকে আর একটা প্রাইভেট ট্যুইশন দেখে নে।

কানাইয়ের হাসি এল। সে নিজে কখন পড়বে—এ-কথা বললেই মা আবার এখুনি তাঁর আদর্শের কথা বলবেন। কোন প্রতিবাদ না করেই সে বললে—বেশ, দেখি!

মায়ের মুখে হাসি ফুটল। বললেন—আয়, চা খেয়ে নে। টাকাটা আজ নিয়ে আসবি বাবা। কানাই মায়ের অনুসরণ করলে।

আকাশে প্রচণ্ড শব্দ; ক্রমশঃ মাথার ওপর এগিয়ে আসছে। প্লেন আসছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি চীৎকার করে উঠল—ওরে বাপরে! কত—কত—কত!

উমাও উৎসাহভরে উচ্চকণ্ঠে গুনতে আরম্ভ করেছে—এক, দুই, তিন, চার—

কানাই তাকিয়ে দেখল—সত্যই সংখ্যায় অনেক। অন্ততঃ পঞ্চাশখানা। চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বড় রাস্তা ধরে ট্রাম-রাস্তায় যেতে হবে। ফুটপাথে যেখানেই গাড়ীবারান্দার মত আশ্রয় সেখানেই মধ্যে মধ্যে নিরাশ্রয় মানুষ শুয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এদের সংখ্যা ক্রমশঃই যেন বাড়ছে। কলকাতায় জনসংখ্যাও বেড়েছে।

হঠাৎ একটা গলির ভেতর থেকে কে ডাকলে—কানাইবাবু!

নারীকণ্ঠ।—নীলা। কানাই দেখলে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসছে নীলা। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের মিটিংয়ের পর আর নীলার সঙ্গে দেখা হয় নি। কিন্তু এত সকালে এখানে নীলা? সবিস্ময়েই সে প্রশ্ন করলে—আপনি? এখানে?

হেসে নীলা বললে—বলেন কেন! শ্রীমান নেপীর খোঁজে এসেছিলাম।

—নেপীর খোঁজে! কোথায় নেপী? মেদিনীপুর থেকে কবে ফিরল?

—এক সপ্তাহ পরে ফিরেছিল। আবার চার-পাঁচদিন আগে উধাও হয়েছে। বাবা রেগে আগুন। মা ভাবছেন। তাই এসেছিলাম—রমেনের কাছে। পার্টি আপিসে খবর পেলাম—কাল সে ফিরেছে।

রমেনও পার্টির একজন উৎসাহী সভ্য। নেপীর সমবয়সী। তার সত্যকার কমরেড।

কানাই প্রশ্ন করলে—পেলেন খোঁজ?

—হ্যাঁ। শুনলাম—আজ সকালের ট্রেনেই এসে পৌঁছুবে।—তারপর হেসে বললে—আমারই হয়েছে এক বিপদ। মা দোষ দেবেন আমাকে। বাবা অবশ্য আমার বা আমাদের কাজে বিশেষ ইণ্টারফিয়ার করেন না। কিন্তু নেপী ছুটছে পাগলের মত। বাবা যখন নেপীর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—তখন আমি অপরাধ অনুভব না করে পারি না। আমিই ওকে পার্টিতে ঢুকিয়েছিলাম।

কানাই হেসে বললে—কিন্তু নেপী তো কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না মিস্ সেন! তখন আপনি কেন অযথা অপরাধী মনে করেন নিজেকে?

নীলা কোন কথা বললে না—বোধ হয় বলতে পারলে না। আত্ম-অপরাধ বোধের গ্লানির মধ্যে যে অশান্তি, সেই অশান্তির মধ্যে সে কানাইয়ের কথায় সান্ত্বনার শান্তি পেয়েছে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে শুধু কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কানাই বললে—চলুন, এগিয়ে যাওয়া যাক। বাড়ী যাবেন তো?

স্বস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীলা বললে—চলুন।

চলতে আরম্ভ করে কানাই বললে—জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কি জানেন—অন্ততঃ আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বলে মনে হয়? সে একটু ম্লান হাসি হাসলে।

নীলা কোন কথা বললে না, শুনবার প্রতীক্ষা করেই নীরব হয়ে রইল।

কানাই বললে—জীবনে যে পথে চলতে চাই—যাকে আদর্শ বলে মনে করি—সেই পথে চলায়—সেই আদর্শকে মানায়—সংসারের পারিপার্শ্বিকের বাধাকে অতিক্রম করতে না পারা। পারিপার্শ্বিক অবশ্য বাধা দেয় না—বাধা দেয় নিজেরই হৃদয়াবেগ—মায়া-মমতা স্নেহ-প্রেম। নেপী আশ্চর্য ছেলে; এই বয়েসে সে সমস্তকে ডিঙিয়ে কেমন করে মুক্তি পেলে—ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই মিস্ সেন!

নীলা একবার একটু হেসে বললে—নেপীর আপনি কোন দোষই দেখতে পান না!

কানাইও হাসলে, বললে—না, পাই না, সত্যিই পাই না মিস্ সেন।

নীলা বললে—কিন্তু বাবা-মার কথা ভুলি কি করে বলুন? আমার বাবাকে আপনি জানেন না। তিনি অত্যন্ত উদার, তিনি কখনও—

ট্রাম এসে পড়ল। দু'জনে ট্রামে উঠে বসল। নীলা বসল লেডীস সিটে—একটি প্রৌঢ়া মহিলার পাশে। কানাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

নীলার কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। সে তার বাবার কথা মনে করে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

কেশব সেন স্ট্রীটেই নীলাদের বাসা। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সামনে ট্রামখানা দাঁড়াল, কিন্তু নীলা সেখানে নামল না। আরও খানিকটা এসে কলেজ স্কোয়ারের সামনে গাড়ীখানা দাঁড়াতেই সে কানাইকে বললে—আসুন।

নীলার গতিই বেশ একটু দ্রুত; যেন অতিরিক্ত সাহসিকতায় খানিকটা উগ্র। কিন্তু উগ্রতা সত্ত্বেও—স্বচ্ছন্দ। সামনে যারা জনতা করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে চেয়ে ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে দিলে। অর্থাৎ—পথ দাও। সরে দাঁড়াল তারা।

গাড়ীর মধ্যে মাত্র 'হ্যাঁ-না'-তেও যাত্রীর জনতা ভন-ভন করে উঠবে মাছির মত। কানাই তাই, কোথায়—কেন ইত্যাদি, কোন প্রশ্ন না করেই নীলার সঙ্গে নেমে পড়ল। নীলার বোধ হয় নেপীর সম্বন্ধে আবেগ এখনও শেষ হয় নি।

গোলদীঘির মধ্যে প্রবেশ করে কানাই বললে—কোথাও বসবেন?

নীলা কানাইয়ের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনার কাছে আমার ত্রুটি স্বীকার করা হয় নি, বাকী আছে।

—সে কি! কিসের ত্রুটি?

—সেদিন ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে আমি আপনাকে—

বাধা দিয়ে হেসে কানাই বললে—না—না। কথাটা আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আর আমাকেই কিছু বলেন নি আপনি। কথাটা সাধারণ ভাবেই—

নীলাও বাধা দিয়ে বললে—না, না। আমি আপনাকেই বলেছিলাম। আমি স্বীকার করছি।

কানাই স্তব্ধ হয়ে রইল। মন্থর গতিতে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। নীলা মৃদুস্বরে বললে—কানাইবাবু!

কানাই বললে—আপনি সেদিন আমাকেই যদি কথাটা বলে থাকেন—তবুও আপনার দোষ হয় নি মিস্ সেন। আমার কাজ আমি করতে পারছি না। নিজের কাছেই আমার জবাবদিহি নেই।

কানাইয়ের কথায় নীলার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল; কানাইয়ের মনের কোন দুঃখকে সে যেন আভাসে অনুভব করলে, বললে—কি হয়েছে কানাইবাবু?

কানাই নীরবেই পথ চলতে লাগল।

নীলা আবার প্রশ্ন করলে—বলতে কি কোন বাধা আছে?

—বাধা? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কানাই বললে—আমাদের বাড়ীর কথা। সে অনেক ইতিহাস। আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে—পার্টির কাজ আমার দ্বারা বোধ হয় হবে না মিস্ সেন।

—কেন?

—বললাম তো, সে অনেক ইতিহাস। তা ছাড়া—

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীলা আবার প্রশ্ন করলে—কমরেড!

কানাই বললে—থাক কমরেড। সে কথা বলব কোনদিন।

নীলা চুপ করে রইল।

কানাই আবার বললে—আমি হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন—। সে চুপ করে গেল—বলতে যাচ্ছিল—"কোনদিন আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব।" কিন্তু বলতে পারলে না। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই মুখ তুলে সুইমিং ক্লাবের বাইরের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললে—আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে মিস্ সেন। আটটা বেজে গেল। আমি যাই।

সে দ্রুতপদে অগ্রসর হল কলেজ স্ট্রীটের দিকে। নীলা পুকুরের ধারের রেলিংটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে তারও মনে হল—অফিসের বেলা হয়েছে।

নিজেদের বাড়ীর দোরে এসে নীলা দেখলে—বেশ একটি ভিড় জমে গেছে। ভিড় দেখে সে শঙ্কিত হল না, কারণ ভিড়ের ভেতর থেকে কোন গায়কের গানের সুর-ধ্বনি ভেসে আসছে। বুঝলে, তার বাপের খেয়াল। বাবা মধ্যে মধ্যে পথের ভিক্ষুক ধরে আনেন। বিশেষ করে তার যদি কোন গুণপনা থাকে তবে তো কথাই নাই; এই মহার্ঘতার দিনে খেয়ালটা অনেকটা কমেছে, তবে সেজন্য তাঁর দুঃখ অনেক।—সে কথা নীলা বুঝতে পারে। দেবপ্রসাদ অবশ্য মুখ ফুটে কোন কথাই কখনও প্রকাশ করেন না, বরং কোনদিন যদি আবেগের আধিক্যবশতঃ নিয়েই আসেন—তবে অপ্রতিভের মত কৈফিয়ত দেন—সংসারের সকলের কাছে, ইদানীং বিশেষ করে নীলাকে যেন কৈফিয়ত দিতে চান। তার কারণটি নীলা বুঝতে পারে, সংসারের ব্যয়ভার নীলাও আংশিকভাবে বহন করে—সেই জন্য। এতে নীলা অত্যন্ত দুঃখ পায়। কিন্তু পরস্পরের দুঃখ পাওয়াটা দুজনেই ভান করে না-জানার।

নীলাকে দেখেই দেবপ্রসাদ বললেন—শোন—শোন নীলা—ভিক্ষুক ছেলেটির গানটা শোন। আর মা—ও-ই নিজে এই গানটা বেঁধেছে। পাড়াগাঁয়ের ভিখিরির ছেলে—

ছেলেটি গান থামিয়েছিল—দেবপ্রসাদের উচ্চ কণ্ঠের কথা শুনে। বললে—আজ্ঞে না বাবু, আমরা ভিখেরী লই গো। ঘর আমাদের বর্ধমান জেলা। ঘর দুয়োর আছে, বাবা ভাগে চাষবাস করে! তা মাশায়, কাল যুদ্দ্ লেগেই যে সর্বনাশ করে দিলে গো! চালের দর কি মাশায়! আগুন! আট আনায় এক সের চাল। বাবা খেটে খায়। আমার আবার একটা হাত নাই। এই দেখেন।—বলে সে তার বাঁ হাতখানি বের করলে। শুকনো মরা ডালের মত একখানি হাত। আবার সে হেসে বললে—আমার মা নাই কিনা। বাবার ছেন্দা খানিক কম। আক্রার বাজারে বাবারও মাশায় খেতে কুলোয় না। মিছে কথা বলব না মাশায়—সত্যিই কুলোয় না। তাই আমি বলি গান গেয়ে ভিখ-টিখ মেগে এখন খাই। আবার যদি কখনও যুদ্দ্‌টুদ্দ্ মেটে—সস্তা গণ্ডা হয়—তবে আবার বাড়ী যাব। লইলে বুঝলেন কিনা বাবু, পথেই কোন্‌দিন হরি বলে—! মাটির উপর শুয়ে পড়ে চোখ উল্টে জিভ বের করে সে মরার অভিনয় করলে—অদ্ভুত ছেলে—পথে মৃত্যু-কল্পনা করে হাসছে। অকৃত্রিম স্বচ্ছন্দ হাসি।

সব চুপ হয়ে গেল ছেলেটির কথায়।

ছেলেটিই বললে—শোনেন মা ঠাকরুণ, গানটা শোনেন। উড়ো জাহাজের গান। দেখেছেন তো উড়ো জাহাজ? তা দেখবেন বইকি! আপনারা সাহেব-মামেদের (মেমেদের) সমতুল্য লোক। আর কলকাতার আকাশে তো বিরাম নাইরে বাবা।—তা শোনেন—গান শোনেন।

ডুবকী যন্ত্রটি বাঁ হাতের অভাবে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে—ডান হাতে বাজিয়ে গান ধরলে।—

"গাড়ী কত বড় কে জানে, গাড়ী উড়ছে আসমানে!
সর্বনেশে বোমা না কি আছে প্যাটের (পেটের) মাঝখানে।
গাড়ীর চল্লিশ হাত ডানা,
ডাইবর আছে তিন জনা,
কলকব্জা কত আছে—যায় নাকো জানা।
আবার, ইঞ্জিন বাবু চালু ক'রে 'দুরবী' (দুরবীন) লাগায় নয়নে।
কলকাতার সব মোটা-গেরস্ত
বোমার ভয়ে পালাতে ব্যস্ত,
গরীব লোকের মরণ হায় রে—নাইক অন্ন, নাইক রে বস্ত্র।
তার ওপরে ঘর গিয়েছে,—পথেই মরণ 'নেকনে'।
(অদৃষ্টের লিখনে)
আবার জাপানীরা এসে, বলে, মেরে দেবে পরাণে।

নীলা বললে—গানটা আমি লিখে নেব।

দেবপ্রসাদের চোখ ভরে জল এসেছে।

ভিতর থেকে মা হাঁকলেন—নীলা, নটা যে বাজে!

দেবপ্রসাদ বললেন—তুই যা মা, আমি লিখে রাখছি গানটা।

নীলার বাবা দেবপ্রসাদ সেন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। ব্যবসায়ে আইনজীবী,—উকীল। দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পাস করে আইন পড়ে উকীল হয়েছিলেন। ওখানেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে। তাঁর জীবনে আইনবুদ্ধি এবং আদর্শবোধের মধ্যে দর্শনশাস্ত্র এমন ভাবে উঁকি মারে যে, দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজীবন লেগেই রইল; দুই বাড়ীর পার্টিশন-সুটের মত চলেছেই, আপোসও হল না, কোন পক্ষ হারলও না। এক্ষেত্রেও একবস্ত্র-পরিহিত নলদময়ন্তীর মত ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং আদর্শ-বোধের মধ্যে যদি দর্শনশাস্ত্র কলির মত ছুরি দিয়ে কাপড়খানাকে দুভাগ করতে সাহায্য করত—তাতেও দেবপ্রসাদ উপকৃত হতেন, কিন্তু তা না করে তাঁর দর্শনজ্ঞান জীবনে ঝগড়ার গুরু ভগবদ্ভক্ত নারদমুনির অভিনয় করে গেল। ওকালতিতে তাঁর জীবনের কোন বিকাশই হল না। অথচ শক্তি যে তাঁর ছিল না এমন নয়। জীবনে আপন আদর্শনিষ্ঠাই তার প্রমাণ। তবুও এর পূর্বে যে উপার্জন তাঁর ছিল—তাতেই তাঁর বেশ চলেছে। ছেলেকে এবং মেয়েকে তিনি সমান শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন। ছেলে অমর এম্-এ পাস করে বি-সি-এস্ থেকে আরম্ভ করে নানা চাকরির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিয়েছিল পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে স্কুল-মাস্টারি। যুদ্ধের প্রথমে স্কুলগুলির দুরবস্থায় তার সে মাইনেও কমে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশে।

বর্তমানে তাঁর নিজের উপার্জনেরও অনুরূপ অবস্থা। বিশেষ করে কয়েক মাস থেকে সাধারণ শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে এসেছে যে ধর্মাধিকরণের মারফতে আপনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা প্রাপ্য আদায় করবার জন্য যেটুকু প্রাথমিক খরচের প্রয়োজন, তাও তাঁদের জোটে না। কয়েকজন বাড়ীওয়ালা মক্কেল তাঁর আছে; তাদের বাড়ীভাড়া আদায় বা ভাড়াটে বিতাড়নের মামলা প্রায় লেগেই থাকত। কিন্তু ইভাকুয়েশনের হিড়িকে কলকাতায় বাড়ীওয়ালারা বাড়ী ভাড়া আদায়ের জন্য মামলা করা দূরে থাক, ভাড়াটেদের কড়া তাগাদা

পর্যন্ত করে না।

তার জন্য অবশ্য দেবপ্রসাদ দুঃখিত নন; কারণ কোন দিনই তিনি অন্যায় মামলা মোকদ্দমার পোষকতা করেন নি। এমন কি মোকদ্দমা নিয়ে পরিচালনার মাঝখানে মক্কেলের দুরভিসন্ধি বা মিথ্যাচারের পরিচয় পেয়ে বহুবার ওকালতনামা ছেড়ে দিয়েছেন। এতদিন উপার্জনের স্বল্পতার জন্য তিনি কোনদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি, কিন্তু বর্তমানে তাঁর দুঃখ—তিনি সংসারের পরিজনবর্গের মুখে একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যটুকুও তুলে দিতে পারছেন না।

সংসারের চালচলন তাঁর চিরদিনই মোটামুটি ধরনের। কেবলমাত্র ছেলেমেয়ের শিক্ষার বিষয়ে তিনি ছিলেন অকৃপণ। বড় ছেলে এম্-এ পাস করেছে। নীলাকে তিনি শিক্ষায় বাধা দেন নি। এ পড়ানোর মধ্যে তাঁর পদস্থ জামাই-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে এইটুকু তিনি ভেবেছিলেন যে, মধ্যবিত্ত জীবনে নীলাও যদি তার আপন সংসারে উপার্জন করতে পারে তবে নীলার সংসার অভাবের দুঃখ থেকে অনেকাংশে ত্রাণ পাবে। কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের দিকে তাকিয়ে আশ্বাসভরে তিনি কল্পনা করতেন—স্বামীকে খাইয়ে আপিস পাঠিয়ে নীলাও চলেছে কোন নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষয়িত্রীরূপে। শিক্ষয়িত্রী ছাড়া অন্য কোন চাকরি তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু এই যুদ্ধের বিপর্যয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্ট দেখে নীলা গোপনে দরখাস্ত করে চাকরি সংগ্রহ করবার পর যখন এসে বলেছিল—বাবা, আমি চাকরি নিয়েছি,—সেদিনই তিনি গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। তবু মুখে কিছু বলেন নাই। সেদিন তিনি ভেবেছিলেন—শিক্ষিতা মেয়ে নীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদ প্রসাধন ইত্যাদির রুচিতে অভ্যস্ত হয়েছে—তার সংস্থানের জন্যই সে এই পথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু নীলা প্রথম মাসের শেষেই ট্রামের টিকিট এবং চা-জলখাবারের দরুন মাত্র পনেরটি টাকা বাদে মাইনের সমস্ত টাকাটাই তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করেছে।

দেবপ্রসাদ অত্যন্ত শান্ত স্থির প্রকৃতির লোক। স্থৈর্য তাঁর এত দৃঢ় যে, তাঁর বড়ছেলে ও নীলার মধ্যবর্তী দু'টি সন্তানের মৃত্যুতেও তাঁর চোখে জল আসে নি। কিন্তু নীলার মাইনের টাকা হাতে নিতেই তাঁর চোখে জল এসেছিল।

জীবনের সবচেয়ে বড় অশান্তি এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছোট ছেলে নেপী। আই. এস-সি পাস করে সে বি. এস-সি পড়ছে, কিন্তু সে নামেই; দিনরাত সে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কিছুদিন থেকে সে প্রায় বাড়ীই আসে না। দেবপ্রসাদ তাকে এক মাস চোখেই দেখতে পান না। গভীর রাত্রে আসে—মৃদুস্বরে নীলাকে ডাকে। শেষ যেদিন তিনি তাকে দেখেছিলেন—সেদিন তাঁর ঘুম ভেঙেছিল ওই ডাকে। ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি পারেন নি। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—বেরিয়ে যা বলছি—বেরিয়ে যা। খবরদার নীলা বারণ করছি আমি, দরজা খুলে দিবি নে।

দরজা খুলতে গিয়ে নীলা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মা নেমে এসেছিলেন, তিনিও দরজা খুলতে সাহস করেন নি। পিছন পিছন দেবপ্রসাদও নেমে এসেছিলেন। নেপী অদ্ভুত। নেপী তখন মৃদুস্বরে নীলাকে ডেকে বলেছিল, দরজা খুলতে হবে না, জানলার ফাঁক দিয়ে চারটি ভাত দাও। বারান্দায় বসে খেয়ে নিই। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

দেবপ্রসাদ নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলেছিলেন—আজ তোমায় আমি মার্জনা করলাম, কিন্তু এমনভাবে যদি ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে থাকে, তবে এ বাড়ীতে

আর এস না। আজ দু-সপ্তাহ ধরে নেপী প্রায় নিরুদ্দেশ। মধ্যে নাকি একদিন সে এসেছিল—কিন্তু দেবপ্রসাদ তাকে চোখে দেখেন নি। নীলাও নাকি রাজনৈতিক দলের মধ্যে গিশেছে! তিনি কি করবেন ভেবে পান না। শিক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। নীলার সে চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকলে তিনি তাকে নিবৃত্ত করবেন কি করে? পারতেন—একটা উপায় ছিল। জীবনে শান্তিপূর্ণ একখানি নীড়ের সংস্থান যদি তিনি নীলার জন্য করে দিতে পারতেন—তবে নীড়ের প্রতি নারীর চিরন্তন মোহে আনন্দে নীলা রাষ্ট্রের কথা, পৃথিবীর কথা হয়তো ভুলতে পারত। কিন্তু তাও তিনি পারেন নি। দেবপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এই সময়েই নীলা বেরিয়ে এল,—স্নান করে খেয়ে সে অফিসে যাচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে সে বললে, অত্যন্ত মৃদুস্বরে—আজ নেপী আসবে বাবা।

ছয়

কানাই এসে দাঁড়াল তার ছাত্রের বাড়ীর ফটকের সামনে। দাঁড়াল কতকটা আকস্মিক ভাবে। যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ীর ভেতর থেকে একটা ঘড়িতে গানের গতের মত বাজনা বাজছে। সওয়া আটটা। কলেজ স্কোয়ারে সে আটটা বাজতে দেখে এসেছে। বড়-লোকের বাড়ীর এই ঘড়িটি প্রতি পনের মিনিট অন্তর বাজে। দামী ঘড়ি। কানাইয়ের মনে হল, আজ আর ভাগ্যকে না মেনে উপায় নাই। ভাগ্য অর্থে অবশ্যই দুর্ভাগ্য!

কানাইয়ের ঠাকুমা মেজগিন্নী যখন অমাবস্যা বা পূর্ণিমার আগমন সম্ভাবনায় বাতবৃদ্ধির আশঙ্কায় অধীর হন—তখন কানাই হাসে, বলে—আকাশে অমাবস্যা লাগল—তার সঙ্গে তোমার পায়ের সম্বন্ধ কি? পা তো থাকে মাটিতে। মোট কথা, গ্রহপ্রভাব বা ভাগ্যকে কানাই স্বীকার করে না, সে বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু আজ এই নীলার সঙ্গে দেখা হওয়াটাকে সে দুর্ভাগ্য বলে মনে না করে পারলে না, কারণ এর ফলে খানিকটা দুর্ভোগ যে অবশ্যম্ভাবী—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সে ছাত্রের বাড়ী ঢুকল। নির্দিষ্ট সময় থেকে অন্ততঃ এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে প্রথমে মনে কয়েছিল আজ আর সে ছাত্রের বাড়ী যাবেই না; কিন্তু মায়ের সেই কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে 'ভাঁড়ারের সব জিনিস ফুরিয়েছে বাবা'—কথা কয়েকটি তাকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। মাইনের টাকাটা আজ তার চাই। মায়ের তাগিদ ছাড়া আরও একটি গোপন তাগিদ এই মুহূর্তে তার মনে জেগে উঠেছে। কাল অথবা পরশু নীলাকে কফি খাওয়াবে সে।

নতুন বড়লোক। হালফ্যাশানের প্রকাণ্ড ঝকঝকে বাড়ী, মার্বেল-মোড়া মেঝে, অত্যন্ত শৌখিন মার্কিনী ফ্যাশানের স্টেয়ার-কেস, বিচিত্র কারুকার্য করা কংক্রীট সিলিং, বহুমূল্য এবং বহুবিধ আসবাব, খানকয়েক মোটর, কুকুর, মায় বাড়ীর সামনে খানিকটা লন্ নিয়ে সে এক আভিজাত্যের আসর। বাড়ীর কর্তা—তিনিই কৃতীপুরুষ,—কাঠের ব্যবসা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে তেঁতুল, তুলো, অভ্র, লোহা প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুর কেনা-বেচা ব্যবসায়ের রস সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছেন ইট-কাট-লোহা ও সম্পদের এই তিলোত্তমা। বাড়ীর নাম সত্যই তিলোত্তমা।

ফটকের গায়ে একদিকে মার্বেল ফলকে কালো অক্ষরে অন্যদিকে কাচের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখা তিলোত্তমা—কাচের নীচে ইলেকট্রিক বাল্‌ব ফিট করা আছে, রাত্রে ঐ বাল্‌বের আলোর ছটায় সোনালী লেখা অগ্নির অক্ষরের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

বারান্দার সামনে থাকবন্দী বালির বস্তা। মধ্যে একটি সরু রাস্তা। কানাই সে রাস্তা ধরে পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। ঘরের দরজা-জানালার মুখেও বালির বস্তা; ইলেকট্রিক আলোগুলোকে ঢেকে আলোক নিয়ন্ত্রণের চমৎকার ঢাকনি। চারিদিকে শো-কেসের মত বইয়ের আলমারীগুলোর কাচে বিচিত্র ছাঁচে কাপড়ের ফালি লাগানো। তারই মধ্য দিয়ে ঝকঝকে বাঁধানো রাশি রাশি বিলিতী বই। অধিকাংশই ইংরেজী, বিদেশী পাব্‌লিশার কোম্পানীর পাবলিকেশন—Encyclopaedia, Book of Knowledge থেকে আরম্ভ করে অতি-আধুনিক কবিতা সংগ্রহ পর্যন্ত সব রকমই আছে। কানাই প্রথম দিন এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত বড় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে যাঁরা মানুষ—তাঁদের বাড়ীর ছেলেকে কেমন করে পড়াবে সেই চিন্তায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আলমারীর এক প্রান্ত থেকে বইগুলোর নামের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে মধ্যস্থলে এসে সে তালা ধরে দাঁড়িয়ে চাবির ছিদ্রের উপরের ঢাকনিটা আঙুল দিয়ে ঠেলেছিল, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই ঠেলেছিল; কিন্তু সেটা কিছুতেই একতিল সরে নি বা নড়ে নি। বিস্মিত হয়ে তালাটার দিকে তাকিয়ে সে এক মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাসিও পেয়েছিল; তালাটায় মরচে পড়ে জাম্‌ ধরে গেছে। শুধু একটায় নয়, সব তালাগুলোরই এক অবস্থা।

কানাই পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। ছাত্র অনুপস্থিত। অবশ্য তার পরীক্ষা হয়ে গেছে, পড়াশুনার তাগিদ খুব নেই। তবু কর্তা সেটা পছন্দ করেন না। এ ছেলেটিকে তিনি বিষয়ী করতে চান না, একে তিনি একজন মনীষী করে তুলতে চান। প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড পণ্ডিত—দেশময় হবে তার খ্যাতি; লোকে বলবে—রত্ন। তাঁর বড়ছেলে দুটি অবশ্য মূর্খ নয়, বেশ ইংরেজী বলে এবং লেখে; তার পর কৃতিত্বের কষ্টিপাথরের 'কষটে' তারা খাদ সত্ত্বেও বাজারে খাঁটি সোনার কদরই পেয়েছে; এবার কর্তা ওই সোনার উপরে এই ছেলেটিকে কেটেকুটে ঘষেমেজে একেবারে একখানি কমলহীরের মত বসাতে চান। তাই তার ঘষা-মাজার বিরাম তিনি পছন্দ করেন না। অঙ্ক, ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাস এবং অপর বিদ্যা এইভাবে ভাগ করে চারজন মাস্টার চার ঘণ্টা পড়িয়ে থাকেন। তবে ছেলেটিকে কানাইয়ের ভাল লাগে; সচ্ছলতায় মধ্যে বেড়ে উঠেছে, তবু ছেলেটির সর্বদেহে মেদময় লালিত্যের পরিবর্তে সবল পেশীদৃঢ়-স্বাস্থ্যের পৌরুষময় রূপ ক্রমশ ফুটে উঠেছে। চঞ্চল দুরন্তপনায় অধীর হলেও ভদ্র, সাধারণ শ্রেণীর মেধা হলেও জানবার আগ্রহ তার প্রবল। ব্যঙ্গভরা বক্রদৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা কানাইয়ের অভ্যাস হয়ে গেছে, তবুও যাদের দেখলে তার বক্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহজ, সরল এবং কোমল হয়ে আসে—ওই ছেলেটি তাদের মধ্যে একজন। ছেলেটি তাদের বাড়ী কয়েকবার গেছে। সুখময় চক্রবর্তীর ঐশ্বর্য-দেবতার শূন্য ভাঙা দেউল দেখে সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে আজও সে তাকে মাইনের টাকা হাতে তুলে দিতে পারে না। মাসের শেষে বাপের মনোগ্রাম করা খাম একখানি হাতে দিয়ে বলে—সার্, এই চিঠিখানা! কানাই এখন আর প্রশ্ন করে না, খামখানা সযত্নে পকেটে রাখে। প্রথমবার একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—চিঠি?

মাথা নীচু করেই ছাত্র অশোক উত্তর দিয়েছিল—বাবা দিয়েছেন।

বলেই সে বাড়ীর ভেতর চলে গিয়েছিল। কানাই খামখানা খুলে—পেয়েছিল নূতন দশ

টাকার নোট তিনখানা।

কর্তা স্বয়ং দেখা করে বলেছিলেন—মাস্টার মশাই, এ আপনার অত্যন্ত অন্যায়। আপনি সুখময় চক্রবর্তী মশাইয়ের প্রপৌত্র! এ কথা বলা আপনার উচিত ছিল।

একটা কঠিন ব্যঙ্গভরা উত্তর কানাইয়ের জিভের ডগায় খেলে গিয়েছিল। কিন্তু সে আপনাকে সংযত করে হাসিমুখে সবিনয়েই উত্তর দিয়েছিল—পরিচয় জানাবার তো কোন ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নি।

কর্তা মোহগ্রস্তের মত শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখের দিক চেয়ে অতীত কালকে স্মরণ করে বলেছিলেন—মাস্টার মশাই, তখন আপনারা জন্মান নি, আমরাই তখন ছেলেমানুষ; সুখময় চক্রবর্তীর ছেলেদের—মানে আপনার পিতামহের—জুড়ী যখন রাস্তায় বের হত, তখন রাস্তার দু'ধারের লোক চেয়ে দেখত। তার পরই তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—রঘুপতির কোশলনগরী—যদুপতির মথুরাই সংসারে বিলুপ্ত হয়ে গেল—আমরা তো সামান্য মানুষ!

কানাই এ কথার কোন জবাব দেয় নি; সে বুঝতে পারে নি কর্তার ওই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির অন্তরালে কোন ভাবনা খেলা করছিল; বিলুপ্ত অতীতের প্রতি মমতা অথবা ভাবীকালে বর্তমানের বিলুপ্তির অবশ্যম্ভাবী বিয়োগান্ত পরিণতি। কয়েক মুহূর্ত পর কর্তার মুখের পেশীগুলি দৃঢ় হয়ে উঠেছিল—ঈষৎ দীপ্ত দৃষ্টিতে কানাইয়ের দিকে চেয়ে তিনি বলেছিলেন—আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে ট্রাস্ট করে দিয়ে যাচ্ছি, সম্পত্তি ভাগ হবে না, কারও বেচবার অধিকার থাকবে না। যারা কাজ করবে ট্রাস্টের জন্যে তারাই আলাউন্স পাবে।

কানাই একটু হেসেছিল। কালের ধ্বংস-শক্তিকে তিনি বিষয়-বুদ্ধির জালে আবদ্ধ করে পঙ্গু করে ফেলতে চান!

একা ঘরে বসে সমস্ত কথাই তার মনের মধ্যে ভেসে গেল পরের পর। কর্তা তখন যুদ্ধের কথা ভাবেন নি। ভাবলেও ভেবেছিলেন ১৯১৪ সালের যুদ্ধের কথা, অর্থাৎ ভেবেছিলেন শুধু লাভেরই কথা; ব্ল্যাকআউট, সাইরেন, শত্রুপক্ষের বোমারু প্লেন, রিট্রীট, ইভাকুয়েশন এসব কথা ভাবেন নি। এখন ভাবেন কিনা কানাই জানে না, তবে তার সন্দেহ হয়, কারণ তিনি এই যুদ্ধের বাজারে নূতন নূতন ব্যবসা খুলে চলেছেন, সম্প্রতি ফেঁদেছেন ধান-চালের ব্যবসা—প্রকাণ্ড কয়েকটি গুদামে রাশি রাশি চাল মজুদ করেছেন। শুধু চাল নয়—আটা চিনিও আছে। কথাটা কানাইকে বলেছে তার ছাত্রটি।

হঠাৎ তার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে দিয়ে একটা চাকর এসে তাকে বললে—কর্তা আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

কানাই বুঝলে বিলম্বের জন্য তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। সমস্ত মন তার মুহূর্তে অগ্নিচ্ছটা-স্পর্শে শাণিত অস্ত্রের মত হিংস্রতায় ঝকমক করে উঠল। গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল, বললে—চল।

কর্তার ঘরের আসবাব দু'ধরনের, একদিকে বিলিতী কায়দায়,—সোফা, কৌচ, টেব্‌ল, পেগ্‌-টেব্‌ল সমস্তই সাহেববাড়ীর কারখানায় তৈরী প্রথম শ্রেণীর জিনিস; অন্যদিকে ফরাশ।

ফরাশ অবশ্য সনাতন ফরাশ নয়; 'ডায়াস' ধরনের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান—দুতিনজনের বসবার উপযুক্ত চারখানা চৌকি, টেবিল ঘিরে চেয়ার বা কৌচ-সোফা সাজানোর ভঙ্গিতে সাজানো;

প্রতিটি চৌকির মাপের তোশক—তার উপর গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ রঙের চাদর বিছিয়ে ফরাশ করা হয়েছে, ফরাশের উপর ওই হলুদ রঙের কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া সারি সারি তাকিয়া, প্রত্যেক চৌকিটির পাশেই দু-তিনটি করে ছোট সুদৃশ জল-চৌকির মত চৌকির উপর সুদৃশ্য পাথরবাটি এবং শ্বেতপাথরের গেলাস সাজানো। পাথরবাটিগুলি অ্যাশ-ট্রে এবং গেলাসগুলি ফুলদানীর স্থলে অভিষিক্ত হয়েছে। এদিকের দেওয়ালে বাঙলার বিখ্যাত চিত্রকরের হাতের পটশিল্প-অঙ্কন-পদ্ধতিতে আঁকা কয়েকখানি ছবি। কৌচ-সোফার দিকটার দেওয়ালে বিলিতী চিত্রকরের আঁকা ছবি।

একটা ফরাশের উপর কর্তা কানে রেডিওর হেড্‌ফোন লাগিয়ে বসে আলবোলা টানছিলেন; বোধ হয় কোন বৈদেশিক বেতারবার্তা শুনছিলেন—বার্লিন, রোম, ভিসি, টোকিও, সাইগনের প্রচারের সময় এখন নয়—হয়তো ফিলাডেল্‌ফিয়া, কালিফোর্নিয়া,—তাও যদি না হয়, তবে কোন অজ্ঞাত দেশের বেতারবার্তা। বাইরে কোন শব্দ যাতে না হয় তাই ওই হেড্‌ফোনের ব্যবস্থা। রেডিও-যন্ত্র একটা নয়, দুটো; একটাতে শোনা হয় ভারতীয় বেতার-বার্তা, অন্যটায় বৈদেশিক। স্মিতহাস্যে আহ্বান করে বললেন—Congratulations মাস্টার মশায়! আসুন—বসুন।

কানাইয়ের ছাত্র অশোক এবার পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে; কিন্তু অঙ্কে ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হয়েছে, একশোর মধ্যে নব্বুই নম্বর পেয়েছে।

কানাই সত্যই খুশী হল। সে হেসে বললে—অশোক কই?

—আপনার কাছে যায় নি সে?

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ, সকালবেলাই সে আপনার কাছে গেছে।

—আমি ভোরবেলাই বেরিয়েছি। পথে একটা কাজে হঠাৎ আটকে গিয়েছিলাম।

—তা হলে সে এক্ষুনি ফিরবে। বসুন। একটু গল্প করা যাক্‌। বলেই তিনি ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গেই এসে দাঁড়াল। কর্তা বললেন—দু কাপ চা নিয়ে আয়। আর মাস্টার মশাইয়ের জন্যে কিছু খাবার।

—না, না, খাবার এখন আর খেতে পারব না আমি। শুধু চা।

কর্তা বার বার ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না, সে হবে না। আজ আপনাকে মিষ্টিমুখ করতেই হবে। তাছাড়া, খেয়ে আপনাকে বলতে হবে—জিনিসটা কী এবং কোথায় তৈরী! কর্তা হাসতে লাগলেন। কিন্তু কানাই কিছু বলবার আগে তিনি নিজেই বললেন—একালে অবিশ্যি কলকাতার মিষ্টির চাপে মফঃস্বলের ভাল জিনিস প্রায় মরেই গেল; কিন্তু সেকালে কান্দীর মনোহরা, জনাইয়ের মনোহরা, গুপ্তিপাড়ার নলেনগুড়ের সন্দেশ, মানকরের কদমা, দুবরাজপুরের ফেনী—বিখ্যাত জিনিস ছিল। এ হল আপনার কান্দীর মনোহরা!

জিনিসটা সত্যই ভাল। কানাই বললে—জনাইয়ের মনোহরা আমি খেয়েছি, আমার এক পিসিমার বাড়ী জনাই। এ মনোহরা জনাইয়ের মনোহরার চেয়ে ভাল। তবে ওপরের চিনির ছাউনিটা একটু বেশী শক্ত।

—চিনির ছাউনিটা শক্ত হলে ভেতরের ক্ষীরের পুরটা ভাল থাকে।

তারপরই কর্তা বললেন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে—চিনি কিছু কিনে রাখবেন।

কানাই তাঁর মুখের দিকে শুধু চাইলে, মুখে কোন প্রশ্ন করলে না।

—বাজারে আর চিনি পাওয়া যাবে না কয়েক দিনের মধ্যে। নলে কয়েকটা টান দিয়ে

আবার বললেন—আটা, চাল—দর হু-হু করে বাড়বে। এর মধ্যে কি কৌতুক আছে, কর্তা সকৌতুকে একটু হাসলেন।

কানাইও নিজেদের সামর্থ্যের কথা স্মরণ করে একটু হাসলে।

কর্তা বললেন—ব্যবসা করবেন মাস্টার মশাই ?

কানাইয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চকিতে গম্ভীর দৃষ্টিতে সে কর্তার মুখের দিকে চাইলে।

আলবোলার নলে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে কর্তা বললেন—আপনি সুখময় চক্রবর্তীর প্রপৌত্র, আপনি আজ তিরিশ টাকা মাইনেতে প্রাইভেট ট্যুইশনি করছেন। আমার বড় কষ্ট হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেলেন—'বাঙালীকে বাঙালী ছাড়া আর কে রক্ষা করিবে ?' আমাদের আপনাকে সাহায্য করা উচিত, তাছাড়া অশোক আপনাকে বড় ভালবাসে।

কানাইয়ের মনের মধ্যে জেগে উঠল তার মায়ের মুখ, অসুস্থ ভাই-বোনদের ছবি, সুখময় চক্রবর্তীর ভাঙা বাড়ী।

কর্তা বলেই চলেছিলেন—আপনি ব্যবসা করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ঋনে, ধারে মাল দেব,—চাল, চিনি, আটা। আজ চালের দর জানেন ? চৌদ্দ টাকা। কাল হয়তো ষোলয় উঠে যাবে। আজ কিনে যদি কাল বেচেন—তাও মনকরা দুটাকা থাকবে আপনার। দৈনিক পঞ্চাশ মণ চাল যদি আপনি কেনা-বেচা করতে পারেন, তবে দৈনিক একশো টাকা, মাসে তিন হাজার টাকা,—বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা লাভ হবে আপনার।

কানাইয়ের শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল—তার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে, হাতের তালু ঘামছে, চোখ দুটির দৃষ্টি স্থির উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে কল্পনানেত্রে দেখছিল—তার মায়ের সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, পরনে পট্টবস্ত্র, দেহ তাঁর নধর লাবণ্যে ভরে উঠেছে, মুখে প্রসন্ন হাসি; ভাই-বোনদের পরনে উজ্জ্বল নূতন পরিচ্ছদ, চিকিৎসকের সূচীমুখে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত বিষামৃতের প্রভাবে বংশগত বিষ নষ্ট হয়েছে—তাদের ধমনীতে বইছে পবিত্র সুস্থ রক্তস্রোত, রোগমুক্ত দেহকোষ; সুখময় চক্রবর্তীর ভাঙা দেউল সুসংস্কৃত হয়ে বর্ণ-বৈচিত্র্যে ঝলমল করছে; কলকাতার রাজপথ দিয়ে চলেছে তার রথ,—মূল্যবান মোটর।

কর্তা বলেই যাচ্ছিলেন—উত্তেজনায় তিনিও এবার উঠে বসলেন—জানেন মাস্টার মশাই, আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতাম, তবে এই যুদ্ধের বাজারে কি লাভ যে হত, সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। লাভ করছে ইউরোপীয়ান কোম্পানী। চাবিকাঠি সব তাদের হাতে। অথচ যোগ্যতায় আমরা তাদের চেয়ে খাটো নই।

তারপর আবার বললেন—করুন, আপনি ব্যবসা করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

কানাই এবার বললে—কাল আপনাকে বলব।—বলে সে উত্তেজনাভরেই উঠে দাঁড়াল। মাইনের টাকাটা পর্যন্ত ভুলে গেল।

—দাঁড়ান। কর্তা তাকিয়ার তলা থেকে একখানা খাম বের করে তার হাতে দিলেন, বললেন—অশোক এটা আপনাকে প্রণামী দিয়েছে। একটুখানি হেসে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—অশোকের নামে একটা যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম তাতে এবার অশোক অনেক টাকা লাভ পেয়েছে। শণের দড়ির জাল। বলে কর্তাও উঠে পড়লেন—বললেন—চলুন, বাইরে রাজমিস্ত্রী লেগেছে দেখে আসি।

একসঙ্গেই দুজনে বেরিয়ে এলেন।

কর্তা আজ অতিমাত্রায় মুখর হয়ে উঠেছেন। হাসতে হাসতে বললেন—আপনি কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন মাস্টার মশাই।

কানাই তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

কর্তা বিচক্ষণ বোদ্ধার মত এবার বললেন—আমার বংশে টাকা আনা পাই, মানে এরিথমেটিকের হিসেবটা সবাই বুঝতে পারে, ওটা প্রায় আমাদের বংশগত বিদ্যে। কিন্তু জিওমেট্রি, অ্যালজ্যাব্রা—এ দুটো হল হাইআর ম্যাথামেটিক্স। অশোক ওই দুটোতেই ফুলমার্ক পেয়েছে—দশ নম্বর তার কাটা গেছে এরিথমেটিকে।

অন্য দিনে হলে হায়ার ম্যাথামেটিক্সের এই ব্যাখ্যা শুনে কানাইয়ের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে হাসতে পারলে না। মোহগ্রস্তের মতই সে পথ চলছিল। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। কর্তা তাকে ব্যবসায়ে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বান তার জীবনাদর্শকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। কর্তার পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে তার মা-বাপ-ভাই-বোন—গোটা সংসার।

বাড়ীর কম্পাউণ্ডের প্রান্তভাগে রাস্তার উপরে একসারি ঘর; ঘরগুলো বাড়ী তৈরীর সময় জিনিসপত্র রাখবার জন্য সাময়িক প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল, ইদানীং পড়েই ছিল, এখন তার সামনে Baffle wall তৈরী হচ্ছে।

কর্তা বললেন—Public Air Raid Shelter করে দিচ্ছি এটাকে।

একজন মিস্ত্রী সেলাম করে একখানা কাগজ এনে সামনে ধরে বললে—বড়বাবু দিলেন, এইটা দেওয়ালে লেখা হবে। চুনকাম করে কালো হরফে লিখে দেব।

রোমান হরফে কাগজটায় লেখা ছিল—

PUBLIC AIR-RAID SHELTER—PROVIDED
BY RAI B. MUKHERJEE BAHADUR

আর্টের মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্যবিধানটা যদি একটা বড় অঙ্গ হয়—তবে বাইরের লেখাটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক অথবা হাস্যকর হয়েছে। কারণ পাবলিক এয়ার-রেড শেল্টার বলে যে দুখানা কুঠরী নির্দিষ্ট হয়েছে তার মাপ বোধ হয় দশ ফুট বাই বারো ফুটের বেশী নয়; আর লেখাটা লম্বায় মাপলে অন্ততঃ পনের ফুট হবে।

এবার কানাই হাসলে। হেসে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে খামখানা খুললে—খামের মধ্যে ছিল একখানা একশো টাকার নোট।

সাত

নোটখানা সে পথেই ভাঙিয়েছিল।

একজোড়া কাবুলী স্যাণ্ডেলের দাম নিলে সাড়ে আট টাকা। অবশ্য জিনিসটা ভাল। কাপড় এবং জামা কিনবারও তার ইচ্ছে ছিল—প্রয়োজনও আছে। কিন্তু কি ধরনের, কি রকমের, কত দামের কিনবে—মনস্থির করতে পারলে না; মিলের ধুতি আর তাঁতের কাপড়ের দামের তফাৎ আজকাল কমে গেছে; মিলের কাপড়ের দাম যে-পরিমাণে বেড়েছে তাঁতের কাপড়ের দাম সে রকম বাড়ে নি। ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ

আজকাল তাঁতের কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে। দশ টাকার জায়গায় বারো টাকা দিয়ে লজ্জা নিবারণের সঙ্গে অভিজাত শৌখিনতাও যেখানে মিটছে, সেখানে হিসেবের দুটো টাকা তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের কাছে। অন্য দিন হলে অবশ্য হিসেবের কথাটা কানাইয়ের মনে একবারও উঠত না, কিন্তু কর্তার ওই ছত্রিশ হাজার টাকার হিসেব এবং নগদ একশো টাকা প্রাপ্তি তার মনেও রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। পথে চলতে চলতে তার মনের দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসা সে প্রায় করে ফেলেছে। কর্তার আহ্বানেই সে সাড়া দেবে। জীবনের আদর্শবাদকে সে বিসর্জনই দেবে; তার বাপ-মা-ভাইবোনদের—বিশেষ করে তার মায়ের দুঃখ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে ব্যবসাতেই নামবে। তাই কাপড় কিনতে গিয়ে কি কাপড় কিনবে এটা একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গেল তার কাছে। একবার এও ভেবেছে, কাপড় না কিনে অল্প দামের স্যুট কেনাই বোধ হয় উচিত। ব্যবসা করতেই যখন নামবে, তখন স্যুট তো দরকার হবেই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত মারোয়াড়ী এবং বাঙালী চাল-ধানের কারবারীর কথাও তার মনে হয়েছে; হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গায়ে বেনিয়ান, গলায় চাদর অথবা পাগড়ী। এই দ্বিধার মধ্যে পড়ে নিজের কাপড়-জামা তার কেনা হয় নি, মায়ের জন্যে এক জোড়া লাল-পেড়ে শাড়ী ও দুটো শেমিজ কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মা যেন তার জন্য প্রতীক্ষা করেই ছিলেন। শেমিজ এবং পঞ্চাশটি টাকা সে মায়ের হাতে তুলে দিলে। কাপড়-শেমিজ রেখে নোট কখানি গুনে দেখে মা তার মুখের দিকে চাইলেন। কানাই প্রশ্ন করলে—এখুনি বাজারে যেতে বলছ?

মৃদুস্বরে মা বললেন—না, বেলায় গেলেই হবে।

—তাই যাব।

তবু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন—কানাই প্রশ্ন করলে—আর কিছু বলছ?'

মা তার দিকে চেয়ে বললেন—আর টাকা?

কানাই সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—অশোক এসেছিল, সে যে বলে গেল, একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিস তুই?

সে বিস্মিত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মা মাথা নীচু করলেন, কিন্তু হাতখানা প্রসারিত হয়েই রইল। কানাই কোন কথা না বলে পকেট শূন্য করে বাকী নোট, টাকা এবং খুচরাগুলো তাঁর হাতে তুলে দিলে। মা আর গুনে দেখলেন না—নিয়ে চলে গেলেন। সে স্তব্ধ হয়ে রইল। ছোট্ট এই ঘটনাটিতে তার অন্তর যেন রি-রি করে উঠল।

দরজার পাশ থেকে উঁকি মারলে একখানি মুখ। অপূর্ব সুন্দর মুখ। তার বোন উমা; চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে। উমার মত সুন্দরী মেয়ে এই কলকাতা শহরে—আভিজাত্যের লীলাভূমি এই মহানগরীতেও তার চোখে দুটি চারটির বেশী পড়ে নি। সাহিত্যে কাব্যে পড়া যায়, রূপের প্রভায় ঘর আলো হয়ে ওঠে; অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে বলা যায় উমার সেই রূপ। ঘর আলো হয় না—কিন্তু ঘর অপূর্ব একটি সুষমায় ভরে ওঠে, যেমন সুন্দর একখানি ছবি টাঙালে ঘরের দেওয়াল মণ্ডিত হয়ে ওঠে অপরূপ শ্রীতে এবং সৌন্দর্যে। উজ্জ্বল শুভ্র আয়ত দুটি চোখ—গাঢ় কালো দুটি চোখের তারা; সে চোখের দৃষ্টিতে সুধাসমুদ্রের মদিরতা। কানাইয়ের মন খারাপ হলেই উমাকে ডেকে তার সঙ্গে সে গল্প করে। উমাকে দেখে তার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে ডাকলে—উমা!

সলজ্জ হাসিমুখে—অকারণে কাপড়ের আঁচল টানতে টানতে উমা এসে ঘরে ঢুকল। তার কাপড় টানার ভঙ্গির মধ্যে কুণ্ঠার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে কানাইয়ের চোখে পড়ল, সে

হাসিমুখেই প্রশ্ন করলে—কি সংবাদ ?

—তোমার ছাত্র এসেছিল।

—অশোক ?

—হ্যাঁ। সে এবার অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছে। তারপর বেশ একটু আদর জানিয়ে উমা বললে—আমাকে একজোড়া কাচের কঙ্কন দিতে হবে কিন্তু।

কানাই একটু হাসলে। উমা বললে—তুমি একশো টাকা পেয়েছ আজ। কানাই উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই এল চটি টানার শব্দ ঠিক দরজার ওপারে। এসে ঢুকলেন বাপ। বিনা ভূমিকায় বললেন—একশো টাকা পেলি তুই, দশ টাকা আমায় দে না।

কানাইয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল ; টাকা নিয়ে তিনি কি করবেন সে তা জানে। বহু কষ্টেই আত্মসংবরণ করে সে উত্তর দিলে—সমস্ত টাকাই মাকে দিয়ে দিয়েছি। বলে উত্তেজনায় পকেট দুটো টেনে বের করে আনলে।

বাপ চলে গেলেন।

উমা কখন এরই ফাঁকে বেরিয়ে গেছে সে তার খেয়াল হয়নি। উমার সন্ধানেই সে বের হল। উমার প্রার্থনা তাকে পূর্ণ করতেই হবে। বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোট খুড়ী—সুখময় চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্রবধূ। তাদেরই মত ধ্বংসোন্মুখ বিত্তশালী ঘরের মেয়ে ; বয়সে কানাইয়ের সমবয়সী। ছোট খুড়ীর চোখে-মুখে কথা, কথাগুলি ব্যাধের তূণের বাণের মতো শাণিত। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই তিনি উপেক্ষা করে চলেন,—তির্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপে ঠোঁটের বাঁকানো ভঙ্গিতে, দ্রুত সশব্দ পদক্ষেপের সঙ্গে সর্বাঙ্গের দোলায় তাচ্ছিল্য যেন উপচিয়ে পড়ে। এ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবার মত রূপ আছে তাঁর, তার উপর এই রূপের প্রভাবে দুর্দান্ত মদ্যপ স্বামীকে জয় করে তিনি তাঁকে মদ ছাড়িয়ে একান্ত অনুগতজনে পরিণত করে তুলেছেন। সুতরাং বিজয়িনীর মত চলাফেরা করবার অধিকারও তাঁর আছে। আজ তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন—একদিন সিনেমা দেখাও কানু।

—বেশ তো।

—বেশ তো নয়, কবে দেখাচ্ছ বল ?

—আসছে সপ্তাহে।

অভ্যাসমত মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে এবার ছোট খুড়ী বললেন—একশো টাকার সুদ থেকে দেখাবে বুঝি ? বলে রেলিংয়ের ওপর বুক দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে খেলার ছলেই বোধ করি থুথু ফেললেন।

কানাইয়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। জ্ঞাতিত্বের অপ্রীতি মেশানো ক্রূর আঘাত যেন বিষাক্ত শলাকার মত তাকে বিদ্ধ করলে। ছোট খুড়ী হাসতে হাসতে আপনার ঘরের দিকে চলে গেলেন, গভীর স্নেহ প্রকাশ করে বলে গেলেন—না—না। তোমায় ঠাট্টা করছিলাম বাবা। এক সপ্তাহের সুদ যেটা পাবে—পরের সপ্তাহে সেটাই তোমার আসলে দাঁড়াবে, তারও সুদ পাবে।

কানাই বাধা দিয়ে বলে—দাঁড়াও ছোট খুড়ী। তোমায় একটা প্রণাম করি।

ছোট খুড়ী ঘরে ঢুকে বললেন—থাক্ বাবা, এমনিই আশীর্বাদ করছি, তুমি লক্ষপতি হও।

কানাইয়ের সর্বশরীর জ্বালা করে উঠল। মনের ক্ষোভ-মেটানো অত্যন্ত জ্বালাকর উত্তর খুঁজে না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। অকস্মাৎ পিছনে অত্যন্ত মৃদু চাপা হাসির শব্দ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেজকর্তার পৌত্র, আঠারো বছরের শিশু-

মানবটি উলঙ্গ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নগ্ন প্রতিবিম্ব দেখে মৃদু-গুঞ্জনে হাসছে! মাথার ভেতর তার যেন আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু তবু তাকে আত্মসংবরণ করতে হল; মেজকর্তার পরম যত্নে আদরে গড়ে তোলা এই আঠারো বছরের শিশুমানবটিকে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। অভ্রান্ত জ্যোতিষী কোষ্ঠীগণনায় বলেছে—শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, ভাবীকালে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি হবে। মেজগিন্নী ওকে দেবতার মত সেবা করেন। মেজকর্তা নিত্যনিয়মিত ওষুধ খাইয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখেন। ওর এই উলঙ্গ অশ্লীলতা—বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে দেবতাভাবের স্ফুরণের ভূমিকা। ঘৃণায় ক্রোধে তার সমস্ত অন্তর অধীর হয়ে উঠেছিল। আত্মসংযম হারাবার ভয়েই সে দ্রুতপদে সেখানে থেকে পালিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পেছন থেকে ডাকলেন মেজগিন্নী—কানু!

কানু ফিরে দাঁড়াল। বাতে কুঁজো হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজগিন্নী, ভাবলেশহীন মুখ, অকুণ্ঠিতভাবেই তিনি বললেন—আমায় দশটা টাকা ধার দিবি? একশো টাকা পেয়েছিস শুনলাম!

রূঢ়স্বরে কানু বললে—না।—বলেই সে দ্রুততর গতিতে দোতলায় নেমে চলে গেল আপনার ঘরের দিকে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল যূথী, মেজকর্তারই পৌত্রী—যে সুযোগ পেলেই পথে-ঘাটে গোপনে ভিক্ষে করে। ঘরের মধ্যে তার জামাটা মাটিতে পড়ে আছে, শুধু জামাটাই নয়, ট্রামের মান্থলি টিকিট—পকেটের কাগজপত্র সমস্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। অত্যন্ত কটু হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। যূথী গোপনে খুঁজতে এসেছিল তার পকেটে—ঐ একশো টাকা।

সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে;—সুখময় চক্রবর্তী কি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে বঞ্চনা করে তাদের চরমতম মর্মান্তিক অভিসম্পাত কুড়িয়েছিলেন?

তেতলা থেকে ভেসে এল মেজকর্তার উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।—কালীঘাটের বস্তি বিক্রী করে রেজেস্ট্রি আপিস থেকে বেরুলাম—পকেটে চেকে নগদে দেড় লক্ষ টাকা। রতনবাঈয়ের বাড়িতে সন্ধ্যে থেকে বারোটার মধ্যে দেড় হাজার টাকা পায়রার পালখের মত ফুঁয়ে উড়ে গেল। বারোটার পর আমার জুড়ী আসছে চিৎপুর দিয়ে; শীতকাল—শালে ওভারকোটে শীত কাটে না। হঠাৎ নজরে পড়ল—একটা গ্যাস-পোস্টের ধারে একটা খোলার ঘরের বেশ্যা দাঁড়িয়ে শীতে হি-হি করে কাঁপছে। ক্রমে দেখলাম, একজন নয়, সারি সারি। বাড়ী এসে ঘুম হল না। পরের দিন রাত বারোটায় জুড়ী নিয়ে বেরুলাম—সঙ্গে একশোখানা আলোয়ান—সে আমলে একখানার দাম আট টাকা। পরের দিন গোটা কলকাতায় গুজব হল—দিল্লীর বাদশার কোন্ এক বংশধর কলকাতায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—একশো টাকা! আরে রাম কহো! রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন—মাটি সোনা—সোনা মাটি! নারায়ণ! নারায়ণ! একশো টাকা—আরে ছি! ছি! ছি!

জানালার গরাদ ধরে শূন্য দৃষ্টিতে সে রাস্তার ওপারের বস্তিটার দিকে চেয়ে রইল। বেলা প্রায় বারোটা, বস্তিটা এখন স্তব্ধ; বেলা নটার মধ্যেই পুরুষেরা খেয়েদেয়ে কাজে বেরিয়ে গেছে, মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছে। যে বাড়িতে এখনও কাজকর্মের জের চলছে, সেগুলির পুরুষেরা কর্মহীন বেকার; বাড়িতে তাদের খাবার আয়োজন একবেলা—তাই খাবার সময়টাকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করে ওবেলার অন্নাভাবের কালটাকে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হচ্ছে।

গীতাদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া আজ এরই মধ্যে হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। গীতার

বাপ ওই যে বারান্দায় রৌদ্রের আমেজে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছে, অন্তদিন এ সময় লুঙ্গি পরে বসে বিড়ি টানে আর কাশে। গীতার মা বসে পান চিবুচ্ছেন—আর গল্প করছেন মোটা ঘটকীটার সঙ্গে। গীতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোঠার কাঠের রেলিংয়ে ভর দিয়ে। গীতাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে। পরনে তার নতুন রঙীন কাপড়; মাথায় চুলের রাশি এলানো। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে গীতা। বোধ হয় ঘটকী কোন সম্বন্ধ এনেছে। গীতার মা কয়েক জোড়া নতুন কাপড় রেখে বাকী কয়েক জোড়া ঘটকীকে ফেরত দিলে। তা হলে পাত্রটি নিশ্চয় কোন অবস্থাপন্ন হৃদয়বান তরুণ। পরক্ষণেই সে শিউরে উঠল—হয়তো কোন ধনী বৃদ্ধ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে গীতাকে বিবাহ করছে—কন্যার অভাবগ্রস্ত বাপ-মাকে ঘুষ দিয়ে বার্ধক্যের অতৃপ্ত লালসাব্যাধি পরিতৃপ্তির জন্য।

পরক্ষণেই মনে হল—তা হোক; তবু তো গীতা ভাল খেতে পরতে পারবে। গীতার মা-বাপের তো দুঃখের লাঘব হবে! সাচ্ছল্যের প্রসাদে দেহ তার পুষ্টিতে ভরে উঠুক, সেই পুষ্টিই তাকে মনের অসন্তোষ সহ্য করবার—বহন করবার মত শক্তি দেবে। তারপর তার কোল জুড়ে আসবে সন্তান—সে-ই তখন তার সে অসন্তোষ নিঃশেষে মুছে দেবে। আর, যদি সে সন্তান তাদের মত ব্যাধিগ্রস্তের রক্ত বহন করে অকালে মরে, তবে? পরমুহূর্তেই মনে হল, না, তার মধ্যেও গীতা আপনার একটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। কিন্তু সে কথা কল্পনা করতে তার মন চাইলে না। বার বার সে কামনা করলে—আশীর্বাদ করলে—গীতার পবিত্র সতেজ রক্তধারার এবং দেহকোষের প্রসাদে তার সন্তান সকল ব্যাধির বিষকে জয় করবে। তা ছাড়া বিজ্ঞান তো ব্যতিক্রমের কথাও মানে; ব্যাধিগ্রস্তের বংশে সুস্থ সন্তান সম্ভব বলেও স্বীকার করে! তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

কিন্তু সে কি করবে? কি তার পথ? কিছুক্ষণ আগে পথে আসতে আসতে সে যা স্থির করেছিল—সে স্থিরতা আর তার নাই। সুখময় চক্রবর্তীর বংশের ভাঙাবাড়ির ইটগুলো—ওই নোনাধরা ইটগুলো পর্যন্ত ক্ষুধিত—শুধু ক্ষুধা নয়, তার অন্তরালে আছে যে ঘৃণ্য লোলুপতা—তাতেই তার স্থিরতার দৃঢ়তার ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে গেছে! ওই নোনাধরা ইটগুলো ঢাকতে পলেস্তারা যতই খরচ সে করুক না কেন, তা আবার খসে পড়বে; তার নোনাধরা স্বরূপ আবার বেরিয়ে পড়বে।

আট

ব্ল্যাক আউটের কলকাতা; শুক্লপক্ষের প্রথম তিথির রাত্রি; চাঁদ ডুবে গেছে। একদিন মাটির বুকের এই মহানগরীটির আলোক-সমারোহে বিচ্ছুরিত ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ছটা আকাশমণ্ডলে যেন অভিযান করত; আজ শত্রুপক্ষের আকাশচারী বোমারুর শ্যেনদৃষ্টি হতে আত্মগোপনের জন্য তার সমস্ত আলো, আলোক-নিয়ন্ত্রণী আবরণে এমনভাবে আচ্ছন্ন করা হয়েছে যে, অন্ধকার জমাট বেঁধে শহরের বাড়িগুলোর মাথায় এবং রাস্তার বুকের উপর নেমে এসেছে। ট্রাম-বাস-মোটরের আলোকরশ্মি দীপ্তিহীন প্রেতচক্ষুর মত অন্ধকার রাস্তার মধ্য দিয়ে সশব্দে আসছে যাচ্ছে। বাস-ট্রামের ভিতরে আবছা আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে যাত্রীদের দেখা যায়, চেনা যায় না; মনে হয় রূপহীন অবয়বের একটি দল চলেছে। রিক্সার যাত্রীদের দেখাই যায়

না, নীচের কাগজ-ঢাকা স্তিমিত আলো দুটি বিন্দুর মত ছুটে চলে যায়, নেহাৎ কাছে এলে দেখা যায় মানুষের দুটো পা শুধু উঠছে, পড়ছে—ছুটছে। ফুটপাতের ওপর মানুষ চলেছে সন্তর্পিত গতিতে।

পথপার্শ্বের দোকানগুলির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু তার রশ্মিধারা বাইরের দিকে নিরন্ধ্র-আবরণীতে প্রতিহত। মধ্যে মধ্যে বড় দোকানের উচ্চশক্তির ভাস্বর আলোর ছটা আবরণীকেও ভেদ করে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত খানিকটা আভা ফেলেছে রাস্তার উপর। অন্ধকারের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য চলন্ত মানুষের দল এইখানে এসে কালো মূর্তির মত কয়েক মুহূর্তের জন্য জেগে উঠে আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কচিৎ কখনও ট্রামওয়ের তারে চলন্ত ট্রামের ট্রলির সংঘর্ষে বিদ্যুচ্চমকের মত একঝলক নীলাভ দীপ্তি ঝলকে উঠে অন্ধকারকে পরমুহূর্তে গাঢ়তর করে তুলছে। আকাশের বুকে এরোপ্লেনের শব্দ উঠছে,—পাশাপাশি দুটি রঙীন উল্কাবিন্দুর মত লাল নীল দুটি আলোকবিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে চলে যাচ্ছে।

ট্রাম থেকে কানাই নামল। সমস্ত অপরাহ্ণবেলাটা সে কার্জন পার্কে বসে কাটিয়েছে। কর্তার কথা ভেবেছে আর ভেবেছে তার বাড়ীর কথা। মাসে তিন হাজার টাকা উপার্জন! ভাবে—কাল তিন হাজার তিরিশ হাজারে উঠতে পারে। যুদ্ধ যদি চলে—! যুদ্ধ চলবে বৈকি। পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ—আটলাণ্টিক হতে প্যাশিফিক পর্যন্ত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে যুদ্ধের ব্যাপ্তি—সে কি হঠাৎ থেমে যাবে? ভূমিকম্প নয়, সাইক্লোন নয়, জলোচ্ছ্বাস নয়, যে অপ্রতিহত গতিতে প্রাকৃতিক বৈষম্যের উচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হয়ে এলেই থেমে যাবে। যুদ্ধ মানুষের হাতে, যে অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মানুষ এ যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে, তার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিরস্ত হবে না। যে কৃত্রিম বৈষম্যের ফলে এ যুদ্ধ-সৃষ্টি মানুষ সম্ভব করে তুলেছে, যুদ্ধের অপচয়ে সে বৈষম্য এক দিকে ক্ষয়িত হয়ে আসছে, কিন্তু মানুষ প্রাণপণে সে বৈষম্যকে পরিপূরিত করে চলেছে। আর যদিই বা থামে, তবে ভাবীকালের নবতর যুদ্ধের ভূমিকা রচনা করে তবে সে থামবে। সুতরাং তিন বা তিরিশ হাজার সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা কিছু নেই। পরক্ষণেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিন বা তিরিশ হাজার কতটুকু? মরুভূমির মত তাদের অভাবে বালুময় সংসারের তৃষ্ণার কাছে—তিন বা তিরিশ হাজার বিন্দু কতটুকু? মরুতৃষ্ণার মত যে তৃষ্ণা আজই সে প্রত্যক্ষ করেছে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সে ভাবে আপন জীবন-স্বপ্নের কথা। তার একমাত্র স্বপ্ন, তার সমস্ত ছাত্র-জীবনের কল্পনা আকাঙ্ক্ষা, এম্‌, এস-সি পাস করে বিজ্ঞানে গবেষণা করবে, একটা কিছু আবিষ্কার করবে। সমস্ত অন্তরটা তার টনটন করে ওঠে। মনে হয় সম্পদের আরাধনা করেই বা সে করবে কি? অভাব-দুঃখের বেদনা যত বড়, যত তীব্রই হোক, সম্পদ-সঞ্চয়ের যে বিয়োগান্ত পরিণতির মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করেছে তাতে সে সম্পদসঞ্চয়কে ঘৃণা করে—ভয় করে; সম্পদ সঞ্চিত হলেই স্বভাবধর্মে সে পচনশীল মিষ্টরসের মত ফেনায়িত মাদক-রসে পরিণত হবেই। সুখময় চক্রবর্তীর বংশের দন্তহীন মুখের কদর্য লোলুপ যে গ্রাস-বিস্তার সে দেখেছে, তাতে সম্পদের ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। তা ছাড়া তার জীবনের আদর্শ, যে আদর্শে সে দীক্ষা নিয়েছে, তাতে এ পথ তার পক্ষে সর্বদা বর্জনীয়।

নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব! সমস্ত দিনটা বাড়ীতে বসে ভেবে কিছু স্থির করতে পারে নি। বিকেলে গিয়ে প্রথমে স্যার্ আশুতোষের প্রতিমূর্তির পাশে দাঁড়িয়েছিল সে। ইচ্ছে ছিল, নীলার ছুটি

হলে তার সঙ্গে দেখা করে তার পরামর্শ নেবে। কিন্তু নীলা বেরিয়ে এল আরও কয়েকটি সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গে। কানাই এমন একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে, তার ইচ্ছে হল না ওদের মধ্য থেকে নীলাকে স্বতন্ত্র ডাকতে; মনে হল—সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গসুখতৃপ্তা হাস্যপরিহাস-মুখরা নীলা—কানাইয়ের কথা শুনবার মত মন কোথায়? তার সমস্যার উত্তর সে কেমন করে দেবে? জনস্রোতের মধ্যে মিশে, নীলার চোখ এড়িয়ে এসে সে বসল কার্জন পার্কে।

সেখানে বসে এতক্ষণ কাটিয়ে সে ফিরছে।

ট্রাম থেকে নেমে গলিরাস্তা। গলির মধ্যে অন্ধকার গাঢ়, তিনটে গ্যাসপোস্টের ঠুঙি-পরানো আলোর আভাস শুধু শূন্যলোকে ভাসছে। জনবিরল পথ। শীতের রাতে দুধারে বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ। গলির মোড়ে বড় রাস্তার পাশে হঠাৎ প্রায় তার সামনেই গর্জন করে উঠল একটা মোটর। পরক্ষণেই জ্বলে উঠল ব্ল্যাক-আউটের ঠুঙি পরানো হেড-লাইট। গাড়িটা এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল—স্টার্ট দিলে। কানাই চমকে উঠেছিল প্রথমটা। পরক্ষণেই সে বিস্মিত হল। গাড়িখানা বেরিয়ে যেতেই নজরে পড়ল—পেছনের নম্বরটা। অত্যন্ত পরিচিত নম্বর। তার ছাত্র অশোকদের গাড়ির নম্বর বোধ হয়। গাড়িখানাও ঠিক তেমনি ওদের ছোট গাড়িখানার মত অবিকল একরকম। সে এসে দাঁড়াল আপনাদের বাড়ির প্রকাণ্ড গাড়ি-বারান্দাটার মধ্যে।

—কে?—কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল আবছায়ার মত।

—আমি নেপী। সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেটি এগিয়ে এল।

—কি, নেপী? এমন সময়?

—কাল জনসেবা-কমিটির মিটিং; আপনাকে যেতেই হবে। বলতে এসেছি আমি। আমাদের ছেলেদের অনেক কম্‌প্লেন আছে—আপনাকে আমাদের হয়ে বলতে হবে।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল কানাইয়ের মুখে—ব্যঙ্গের নয়, স্নেহের হাসি। নেপীকে সে বড় ভালবাসে। নীলার পাগল-ভাই নেপী! নেপী পৃথিবীর মানুষের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। দিন নাই—রাত্রি নাই, আহার নাই—নিদ্রা নাই, প্যাম্ফলেট বগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিলি করছে, দেওয়ালে আঁটছে, বুভুক্ষুর দলকে ডেকে ডেকে মিছিল করছে, সমস্ত অন্তর ফাটিয়ে চীৎকার করছে—মানুষের জন্য রুটি চাই, ভাত চাই। তার জন্য আপনার সাধনার দীর্ঘজীবন কামনা করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

নেপী অনুনয় করে বললে—আপনাকে যেতেই হবে কানুদা।

—যাব। কিন্তু কিছু খেয়েছিস তুই? মনে পড়ল নীলার মুখে শোনা নেপীর দৈনন্দিন জীবনের কথা।

—না। এই বাড়ি যাচ্ছি,—অন্ধকারে দেখতে না পেলেও তার হৃষ্ট কণ্ঠস্বরে কানাই অনুমান করলে কথা বলতে গিয়ে নেপীর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। কানাই বললে—দাঁড়া।—সে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর চলে গেল। সুখময় চক্রবর্তীর পুরী অন্ধকার। ইলেকটিক কোম্পানী বিলের টাকা না পেয়ে অনেক দিন আগেই কনেক্‌শন কেটে দিয়েছে; ঘরে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে, সিঁড়ি-উঠোন-বারান্দা অন্ধকার; অন্ধকারের মধ্যেই অভ্যাসের ইঙ্গিতে দ্রুতপদেই সে মায়ের ঘরের দিকে চলেছিল। আজই সে টাকা এনে দিয়েছে, খাবার কিছু অবশ্যই আছে আজ—অন্ততঃ তার জন্যও যেটা রাখা আছে, সেটা সে নেপীকে খাওয়াতে পারবে। বন্ধ দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। কানাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল দরজার মুখে।

তার বাবা একটা বোতল নিয়ে বসে মদ খাচ্ছেন। তার মা থালার উপর খাবার সাজিয়ে দিচ্ছেন। গন্ধ থেকে বুঝতে পারা যায়—মাংস থেকে প্রস্তুত কোন খাদ্যবস্তু। মা তার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টেনে দিলেন। বাবা তার দিকে আরক্ত চোখ তুলে বললেন—দশ টাকা তোর মা আমাকে দিয়েছে, দশ টাকা। তারপর বোতলটা তুলে ধরে বললেন—Eight twelve—তাও country-made whisky! কি যুদ্ধই লাগল বাবা! আর দু টাকা চার আনা দিয়ে এনেছি—First class mutton! স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—দাও না কানুকে একটু মাংস, চেখে দেখুক!

কানাই প্রথমটা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অকস্মাৎ তার চোখে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। চক্রবর্তী-বাড়ীর নোনাধরা ইট। তার পরমুহূর্তেই সে ফিরল,—দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য! তার মা অন্নপূর্ণার মত বসে শিবের মত নেশাখোর স্বামীকে মদ ও মাংস খাওয়াচ্ছেন! মনে হল এই সময় একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সুখময় চক্রবর্তীর বাড়িটা তার সকল বংশধরকে নিয়ে ধরিত্রীগর্ভে যদি সমাহিত হয়, তবে সে জয়ধ্বনি করে ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে করতে মরতে পারে!—কিন্তু নেপী কই?

নেপী! নেপী চলে গেছে। বিচিত্র ছেলে, হয়তো আবার কোনও কাজ মনে পড়েছে। নইলে সে কখনই যেত না। না, ওই সে আসছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় লক্ষ্য করে সে এগিয়ে গেল।—নেপী!

—না বাবা, আমরা। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্তরাল থেকে ফুঁপিয়ে কে কেঁদে উঠল।

কানাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—কে? সে এ-পাড়ার সকলকেই চেনে। যে কাঁদছিল, তার কান্নার মাত্রা বেড়ে গেল। প্রৌঢ়া সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে বললে—অন্ধকারে হুঁচোট লেগেছে বাবা। আয়—আয়, বাড়ি আয়।

উচ্ছ্বসিত কান্নার মধ্যে ক্রন্দনপরায়ণা বললে—না।

এবার কানাই কণ্ঠস্বর চিনতে পারলে। বর্ধিত বিস্ময়ে ডাকলে—গীতা!

প্রৌঢ়া সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে ফিরে বললে, তবে তুই বাড়ি যাস্। আমি চললাম। বলেই সে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চলে গেল। অন্ধকারের মধ্যে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে অধীর হয়ে গীতা সেই পথের ওপরেই যেন ভেঙে পড়ে গেল।

—কি হল গীতা? কি হয়েছে? ওঠ। ওঠ।

ধূলায় লুটিয়ে গীতা কাঁদতে আরম্ভ করলে।

—কি হয়েছে বল?

বহু কষ্টে গীতা বললে—আমায় বিষ এনে দাও কানুদা।

কানু শিউরে উঠল।

গীতা আবার বললে—কেমন করে আমি এ মুখ দেখাব?

কানু সস্নেহে তাকে হাতে ধরে আকর্ষণ করে বললে—ওঠ। কি হয়েছে বল দেখি!

—ওই ঘটকী আমায়—। আবার সে কেঁদে উঠল।

বহু কষ্টে গীতা যা বললে—তা শুনে কানাই যেন পাথর হয়ে গেল। ওই ঘটকী তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল কোন ধনী পাত্রকে দেখাবার জন্য। গীতার ফোটো দেখে পাত্র

নাকি গীতা এবং তার মা-বাবাকে কাপড় পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল—কন্যাটিকে যেন তাঁরা ঘটকীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন—তিনি চোখে একবার দেখবেন; তাঁর পক্ষে বস্তিতে কন্যা দেখতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। ঘটকী তাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়। তার সে বাড়ীতে চলে গোপন দেহ-ব্যবসায়। ঘটকী তাকে সেই ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে বিক্রী করেছে।

গীতা আবার বললে—কেমন করে আমি বাঁচব কানুদা?

কানু বললে—ছি ছি, ছি, তোমার মা—

মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে গীতা বললে—মা জানে কানুদা, মা জানে।

—জানে!

—জানে। নিশ্চয় জানে। নইলে যাবার সময় আমায় কেন সে বললে—বামুনদিদি যা বলবে, তাই শুনিস মা। তোর দৌলতে যদি দুটো খেতে পরতে পাই; নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও পৃথিবীর এক অদ্ভুত মূর্তি ভেসে উঠেছিল তার চোখের সম্মুখে। সর্বাঙ্গে দুষ্টক্ষতময়ী পৃথিবী। সুখময় চক্রবর্তীর রক্ত কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে? পৃথিবীর পথে পথে কি চক্রবর্তী-বাড়ীর নোনাধরা ইট ছড়িয়ে পড়েছে?

গীতা বললে—নইলে মা কাপড়গুলো নিলে কেন? শুধু মা নয় কানুদা, বাবাও জানে। সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কানাই নির্বাক।

—আমি কি করব কানুদা?

কানাই দৃঢ়মুষ্টিতে তার হাত ধরে বললে—আমাকে বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে আসতে পারবে গীতা?

গীতা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কানাই অন্ধকার পথের দিকে হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে বললে—যদি পার তো এস আমার সঙ্গে।

—তোমাদের বাড়ী?

—না। এ বাড়ীর সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

নয়

বাঙালীর জীবনে ভীরুতার অপবাদ নিতান্ত মিথ্যা কথা নয়। তার কল্পনা আছে; কিন্তু সে কল্পনা কার্যকরী করে তোলবার মত বাস্তব জ্ঞান তার নেই; কর্মের পথে পা বাড়িয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভাসতে তার ভয় আছে—একথা সত্য। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর। বৈজ্ঞানিকেরা নানা ব্যাখ্যা করে থাকেন, বিজ্ঞানের ছাত্র কানাইয়ের নিজেরও সে ব্যাখ্যায় অনুমোদন আছে;—জীবনধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী বাঙলার শস্য-সম্পদ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির সমাজব্যবস্থা তার কর্মশক্তিকে আলস্যাচ্ছন্ন করে ক্রমশঃ তাকে সুষুপ্তির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। তার দেহকোষ এবং বীজকোষের পরস্ব গ্রাসের

ইচ্ছার পক্ষে প্রয়োজনীয় অভিযানের দুঃসাহসিকতার যে আবেগ—সে আবেগ তার সুষুপ্ত হয়ে গেছে।

কানাই তার নিজের জীবনে বহুবার কর্মশক্তির এই দুঃসাহসিকতা জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুখময় চক্রবর্তী হতে তার বাপ পর্যন্ত—তিন পুরুষ ধরে যে শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছেন, যে ঘুম বিশ্রাম এবং আরামকে অতিক্রম করে আজ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে—সুখময় চক্রবর্তীর রাক্ষসী-মায়ায় ঘুম-ভরা এই পুরী সে পরিত্যাগ করে নূতন যুগের অভিনব মানব-গোষ্ঠীর এক বংশের প্রথম পুরুষ হিসাবে জীবন আরম্ভ করবে। নিজের রক্তধারার বিষকে নষ্ট করিয়ে সুস্থ এবং পবিত্র করে নেবে। তারপর কাজ আরম্ভ করবে—বিপুল উৎসাহে, প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু পারে নি। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম বাধা দাঁড়িয়েছিল তার মায়ের স্নেহ; যে বংশে তার জন্মকে সে অভিশাপ বলে মনে করে সেই বংশের প্রতি মমতা। কেমন করে যে বিপরীত-ধর্মী দু'টি হৃদয়বৃত্তি—ঘৃণা ও মমতা পাশাপাশি তার মধ্যে বাস করছে—সে তার নিজের কাছেও এক রহস্য বলে মনে হয়েছে। এই দু'টি বিপরীত হৃদয়ধর্ম তার মনকে দু'দিক থেকে আকর্ষণ করে তাকে গতিহীন করে রেখেছে। কল্পনা সে করেছে অনেক। কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নি। আজ ওই একশো টাকার উপর সমগ্র পরিবারের লোভ দেখে—বিশেষ মাংসের উপকরণ সহযোগে মদ্যের নৈবেদ্য সাজিয়ে তার মায়ের আত্মত্যাগ এবং স্বামীসেবার নিষ্ঠার বিকৃতি দেখে তার ঘৃণার দিকটা অধীর শক্তিতে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। সে নিজে কয়েকটা টাকা রেখেছিল, তা তার মায়ের সহ্য হয় নি; কিন্তু স্বামীদেবতাকে দশ-দশটা টাকা মদের জন্য দিয়ে অপব্যয় করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা হল না। তারপর গীতার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে সমগ্র বর্তমানের উপরেই নিষ্ঠুরভাবে মমতাহীন হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত অধীর হৃদয়াবেগের শক্তিতে এক মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় অস্পষ্ট কানাই সক্রিয় হয়ে নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠল; যেন একটা আকস্মিক ভূমিকম্পে পাথরের পুরী ফেটে গিয়ে তার মধ্য থেকে মুক্তির পথ পেল। দুর্যোগভরা মুক্ত পৃথিবী ওই চক্রবর্তী-বাড়ীর চেয়ে কম ভয়াবহ—কম জটিল নয়; সে কথা কানাই জানে—তবু জটিল পৃথিবীর বুকে—জীবনের পথ বেছে নিতে তার এতটুকু দ্বিধা হল না; গীতার হাত ধরে মহানগরীর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অজানিত ভবিষ্যতের মধ্যে ভেসে পড়ল।

কিছুদূর এসে গীতা সভয়ে প্রশ্ন করলে—এই রাত্রে কোথায় যাবেন কানুদা?

কানাই স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরে বললে—এত বড় কলকাতা শহর, লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে থাকে, সেখানে কি দু'জনের এক রাত্রির মত জায়গা মিলবে না ভাই? এস।

গীতা আর কোন প্রশ্ন করতে পারলে না; কিন্তু জীবনের পটভূমিকার যে স্বল্পপরিসরতার মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে, যে সব মানুষকে সে দেখেছে, তাতে গাঢ় অন্ধকার রাত্রে দু'টি অপরিচিত নরনারীর জন্য যে কোন গৃহদ্বার সহৃদয়তার সঙ্গে উন্মুক্ত হতে পারে, এ আশ্বাসে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তাদের বস্তিতে এক বাড়ির একটুকরো ছেঁড়া কাগজ যদি কোনক্রমে অন্য বাড়িতে গিয়ে পড়ে অথবা কেউ যদি মুক্ত বায়ুর জন্য অপরের বাড়ির দিকের জানালা খুলে মুহূর্তের জন্য সেখানে দাঁড়ায়, এমন কি কেউ যদি রোগের যন্ত্রণাতেও অধীর হয়ে কাতর চীৎকার করে, তবে সেই মুহূর্তে যে অসহিষ্ণু তীব্র কদর্য প্রতিবাদ ওঠে, সে কথা স্মরণ করে গীতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বড় বাগানওয়ালা বাড়ীটায় দুটো পূজার ফুল তুলতে হয় লুকিয়ে; বস্তির ওপাশে প্রকাণ্ড ছ'তলা বাড়ীটায় ইলেকট্রিক পাম্পওয়ালা দুটো টিউবওয়েল আছে, সেখানে গীতা গিয়েছিল তার অজীর্ণরোগগ্রস্ত বাপের জন্যে খাবার

জল আনতে,—তারা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে কানাই একটা ট্যাক্সি ডাকলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গাড়ী থামল একটা অন্ধকার অল্পপরিসর রাস্তার উপর। কানাই একটা বাড়ীর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল—বিজয়দা! বিজয়দা!

ট্যাক্সি-ড্রাইভার হাঁকল—বাবু, আমার ভাড়া?

—সবুর কর। নিয়ে দিচ্ছি। বলে সে আবার ডাকল—বিজয়দা!

একজন চাকর দরজা খুলে দিয়ে প্রশ্ন করল—কে?

—ষষ্ঠী, বিজয়দা কোথায়?

—কানাইবাবু? বাবু তো এখনও ফেরেন নি।

—ফেরেন নি? তাই তো! তোমার কাছে টাকা আছে ষষ্ঠী?

—আজ্ঞে টাকা তো নেই।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার অধীর হয়ে উঠল—বাবু!

গীতা আপনার আঁচল খুলে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে এগিয়ে দিল। ড্রাইভার বললে, চেঞ্জ নাই আমার।

মৃদুস্বরে গীতা বললে—চেঞ্জ চাই না। ড্রাইভার মুহূর্তে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ীখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। কানাই সবিস্ময়ে পিছন ফিরে চাইতেই সে বললে—আমার কাছে একখানা পাঁচ টাকার নোট—। আর সে বলতে পারল না, মুহূর্তে নোটটার ইতিহাসের মর্মান্তিক স্মৃতি তার অন্তরের মধ্যে আবার উদ্বেল হয়ে উঠে চাপা কান্নার উচ্ছ্বাসে তার স্বর রুদ্ধ করে দিলে।

কানাই ব্যাপারটা বুঝলে; সান্ত্বনার হাসি হেসে সে বললে—বেশ করেছ। এস।

•

কানাইয়ের বিজয়দা—একখানা দৈনিক ইংরেজি কাগজের আপিসে কাজ করেন। সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সম্পাদক। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রের আসরে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'ভাগ্যাকাশ' 'ঘনঘটা' 'ঘোরঝঞ্ঝা' 'মহাকাল' 'তমসারূপিণী কালিকা' নিয়ে ফেনোচ্ছ্বসিত বাংলাদেশের সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলির মধ্যে ফেনোচ্ছ্বাসবর্জিত যুক্তিতর্কের প্রখর স্রোতসম্পন্ন লেখাগুলি পড়লেই সকলে বুঝতে পারে—এ লেখা বিজয়বাবুর। এছাড়া আরও একটা পরিচয় তাঁর আছে। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই যে সব বাঙালীর ছেলের ঘাড়ে দেশমাতৃকা সিন্ধবাদ নাবিকের ঘাড়ের বুড়োর মত চেপে বসে আর নামেন না—বিজয়দা তাদের একজন। ১৯১৬ সালে কলেজে ঢুকেই তিনি সে আমলের বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তারপর ১৯২১ সালে এম্-এ ক্লাসে পড়া মুলতুবী রেখে নেমেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। জেল থেকে বেরিয়ে দ্বিগুণিত উৎসাহে বিপ্লববাদ নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ১৯২৪ সালে রাজবন্দী হয়ে এম্-এ পাস করলেন। মুক্তি পেয়ে অধ্যাপনা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর এল ১৯৩০ সাল। ১৯৩০ সালের গণ-আন্দোলনের সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডেটিন্যু হিসেবে আটক করে রেখেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে মুক্তি পেয়ে একটি চাকরি নিয়েছেন। বর্তমানে রাজনীতিতে বিজয়দা সাম্যবাদী—কম্যুনিস্ট। একা মানুষ; ভৃত্য ষষ্ঠীচরণই তাঁর সংসারে সব। জুতো সেলাই তিনি মুচিদের দিয়েই করিয়ে থাকেন এবং চণ্ডীপাঠের পাটই নেই বিজয়দার জীবনে—ও দুটো কর্ম বাদ দিয়ে তাঁর সকল কর্ম ষষ্ঠীচরণই করে; অকৃতদার বিজয়দারও ষষ্ঠীচরণের উপর নির্ভরতা অকৃত্রিম এবং অগাধ। কেবল বাজার খরচের হিসেব নেবার সময় বিজয়দা সন্দিগ্ধ হয়ে সজাগ হয়ে ওঠেন। কারণ, বাজারে

ষষ্ঠী প্রায় পুকুরচুরি করে থাকে। মাছের খরচ লিখিয়েও ষষ্ঠী খেতে দেয় নিরামিষ; মাছ কোথায়, প্রশ্ন করলে বলে—মাছটা পচা ছিল।

—পচা মাছ কই?—প্রশ্ন করে বিজয়দা তাকে চেপে ধরবার চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠী অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—ফেলে দিয়েছি সব। সে মাছি উড়ছিল!

বিজয়দা তার এই উপস্থিতবুদ্ধিতে খুশী হয়ে ওঠেন এবং পুনরায় মাছের দাম স্বরূপ আরও দশ আনা পয়সা দিয়ে বলেন—একটাকা সেরের মাছ এবার পাঁচসিকে দিয়ে আনবে ওবেলায়। আধ সের মাছ জল মরে দেড়পো দাঁড়াবে। তাহলে আর পচা হবে না।

বিজয়দা ফিরলেন প্রায় রাত্রি দশটায়। অদ্ভুত মানুষ বিজয়দা, কানাইয়ের সঙ্গে গীতাকে দেখেও কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন—কি রে, কি খবর?

কানাই গীতাকে ইঙ্গিত করতেই সে বিজয়দাকে প্রণাম করলে। বিজয়দা সস্নেহে বললেন—বাঃ, এ যে বেশ মেয়ে! বস, ভাই বস।

সমস্ত বৃত্তান্ত বলে কানাই প্রশ্ন করলে—এখন কি করব বল?

গীতা পাশের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। বিজয়দা ডাকলেন—ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী এসে দাঁড়াল। বিজয়দা বললেন—টাটকা পুরী ভাজিয়ে আনতে গেলে কি দর নেবে?

ষষ্ঠী মাথা চুলকোতে লাগল। বিজয়দা বললেন—যা দর নেবে—তার চেয়ে চার আনা দর বেশী দিয়ে আধ সের পুরী ভাজিয়ে আন। আর মিষ্টি চারটে। বুঝলে? বলে একটি টাকা তার হাতে তুলে দিলেন।

কানাই বললে—আমি খাব, কিন্তু মেয়েটির মুখে আজ আর কিছু উঠবে না বিজয়দা।

বিজয়দা একটু ম্লান হাসি হাসলেন।

—এখন কি করব বল?

—অত্যন্ত সহজ উপায় আছে, কিন্তু সে তোর হাতে।

—বল?

—মেয়েটিকে তুই বিয়ে করে সংসার পেতে ফেল্।

কানাই স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিজয়দার দিকে চেয়ে রইল। বিজয়দা একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কানাই বললে—না বিজয়দা, সে হয় না; অন্য উপায় বল।

—তবে তো মুশকিলে ফেললি।

কানাই আবেগের বশবর্তী হয়েই তাঁকে বলে গেল আপনার বংশের কাহিনী। শেষে বললে—আমার এ বিষাক্ত রক্ত নিয়ে সংসার পাতা হয় না বিজয়দা।

—বিষাক্ত রক্ত তো চিকিৎসা করিয়ে নির্বিষ করা যায়। কালই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ফেলে, তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্। খরচের জন্যে ভাবিস নে, সে ব্যবস্থা আমি করব।

কানাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—না বিজয়দা।

—তবে তুই ওকে এমনভাবে নিয়ে এলি কেন?

—নিয়ে এলাম কেন? এই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ? এত বড় অনাচার—অত্যাচার—

বাধা দিয়ে বিজয়দা বললেন—সে তো আদ্যকাল থেকে হয়ে আসছে। মেয়েরা বাল্যে বাপের সম্পত্তি—যৌবনে স্বামীর, তার পরে পুত্রের। দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে বাপ-স্বামী কন্যা পত্নী বিক্রী করে আসছে। তারপর একটু হেসে বললেন—আর পৃথিবীতে রাষ্ট্রবিপ্লব কদাচিৎ হলেও দুর্ভিক্ষ তো চিরস্থায়ী অবস্থা। ধনী আর দরিদ্র নিয়ে পৃথিবী—দরিদ্রের মধ্যে দুর্ভিক্ষ

চিরকাল। সুতরাং কেনা বেচা চিরকাল চলেছে। এই কলকাতা শহরে ওটা একটা চিরকেলে ব্যবসা। শুধু কলকাতা কেন, যে কোন দেশের পুলিস রিপোর্ট দেখ তুই, দেখবি ব্যবসাটা প্রাচীন। ওই মেয়েটির মত কত শত মেয়ে—

বাধা দিয়ে কানাই বললে—মেয়েটির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ বিজয়দা?

—ভাল করে দেখি নি, তবে আজকের মর্মান্তিক দুঃখ আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু দশ দিন পরে ওটা সয়ে যেত।

কানাই উঠে দাঁড়াল। তার উত্তেজনা বিজয়দা বুঝতে পারলেন—কানাইয়ের হাত ধরে আকর্ষণ করে বললেন—বস।

কানাই কঠিন মৃদুস্বরে বললে—তুমি এত হৃদয়হীন তা জানতাম না বিজয়দা।

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিজয়দা বললেন—মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে কানাই বললে—থাক্। ওর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কি বিপদ! বল না যা জিজ্ঞেস করছি!

—ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। আমার বোনের সঙ্গে পড়ত। বছরখানেক আগে বাপের চাকরি যেতে পড়া ছেড়েছে।

—তা হলে? একটু হেসে বিজয়দা বললেন—তাহলে ওকে কোন নারীকল্যাণ-আশ্রমে পাঠিয়ে দে।

—নারী-কল্যাণ আশ্রম?

—হ্যাঁ, বলিস তো মিশনারীদের হাতে আমি দিয়ে দি। ভবিষ্যতে তাতে ভালই হবে। আমার একজন বন্ধু মিশনারী আছেন—খুব ভাল লোক—আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

কানাই হেসে বললে—থাক বিজয়দা। আজকের রাত্রির মত এখানে থাকতে দিয়েছ, এই যথেষ্ট। এর ওপর অযথা ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে।

তার মনে পড়ে গেল মিঃ মুখার্জি, অশোকের বাপ—কর্তাবাবুর কথা। ব্যবসায়ে তিনি তাকে সাহায্য করবেন; দিনে পঞ্চাশ মণ চাল বেচতে পারলে দৈনিক লাভ একশো টাকা—মাসে তিন হাজার, বছরে ছত্রিশ হাজার; গীতাকে সে কোন স্কুলে ভর্তি করে দেবে, বোর্ডিংয়ে রাখবে; লেখাপড়া শিখে সে আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। ও নিয়ে সমস্ত দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

ষষ্ঠীচরণ পুরী মিষ্টি নিয়ে এসেছে, সে খাবার জন্য তাগিদ দিলে।

বিজয়দা বারান্দায় দুটো বিছানা করে ফেললেন। শোবার মত ঘর কেবল একটা। আর একখানা ঘরে রান্না হয়, ভাঁড়ার থাকে এবং ষষ্ঠীচরণ শোয়। কানাই গীতাকে ডাকলে। গীতা রান্নাঘরেই একখানা মাদুরের ওপর শুয়ে ছিল। তখনও সে কাঁদছিল। একান্ত অনুগতের মতই সে উঠল এবং খেলও। তবে খাবার সময় কান্না বেড়ে গেল। কানাই তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিজয়দা ইঙ্গিতে বারণ করে তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর গম্ভীর স্বরে বিজয়দাই ডাকলেন—গীতা! গীতা!

গীতা নীরবে এসে সামনে দাঁড়াল। বিজয়দা বললেন—ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। গীতা তাই করলে।

বারান্দায় কনকনে শীত। কলকাতায় যতখানি কনকনে হওয়া সম্ভব। বিজয়দা বেশ নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। কানাই আজকের কথাই ভাবছিল। অনুশোচনা হয় নি, স্থির মনে সমস্ত খতিয়ে দেখছিল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিল।

এরোপ্লেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একখানা প্লেন উড়ে গেল। আবার একখানা। আর একখানা।—আরও একখানা। নিশীথ আকাশ মুখর হয়ে উঠেছে ঘর্ঘর শব্দে। বম্বার প্লেনের দল হয়তো অভিযানে চলেছে। অথবা ফাইটারের ঝাঁক চলেছে সীমান্তের দিকে শত্রুর বম্বারের সন্ধানে। বিজয়দার বাসার পশ্চিম দিকে অল্প খানিকটা দূরে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে পোর্টকমিশনারের রেলওয়ে লাইনে অবিরাম গাড়ি চলেছে। শান্টিংয়ের জন্য গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কার শব্দ উঠছে। অদূরবর্তী বড় রেল-ইয়ার্ডটাতেও চলেছে শান্টিং। মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনের শিটি বেজে উঠছে। ইয়ার্ডটার অদূরবর্তী বন্দুকগুলি তৈয়ারীর কারখানায় কাঁচা মাল আসছে; তৈরী মাল চালান হচ্ছে। হাজারে হাজারে মানুষ কাজ করে চলেছে যন্ত্রের সঙ্গে; মজুরী ডবল। গলির মোড়ে বড় রাস্তার ওপারেই এ-আর-পি আড্ডায় বন্ধ জানালা-কপাটের মুখে মুখে দুপাশে বাজুর গায়ে সমান্তরাল সরল রেখায় আলোর রেখা ফুটে রয়েছে। সেখানে কেউ গান করছে। বাজারের (Buzzer) সামনে ডিউটিতে বসে বোধ হয় কোন এক বিচিত্র মানসিকতার মধ্যে বেচারার গান জেগে উঠেছে।

বিজয়দা বেশ ঘুমুচ্ছেন। কানাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। গীতার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে বিজয়দার ওপর তার মন বিরূপ হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে কর্তাবাবুর আহ্বানেই সাড়া দেবে, তাঁর সাহায্যই গ্রহণ করবে।

দশ

ভোরবেলায় উঠেই সে ছাত্রের বাড়ী গেল। অন্যদিন অপেক্ষা সকালেই পৌছুল সে। নূতন কর্মজীবন আরম্ভ করবার আগ্রহের আবেগ তাকে অধীর করে তুলেছিল। ছাত্রের বাড়ীর কাছে এসে তার সে কথাটা মনে হল। অদূরবর্তী ফটকটার ভিতর দিয়ে তার নজর পড়ল বাড়ি ধোয়া-মোছার কাজ চলছে। কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারটি পর্যন্ত এখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় নি। কানাইয়ের নির্দিষ্ট সময় সাড়ে সাতটা; সাড়ে সাতটায় সবচেয়ে বড় সঙ্কেত রেডিও-প্রোগ্রাম আরম্ভ; বাঙলায় সংবাদ ঘোষণা। রেডিও এখনও নিস্তব্ধ। মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েই সে চলে এসে দাঁড়াল বউবাজার-কলেজ স্ট্রীট জংশনে। এসপ্লানেডের ট্রাম যাচ্ছে। সে উৎসুক হয়ে উঠল। নীলার অফিসের বিশৃঙ্খল ফাইলের স্তূপ কি একদিনেই গোছগাছ হয়ে গেছে? পশ্চিমদিকের ফুটপাথ থেকে সে পূর্বদিকে এসে দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মন্থরগতিতে এসে ট্রামখানাও দাঁড়াল। নাঃ, নীলা নেই। কিছুক্ষণ পরেই আবার ট্রাম এল। ওঃ, ওটা ডালহৌসীর ট্রাম! আবার এস্প্লানেডের ট্রাম এল। ট্রামখানায় পূর্বের চেয়ে ভিড় বেশী, কিন্তু নীলা নেই। ওই আর একখানা আসছে। ওখানা নিশ্চয় ডালহৌসী, তার পিছনে অনেকটা দূরে ওই আর একখানা।

"নমস্কার! অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে—বাঙলায় খবর বলছি—"

কানাই চকিত হয়ে উঠল। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু তবুও সে দাঁড়িয়ে রইল। পেছনের ট্রামখানা আসতে তিন-চার মিনিটের বেশী লাগবে না। মাত্র তিন-চার মিনিট।

—"বাঙলায় খবর বলছি। গতকাল অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে প্রচারিত মিত্রপক্ষীয় সামরিক বিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, পরশু অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর

চট্টগ্রামের ওপর শত্রু অর্থাৎ জাপানী বিমান হানা দিয়েছিল। দু'বার হানা দেয়, সকালে একবার এবং পুনরায় দেয় সন্ধ্যার পর। দুবারই অবশ্য তারা অল্প কয়েকটি বোমা ফেলে যথাসম্ভব সত্বর চম্পট দেয়। ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিক জানা যায় নি; তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। কারণ, সমস্ত বোমাগুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এদিকে সেদিকে পড়েছে। ঐ তারিখেই জাপানী প্লেন ফেণীর উপরেও হানা দিয়েছিল। সেখানেও ক্ষতি অতি সামান্য।"

এই সংবাদ-ঘোষকটির ঘোষণা শুনলেই কানাইয়ের মনে হয়, এই ব্যক্তিটির হওয়া উচিত ছিল কোন সামন্ত নরপতি, অথবা থিয়েটারের অ্যাক্টর। যে রকম গুরুগম্ভীর স্বরে এবং রাজকীয় ঢঙে খবর বলে, তাতে শুনে মনে হয়—লোকটি যেন বিপুল গুরুত্বপূর্ণ কোন চার্টার ঘোষণা করছে বা আধুনিক কায়দায় আলমগীর পাঠ করছে। ডালহৌসীর ট্রামটা মোড় ফিরল।

"আমাদের বিমানবহরও গতকাল রাত্রে ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে এসেছে। সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর সরাসরি বোমা পড়তে দেখা যায়। সামরিক দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ট্রেনের উপর বোমা পড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। আগুনের শিখায় সমস্ত স্থানটা আলো হয়ে ওঠে। আগুন বোধ হয় এখনও জ্বলছে। আমাদের সব কটি বিমানই নিরাপদে ফিরে এসেছে।"

এসপ্লানেডের ট্রামখানা এসে দাঁড়াল। ওই যে, হ্যাঁ, ওই যে ওপাশের লেডিজ্ সিটে বসে রয়েছে নীলা। কিন্তু ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ব্যগ্র কানাই চেয়ে রইল। কিন্তু নীলা এদিকে মুখ ফেরালে না। ট্রামখানা চলতে আরম্ভ করলে। একবার তার ইচ্ছে হল ট্রামে চড়ে বসে। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে সে। ট্রামখানা চলতে আরম্ভ করলে। কানাই ফিরল ছাত্রের বাড়ীর দিকে।

অশোকদের বাড়ীতে চট্টগ্রাম ও ফেণীতে বোমাবর্ষণের আলোচনা চলছে। কর্তা গম্ভীর মুখে বলছেন,—ডিসেম্বরেই তিন দিন বম্বিং হল চাটগাঁর ওপর—ফিপ্‌থ্, টেন্‌থ, ফিপ্‌টিন্‌থ্, ঠিক পাঁচ দিন অন্তর।

সে প্রায় একটা কনফারেন্স বসে গেছে। কর্তার চারদিকে বসে আছে—তাঁর বড়ছেলে, মেজছেলে, দু'তিনজন কর্মচারী। অশোকও ছিল, সে-ই তাকে ডেকে নিয়ে গেল সেখানে। কর্তা বললেন—বসুন মাস্টার মশাই। তারপর বললেন—আমি সাইগন, টোকিও রেডিও শুনেছি। আমার বিশ্বাস, ওরা সত্যিই এবার বেশ বড় রকম এয়ার অ্যাটাক আরম্ভ করবে।

বড়ছেলে অমলবাবু বললে—সমস্ত হেড অফিসই তো বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জরুরী কাগজ দলিল সমস্তই সেখানে। কিন্তু গোডাউনের মাল সরানো তো মুখের কথা নয়।

মেজছেলে অসীম বললে—সে সব যখন ইন্সিওর করা আছে, তখন সরিয়ে আর বেশী লাভ কি হবে?

—হবে। আমি যা বলি শোন। সুবার্বের দিকে গোডাউন পাওয়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখ। আমাদের বাগানবাড়ির কারখানায় একটা গোডাউন হয়েছে। যত শীগগির হয় আর দুটো গোডাউন তৈরী করে নাও। মেজছেলের দিকে চেয়ে বললেন—বৌমাদের নিয়ে বেনারসে রেখে এস। অশোক এখন সেখানে থাকবে। মাস্টার মশাই, আপনিও যান না অশোকের সঙ্গে। মাসে একশো টাকা হিসেবে পাবেন আপনি।

কানাই সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে, তারপর বললে, আমার পক্ষে তাতে অসুবিধে আছে। আর—আপনি আমাকে কাল বলেছিলেন—চালের ব্যবসাতে—

—ও ইয়েস! ভুলে গিয়েছিলাম আমি। অমল, তুমি কানাইবাবুকে আমাদের একজন এজেন্ট করে নাও। কেনা-বেচার ওপর কমিশন পাবেন। মানে ওঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। নিজের হাতে ওঁকে তৈরী করে নাও। জান তো, উনি কত বড় বংশের ছেলে! আর উনি স্বাধীনভাবে যদি কোন মাল কেনা-বেচা করেন, তবে পার্টি দেখে, ওঁকে ক্রেডিটে মাল দিয়ো।

অমলবাবু সস্নেহে হেসে বললে—বেশ। আজ থেকেই আসবেন অফিসে। যদি পারেন তো চলুন—এক্ষুনি বেরুব আমি। আমার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন অফিসে।

খাওয়া-দাওয়ার কথাটা মুহূর্তের জন্য কানাই ভেবে নিলে। ও-প্রস্তাবটাতে তার দ্বিধা ছিল, কিন্তু সে দ্বিধা করতে গেলে কর্মারম্ভের প্রথম পদক্ষেপেই যেন বাধা পড়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই মনে হল, এই একদিনের খাওয়াটা জীবনে নিশ্চয়ই খুব একটা বড় ঋণ নয়, অন্ততঃ যে অনুগ্রহ সে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে, তার চেয়ে নয়। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সে বললে, তাই যাব।

—আপনি অপেক্ষা করুন আমি আসছি।—বলেই অমলবাবু বললে—আপনি ততক্ষণ ওঘরে বসুন। অশোক, তোমার যদি কিছু জেনে নেবার থাকে, মাস্টার মশায়ের কাছে জেনে নাও ততক্ষণ।

অশোকের আনন্দ সব চেয়ে বেশী। প্রাণময় স্বাস্থ্যবান ছেলেটির চোখ দুটি শুভ্র উজ্জ্বলতায় ঝকমক করছিল।—আপনি বিজনেস করবেন?

কানাই হাসলে—দেখা যাক্ চেষ্টা করে।

—ঠিক হবে সার্, দেখবেন ঠিক এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে মোটর কিনতে হবে। নইলে কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না।

—বল কি!

—দেখবেন। তখন আমাকে বলবেন।

ছেলেটির আন্তরিক শুভেচ্ছা দেখে কানাই বড় তৃপ্তি অনুভব করলে। সত্যিই অশোক তাকে ভালবাসে।

—কিন্তু আমারই মুশকিল হল সার্।

—কেন?

—আবার নতুন মাস্টার আসবে। আপনার মত পড়াতে পারবে না।

—আমার চেয়ে ভাল মাস্টার আসবেন হয়তো।

—নাঃ।—অশোক বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলে।

কানাই হেসে বললে—বেশ, বিজনেস করলেও আমি তোমাকে পড়িয়ে যাব।

অশোক হাসলে—সে তখন আর ভাল লাগবে না সার্। আর টাইম পাবেন না। বাবা বলছিলেন কি জানেন? ওয়ার-মার্কেটে সব চেয়ে লাভের সময় এইবার আসছে। এতদিন তো শুধু তোড়জোড় করতে গেল। বিশেষ চাল, আটা, চিনি—এই সবের ব্যবসাতে। বাবা হাসতে হাসতে বলছিলেন—আমাদের গুদামের চাবি যদি এক সপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আট দিনের দিন বাংলা দেশে উনোন জ্বলবে না।

—বল কি!

—উঃ, বাবা যা স্টক করেছেন চাল!

অর্থবিজ্ঞান কানাই মোটামুটির চেয়েও ভাল ভাবেই পড়েছে, তবুও সে এই ব্যবসায়ীর ঘরের ছেলেটির শুনে-শেখা ব্যবসায়-জ্ঞান দেখে বিস্মিত হল।

অমলবাবু বাইরে থেকে ডাকলে, মাস্টার মশাই! কানাই বেরিয়ে আসতেই হেসে বললে —তিনবার ডাকলাম মিঃ চক্রবর্তী বলে! বোধ হয় খেয়াল করেন নি। এবার থেকে খেয়াল রাখবেন। বিজনেস-কোয়ার্টারে মাস্টার মশাই নাম শুনলে লোকে—মানে, তাদের এস্টিমেটে খাটো হয়ে যাবেন আপনি।

ডালহৌসী স্কোয়ারের চারিধারে এবং পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলোর চারিপাশে ইট, কাঠ, পাথর, লোহা দিয়ে তৈরী বিরাট বিশাল বাড়িগুলো সে বাইরে থেকে অনেকবার দেখেছে। আকাশস্পর্শী চারতলা, পাঁচতলা, সাততলা বাড়িগুলোর অতিকায় আকার, অতি কঠিন দৃঢ়তা, অত্যুচ্চ ভঙ্গির মধ্যে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের পরিচয় আছে, কিন্তু কোন আনন্দময় শ্রীর আবেদনে কোন দিন কানাইয়ের চিত্তকে আকর্ষণ করে নি। আজও অমলের সঙ্গে যখন পাঁচতলা বাড়িটার প্রথমতলায় ঢুকল, তখন তার সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা কম্পন সে অনুভব করলে। সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল একটি চমকে। কানাই চমকে উঠল। অতি তীক্ষ্ণ একটা অনুনাসিক শব্দ উঠেছে মাথার ওপরে। পরক্ষণেই সে আপনাকে সংযত করলে। উপরতলা থেকে লিফ্‌ট্ নেমে এসে প্রায় সেই মুহূর্তেই তাদের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। লিফ্‌টম্যান দরজা খুলে দিয়ে অমলকে সেলাম করলে।

অমল অফিসে বসে ডাক দেখে কতকগুলো মন্তব্য লিখে উঠে পড়ল। কানাইকে বললে —চলুন, কতকগুলো বড় অফিসে আমায় যেতে হবে, সব দেখে আসবেন চলুন।

আজ তার অমলবাবুকে অদ্ভুত লাগল। তার এ রূপ কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারে নি। বাড়িতে অনেক সময় তার সঙ্গে সে কথাবার্তা বলেছে, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে মধ্যে মধ্যে এমন অজ্ঞতার, এমন কি মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে যে, কানাই মনে মনে হেসেছে: উপমা খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছে—স্বর্ণক্ষুর গর্দভ। আজ কিন্তু দেখলে তার এক অদ্ভুত রূপ। তাদের বাড়িতে যে ঐশ্বর্য, সে বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়, অমলবাবুর উপর যার প্রভাব শুধু প্রসাধনে এবং প্রমোদেই আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য এখানে এক বিরাট শক্তি; অমলবাবুর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, স্বচ্ছন্দ সাহসিক পদক্ষেপের মধ্যে সেই শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ দেখে সে বিস্মিত হল, অমলবাবুর উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল। বড় বড় সাহেব-কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার অসঙ্কোচ সমকক্ষতার ব্যবহার দেখে সে মুগ্ধ হল। আরও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—এই অঞ্চলের ইট-কাঠ লোহা-পাথরের পুরীর ভিতরের পরিচয় পেয়ে। কুবের এবং লক্ষ্মীতে জুয়াখেলা চলেছে। লক্ষ্মী ক্রমাগতই হেরে চলেছেন, খেলার দান দিতে তাঁর অফুরন্ত সম্পদ-ভাণ্ডারের সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে রাখতে তিনি বাধ্য হয়েছেন; পৃথিবীর শস্যক্ষেত্র, চাষীর খামার, দুর্গম অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, উত্তপ্ত অন্ধকার ভূগর্ভ— যেখানে যত কিছু সম্পদ তাঁর আছে, সমস্ত স্থান থেকে সেই সমস্ত সম্পদ এসে ঢুকেছে কুবেরের ভাণ্ডারে। পাশার প্রতি দানেই লক্ষ্মী হেরে চলেছেন। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে, পায়ে হেঁটে, শহরতলী থেকে যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে ছুটে আসে, তারা বিশীর্ণ ফ্যাকাসে মুখ, কুব্জ দেহ নিয়ে ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলেছে;—কুবেরের সঙ্গে লক্ষ্মীর জুয়াখেলার হিসেব রাখছে। দানের মোট বইছে।

অমলবাবু বাইরের কাজ সেরে এসে সমস্ত অফিসটা একবার ঘুরে এল। অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি!

কোথায় কোথায় যে কাজের গতি শ্লথ, তার দৃষ্টি এড়ায় না। কয়েকজনের কাজ তলব করে সে-সত্য দেখিয়ে দিয়ে নোট পাঠিয়ে দিলে ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌চার্জের কাছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অমলবাবু বললে—চলুন, আমাদের বাগান দেখে আসবেন।

কানাই মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার নিজের কাজ এখনও কিছু হয় নি। অমলবাবু সে কথা মুহূর্তে বুঝে নিলে, হেসে বললে—এর মধ্যে দিয়েই আপনার কাজের হাতেখড়ি হচ্ছে কানাইবাবু! স্থান কাল পাত্র—তিন নিয়ে পৃথিবী; আগে কোন্ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন—সেই ক্ষেত্রটা চিনে নিন।

কানাই একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক কথা।

গাড়িতে চড়ে অমলবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললে—আপনি সিগারেট খান না, না? ধরুন মশাই, অ্যাট লিস্ট, টু কীপ কোম্পানী—বলে হাসলে। কানাইও হাসলে। অমলবাবু আবার বললে—আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে কানাইবাবু। আমি আমার মনের মত একজন অ্যাসিস্টাণ্ট খুঁজছি; অ্যাসিস্টাণ্ট নয়—পার্টনার—আমার বন্ধু। আমার নিজের একটা সেপারেট বিজনেস আছে; অবশ্য বাড়ীর কেউ জানে না, বাবাও না। আমি জানাতেও চাই না। আমি একজন বিশ্বাসী বন্ধু চাই—তাঁকে আমার পার্টনার করব।

গাঢ়স্বরে কানাই বললে—অবিশ্বাসের কাজ আমি কখনও করব না। তবে বন্ধু তো হবো বললেই হওয়া যায় না।

স্টীয়ারিং ধরে অমল সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই একটু হাসলে—বললে—আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। তোষামুদে লোক আমি পছন্দ করি না। আমি আপনার বন্ধু হয়েছি, আপনি আমার বন্ধু হবার চেষ্টা করবেন।

কানাই হেসে বললে—উইথ অল মাই হার্ট!

এক হাতে স্টীয়ারিং ধরে অন্য হাতে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে খুলে সামনে ধরে অমলবাবু হেসে বললে—তবে আসুন, পাশের সঙ্গী হয়ে বন্ধুত্বটা গাঢ় এবং পাকা করে নিন।

অমল আবার বললে—আর একজন আমার বন্ধু আছেন—আমাদের কারখানায় যাচ্ছি—সেই কারখানার ম্যানেজার। ভারি চমৎকার লোক।

কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরে শহরতলীর একখানা পল্লীতে তাদের যেতে হবে। বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি অপেক্ষাকৃত অপরিসর রাস্তার মোড় ফিরল। এ রাস্তাতেও মিলিটারী লরী চলছে। মধ্যে মধ্যে এক-একটা বাগানে পণ্টনের ছাউনি পড়েছে। নূতন ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে। দু'চার জায়গায় বস্তি ভেঙে ফেলে জায়গা পরিষ্কার হচ্ছে—সেখানেও ছাউনি পড়বে। রাস্তার ধারে বড় বড় বাগানে মিলিটারী লরী সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। পথে গ্রাম্য লোকের আনাগোনা। জঙ্গল এবং গাছের ভিড়ের মধ্যে ছিটেবেড়ার ঘর দেখা গেল; পথের পাশে ডোবার মত পুকুর, শীতের রবিশস্যসমৃদ্ধ ক্ষেত, মটরশুঁটির লতায় সাদা বেগুনী ফুল ফুটেছে; গম যব সর্ষের গাছগুলি হয়ে রয়েছে গাঢ় সবুজ। জনবিরল পথে গাড়িখানা হু-হু করেই চলছিল; হঠাৎ একটা জনতা সম্মুখে পড়ায় গাড়ির গতি মন্থর করলে অমলবাবু। মেয়ে-পুরুষের একটি দল চলেছে;—মাথায় কাঁকালে রাজ্যের জিনিস, কয়েকজনের কাঁধে ভার; ছোট ছেলেরা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কতকগুলি গরু ও ছাগল। তাদের দিকে চেয়ে দেখেই অমলবাবু গাড়ি থামালে। একজন বৃদ্ধকে ডেকে বললে—তোমাদের বুঝি বাড়িঘর ছেড়ে যেতে হচ্ছে? গ্রামে পণ্টনের ছাউনি পড়েছে?

বৃদ্ধ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, কোন উত্তর দিতে পারল না, ঠোঁট দুটি থর থর করে

কেঁপে উঠল, তার চোখ হতে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুটি বিশীর্ণ অশ্রুধারা। সমস্ত দলটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, মেয়েগুলি সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল অমল এবং কানাইয়ের দিকে। একটি বেশ সুশ্রী তরুণী মেয়ে চেয়ে দেখছিল কানাইকে।

অমলবাবু আবার প্রশ্ন করলে—তোমাদের সব ঘরের দাম পেয়েছ ?

একটি বৃদ্ধা বললে—তা পেয়েছি বাবা। কিন্তু দাম নিয়ে কি করব ? কোথায় যাব, কনে যাব বল দিকিনি ? পিতি-পুরুষের গেরাম ! বৃদ্ধা চোখ মুছলে। আর একজন তার অসমাপ্ত কথার সুর ধরে বললে—ঘরদোর, পুকুর-ঘাট, গাঁয়ে-মায়ে সমান কথা বাবু। টপ টপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। এবার শুধু সে নয়, সকলেই চোখ মুছলে আঁচলে। কানাইয়ের অন্তরটাও টন টন করে উঠল।

অমলবাবু বললে—কি করবে বল ? দেশে লড়াই লেগেছে। এখন মানুষকে কষ্ট তো করতেই হবে। সেপাই থাকবার জায়গা না দিলে—তারা থাকবে কোথায় ? কত বড় বড় বাড়িও তো নিয়েছে, দেখেছ তো ?

হেসে একটি বৃদ্ধ বললে—যাদের পাঁচখানা আছে, তাদের একখানা গেলে অন্যখানায় থাকবে তারা। আমরা কি করব ? কনে যাব ?

—তোমরা যদি থাকবার জায়গা চাও তো আমি জায়গা দিতে পারি।……পুর জান ?

—পুর ? জানি।

—ওখানে রায়বাহাদুর বিভূতিবাবুর বাগানে যেয়ো। আমি যাচ্ছি সেখানে। সেখানে থাকবার জায়গা পাবে। এখন আমাদের টিনের ছাউনির তলায় থাকবে। তারপর ঘর করে নেবে। আমাদের ওখানে বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে। সেখানে তোমরা খেটেও খেতে পারবে।

সকলে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে।

—কি বলছ ?

—দেখি বাবা বুঝে।

একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে অমলবাবু বললে—ছেলেদের খাবার কিনে দিয়ো। যদি ভালো মনে কর তবে যাবে।…পুরে বিভূতিবাবুর বাগানে ; সেখানে জায়গা পাবে তোমরা।

গাড়িতে উঠে অমলবাবু বললে—হতভাগ্যের দল !

কানাই চোখ মুছলে। অমলবাবু বললে—ওই সুশ্রী মেয়েটিকে কিন্তু ওদের মধ্যে মানাচ্ছিল না।

প্রকাণ্ড বড় বাগান। এককালে কোন শৌখীন ধনী পরম যত্নে প্রমোদবাসর সাজিয়েছিলেন। সমাজের আদিকাল থেকে মায়াবাদ, ত্যাগ, সংযম প্রভৃতির অজস্র মহিমা প্রচার সত্ত্বেও মানুষের সমাজে বশিষ্ঠ-বুদ্ধের সংখ্যা একটি দুটি ; মুনি-ঋষিরাও সংখ্যায় নগণ্য, অনুপাত কষলে কোটিতে একজন হবে কি না সন্দেহ। আসলে ব্যবহারিক জগতে ইন্দ্রত্বের জন্যই তপস্যা চলে আসছে। কোনমতেই ইন্দ্রত্বের প্রলোভন এবং আদর্শকে মানুষের কাছে খর্ব করা যায় নি। পিটুলি গোলায় দুধের আস্বাদ লাভের আগ্রহের মত—দেশে সাধারণ মানুষের নাম খুঁজলে দেখা যাবে ইন্দ্রত্বযুক্ত নামের দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশী। হরিদাস ইত্যাদিও আছে কিন্তু কামনা তাদের হরেন্দ্র হবার। ইন্দ্রত্বের ঐশ্বর্য-গৌরব এবং লোভনীয় অধিকারের জন্য নন্দনকানন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ওর সঙ্গে অপ্সরা এবং সোমরসের সম্বন্ধ

প্রায় অবিচ্ছেদ্য। তাই বাস্তব জগতে আধতোলা কি একতোলা ইন্দ্রত্ব সঞ্চয় করতে পারলেই তদুপযুক্ত একটা নন্দনকানন রচনার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক। তেমনি কোন ছটাকী ইন্দ্রের নন্দনকানন রায়বাহাদুর বি. বি. মুখার্জির ব্যবসায়ের অশ্বমেধের ফলে—এখন পূর্ব ইন্দ্রের হস্তান্তরিত হয়ে তাঁর দখলে এসেছে।

বাগানের মাঝখানে 'সরোবর' অর্থাৎ পুকুর। পুকুরের ঠিক সামনেই চমৎকার একখানি বাড়ি। বাড়ির মেঝেটার মার্বেলের জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে—মর্তসুলভ সোমরস এবং নর্তনরতা অপ্সরার পায়ের ধুলো আজও বোধ করি রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে বলেই কানাইয়ের ধারণা হল। তবে সে শ্রদ্ধান্বিত হল মুখোপাধ্যায় মশায়ের উপর, বিশেষ করে অমলবাবুর উপর। কারণ তাঁদের সাধনা ইন্দ্রত্বের হলেও—নন্দনকাননে বিশ্বকর্মার আসর বসিয়েছেন —বাগানটাকে পরিণত করেছেন কারখানায়।

বাগানে ঢুকেই চোখে পড়ে পাঁচ-ছটা বড় বড় টিনের শেড।

অমলবাবুর মোটর দাঁড়াতেই ছুটে এল কারখানার ম্যানেজার। সুস্থ সবল লোকটি, কপালের নীচে নাকের উপরে পাঁচের খাঁজের মত একটা খাঁজ লোকটির চেহারার বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য তাব মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য। ছুটে এসে নিজে মোটরের দরজা খুলে দিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে হেসে বললে—গুড মর্নিং সার্!

অমলবাবু হেসে তার হাত চেপে ধরে বললে—গুড মর্নিং! কেমন আছেন জিতুদা?

—আপনাদের দয়াতেই বেঁচে আছি ভাই!—জিতুদা হাসলে।

—কাজ কেমন চলছে?

—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছি ভাই। আজ নিজে হাতুড়ি ধরেছিলাম। লোকের অভাব হচ্ছে। লেবার পাচ্ছি নে।

অমল বললে—কি খাওয়াবেন বলুন? আমি আপনাদেব লেবারের ব্যবস্থা—অবশ্য অল্পস্বল্প, করে এসেছি। পারমানেণ্ট লেবার, এইখানেই থাকবে। জন দশেক পুরুষ, জন বারো মেয়ে, আর ছেলেও কতকগুলো আছে, তার মধ্যেও কয়েকজনকে দিয়ে কাজ চলবে।

অমল বললে সমস্ত বিবরণ।

ম্যানেজার জিতুবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠল। লোকটির উৎসাহ অসাধারণ।

অমল আবার বললে—ভারি দুঃখ হল জিতুদা! আশ্রয়হীন হয়ে চলেছে বেচারারা। ভাবলাম আশ্রয় দিলে ওদেরও উপকার হবে, আমাদেরও হবে।

জিতুবাবুর দৃষ্টি সকরুণ হয়ে উঠল, বললে—আপনার কল্যাণ হবে ভাই!

অমল হাতের ঘড়ি দেখে বললে—চালের গুদোমটা দেখব। আপনি দেখছেন তো? খারাপ না হয়!

—আমি দু'বেলা দেখি। আসুন নিজের চোখে দেখুন।

টিনের শেডের মধ্যে একটা গুদাম, উপরে টিনের ছাউনি—চারিপাশে ইটের দেওয়াল। দরজাটা খুলতেই কানাই বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেল। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চালের বস্তায় ঠাসা।

অমলবাবু নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে ঘুরে দেখলে। কানাই দেখলে অমলের চেহারা পাল্টে গেছে—জিতুবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সমস্ত প্রকাশ নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে তার অবয়ব

বেরিয়ে এসে বললে—ঠিক আছে।

আবার কয়েক পা এসে প্রশ্ন করল—আড়াই হাজার বস্তা আছে, না?

জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বললে—হ্যাঁ।

বাকী পাঁচটা শেডের তিনটের মধ্যে ছোটখাটো একটা লোহার কারখানা। লেদ যন্ত্রে কাজ চলছে। নাট কাটাই হচ্ছে। দু-তিনটে বিভিন্ন মাপের হাজার হাজার নাট। মিলিটারী কনট্রাক্টের মাল।

বাকী দুটো টিনের শেড নতুন তৈরী হয়েছে। তার চারিপাশ ইট দিয়ে গাঁথা হচ্ছে।

অমলবাবু প্রশ্ন করলে—এ দুটোতেও বোধ হয় আড়াই হাজার করে পাঁচ হাজার বস্তা ধরবে, কি বলেন?

জিতুবাবু বললে—বেশী ধরবে। মাপে ওটার চেয়ে লম্বায় পনেরো ফুট বেশী আছে।

অমল হেসে বললে—আপনি একজন ওয়াণ্ডারফুল লোক জিতুদা।

আবার অমলবাবু পাল্টে গেছে।

জিতুবাবু বললে—আপনাদের কাজ একদিকে, আমার প্রাণ একদিকে।—আপনার বাবা আমার কাছে দেবতা।

অমল হেসে বললে—দেবতার ছেলেকে চা খাওয়াবেন চলুন। পরমুহূর্তেই সজাগ হয়ে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভুলেছি। ওঃ, আমার ভুল হয়ে গেছে! ইনি আমার বন্ধু—কানাই চক্রবর্তী। আর ইনি আমার স্বনামধন্য জিতুদা—জিতেন্দ্র বোস।

জিতু বোস সামনে ঝুঁকে পড়ে সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে বললে—আমার সৌভাগ্য!

কানাই নমস্কার করতে যাচ্ছিল—কিন্তু জিতু বোসের প্রসারিত হাত দেখে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে।

অমল বললে—উই আর ফ্রেণ্ড্‌স্‌, বুঝলেন জিতুদা!

অমলবাবু অদ্ভুত! অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে হাসিমুখে। কানাই অবাক হয়ে গেল।

অফিসে ফিরেই অমল আবার বের হল। সরবরাহ বিভাগের প্রকাণ্ড অফিস। কানাইকে সে সঙ্গে নিলে। চারিদিকে সামরিক পোশাকে ভূষিত আর্দালী কর্মচারী গিস্‌গিস্‌ করছে। কানাই বিস্মিত হয়ে গেল একজন বামন আর্দালী দেখে। লোকটা লম্বায় বোধ হয় তিন ফুটের চেয়েও কম। অমলকে দেখে সসম্ভ্রমে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে। অমল অভিজাত হাসি হেসে প্রত্যভিবাদন করলে তাকে এবং হাতে যেন কিছু গুঁজে দিলে। তারপর কানাইকে বললে—বাইরেই একটু অপেক্ষা করুন আপনি। আমি আসছি। বামনটা সসম্ভ্রমে কানাইকে বসতে দিলে একখানা চেয়ারে।

কানাই ওই বামনটার কথা ভাবছিল। মনে পড়ল লঙ্কার যুদ্ধে সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের কথা। যন্ত্র, পায়রা, ঘোড়া, অশ্বতর, গরু, উট, হাতী—কত শক্তি যে নিয়োজিত হয়েছে এই যুদ্ধে। মানুষের তো কথাই নাই। আজ ওই বামনটার শ্রমশক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—আজ চল্লিশ কোটি লোকের শক্তি কি অসাধ্যসাধনই না করতে পারত!

—মিস্টার চক্রবর্তী!

অমল ডাকছে। কানাই এগিয়ে গেল। অমল তাকে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। সামরিক পোশাক পরা একজন সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে অমল বললে—

আমি নিজে নেহাৎ আসতে না পারলে এঁকেই পাঠাব।

সাহেব সাগ্রহে কানাইয়ের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললে—আমি ভারি খুশী হলাম মিঃ চক্রবর্তী!

বেরিয়ে এসে অমল গাড়িতে চড়ে হেসে একটা ঘড়ি বের করে দেখিয়ে বললে—সাহেবের কাছে ঘড়িটা কিনলাম। কত টাকায় জানেন?

ঘড়িটা সোনার।

অমল হেসে বললে—এক হাজার টাকায়।

তারপর বললে—আপনার পয় ভাল। একটা বড় অর্ডার পেয়েছি।

অফিসের শেষ ঘণ্টায় অমল বললে—কানাইবাবু ও-ঘরে কয়েকজন কামার এসেছে। জঙ্গল কাটিং ছুরি তৈরীর অর্ডার নিতে। আমরা লোহা দেব, ওরা তৈরী করে দেবে, আমরাই কাঠের হাতল দেব—সেগুলো ফিট করে দেবে। আমরা তৈয়ারী খরচ ছুরি পিছু দেড় টাকা পর্যন্ত দিতে পারি। আপনি দেখুন কততে ওদের সঙ্গে সেট্‌ল্ করতে পারেন।

দেশী লোহার কারিগর। কিন্তু আশ্চর্য রকমের খবর রাখে। তারা বললে—দু'টাকার কম পারব না। আমাদের দু'টাকা দিলেও আপনাদের অনেক লাভ থাকবে।

কানাই নিজের কৃতিত্ব দেখাতে বদ্ধপরিকর। দর করার বিদ্যাটায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও 'দর করিতে হয়' কথাটা 'কখনও কাহাকেও বঞ্চনা করিও না' কথাটার আগেই তার কানে এসেছে এবং কি করে দর করতে হয় তার পদ্ধতিও শুনেছে। সে বললে—এক টাকা বারো আনার বেশী কোম্পানী দিতে পারবে না। তোমরা না পার কি করব, অন্য লোক দেখব আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে বেশ দৃঢ়ভাবেই দাঁড়াল সে।

ওরা এবার কানাইয়ের দৃঢ়তা দেখে দমে গেল, একজন বললে—যাক্ বাবু, এক টাকা চৌদ্দ আনা করে দেন। আর আপত্তি করবেন না।

দ্বিধাভরেই কানাই এসে সেই কথা অমলকে জানালে। অমলবাবু হেসে বললে—একটু চেপে ধরলে আরও কম হত! যাক গে। সঙ্গে সঙ্গে এল এক ভাউচার—সাড়ে বাষট্টি টাকা দালালী হিসেবে পাওনা হয়েছে কানাইয়ের। কানাই বিস্মিত হয়ে গেল।

অমল বললে—মেকিং চার্জ আমাদের ধরা ছিল দু'টাকা। আপনি দু'আনা কমিয়েছেন, সুতরাং তার অর্ধেক এক আনা আপনি পাবেন এই আমাদের নিয়ম।

কানাই টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে এল মোহগ্রস্তের মত।

সাড়ে বাষট্টি দ্বিগুণে একশো পঁচিশ টাকা! টাকাটা পাওয়ার কথা ছিল ওই কামার দুজনের। তার মন কেমন যেন অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

অমল বললে—কাল এগারটার মধ্যে আসবেন কিন্তু।

কানাই কার্জন পার্কে এসে বসল।

কিছুক্ষণ পর তার মনে হল অমলের কথা। আরও কমে হত। অর্থাৎ কানাইয়ের জন্যই তারা বেশী পেয়েছে। এতে সে খানিকটা সান্ত্বনা পেলে। সে উঠল। অফিস ভেঙেছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড় ধরছে না। এসপ্লানেডের ট্রামের শেডে এসে হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল নীলার সঙ্গে। মুহূর্তে তার মনের অবসাদ কেটে গেল।

নীলা দাঁড়িয়েছিল সাময়িক পত্রের স্টলের ধারে। সে তার পিছনে এসে সকৌতূহলে দাঁড়াল। নীলা কিন্তু একমনে সাজানো কাগজগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। সে

আরও একটু ঝুঁকে পড়ল, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস গিয়ে লাগছে নীলার গলার পিছনে।

নীলা এবার দেহখানা বাঁকিয়ে পিছনের দিকে ফিরে চাইল। শ্যামল মুখশ্রীতে দৃপ্ত ভ্রূভঙ্গী চমৎকার ফুটে উঠেছে। মুহূর্তে ভ্রূভঙ্গী মিলিয়ে গেল, সস্মিত প্রসন্নতায় মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আপনি!

—হ্যাঁ, কমরেড। সে আজ মিস্ সেন বললে না, প্রথমেই বললে কমরেড। পরমুহূর্তেই সে আশপাশের জনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বললে—এখানে নয়, কফিখানায় চলুন। আজ আমি কফি খাওয়াব।

নীলা হেসে বললে—শোধ দিচ্ছেন?

—না। শোধ নয়। আমি আজ প্রথম উপার্জন করেছি। চলুন অনেক কথা আছে।

—চাকরি করছেন? সে কি! পড়া ছেড়ে দিয়েছেন আপনি?

—পড়া ছেড়েছি। তবে চাকরি নয়। ব্যবসা—বিজনেস।

—বিজনেস?

—হ্যাঁ, আসুন।

কিন্তু কফিখানাতে বিষম ভিড়। সেখানে কানাই বলতে পারলে না তার কথা। তার জীবনে যে মর্মান্তিক আঘাত ভয়ঙ্কর মূর্তিতে এসেও দিয়ে গেছে পরম কল্যাণকর মুক্তি, সেই কথা সে এখানে বলতে পারলে না। খেতে খেতে হল অন্য কথা। পার্টির কথা।

বেরিয়ে এসে নীলা বললে—কই, আপনার কথা তো কিছু বললেন না?

কানাই বললে—পার্কে যাবেন?

চারিদিক ধূসর হয়ে এসেছে, রাস্তায় আলো জ্বলছে; নীলা সেই দিকে তাকিয়ে বললে—অন্ধকার হয়ে গেছে। বাবা হয়তো ভাববেন।

—তবে? আমার যে অনেক কথা!

—সংক্ষেপে বলুন।

কানাই বললে—সংক্ষেপে বলা যায় না। সে অনেক কথা। সেদিন বলিনি; এইবার বলতে চাই আপনাকে।

নীলা বললে—তা হলে পরশু—শনিবার। কার্জন পার্কে দেখা হবে। তারপর বরং ইডেন গার্ডেনে যাব। কেমন?

—বেশ। আমি অপেক্ষা করে বসে থাকব।

নীলা হেসে বললে—হয়তো আমাকে দেখতে পাবেন অপেক্ষা করে থাকতে। কারণ আমার শুনবার আগ্রহ আপনার বলার আগ্রহের চেয়ে বেশী।

কানাই বললে—তবে একটু বলি। বলে আবেগভরেই বললে—আমি মুক্তি পেয়েছি কমরেড। বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। আমি বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছি।

নীলা সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

কানাই বললে—আমি শুধু মানুষ আজ, মুক্ত মানুষ; মুক্ত পৃথিবীতে নূতন করে গড়ব—আমার ঘর—আমার জীবন। তারই পরামর্শ চাই আমি তোমার কাছে নীলা। তোমাকে তুমি বলছি—তুমি রাগ করবে?

নীলা হেসে বললে—না।

ট্রাম এসে পাশে দাঁড়াল।

বাসায় অর্থাৎ বিজয়দার বাসায় এসে কানাই দেখলে বিজয়দা ভয়ানক ব্যস্ত। নীচে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ষষ্ঠীকে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছেন। ষষ্ঠী গেছে ট্যাক্সি আনতে।

একটি ভিক্ষুকশ্রেণীর মেয়ে কোন দুঃসহ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ; গীতা তাকে বাতাস করছে। পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে দুটি ছেলে : ওই মেয়েটির ছেলে সে দেখেই বুঝতে পারা যায়। তারা কাঁদছে মায়ের যন্ত্রণা দেখে বোধ হয়।

মেয়েটি আসন্নপ্রসবা, প্রসববেদনায় অধীর হয়ে উঠেছে।

জাতিতে মুসলমান ; বাড়ি দক্ষিণ-বঙ্গে। গত ঝড়ে স্বামী মারা গেছে ; সামরিক বিভাগের নির্দেশে গ্রাম পরিত্যাগ করে এসেছিল মহানগরীতে অন্ন এবং আশ্রয়ের সন্ধানে দুটি ছেলের হাত ধরে এবং একটিকে গর্ভে নিয়ে। গর্ভের শিশু আজ ধরিত্রীর বক্ষ স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

বিজয়দার অফিস চারটের পর। তিনি অফিসে যাবার জন্যে বের হয়ে বাড়ির সামনেই মেয়েটিকে দেখতে পান, অল্প আবর্জনা ভরা একটি ডাস্টবিনের মধ্যে আত্মগোপন করে কাতরাচ্ছিল ; পাশে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল ছেলে দু'টি। বিজয়দা ষষ্ঠীকে পাঠিয়েছেন ট্যাক্সি আনতে। হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

তিনি শুধু প্রশ্ন করলেন—সকালে গিয়ে সমস্ত দিন কোথায় ছিলি ? গীতার কথা তোর ভাবা উচিত ছিল।

একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার উপরে ষষ্ঠী।

এগারো

কানাই ডাকলে—গীতা !

কোন সাড়া এল না।

সে আবার ডাকলে। এবারও সাড়া না পেয়ে সে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কাল রাত্রে এসে থেকেই গীতা রান্নাঘরের মধ্যেই বেশীর ভাগ থাকবার চেষ্টা করছে। রাত্রে বিজয়দা হুকুম করে তাকে এ ঘরে শুতে বাধ্য করেছিলেন। হুকুম অমান্য করবার মত শক্তি গীতার নাই। গীতার স্বভাবই অবশ্য কোমল, তবু এ নমনীয়তার মধ্যে দারিদ্র্যজনিত ভীরুতার প্রভাবটাই বেশী। অল্পক্ষণের আচরণের মধ্যে—ও যে এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে, ও যে এখানে একান্তভাবে দয়ার উপর নির্ভর করে রয়েছে, সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কানাইয়ের মন করুণায় ভরে উঠল। রান্নাঘরের দরজা ঠেলে সে ডাকলে—গীতা !

এখানেও গীতা নাই। ষষ্ঠী বসে বসে বিড়ি টানছে। কানাইকে দেখে সে বিড়িটা মুখ থেকে নামালে।

কানাই উদ্বিগ্ন হয়েই বললে—গীতা কোথায় গেল ?

ষষ্ঠী তার মুখের দিকে চেয়ে এবার উত্তর দিলে—আমাকে বলছেন ?

বিরক্তিভরেই কানাই বললে—আবার কাকে বলব ?

ষষ্ঠী বললে—চানের ঘরে গিয়েছে। চান করছে।

—স্নান করছে ? শীতের দিনে সন্ধ্যাবেলা স্নান করছে কেন ?

—তা জানি না আমি। জিজ্ঞেস তো করি নাই। বললে—ষষ্ঠীদাদা, আমি চান করে আসি ?

গীতা বেরিয়ে এল স্নানের ঘর থেকে। পরনে তার একখানা ধুতি, মাথার ভিজে চুল পিঠের উপর এলানো আছে। সে একটু বিনীত ম্লান হাসি হাসলে।

কানাই বললে—তুমি স্নান করলে গীতা এই সন্ধ্যাবেলা ?

মৃদুস্বরে গীতা বললে—ওই মেয়েটিকে ছুঁলাম, নাড়লাম, তাই।

কানাই স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মানুষকে তুমি এত অপবিত্র ভাবো গীতা ? ছিঃ!

গীতা একবার মুহূর্তের জন্য তার ভীরু দৃষ্টি তুলে কানাইয়ের দিকে চেয়ে পরক্ষণেই নিতান্ত অপরাধীর মত দৃষ্টি নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল ; স্থির মূর্তি, সর্বাঙ্গে তার অপরাধের স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে। কানাই তাকে আর কিছু বলতে পারলে না। বরং তার করুণা হল। এবং এই করুণাবিষ্ট মুহূর্তে তার দৃষ্টিতে গীতার পরনের ধুতিখানা চোখে পড়ল বিশেষ অর্থ নিয়ে। তাই তো! গীতা তো এক-কাপড়ে চলে এসেছে! তার তো কাপড়-জামার প্রয়োজন! শুধু গীতা নয়, তার নিজেরও জামা-কাপড় চাই। সকালে উঠেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল, আজ দিনে স্নানের অবসর হয় নাই। সুতরাং নিজের জামাকাপড়ের প্রয়োজনের কথাও মনে হয় নাই।

গীতাকে সস্নেহে সে বলল—উনোনের ধারে আগুনের আঁচে বস একটু। এই শীতের দিন। তাই বলছিলাম। তা ছাড়া গীতা, ছোঁয়ানাড়ার বিচারটাকে একালে আমরা ভুল বলি—এইটাকেই আমরা অপরাধ বলি।

গীতা চুপ করেই রইল। কানাই তাকে আবার বললে—যাও উনোনের কাছে একটু বস।

কোনক্রমে এবার গীতা বললে—রান্না হচ্ছে উনোনে।

—হোক না।

—আমার ছোঁয়া পড়ে যাবে হয়তো!

বিদ্যুৎচমকের মত কানাইয়ের মাথায় গীতার কথার ইঙ্গিত খেলে গেল। সে নিজে প্রাচীন চক্রবর্তী-বংশের ছেলে। সেখানে পাপকে কেউ মানুক আর না-ই মানুক—পাপ-পুণ্যের বিধান সে-বাড়ির সকলের মুখস্থ। একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে তার দেহের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, প্রচলিত দেশাচারের বিধানে গীতা তাতে নিজেকে অস্পৃশ্য ভাবছে। কানাই বলে উঠল—না না গীতা। না!

গীতা তার মুখের দিকে এবার চোখ তুলে চাইলে।

কানাই বললে—তুমি দেবতার পূজার ফুলের মত পবিত্র। তুমি ওসব ভেবো না। নিষ্পাপ তুমি। সে পরম স্নেহভরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—উনোনের ধারে গিয়ে বস। আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি। কাপড়-জামা চাই তো!

কানাই পথে বেরিয়ে ভাবছিল—গীতাকে নিয়ে সে কি করবে ? তার জীবনের এই অকারণ অপরাধবোধ—হীনতাবোধ কি কখনও কাটবে ?

গীতা কানাইয়ের কথা অমান্য করলে না। শীতেও বেলায়-অবেলায় স্নানে সে অনভ্যস্ত নয়—তবুও শীত করছে। গায়ে জামা পর্যন্ত নাই। উনোনের ধারে বসে সে আরাম বোধ করলে। গন্‌গনে কয়লার আঁচ। আগুনের রক্তাভ দীপ্তির দিকে চেয়ে সে বসে রইল। এমনি ভাবে উনোনের ধারে বসেই তার সন্ধ্যে কাটত। বাড়িতে রান্না করতে সে-ই। অবশ্য

কিছুদিন থেকে অভাবের দরুন সব দিন ঘরে উনোন জ্বলত না। আজ বাড়িতে উনোন জ্বলছে কি না কে জানে ? সে শিউরে উঠল। তাকে বিক্রী করে সংসারে উনোন জ্বালাবার ব্যবস্থা কতখানি পেটের জ্বালায় পড়ে যে তার বাপ-মা করেছিলেন, ভেবে তার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল মমতায়-দুঃখে-ধিক্কারে। মনে পড়ল তার মায়ের কথা—তার মা সুশ্রী ছিলেন—তাঁর বুকের প্রতিটি পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তিনি হয়তো কাঁদছেন, তারই জন্মে কাঁদছেন। হীরেন, তার ভাই, হয়তো ঘরেই আসে না, সে বাড়ীতে নাই বলেই আসে না।

তার বাপ—কাশি হাঁপানীর রোগী—বিছানার উপর বসে বিড়ি টানছেন, কাশছেন, হাঁপাচ্ছেন।

গীতার কল্পনা, কল্পনা নয়। বাস্তবে দেখা ছবি। সে যেমন মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছিল, বাস্তবেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটছিল। গীতার বাবা সত্যিই হাঁপাচ্ছিল। বরং গীতার কল্পনাকে বাস্তবের চেয়ে খানিকটা কমই বলতে হবে। কারণ গীতার বাপ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল—ঠিক এই সময়ে। নিষ্ঠুর ভাবে রোগটা আক্রমণ করেছিল তাকে। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। গীতার মা সরোজিনী খানিকটা গরম তেল নিয়ে বুকে মালিশ করে দিচ্ছেন। ছেলে হীরেন ভাগ্যক্রমে ঘরে এসে পড়েছিল—সে পাখা নিয়ে হাওয়া করছিল। ঘরটা অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধ,—কারও মুখে কথা নাই। প্রদ্যোৎ ভট্চাযের হাঁপানী এত বেশী যে, হাঁপানীর অবসরে একটু কাতর শব্দও বেরিয়ে আসতে পারছে না। বাইরে রাত্রের আকাশে প্লেন উড়ছে।

অনেকক্ষণ পর ঈষৎ সুস্থ হয়ে প্রথমেই প্রদ্যোৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল শব্দায়মান প্লেনগুলোর ওপর। দাঁত খিঁচিয়ে সে প্রথমেই বলে উঠল—দে—দে গোটাকতক বোমা আমার ওপর ফেলে দে! আমি মরে বাঁচি! আঃ—আঃ—আঃ!

গীতার মা প্রশ্ন করলে—একটু জল খাবে ?

—জল ? দাও।

জলের গ্লাস পরিপূর্ণ করেই রাখা ছিল—সরোজিনী গ্লাসটি তুলে ধরলে মুখের কাছে। সাগ্রহে চুমুক দিয়েই প্রদ্যোৎ বিকৃত মুখে ফু ফু করে জলটা ফেলে দিয়ে বললে—ক্লোরিনের গন্ধ! কলের জল কেন ?

সরোজিনী চুপ করে রইল। প্রদ্যোৎ চীৎকার করে উঠল—তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও ?

এবার সরোজিনী বললে—টিউবওয়েলের জল কে আনবে ?—ওই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করা হল গীতার। গীতাই আনত টিউবওয়েলের জল। প্রদ্যোৎ টিউবওয়েলের জল খায়।

প্রদ্যোৎ এবার মাথা হেঁট করে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। তারপর অকস্মাৎ কপালে হাত রেখে আর্তস্বরে ডেকে উঠল—ভগবান!

সরোজিনীর চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে আসছিল—দু'টি শীর্ণ ধারায়, হীরেনের চোখেও জল এসেছিল—পাখাটা রেখে সে হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছলে। প্রদ্যোৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হীরেনের মাথার ওপর বসিয়ে দিয়ে বললে—তুমি পারো না ? রাস্তার ধারে টিউবওয়েল, নবাবপুত্তুর—তুমি এক কুঁজো জল আনতে পারো না ?

একলাফে হাত দুয়েক পিছনে সরে এসে হীরেন চীৎকার করে উঠল—না, পারব না—

পারব না আনতে।

হীরেনের চীৎকার শুনে মা-বাপ দু'জনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। হীরেন বলেই চলেছিল— কেরোসিনের লাইনে দাঁড়াতে হবে, চিনির লাইনে যেতে হবে, পয়সা পর্যন্ত আমাকে দিতে হবে। অ্যাঃ, আবার মারছে দেখ না!

হীরেন নিজেই কিছু এখন উপার্জন করতে শিখেছে। একদা সে বাড়ি থেকে চুরি করে সংগ্রহ করেছিল বারো আনা পয়সা; সেই পয়সাকে মূলধন করে সে নিত্য নিয়মিত সকালে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে সিনেমা হাউসের সাড়ে চার আনার টিকিট ঘরের সামনে। বিকেলবেলা সেই টিকিট সে চড়া দামে বেচে। আজকাল সরকারের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অনুযায়ী চিনি বিক্রী হয়—মাত্র কয়েকটি দোকানে; দোকানের সামনে 'কিউ' করে লোক দাঁড়ায়; সেই 'কিউয়ে' দাঁড়িয়ে হীরেন কন্‌ট্রোলের দরে চিনি কিনে চড়া দামে বেচে দেয় চায়ের দোকানে। শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত তার এলাকা। চলন্ত ট্রামে সে ওঠে নামে অবলীলাক্রমে; বিশখানা ট্রাম বদল করে বিনা ভাড়ায় তার যাতায়াত চলে অবাধগতিতে। কয়েকজন বাস-কণ্ডাক্টারের সঙ্গে তার হৃদ্যতা আছে, তাদের বাস পেলে অবশ্য বাসেই যায়, ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে সে কণ্ডাক্টারকে সাহায্য করে; চীৎকার করে—লেক, কালীঘাট, আসুন বাবু আসুন! চলন্ত বাসে যারা চড়ে তাদের সে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নেয়, ডবল ডেকারের উপরতলায় যেতে অনুরোধ করে—উপর যাইয়ে বাবু, উপর যাইয়ে—একদম খালি একদম খালি।

হীরেনের দৃঢ় নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে হিংস্র বিদ্রোহ যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছিল। বাড়ির অসহনীয় অভাব-দুঃখ তাকে ইদানীং অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না; অনাহারে সে থাকে না— বাইরে খেয়ে আসে; জামা হাফপ্যাণ্টও তার জীর্ণ নয়, চোরাবাজার থেকে জামা-কাপড়ও সংগ্রহ করেছে, তবুও যতটুকু সময় সে বাড়িতে থাকে সেই সময়টুকুর মধ্যে মা-বাপ বিশেষ করে দিদি গীতার দুঃখকষ্ট তাকে পীড়া দেয়। মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে; বাড়ি থেকে পালাবার জন্যে সে অস্থির হয়। সব চেয়ে বেশী রাগ হয় বাপের ওপর। মনে হয়—অক্ষম, অপদার্থ চিররোগীটাই সকল দুঃখকষ্টের মূল। অতি দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতির পর সে যেদিন বাড়ি ফিরত, সেদিন রুগ্ন প্রদ্যোৎ নিষ্ঠুরভাবে তাকে প্রহার করত। হীরেন দাঁতে দাঁত টিপে সে প্রহার সহ্য করত আর মনে মনে বলত—মর, মর, তুমি মর। পরশু পর্যন্তও সে এর বেশী কিছু করতে সাহস করে নি। পরশু রাত্রে গীতার নিরুদ্দেশের পর থেকে আজ দু'দিন সে ক্রমাগত ঘুরছে তার দিদির সন্ধানে। এই নিরুদ্দেশ হওয়ার অর্থ সে তার বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বুঝেছে। গীতার সন্ধানে সে নানা বস্তির গলি-ঘুঁজি ঘুরে অত্যন্ত তিক্ত চিত্ত নিয়ে আজ বাড়ি ফিরেছিল, এবং এর জন্য সে মনে মনে গীতাকে কানাইকে অভিসম্পাত দিয়েছে, কিন্তু দায়ী করেছে তার অক্ষম অপদার্থ বাপকে; কেন সে গীতাকে বিয়ে দেয় নি? সেই অবস্থায় ওই পাখার এক আঘাতেই সে বিস্ফোরক বস্তুর মত ফেটে পড়ল।

কয়েকটি দ্রুততম মুহূর্ত পরেই স্তম্ভিত ভাবকে অতিক্রম করে সরোজিনী সভয়ে কাতর অনুরোধে বলে উঠল—হীরেন! হীরেন!

গর্জন করে হীরেন বললে—না।

রোগের তীব্রতায় তিক্ত-চিত্ত প্রদ্যোৎ অপমানক্ষুব্ধ পিতৃত্বের দাবী নিয়ে মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে পাখাটা হাতে উঠে দাঁড়াল।—খুন করে ফেলব তোকে।

সরোজিনী দু'হাত দিয়ে তাকে আটকাল, কাতর অনুরোধে বললে,—না না, ওগো না।

স্থির হিংস্র তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে হীরেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে, এক চুল সে নড়ল না, প্রতি ভঙ্গিমার মধ্যে আক্রমণের উদ্যত ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ; প্রদ্যোৎ থমকে গেল। সরোজিনী এবার তার পা জড়িয়ে ধরলে, বললে—তোমার পায়ে ধরি গো, আর সর্বনাশ করো না।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রদ্যোতের ক্রোধ ফেটে পড়ল সরোজিনীর উপর। হাতের পাখাটা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে করতে বললে—তুই—তুই—তুই আমার সকল দুর্ভাগ্যের মূল ! তুই—তুই—তুই !

মুহূর্তে হীরেন লাফিয়ে পড়ল বাপের ওপর, এক ধাক্কাতেই প্রদ্যোৎ মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হীরেন প্রচণ্ড টানে বাপের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তাকেই নিষ্ঠুরভাবে প্রহার আরম্ভ করলে।

—ওরে হীরেন ! হীরেন—হীরেন ! চীৎকার করে সরোজিনী ছুটে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে। হীরেন মুখ ফিরিয়ে একবার মায়ের দিকে চেয়ে একটা ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে হাতের পাখাটা ফেলে দিলে, বললে—ছেড়ে দাও আমাকে।

—না।—সরোজিনী আবার চীৎকার করে—তুই পালিয়ে যাবি !

সবল বাহু দিয়ে ঠেলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হীরেন বললে—হ্যাঁ। বলেই হাতের আঙুল দিয়ে মুখের উপর এসে-পড়া চুলগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে সে বেরিয়ে চলে গেল। কোথায় সে যাবে, কি সে করবে, সে চিন্তা তার মুহূর্তের জন্য হল না। সেজন্য সে নিশ্চিন্ত। উপার্জনের বহু পন্থা সে জানে, আরও বহুতর পন্থার কথা সে শুনেছে। অন্ধকার গলিতে দুর্বলের কাছ থেকে তার যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়া যায় ; লোককে ঠকিয়ে উপার্জন করা যায় ; যে পল্লীতে অবাধে চলে ব্যভিচার, সে পল্লীতে গলিঘুঁজি চিনে বাবুদের পথ দেখাতে পারলে, গভীর রাত্রে গোপন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মদ এনে দিতে পারলে টাকা মেলে।

অন্ধকারের মধ্যে মিশে গলি-পথে ঘুরে এসে উঠল বড় রাস্তার ধারে একটা উন্মুক্ত জায়গায়। এখানে ওখানে স্লিটট্রেঞ্চ। ওপাশে কয়েকটা খিলেন করা এয়ার-রেড শেল্টার ; সে নিঃশব্দে গিয়ে ওই একটা শেল্টারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গোল খিলেনের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার ; সঙ্কীর্ণ-পরিসর জায়গা। সন্তর্পণে সে অগ্রসর হল। ভিতরটায় একটা উগ্র গন্ধ উঠছে। মেঝেটা পিছল। সম্মুখে ওপাশে কতকগুলো জলজ্বল করছে কি ? ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠছে। মুহূর্তের জন্য হীরেন চঞ্চল হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই সে বলে উঠল···শালা ! গরু ! শীতের প্রকোপে গরুগুলো এর মধ্যে ঢুকেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সে জ্বেলে দেখলে তার অনুমান সত্য। দেশলাইয়ের কাঠির আলোতে এপাশ ওপাশ ভাল করে দেখে একটা শুকনো কোণে সে ঠেস দিয়ে বসল, যাতে গরুগুলো তাকে রাত্রে না মাড়িয়ে দেয়।

আকাশে প্লেন উড়ছে। একটি বিড়ি ধরিয়ে সে বিকৃত মুখে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল—দূ-র শা-লা ! দে বোমা ফেলে পৃথিবী চুরমার করে দে, তবে তো বুঝি ! তার বাপের মতই সে সমস্ত পৃথিবীর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমানে যা কিছু তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখতৃপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সব চুরমার হয়ে গেলে—সে অবাধে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে ভোগ করে নেবে। এ কামনা তার আজ নতুন নয় ; কতদিন সে কামনা করেছে, ভূমিকম্প হয়ে সব ভেঙেচুরে যাক, অথবা মহামারী হয়ে মরে যাক অধিকাংশ মানুষ। কখনও কখনও মনে এই কামনা অতি বিচিত্র আকারে উদিত হয়েছে—তখন সে কামনা করেছে, আজ যদি সে এমন অলৌকিক শক্তি লাভ করে, যাতে বন্দুক কামানের গুলি তার বুকে ঠেকে

পালকের মত পড়ে যায় ; যাকে সে বলে 'মরে যাও'—সেই মরে যায় ; যাকে বলে 'বেঁচে ওঠ' সেই বেঁচে ওঠে—আঃ! তবে কেমন হয়! আজ মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ শুনে সেই তিক্ত কামনাতেই তার মনে হল বোমার কথা।

বারো

কানাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিজয়দা ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। গত রাত্রির মত তারা দুজনে বাইরের বারান্দাতেই শুয়েছিল। গীতা শুয়েছিল ঘরের মধ্যে।

বিজয়দার ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে বসে কানাই বললে—ইস্, বড্ড বেলা হয়ে গেছে!

হাসিটা বিজয়দার অভ্যাসের চেয়েও বেশী, মুদ্রাদোষ বললেই যেন ঠিক বলা হয়। কৌতুকে তো হাসা স্বাভাবিক, বিজয়দা দুঃখেও হাসেন, রাগলেও হাসেন, কাঁদবার সময়ে হাসেন কিনা বলা যায় না, কারণ কাঁদতে তাঁকে কেউ দেখে নি। হেসে বিজয়দা বললেন—তুই ভাই, একটা স্লিপিং গাউন আর একজোড়া ঘাসের চটি কিনে ফেল ; তা হলে সাড়ে আটটায় ঘুম ভাঙলেও লজ্জা পাবে না তোর। আর যদি পাইপ ধরতে পারিস তবে তো দশটাতেও দোষ হবে না। ধূসর মধ্যবিত্ত থেকে খাঁটি মধ্যবিত্তত্বে পৌঁছে যাবি। খাঁটি পেটি বুর্জোয়া!

কাল রাত্রে বিজয়দাকে কানাই বলেছিল—তার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অভিযানের কথা।

কানাই অপ্রস্তুত হয়েই বললে—আচ্ছা, কাল দেখব তুমি সকালে ওঠ, না আমি উঠি।

—বাজি রাখিস নে, হেরে যাবি কিন্তু।

—তা হলে আমি বাজিই রাখছি।

হেসে বিজয়দা বললেন—দেখ, আমি খুব বড় আয়ুর্বেদবিদের কাছে শুনেছি যে, রোগের দু'রকম উপসর্গ আছে, একরকম উপসর্গ হল প্রকট যন্ত্রণাদায়ক, সেগুলো সাধারণ চিকিৎসকেও বুঝতে পারে ; আর একরকম উপসর্গ আছে সেগুলো অপ্রকট, সহজ দৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না। যেমন ধর্, ডিস্‌পেপসিয়ার রোগীর বদহজম, পেটব্যথা, ঢেকুর তোলা—এগুলো হল প্রকট উপসর্গ। কিন্তু অপ্রকট উপসর্গ হল, অম্বুলে জিনিসগুলোর ওপর রুচি, লোভ, আর পেঁপে পলতার ওপর অরুচি। তারপর ধর, টাকের রোগীর কথা। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া চক্‌চক্ করা, ওগুলো হল প্রকট লক্ষণ ; অপ্রকট লক্ষণ হল টাকে হাত বুলানো। সুখেও হাত বুলোচ্ছে ; চিন্তা থাকলে তো কথাই নাই, নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও, মানে চিন্তার অভাবেও হাত বুলোয়। তেমনি টাকার অর্থাৎ বুর্জোয়াত্বের প্রকট লক্ষণ হল, দাম্ভিকতা কর্তৃত্বাভিলাষ ইত্যাদি, আর অপ্রকট লক্ষণ হল দেরিতে ওঠা, বড় বড় কথা বলা, পাইপ, স্লিপিং গাউন ইত্যাদি। কথায় বলে, লক্ষ টাকার ঘুম! তোর বাষট্টি টাকাই কি কম নাকি?

কানাই বিজয়দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে।

বিজয়দা বললেন—কি? চটে গেলি নাকি?

—না। কিন্তু তুমি কি বল এ কাজ আমি করব না?

—যা, আগে মুখ হাত ধুয়ে আয়। ওই দেখ গীতা চা নিয়ে এসেছে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে গীতা আসছে, তার হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

পালকের মত পড়ে যায় ; যাকে সে বলে 'মরে যাও'—সেই মরে যায় ; যাকে বলে 'বেঁচে ওঠ' সেই বেঁচে ওঠে—আঃ ! তবে কেমন হয় ! আজ মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ শুনে সেই তিক্ত কামনাতেই তার মনে হল বোমার কথা।

বারো

কানাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিজয়দা ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। গত রাত্রির মত তারা তুজনে বাইরের বারান্দাতেই শুয়েছিল। গীতা শুয়েছিল ঘরের মধ্যে।

বিজয়দার ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে বসে কানাই বললে—ইস্, বড্ড বেলা হয়ে গেছে !

হাসিটা বিজয়দার অভ্যাসের চেয়েও বেশী, মুদ্রাদোষ বললেই যেন ঠিক বলা হয়। কৌতুকে তো হাসা স্বাভাবিক, বিজয়দা তুঃখেও হাসেন, রাগলেও হাসেন, কাঁদবার সময়ে হাসেন কিনা বলা যায় না, কারণ কাঁদতে তাঁকে কেউ দেখে নি। হেসে বিজয়দা বললেন—তুই ভাই, একটা স্লিপিং গাউন আর একজোড়া ঘাসের চটি কিনে ফেল ; তা হলে সাড়ে আটটায় ঘুম ভাঙলেও লজ্জা পাবে না তোর। আর যদি পাইপ ধরতে পারিস তবে তো দশটাতেও দোষ হবে না। ধূসর মধ্যবিত্ত থেকে খাঁটি মধ্যবিত্তত্বে পৌছে যাবি। খাঁটি পেটি বুর্জোয়া !

কাল রাত্রে বিজয়দাকে কানাই বলেছিল—তার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অভিযানের কথা।

কানাই অপ্রস্তুত হয়েই বললে—আচ্ছা, কাল দেখব তুমি সকালে ওঠ, না আমি উঠি।

—বাজি রাখিস নে, হেরে যাবি কিন্তু।

—তা হলে আমি বাজিই রাখছি।

হেসে বিজয়দা বললেন—দেখ, আমি খুব বড় আয়ুর্বেদবিদের কাছে শুনেছি যে, রোগের তু'রকম উপসর্গ আছে, একরকম উপসর্গ হল প্রকট যন্ত্রণাদায়ক, সেগুলো সাধারণ চিকিৎসকেও বুঝতে পারে ; আর একরকম উপসর্গ আছে সেগুলো অপ্রকট, সহজ দৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না। যেমন ধর, ডিস্‌পেপসিয়ার রোগীর বদহজম, পেটব্যথা, ঢেকুর তোলা—এগুলো হল প্রকট উপসর্গ। কিন্তু অপ্রকট উপসর্গ হল, অম্বুলে জিনিসগুলোর ওপর রুচি, লোভ, আর পেঁপে পলতার ওপর অরুচি। তারপর ধর, টাকের রোগীর কথা। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া চক্‌চক্ করা, ওগুলো হল প্রকট লক্ষণ ; অপ্রকট লক্ষণ হল টাকে হাত বুলানো। সুখেও হাত বুলোচ্ছে ; চিন্তা থাকলে তো কথাই নাই, নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও, মানে চিন্তার অভাবেও হাত বুলোয়। তেমনি টাকার অর্থাৎ বুর্জোয়াত্বের প্রকট লক্ষণ হল, দাম্ভিকতা কর্তৃত্বাভিলাষ ইত্যাদি, আর অপ্রকট লক্ষণ হল দেরিতে ওঠা, বড় বড় কথা বলা, পাইপ, স্লিপিং গাউন ইত্যাদি। কথায় বলে, লক্ষ টাকার ঘুম ! তোর বাষট্টি টাকাই কি কম নাকি ?

কানাই বিজয়দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে।

বিজয়দা বললেন—কি ? চটে গেলি নাকি ?

—না। কিন্তু তুমি কি বল এ কাজ আমি করব না ?

—যা, আগে মুখ হাত ধুয়ে আয়। ওই দেখ গীতা চা নিয়ে এসেছে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে গীতা আসছে, তার হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

বিজয়দা বললেন—গীতাকে আজ কাজে লাগিয়েছি। দেখ তো কেমন সুন্দর শান্ত মেয়ে!

কানাই হাসলে স্নেহের হাসি। গীতা শীতের দিনে এই সকালেই স্নান করে ফেলেছে। পরনে তার নতুন রঙীন ডুরে শাড়ী; কাল রাত্রে কানাই কিনে এনেছে। গীতা এসে চায়ের কাপটি নামিয়ে দিলে।

কানাই তাড়াতাড়ি উঠে বললে—মুখটা ধুয়ে আসি।

মুখ ধুয়ে এসে কানাই দেখলে নেপী এসে হাজির হয়েছে। চায়ের কাপটা তার হাতে। মুখচোরা নেপীর মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে; কোন অঘটন ঘটে গেছে নিশ্চয়, নেপী অকস্মাৎ নিশ্চয় কোনো পরমানন্দ বা পরম দুঃখের স্পর্শ পেয়েছে। মূক নেপী বাচালের মত কথা বলে যাচ্ছে, বিজয়দা চুপ করে বসে শুনছেন। গীতা ও-ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল, তার হাতে আর এক কাপ চা। চায়ের কাপটি সে কানাইয়ের হাতে তুলে দিলে।

নেপী বলছে অভিজ্ঞতার কথা। রিলিফে গিয়ে সে চোখে দেখে এসেছে। সাইক্লোনে সর্বস্বান্ত হয়ে একটি ভদ্র পরিবার ভাবী জীবনে ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আত্মহত্যা করেছে। পরিবার ছিল স্বামী-স্ত্রী একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা, তিনজনে গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

বিজয়দার ঠোঁটে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে রয়েছে, নীরবে সিগারেটে টান দিয়ে চলেছেন। গীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

নেপী বললে—শুনে এলাম ছেলেমেয়েও বেচছে লোকে। বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়ে।

কানাইয়ের শরীর ঝিম্-ঝিম্ করে উঠল।

বিজয়দা বললেন—গীতা, কানাই অফিসে যাবে, ষষ্ঠীকে তাগাদা দাও, নইলে সে বারোটা বাজিয়ে দেবে, যাও—যাও।

গীতা চলে গেল।

নেপী বললে—আরও রিলিফ পাঠাতে হবে বিজয়দা।

বিজয়দা হাসলেন।

নেপী আবার বললে—বিজয়দা!

—আচ্ছা।

নেপী ওই একটি কথাতেই আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। কানাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু বললে না, শুধু তার দিকে চেয়ে একটু সশ্রদ্ধ হাসি হাসলে। ওইটাই নেপীর পক্ষে স্বাভাবিক।

কানাই বললে—বিজয়দা!

হেসে বিজয়দা নীরবে তার দিকে চাইলেন।

—তুমি কি বল, বিজনেস করা উচিত নয়?

—তুমি পাগল কানাই। ও আমি ঠাট্টা করে বললাম। টাকার প্রয়োজন আছে ভাই। আর দুনিয়া জুড়ে যেখানে চলেছে কাড়াকাড়ি, সেখানে তুই কাড়বি না বললে—তোর ভাগই কাড়া যাবে, তুই ফাঁকি পড়বি। আমার কথাই ভেবে দেখ না, আমি পাই দেড়শো টাকা মাইনে, প্রেসের কম্পোজিটর পায় ত্রিশ টাকা, পিওন পায় পনেরো টাকা। সেখানে আমিও তো কেড়ে খাই। ওটা আমি ঠাট্টা করেছিলাম তোকে।

কানাই চুপ করে রইল।

বিজয়দা বললেন—টাকার অনেক প্রয়োজন কানাই। উপস্থিত আমারই একখানা

আলোয়ান চাই।

কানাই এবার একটু হাসলে।

বিজয়দা আবার বললেন—গীতার ভবিষ্যৎ আছে। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

গীতা! হ্যাঁ, গীতার একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কিন্তু ওই শান্ত, সঙ্কুচিত, শত সংস্কারের ভারে পঙ্গু মেয়েটি যে পথ চলতেই অক্ষম! তার কি ব্যবস্থা সে করবে? সেই কথাই সে গতরাত্রে ভেবেছে; প্রায় সমস্ত রাত্রিই তার ঘুম হয় নাই। শেষরাত্রে একটু ঘুম এসেছিল, সকালে উঠতে তাই আজ দেরি হয়ে গেছে। সে বললে—ওই কথাই কাল সমস্ত রাত্রি ধরে ভেবেছি বিজয়দা। কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। ওকে নিয়ে কি করি বল তো বিজয়দা? ওর দ্বারা কি হতে পারে, তা আমি ভেবে পেলুম না।

শান্ত হাসি হেসে বিজয়দা বললেন—যাতে ওর সব চেয়ে ভাল হয় সে কথা তো তোকে বলেছিলাম কানু। তুই যে 'না' বলেছিস।

কানাইয়ের মনে পড়ে গেল বিজয়দার কথা। গীতার তার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল নীলার কথা। আজ শুক্রবার। কাল শনিবার অফিসের পর নীলার সঙ্গে তার দেখা হবার কথা হয়ে আছে। সর্ব দেহে তার একটা চাঞ্চল্য প্রবাহিত হয়ে গেল।

বিজয়দা বললেন—কথাটা ভেবে দেখ কানাই।

—না, সে হয় না বিজয়দা।

বিজয়দা আর কোন কথা বললেন না।

গীতা এসে বললে—খাবার হয়ে গেছে। স্নান করুন কানুদা।

অমল কানাইকে দেখে বললে—বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে।

কাল সন্ধ্যার সময় কানাই যে নতুন কাপড়-জামা কিনেছিল—সেই পোশাক পরেছিল সে। অমলের কথা শুনে সে একটু হাসলে।

অমল বললে—এ কিন্তু আপনার অফিসের পোশাক হয় নি। স্যুট করিয়ে ফেলুন।

কানাই বললে—দরকার হলে করাতে হবে বৈকি।

—দরকার হবে। আজই দরকার ছিল। আপনাকে আজ কয়েক জায়গায় পাঠাব।

কানাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। কাজ নিয়ে অদম্য উৎসাহের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ফিরল বেলা চারটের সময়—হাসিমুখে। কাজগুলি সে ভাল ভাবেই করে এসেছে। এসে দেখলে—অমলের টেবিলের সামনে বসে আছে জিতু বোস—কারখানার ম্যানেজার। গম্ভীর মুখে বসে আছে। সে হেসে বোসকে নমস্কার করলে। বোসও প্রতিনমস্কার জানালে।

অমল কানাইকে জিজ্ঞাসা করলে—কাজগুলো সব হল?

কানাই সমস্ত বিবরণ বললে। অমল খুশী হল। বললে—এইবার আপনার কাজ। বাবা যা বলেছেন। চালের ব্যবসা আরম্ভ করে দেব। বসুন আপনি।

কাজ শেষ করে কলম ফেলে অমল বললে—ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে চেহারাও যেন পাল্টে গেল তার। একটা সিগারেট ধরিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললে—গুঁইবাবুকে পাঠিয়ে দে।

তারপর হেসে জিতু বোসকে বললে—আজ আপনাকে নতুন একটা জায়গায় নিয়ে যাব জিতুদা।

জিতুদা সসম্ভ্রমে বললে—ওরে বাপ রে! সে তো আমার সৌভাগ্য ভাই।

—আজ কিন্তু বাড়ি ফেরা হবে না। এখানেই থাকতে হবে।

—বাড়ি! আমার আবার বাড়ি! যেখানে আমি সেইখানেই আমার বাড়ি।

—এইবার একটা বিয়ে করে ফেলুন।

—বিয়ে? সর্বনাশ!

—কেন?

—কেন? তবে বলি শুনুন। উর্দুতে একটা কথা আছে "আশিককো পত্তা কাঁহা?" অর্থাৎ একজন জিজ্ঞাসা করছে—ভালবাসার লোকের ঠিকানা কি? না—"সুবা কঁহি, সাম কঁহি, দিন কঁহি, রাত কঁহি, কাটি জিন্দগী হোটেলোমে, মরি যা কর—হাসপাতলমে।" অর্থাৎ উত্তর দিলে ভালবাসার লোক যে,—সকাল কোথাও, সন্ধ্যে কোথাও, দিন কোথাও, রাত কোথাও কাটে আমার; যতদিন বাঁচি থাকি হোটেলে, মরবার সময় যাই—হাসপাতালে। আমাদের বাড়ি আর বিয়ে বারণ ভাই।

অমল হাসতে লাগল। কানাইয়ের মুখে ফুটে উঠল ধারালো হাসি। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—সূত্রটা শুধু সুস্বাদুই নয়, রঙীনও বটে।

নক্সীপাড় কাপড়, পাশ-বোতামে পাঞ্জাবি পরা, পাকানো চাদর গলায় এক প্রৌঢ় এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। অমলবাবু বললে—ইনি মিঃ চক্রবর্তী, আমাদের নতুন এজেন্ট; এঁকে নিয়ে কাল থেকে তুমি বাজারে ঘুরবে। সমস্ত হালহদিস শিখিয়ে দেবে। বুঝলে?

—যে আজ্ঞে। গুঁই সঙ্গে সঙ্গে কানাইকে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ নমস্কার করলে। কানাইও সবিনয়ে প্রতিনমস্কার করলে। অমলবাবু চট্ করে এক টুকরো কাগজে কি লিখে কানাইয়ের হাতে এগিয়ে দিলে, তাতে লেখা ছিল—Return his salute by nod only.

অমলবাবু মৃদুস্বরে গুঁইকে বললে—আমার বিজনেসও উনি দেখবেন। একজন পার্টনার হবেন। বুঝেছ?

—আমি আজ্ঞে সব দেখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব। উনি বুঝে নিলেই—

—উনি একজন এম. এস-সি। বলে অমলবাবু হাসলেন।—তা ছাড়া শ্যামবাজারের সুখময় চক্রবর্তীর নাম জানো—মস্ত বড় ধনী ছিলেন?

—ওরে বাপ রে! তা আর জানি না? তাঁর ছেলেদের জুড়ী যখন চিৎপুর দিয়ে যেত তখন সোরগোল পড়ে যেত। একছড়া বেলফুলের মালা কিনে দিতেন—একটা টাকা। তামার পয়সা হাতে কখনও ছুঁতেন না।

—তাঁরই প্রপৌত্র ইনি।

—ওরে বাপ রে!—বলে গুঁই এবার একেবারে কানাইয়ের পায়ের ধুলো নিতে অগ্রসর হল।

কানাই বললে—থাক্।

অমলবাবু একটু বিস্মিত হল। পরমুহূর্তেই সে একটু হাসলো। কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হল, গুঁইয়ের স্তাবকতার ধরনটা কানাই ঠিক বরদাস্ত করতে পারে নি।

গুঁই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে? অর্থাৎ আমার কি অপরাধ হল?

অমলবাবু আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে কাজের আবর্ত সৃষ্টি করে মুহূর্তে ব্যাপারটা সহজ করে নিলে। বললে—হ্যাঁ, একশো মণ চালের একটা বিক্রী রসিদ করে আন দেখি। স্ট্যাম্প দিয়ে —রসিদ লিখে দেবে—সেই রসিদ দেখালেই আমাদের দু'নম্বর গোডাউন থেকে মাল ডেলিভারী পাবে। মাল আমরা কানাইবাবুকেই বেচছি।

গুঁই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—একশো মণ? পঞ্চাশ বস্তা?

হেসে অমলবাবু বললে—হ্যাঁ। কানাইবাবুর জন্যে ওটা বাবার স্পেশাল পারমিশন।

গুঁই তবু বললে—খুচরো কাজে বড় অসুবিধে বাবু, একেবারে হাজার মণ করে দিলেই হত।

—না, না। একশো মণই করে আন তুমি।

রসিদ নিয়ে অমল কানাইকে বললে—আসুন, চালটা বিক্রী করতে হবে। গুঁই, এস। অমলের গাড়িতেই তারা রওনা হল—জিতু বোস, গুঁই, সে এবং অমল। আশ্চর্যের কথা—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুঁই চালটা আড়াই টাকা বেশি দরে বেচে ফেললে বাজারের একটা দোকানে, মায় টাকাটা এনে সে কানাইয়ের হাতে তুলে দিলে; অমলবাবু হেসে বললে—মণকরা আড়াই টাকা মুনাফা হয়েছে আপনার, একশো মণে—আড়াইশো টাকা রেখে বাকীটা আমাকে চালের দাম হিসেব দিয়ে দিন। তারপর অতি মৃদুস্বরে কানে কানে বললে—গুঁইকে দিয়ে দিন মণকরা চার আনা হিসাবে—পঁচিশ টাকা। আমার সামনে নয়, ওদিক ডেকে নিয়ে দিন।

কানাই গুঁইকে দিলে পঁচিশ টাকা। গুঁই তার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে চুপি চুপি বললে—একশো মণটাকে অন্ততঃ পাঁচশো মণ করে নিন স্যার। আর ক্রেডিটের কড়ারটা এক সপ্তা করে নিন। দেখুন না, কি করে দি!

কানাই একটু হাসলে—চেষ্টা করে টেনে আনা কৃত্রিম হাসি। কাল থেকে আজ পর্যন্ত দুটো দিন সে যা দেখেছে, তাতে তার জীবনের সহজ স্ফূর্তি যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে; মাথায় খাটো ওই অমলবাবুটি তার চোখে এক বিরাট মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। জুয়োখেলার মধ্যে যেটা অন্যের কাছে অদৃষ্ট, সেটা তার কাছে জুয়াচুরি ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। বিজয়দার তীক্ষ্ণ রসিকতা তার মনে পড়ছে।

ওদিকে গাড়ি থেকে অমলবাবু ডাকলে—মিঃ চক্রবর্তী, আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

কানাই সবিনয়ে বললে—না না, আপনি বাড়ি যান। আমি ট্রামে কি বাসে চলে যাব।

—চলুন না, আমার নিজেরও দরকার আছে আপনাদের ওদিকে। গাড়ি সে ঘুরিয়ে ফেললে—পূর্বমুখে—অর্থাৎ কানাইদের নিজেদের বাড়ির দিকে।

কানাই বললে—আমি তো ওখানে যাব না।

—কোথায় যাবেন?

বিজয়দার ঠিকানা বললে কানাই। অমলবাবু বললে—আচ্ছা, ওখানেই পৌঁছে দিচ্ছি।

গাড়িখানা হু-হু চলল। অমলবাবু বললে—মুশকিল হয়েছে পেট্রোলের। ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে প্রয়োজন মত সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে এজেণ্ট হিসেবে একখানা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কোম্পানী থেকে আপনাকে দিতাম।

—এই বাঁয়ে—এই গলির মধ্যে যাব আমি।

সুদক্ষ নাবিকের হাতের নৌকার মত মুহূর্তে গাড়িখানা মোড় ফিরে গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

কানাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, ধন্যবাদ দেবার মত সমকক্ষতার সাহস যেন তার ফুরিয়ে গেল। অমলবাবু গাড়ি থেকে মুখ বার করে হেসে বললে—আচ্ছা। কাল ঠিক দশটায় সময় যাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ বের করলে জিতু বোস, সে এক মিলিটারী সেলাম ঝেড়ে দিলে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির দরজা খুলে গেল। গীতা বোধ হয় ওপর থেকে কানাইকে

মোটর থেকে নামতে দেখেছিল। দরজা খুলে দরজার মুখে দাঁড়িয়েই গীতা কেমন হয়ে গেল। অপরিসীম ভয়ে বিবর্ণ মুখে সে থরথর করে কাঁপছে, হয়তো বা সে পরমুহূর্তে পড়ে যাবে। কানাই ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তার দুই বাহু ধরে ডাকলে—গীতা! গীতা!

গীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোটরের দিকে। মোটরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল কানাই।

অমলবাবুর চোখেও অদ্ভুত দৃষ্টি। সে বললে—ও মেয়েটি কে মিঃ চক্রবর্তী ?

—আমার বোন।

মুহূর্তে অমলবাবুর গাড়িটা গর্জন করে উঠল এবং দ্রুতগতিতেই গলিপথের ভিতর দিয়ে চলে গেল, পিছনের লাল আলোটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

গীতা বললে—ও কে ? ও কে কানাইদা ?

—উনি অমলবাবু, ওঁরই অফিসে আমি ব্যবসা শিখছি। ওঁকে তুমি চেন নাকি ?

আতঙ্কিত মুখে গীতা বলে ফেলল—ঘটকীর বাড়িতে, ওই—ওই—ওই কানুদা—। সে আর বলতে পারলে না।

কানাইয়ের সমস্ত অন্তর থর থর করে কেঁপে উঠল। মনে হল তার মনের ভিতরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ডালহৌসী স্কোয়ারে তার কল্পনার বিশাল সৌধখানা কাঁপতে কাঁপতে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে। অমলবাবু! অমলবাবুর মধ্যে এতবড় পাপ ? মাথার মধ্যে তার আগুন জ্বলে উঠল। মুহূর্তে মনে পড়ল তার পূর্বপুরুষদের কথা। এক ইতিহাস! কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চনা করে যে সম্পদ সঞ্চয় করে মানুষ, সে সম্পদ গুপ্ত ব্যাধি! সেই ব্যাধির তরুণ উপসর্গ আজ অমলবাবুর মধ্যে দেখা দিয়েছে। কালে ওই বংশটাও হবে তাদেরই অর্থাৎ চক্রবর্তী-বংশের মত। অকস্মাৎ সে দাঁড়াল। তার হাত পড়েছিল জামার পকেটের ভিতরের ওই দুশো পঁচিশ টাকার নোট—পকেটের মধ্যে ইনসেণ্ডিয়ারি বোমার মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—জ্বলে উঠবে এইবার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নোট কখানা হাতের মুঠোয় পিষে পাকিয়ে সম্মুখের ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিলে।

তেরো

বিজয়দার ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। তবে রাত্রি দশটার এদিকে তিনি কখনই ফেরেন না। আজ কিন্তু আটটা না বাজতেই তিনি ফিরলেন। তখন কানাই স্তব্ধ হয়ে বসে। ও ঘরে গীতা উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কানাইয়ের সঙ্গে অমলবাবুকে দেখে গীতা আশঙ্কায় চমকে উঠেছিল, তারপর কানাইদার এই স্তব্ধ ভাব দেখে আশঙ্কায় সেও প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আর কোনো কথা সে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে নি, রান্নাঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে ক্রমাগত নিঃশব্দে নিরুচ্ছ্বসিত কান্না কাঁদছে, তার কণ্ঠনালীতে একটা অসহনীয় উদ্বেগ পাথরের মত আটকে রয়েছে ; সেটাকে সে সংবরণও করতে পারছে না, আবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় প্রকাশ করতেও পারছে না। কি হবে ? ঐ লোকটা কানুদাকে কি বলেছে ? তার ওপর হয়তো উপযাচিকাত্বের অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। তার মিথ্যা অপবাদে সাক্ষ্য দিয়েছে হয়তো সেই ঘটকী। তার কথা মনে করে

তার সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছে। মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা। অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল—ঘটকীর মিষ্ট কথায় নানা প্রলোভনেও তার কান্না থামে নাই। তখন ঘটকী বলেছিল,—"ন্যাকামি করিস নে বাছা, ঢং আমি দেখতে নারি। চুপ কর্, নইলে এবার আমি নোক ডেকে বলব যে ছুঁড়িকে বাবু পছন্দ করে নি, তাই কাঁদছে, দেখ।" মুখে বীভৎসতার ছাপ আঁকা, সেই স্থূলাঙ্গী ঘটকীর অসাধ্য কিছুই নাই।

বাসার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ষষ্ঠীচরণ, সে নিতান্তই নিরুৎসুক মানুষ, একবার মাত্র কানাইকে সে প্রশ্ন করেছিল—চা করে দি?

কানাই নীরবে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

ষষ্ঠী আর কোন প্রশ্ন না করে বাইরে বসে বিড়ি টানছে। সন্ধ্যা থেকে রান্নাবান্নার উদ্যোগ আরম্ভ করেছে। গীতার কান্না দেখে একবার প্রশ্ন করেছিল—কি হল বাছা?

গীতাও নীরবে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

যার অর্থ হতে পারে—'কিছু হয় নি' অথবা 'বলব না'। ষষ্ঠীও এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করে নি। আর একবার প্রশ্ন করেছিল—দেখ তো গো, তরকারিতে এই নুনটা দোব?

গীতা ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতেই উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ।

কানাইকে ওই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বিজয়দা বললেন—কি রে? কি হল?

কানাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বিজয়দা হেসে বললেন—ওরে বাপ্‌রে, এতবড় দীর্ঘনিঃশ্বাস! কুম্ভক যোগ করে বসে ছিলি নাকি? হাতের অ্যাটাচি কেসটা বিছানায় ফেলে নিজেও তার উপর গড়িয়ে পড়লেন বিজয়দা। কানাইয়ের কোন উত্তর না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি আবার বললেন—সকাল থেকে বেরিয়ে তোর পাত্তা নেই। খুব ব্যবসা করছিস যা হোক! এদিকে আমার বিপদ! একদিকে গীতা আর একদিকে নেপী। তুই চলে যাওয়ার পর গীতা আজ আবার কাঁদতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ শ্রীমান নেপী এসে হাজির। এসেই চারিদিকে চেয়ে বেচারীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে মুখ দেখে মনে হল, পৃথিবীর বোধ হয় অন্তিম কাল উপস্থিত। কি ব্যাপার? না কানুদা কই? তিনি কোথায় গেছেন? বললাম—ভেবো না, কানুদা আসবেন। তোমাদের ব্রজরাখাল দলকে কাঁদিয়ে তিনি মথুরায় রাজা হতে যান নি। নেপীটা বোকার মত একটু হাসলে। তারপর বললে—জনসেবা কমিটির মিটিংয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল। আমাদের অনেক কমপ্লেন আছে। বললাম—মাভৈঃ! কানাই এলে তাকে বলব আমি; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার নৃপেন্দ্র! কিন্তু নেপী বসেই থাকে। অন্যদিকে গীতার চোখ থেকে জল পড়ে। খায় না। নেপীও তাই। খেতে বললে বলে—না। অবশেষে অনেক কষ্টে গীতার সঙ্গে পাতালাম 'হাসি-ভাই', নেপীর সঙ্গে 'খুশি-ভাই'। তোমার অভাবে আমাকেই যেতে হল মিটিংয়ে, নতুন সম্বন্ধের মাশুল দিতে। যাক্, ব্যাপার কি বল দেখি? এমন ভাবে বসে কেন? ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিস নাকি আজ? না খুব মোটা লাভ করে গম্ভীর ভাবে গভীর তত্ত্ব চিন্তা করছিস? তিনি হাসতে লাগলেন।

বিজয়দার মধ্যে একটা সরল ছোঁয়াচ শক্তি আছে। আপন সাহচর্যে অল্প সময়ের মধ্যেই পাশের লোককে আপন ভাবে প্রভাবিত করে তুলতে পারেন। কানাই এতক্ষণে কথা বললে, বিজয়দার সাহচর্যে তার মূক মূঢ় ভাব কেটে গেল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অদৃষ্টকে মানতাম না বিজয়দা; কিন্তু আজ কর্মবিপাকের মধ্যে এমন একটা অতি সূক্ষ্ম

নিষ্ঠুর পরিহাসরসিকতার পরিচয় পেলাম, যাকে অ্যাকসিডেণ্ট বলতে পারি না। নাটকের মত রচা ছক যেন ; আর অদৃষ্ট-প্রম্পটারের নির্দেশমত সেই ছকে ছকে ঘুরেছি আমি আজ। অদ্ভুত!

বিজয়দা গভীর আরাম এবং আশ্বাসভরে বলে উঠলেন—আঃ! তারপর বললেন—তাই মেনে নে ভাই, অদৃষ্টকে মেনে নে। অনেক দুঃখ থেকে বেঁচে যাবি।

—দুঃখ থেকে বাঁচব ? তার রসিকতার সকল আয়োজনই দেখলাম দুঃখ দেবার জন্তে।

—উঁহু। একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঐ দুটি কথা ছাড়া আর কিছু বলবার অবসর বিজয়দার হল না।

—উঁহু! মানে ?

—দুঃখদাতা যদি রসিক হয় এবং দুঃখ দানের মধ্যে যদি রসিকতা থাকে, তবে তো হাসতে হাসতে সে দুঃখ ভোগ করা যায়। এখন আমার বক্তব্য—অদৃষ্টকে মেনে নে—তা হলে তুই ছাড়া আরও দুটি লোক দুঃখের হাত থেকে বাঁচে—গীতা এবং আমি। "জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন অদৃষ্ট নিয়ে"—অদৃষ্টকে স্বীকার করে, তার যোগাযোগ মেনে নে, গীতাকে তুই বিয়ে কর।

অসহিষ্ণু হয়ে কানাই এবার বলে উঠল—বিজয়দা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর।

বিজয়দা একটু চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর উচ্চ করে ডাকলেন—হাসি-ভাই! গীতা!

গীতা ম্লানমুখে এসে দাঁড়াল। বিজয়দা তার দিকে চেয়ে দেখেই ভ্রূকুঞ্চিত করে কানাইয়ের দিকে চাইলেন, তারপরে বললেন গীতাকে,—এ তো তোমার সঙ্গে কথা ছিল না হাসি-ভাই।

গীতা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজয়দা বললেন—হাসি-ভাই পাতাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আমার মধ্যে কণ্ট্রাক্ট হয়েছে যে, দেখা হলেই আমাদের দুজনকে হাসতে হবে। হাস, হাস, হাস! দ্যাটস্ রাইট্! গীতার মুখে এবার একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল। বিজয়দা এবার বললেন—একটু চা খাওয়াও দেখি। ষষ্ঠীকে বল, দু'টাকা পাউণ্ডের চা, যা আড়াই টাকা পাউণ্ড দিয়ে ধুলো ঝাড়াই করে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ও নিয়ে এসেছে, সেই চা বের করে দিতে। বুঝলে?

গীতার মুখের মৃদু হাসি আরও একটু বিকশিত হয়ে উঠল। সে মৃদুস্বরে বললে—হ্যাঁ। বলে সে চলে গেল। বিজয়দা নীরবে সিগারেট টানতে আরম্ভ করলেন।

কানাই বললে—বিজয়দা!

—বল।

—আজকের ঘটনাটা তোমাকে আমি বলতে চাই।

—বলে যা।

কানাই আবেগের সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করলে—বলছিলাম না বিজয়দা, কর্মবিপাকের মধ্যে—

বাধা দিয়ে বিজয়দা বললেন—আমি খবরের কাগজের লোক কানু, আমরা ওসব ভূমিকা ভণিতা বাদ দিয়ে চলি। ব্রেফ ঘটনাটুকু বলে যা তুই।

কানাই এবার একটু হাসল। তারপর সে আরম্ভ করলে। ধীরে ধীরে আজকের সমস্ত ঘটনা বলে শেষ করে সে বললে—কাল রাত্রে আমি তোমাকে বলেছিলাম—আমার বা গীতার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। ভেবেছিলাম—বিজনেস-ফিল্ডে এত বড় একটা লোকের ব্যাকিং যখন পাব, তখন গীতাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যিকারের শক্ত শিক্ষিতা মেয়ে করে গড়ে তুলব। কিন্তু লোকটা গীতার ওপর চরম অত্যাচার করেছে—

না জেনে তারই সাহায্য নিলাম। এই দুশো পঁচিশ টাকা—

—দে, টাকাগুলো আমাকে দে। বিজয়দা হাত বাড়ালেন।

—সে টাকা আমি ওই সামনের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি।

—ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছ! বিজয়দা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। ডাকলেন—ষষ্ঠী, ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী এসে দাঁড়াতেই বিজয়দা বললেন—দেখ, কানুবাবু বাজে কাগজের সঙ্গে পকেট থেকে দুশো পঁচিশ টাকার নোট ওই সামনের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছেন। খুঁজে বের করতে যদি টাকা কমে গিয়ে দুশো পনের টাকাও হয়ে যায়, তাতেও আমি খুশি হয়ে তোমাকে পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দেব। পারবে তুমি খুঁজতে?

ষষ্ঠী বললে—কেমন ছেলেমানুষী দেখেন দেখি। দাঁড়ান, লণ্ঠনটা নিয়ে আসি।

—উঁহু। বড় টর্চটা নিয়ে এস।

কানাই বাধা দিয়ে বললে—না বিজয়দা।

—আঃ! পাগলামি করিস নে। বিলাস করে জলে টাকা ছুঁড়ে খেলা করাও যা, ঘৃণা করে টাকা ডাস্টবিনে ফেলাও তাই, সমান অপব্যয়। বিজয়দা ধমকের সুরেই কথাগুলি বললেন।

কানাই বললে—টাকাটা আমার। আমি ওটা ফেলে দিয়েছি।

—আমার ভাগ্যি যে, পুড়িয়ে ফেল নি নোট ক'খানা। কাল গীতাকে নার্সেস ট্রেনিং-এ ভর্তি করতে হবে। টাকা চাই, অথচ ব্যাঙ্কে আমার ব্যালেন্স আটাশ টাকা কয়েক আনা। এস ষষ্ঠী!

—ওই টাকা দিয়ে তুমি গীতাকে ভর্তি করবে?

—নিশ্চয়। তা-ছাড়া লোকটার সন্ধান যখন পেয়েছি তখন গীতার পড়ার সমস্ত খরচ আমি ওর কাছ থেকেই আদায় করব।

কানাই কঠিন স্বরে বললে—মানমর্যাদা একেবারে ভুয়ো জিনিস নয় বিজয়দা। তোমার অপমানবোধ না থাকতে পারে, কিন্তু ঐ টাকাটায় গীতার পড়ার ব্যবস্থা করলে তার চরম অপমান করা হবে।

বিজয়দার দুচোখ ধক করে এবার জ্বলে উঠল—কিন্তু তিনি কিছু বলবার পূর্বেই দু' হাতে দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল গীতা; মুহূর্তে বিজয়দা আত্মসংবরণ করে হাস্যস্মিত মুখে কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করে তাকে অভ্যর্থনা করলেন—

> "প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তব নত
> স্তম্ভিত মেঘের মত তৃষ্ণা-হরা
> আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।"

গীতা, তোমার ঠিক নাম হওয়া উচিত ছিল কাজলী।

গীতা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে বিজয়দার মুখের দিকে চাইলে; বিজয়দা আবার আবৃত্তি করলেন—

> "কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
> থমকিয়া আছ
> স্তব্ধ ছায়া পাতি'
> হাসির খেলার সাথী
> সুগভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি;

যেন তাহা দেবতারি করুণা-অঞ্জলি,—
—নাম কি কাজলী ?"

তোমার নাম দিলাম কাজলী! ওই নামেই তুমি খ্যাত হবে সেবিকারূপে। ওই নামেই তোমাকে ভর্তি করে দেব। বলতে বলতেই তিনি তার প্রসারিত হাত দুখানি হতে চায়ের কাপ দুটি নিয়ে একটা দিলেন কানাইকে, অপরটায় চুমুক দিয়ে বললেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে! তুমি খাবে না হাসি-ভাই ?

টেবিলের প্রান্তদেশটি ধরে অবনতমুখে গীতা বললে—বিজয়দা!

—ডেকে মনোযোগ আকর্ষণের তো প্রয়োজন নেই হাসি-ভাই ; আমি তোমার মুখের দিকেই চেয়ে আছি।

—যুদ্ধের নার্সের কথা বলেছিলেন না ? কম সময় লাগে আর প্রথম থেকেই মাইনে পাওয়া যায় ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে ওইতেই ভর্তি করে দিন।

বিজয়দা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কানাই বলে উঠল—না। ও-সব মতলব তুমি করো না গীতা।

গীতা বললে—না, আপনি মানা করবেন না কানাইদা। বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ঠিক এই সময়েই সর্বাঙ্গে ময়লা ধুলো মেখে এসে ঘরে ঢুকল ষষ্ঠীচরণ। টেবিলের ওপর কাগজের একটা তাল রেখে বললে—এই লেন।

গম্ভীরভাবে বিজয়দা বললেন—তোমার কাছেই রাখ। পরে নেব আমি।

কানাই বললে—বিজয়দা!

—টাকা আমি পার্টির কাজে দিয়ে দেব—চাঁদা বলে।

—সে তুমি যা খুশি করগে। কিন্তু গীতাকে ওয়ার সার্ভিস নিতে দিয়ো না তুমি।

—সে যদি নিতে চায়—তার যদি আন্তরিক আগ্রহ আর সাহস দেখি, আমি বারণ করব না।

কানাই চুপ করে বসে রইল।

বিজয়দা বললেন—গীতার সবচেয়ে বড় অপমান করেছিস তুই কানাই।

কানাই তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

—গীতা তোকে ভালবাসে, তুই তার সে ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করলি।

—কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি না বিজয়দা। কখনও তাকে স্ত্রীরূপে পাবার কল্পনা আমি করি নি। তুমি বিশ্বাস কর—আমি ওকে আমার বোন উমা থেকে পৃথক দেখি না। তাছাড়া ···বিজয়দা, সে হয় না।

বিজয়দা চুপ করে রইলেন।

কানাই বললে—গীতার ভার তুমি নিলে, আমি নিশ্চিন্ত। এখন একটা চাকরি দেখে দিতে পার ?

—চাকরি! বিজয়দা সবিস্ময়ে বললেন—কেন, ব্যবসা ?

—নাঃ, ব্যবসা আমি আর করব না। নিজে কিছু তৈরী করে যদি সেই জিনিসের ব্যবসা করতে পারতাম তো করতাম। আমি তাই আমার পরিশ্রম বেচতে চাই।

—হুঁ। বিজয়দা আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

—বিজয়দা!

—ভাবছি কানাই। আমাদের বাংলা কাগজের নিউজ ডিপার্টমেণ্টে একজন অ্যাসিস্টাণ্ট চাই, নাইট ডিউটি, পারবি ?

—পারব।

—সামান্য চেষ্টাতেই কাজ শিখে নিবি তুই। বাংলা তুই বেশ লিখিস। মাইনে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ।

—তাই করব বিজয়দা। এই রকম কাজই আমি চাই।

—তাই হবে। বলে বিজয়দা নির্বিকারভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ ছাড়তে ছাড়তে বললেন—কালকের মত বাইরে বিছানা করে ফেল দেখি!

আকাশে চাঁদ ডুবছে; পৃথিবীর বুক থেকে অন্ধকার ক্রমশঃ উপর দিকে উঠছে। রাস্তাগুলোর ভেতর অন্ধকার গাঢ়তর, বড় বড় বাড়িগুলোর ছাদের ওপর এখনও অস্তমিতপ্রায় চাঁদের ম্রিয়মাণ জ্যোৎস্নার আভাস জেগে রয়েছে; পুরনো কালিপড়া চিমনির লালচে আলোর মত প্রভাহীন পাণ্ডুর জ্যোৎস্না; তারই মধ্যে বাড়িগুলোর ছাদের আলসের সারি—রক্তাভ পটভূমির উপর গাঢ় কালো রঙে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। শীতও আজ যেন কালকের চেয়ে তীক্ষ্ণতর। নিত্যকার মত দূর আকাশে আজও কোথাও প্লেন উড়ছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অথবা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চলেছে বোধ হয়; কিংবা মহানগরীর টহলদারীতে ফিরছে। ডিসেম্বর মাসের পনর দিনের মধ্যে চট্টগ্রামে তিন দিনে চারবার বম্বিং হয়েছে। সেখানকার মানুষেরা দীপশূন্য ঘরে বিনিদ্র চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে বসে রয়েছে উৎকর্ণ হয়ে। মোটরের সেল্‌ফ স্টার্টারের শব্দেও চমকে উঠছে হতভাগ্য মানুষের দল। এই অবস্থার মধ্যেও রাস্তার একপ্রান্তে হয়তো বাড়ির বাইরের দিকে শোবার জন্য নির্মিত সামান্য পরিমিত আচ্ছাদনীর তলায় ছেঁড়া চট গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ভিক্ষুকেরা। বিজয়দা বাইরে এসে বললেন—তাই তো রে, আজ বেশ শীত পড়েছে। কনকনে বাতাস বইছে। ভাল করে লেপ জড়িয়ে বিছানার উপর বসে বললেন—বাঃ, আজ জমবে ভাল! শোন গতকাল রয়টার লেনিনগ্রামের যুদ্ধের ভারি চমৎকার এক টুকরো ছবি দিয়েছে। তোকে শোনাবার জন্যেই এনেছি।—

'It was the dead of night. Frost and blizzard. With a hiss and a clang shell after shell passed overhead. Somewhere from around the corner red flames shot up-wards and thunderous explosion rever-berated through the street.'

একজন নার্স আর একজন লোক সঙ্গে করে বরফের গাদার মধ্যে দিয়ে চলেছে—তারা খবর পেয়েছে রাস্তায় একটি মেয়ে অকস্মাৎ প্রসব-বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে রয়েছে—সেইখানেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। "They ran from snowpile to snowpile, stopped and listened." প্রসব-যন্ত্রণা-কাতর মায়ের কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতম সাড়া শুনবার জন্য তারা কান পেতে আছে।

দু'জনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ঘরের মধ্যে টাইম্‌পিস ঘড়িটি টিক-টিক করে চলছে, তার আওয়াজ আসছে। গীতারও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আকাশে আর এখন প্লেন উড়ছে না। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ বিজয়দা প্রশ্ন করলেন—তুই কি অন্য কাউকে ভালবাসিস কানু ? সেই রকম আভাস

যেন আমি পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

কানাই কোন উত্তর দিলে না।

তার মনে পড়ল—কাল শনিবার। তিক্ত হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। না, নীলার সঙ্গে দেখা সে করবে না। তার জীবনের বিষে তাকে সে জর্জরিত করবে না। দেহের মধ্যে তার রক্ত বিষ-জর্জরিত; বাইরে তার জীবন দারিদ্র্য-জর্জরিত। না; কাউকে ভালবাসার অধিকারই তার নাই। শনিবার এসপ্লানেডের দিকে সে যাবে না।

চোদ্দ

শনিবার। ভোরে উঠেই নীলার মনে হল আজ শনিবার। মনে পড়ল—কার্জন পার্কের সেই বেঞ্চখানা। হঠাৎ তার কানে এল তার বাপের কণ্ঠস্বর।

দেবপ্রসাদ গৃহিণীকে ডেকে বলছিলেন—দেখ, আমার হজমের গোলমালটা বেড়েছে। রাত্রে রুটিটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

জিনিসের দর আজ নাকি হঠাৎ একটা লাফ দিয়েছে। চালের দর আঠারো, আটা পঁচিশ, চিনি মেলে না, কেরোসিনের কিউয়ে দাঁড়িয়ে তেল আনতে এ-বেলায় গেলে ও-বেলার আগে ফেরা যায় না। কলের মজুরেরা চীৎকার শুরু করেছে—'মাগ্‌গী ভাতা দাও'। কেরানীরা নির্বাক। নিজেদের জলখাবার তারা আগেই বন্ধ করেছিল, এইবার ছেলেদের জলখাবার বন্ধ করতে হবে তাদের। নীলার মন মুহূর্তে যেন একটা ঘা খেয়ে গেল। শনিবারের অপরাহ্ণের কল্পনাটাও স্তিমিত হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মত ধীরে ধীরে নিভে গেল। সে খবরের কাগজ-খানা টেনে নিলে। ভোরবেলায় তার বাবা কাগজখানা নিজে পড়ে নীলাকে দিয়ে যান। আজ দিয়ে গেছেন একটু বেশী সকালে।

গৃহিণীর মুখে অতি সূক্ষ্ম ম্লান হাসি ফুটে উঠল। তিনি কোন উত্তর না দিয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেবপ্রসাদ বললেন—এক মুঠো করে ভাতই খাব আজ থেকে।

এবার গৃহিণী বললেন—তিন ছটাক ময়দা; ওতে আর তোমার কত টাকা বাঁচবে?

—উঁহু, বাঁচবার কথাই নয়। ওটাতে বরং বাচ্চাগুলোর জলখাবার করে দিয়ো।

খবরের কাগজওয়ালা এসে দাঁড়াল—বাবু, কাগজখানা?

—কাগজ কি হবে? গৃহিণী প্রশ্ন করলেন।

হেসে দেবপ্রসাদ বললেন—ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, ভোরবেলা কাগজ দিয়ে যাবে, আবার আটটার সময় নিয়ে যাবে, দাম অর্ধেক—বলেই তিনি ডাকলেন—নীলা!

ভিতর থেকে উত্তর এল—বাবা!

—খবরের কাগজখানা হল তোর?

নীলা কাগজখানা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—পড়া হয়েছে তোর?

—ভাইসরয়ের স্পীচটা পড়ছিলাম।

ম্লান হেসে দেবপ্রসাদ বললেন—খুব বড় কথাই বলেছেন! অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা;

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আইনসঙ্গত স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা—'full justice to the rights and legitimate claims of the minorities.'

—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার !—কাগজওয়ালা তাগাদা দিলে।

—দিয়ে দে মা কাগজখানা।

নীলা বাপের মুখের দিকে তাকালে। অকারণে পায়ের নখের দিকে মনঃসংযোগ করে দেবপ্রসাদ বললেন—ওর সঙ্গে আজ থেকে বন্দোবস্ত করেছি—সাড়ে আটটায় কাগজ ফেরত নেবে—দাম অর্ধেক পাবে।

নীলার মা নীলার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে এগিয়ে দিতে গিয়ে সবিস্ময়ে বললেন—পরশু আবার চাটগাঁ-ফেণীতে বোমা পড়েছে! ১৪ই তারিখে চট্টগ্রাম ও ফেণীতে বিমান-হানা!

অসহিষ্ণু কাগজওয়ালা অনুনয়ের আবরণে আবার তাগিদ দিলে—মা!

স্বামীর ওপরেই বোধ হয় ক্ষোভ প্রকাশ করে গৃহিণী কাগজখানা ফেলে দিলেন। কাগজওয়ালা মুহূর্তে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল—জোর খবর! চাটগাঁয়ে বোমা, ফেণীতে বোমা! জোর খবর!

—দুপুরবেলা কাগজখানা নেড়ে-চেড়ে কাটাতাম, তাও ঘুচে গেল! আমরা কি মানুষ!—বলে দ্রুতপদে গৃহিণী বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

দেবপ্রসাদ একটু হাসলেন। নীলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সন্ধ্যেবেলায় আপনি কাগজ নিয়ে থাকতেন—কাগজটা রাখলেই হত বাবা।

—দুনিয়ার খবর অনেক ঘাঁটলাম মা। দেখলাম, বাজে। কিছু হয় না মা। মা, দুগ্ধপোষ্য নাতি-নাতনীগুলোর জলখাবার বন্ধ হয়েছে, তোকে চাকরি নিতে হয়েছে—

—আমি চাকরি নিয়েছি তাতে কি আপনি খুশী হন নি বাবা?

—খুশী?

—কেন এতে দোষের কি আছে?

—থাক্ মা, ও আলোচনা থাক্।

নীলা সবিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার বাবার মুখ থেকে এ কথা শুনতে সে যেন প্রস্তুত ছিল না। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

'আলোচনা থাক্'—এ কথা বলেও দেবপ্রসাদই আবার বললেন—এবার তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্ছ্বসিত—ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে বললেন—নতুন জীবনে নিজের ঘর বেঁধে তুই যদি চাকরি করতিস মা, তবে আমি হাসিমুখে চেয়ে দেখতাম, অহঙ্কার করে বলতাম—কেমন মেয়ে আমি গড়ে তুলেছি দেখ। কিন্তু আমার সংসারের জন্যে তোর উপার্জন আমায় নিতে হচ্ছে—অক্ষমতার এ লজ্জা এ দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না মা।

এক মুহূর্তে নীলার মনের সমস্ত ক্ষোভ গলে জল হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—আজ শনিবার। কমরেড আজ তাকে তার কথা বলবে। দুই ভাবের সংঘাতে চোখে তার জলও এল। সে-চোখের জল নীলা বাপের কাছে গোপন করলে না। বাপের কোলের কাছে বসে ছোট মেয়ের মত তাঁর কাঁধের ওপর চিবুকটি রেখে বললে—ছেলে আর মেয়ে সংসারে কি সত্যই ভিন্ন বস্তু বাবা? কই দাদা যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন তাতে তো আপনি একবারও 'আহা' বলেন না। তাঁর টাকা নিতে হয় আপনাকে—এতে তো আপনি কুণ্ঠিত হন না।

দেবপ্রসাদ কোন উত্তর দিলেন না। যে প্রশ্ন নীলা তাঁকে করেছে তার কোন আবেগময়

উত্তর বা মনস্তুষ্টিজনক মিথ্যা উত্তর দিতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। সত্যই নীলার উপার্জন গ্রহণ করতে তাঁর কুণ্ঠা হয়। যেখানে কন্যাকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন—এম্-এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন, সেখানে নারীজাতির অর্থ-উপার্জনকারী অধিকারকে তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেছেন। পুরুষের উপার্জনের আওতায় মেয়েরা ঘরের মধ্যে গৃহকর্মকেই শুধু মাথায় করে রাখলে গৃহকর্ম শ্রী-সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে এ কথা সত্য, স্বামী সন্তান তাতে কর্ম-জীবনে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে এও সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ পদ্ধতির পরিণতিতে নারীজাতির পরাধীনতা সেখানে অনিবার্য, এও সত্য। জীবনে সহধর্মিণীর এবং সিংহাসন-ভাগিনীর অধিকার সত্ত্বেও সীতা বনবাসে গিয়েছিলেন; পাশার বাজিতে দ্রৌপদীকে পণ থাকতে হয়েছিল। এ সব যুক্তিকে স্বীকার করেন দেবপ্রসাদ। কিন্তু তবু বর্তমান ক্ষেত্রে কিছুতেই তিনি এ কুণ্ঠাকে জয় করতে পারেন নি। অন্তরে অন্তরে যে ক্ষোভ তাঁর পাক খেয়ে ফিরছিল—আজ এক দুর্বল মুহূর্তে অকস্মাৎ সে আত্মপ্রকাশ করল।

নীলা আবার ডাকলে—বাবা!

—মা।

—আমার কথার জবাব দেবেন না বাবা?

—যুক্তিতে তোর কথাই ঠিক মা, মনে মনে কতবার ওই যুক্তি দিয়েই মনকে বোঝাই, সান্ত্বনা দিই! কিন্তু আমি যাঁদের আমলে মানুষ হয়েছি, তাঁদের যে আদর্শ আমাদের ভেতর সংস্কার হয়ে বেঁচে রয়েছে, সে মানে না। এই ধর—বলেই তিনি চুপ করে গেলেন।

নীলা প্রশ্ন করলে—কি বাবা?

—থাক না মা।

—না, আপনি বলুন।

একটু ইতস্তত করে দেবপ্রসাদ বললেন—নেপী কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বর। মনে হচ্ছে তুইও বোধ হয় যোগ দিয়েছিস। তোমাদের যুক্তি আমি মানি, কিন্তু কোন রকমেই অন্তরকে বোঝাতে পারি নে—ভুলতে পারি নে গান্ধীজীর মত লোককে জাপানের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন বলে অপবাদ দিয়ে—তাঁকে বন্দী করে রেখে—। ···তিনি অর্ধপথেই চুপ করে গেলেন।

নীলার চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল; সে বললে—এ অপবাদের প্রতিবাদ আমরা বোধ হয় সকলের চেয়ে করি বাবা। অন্তরে অন্তরে এর জন্যে দুঃখ পাই। নেতাদের মুক্তি আমাদের প্রধান দাবি। কিন্তু ওদিকে যে জাপান এসে আসামের বর্ডারে থাবা গেড়ে বসেছে; অভিমান করে তাকে ঢুকতে দিলে যে সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ হবে। বাবা, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে রাণী ভবাণী বলেছিলেন—সায়রের রাঘব বোয়ালকে মারতে নদী থেকে খাল কেটে কুমীর এনো না। আমাদের স্বাধীনতা—

দেবপ্রসাদ বাধা দিলেন—থাক মা। রাজনীতি আমার ভাল লাগে না। তোদের নতুন জীবন, তাজা রক্ত—তোরা যা ভাল বুঝিস কর। আমার কাছে আজ ম্যালথাসের কথাই সত্য। পৃথিবীতে স্বাধীন শক্তিমান জাতিদের মধ্যে ফুলবাগানে আগাছার মত আমরা অনাবশ্যকভাবে জায়গা জুড়ে রয়েছি। যুদ্ধে মহামারীতে ধ্বংস হওয়াই আমাদের নিয়তি।

তাঁর কথার মধ্যে এমন একটি সকরুণ বেদনার সুর ছিল যার স্পর্শে নীলা ব্যথিত হয়ে

উঠল, কয়েক মুহূর্তের জন্য গভীর হতাশায় সেও স্তব্ধ হয়ে রইল।

দেবপ্রসাদ বললেন—কিন্তু এমন তিল তিল করে মৃত্যু এ সহ্য হচ্ছে না মা। বিশেষ করে ঐ শিশুগুলোর দুঃখ আর দেখতে পারছি না।

নীলার মা এসে পিতা-পুত্রীর আলোচনায় বাধা দিলেন—তুই কি আজ অফিস-টফিস যাবি নে?

চকিত হয়ে নীলা বললে—কটা বাজল?

—সে জানি নে বাছা, অমরের স্নান হয়ে গেছে।

—দাদার স্নান হয়ে গেছে?—নীলা উঠে ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেল। নীলার মা আপন মনেই বকতে আরম্ভ করলেন—চাকুরে মেয়ের আপিসের ভাত যোগাতে হচ্ছে; অদৃষ্ট বটে আমার!—তারপরই স্বামীকে বললেন—তোমার বুঝি কোর্ট-টোর্ট নেই আজ?—পরমুহূর্তেই হেসে বললেন—না থাকলেই ভাল, ভূতের ব্যাগার তো!—দেবপ্রসাদও একটু হাসলেন।

বাড়ির ভেতর দুটি শিশুতে কলরব করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। অমরের পাতের ভাত নিয়ে মারামারি। গিন্নী বললেন—বউমা, ভাগ করে খাইয়ে দাও তুমি। ছোট খোকাকেও একটু একটু ভাত-ডাল মেখে মুখে দিয়ো। গোয়ালাটা সুর ধরেছে দুধের দর বাড়াবে।

পাউডার ফুরিয়েছে। নীলা পাউডার যে-ভাবে মাখে সে না-মাখারই সামিল। স্নান করার পর মুখের চকচকে তৈলাক্ততাটুকু ঘোচাবার জন্য পাউডারের প্যাডটা শুধু বুলিয়ে নেয়। কদিন থেকেই অফিস যাবার সময় তার পাউডার কেনার কথা মনে হয়েছে, কিন্তু ফেরবার সময় আর মনে হয় নি। আজ সে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল। তার বাপের সঙ্গে যে কথা-বার্তাটুকু হল তার সবটাই দুঃখের কথা—হতাশার কথা। কিন্তু ওর ভেতরের একটি কথা তার মনে বিচিত্রভাবে একটা সলজ্জ পুলকিত সুর তুলে দিয়েছে। "নতুন জীবনে নিজের ঘর বেঁধে তুই যদি চাকরি করতিস"—ওই কথাটি তার মনে যেন গুঞ্জন করে ফিরছে। বার বার মনে হচ্ছে, আজ শনিবার। সে আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখল। চুলের সামনের দিকটায় আবার একবার চিরুনি দিয়ে ঈষৎ একটু পরিবর্তন করলে। পাউডারের কৌটোটা কয়েকবার ঠুকে নিয়ে প্যাডটা সযত্নে মুখের উপর বুলিয়ে আয়নার দিকে চাইলে স্থির দৃষ্টিতে। তার রূপের দৈন্য সম্বন্ধে সে সচেতন, কিন্তু আজ নিজের ছবি তার নিজের ভালো লাগল।

নতুন জীবন—তার নিজের ঘর! ছোট একটি ফ্ল্যাট, হাল্কা অথচ সুন্দর অল্প কতকগুলি, আসবাব, চারিদিকে পরিচ্ছন্নতার উজ্জ্বলতা, অনাড়ম্বর দুটি জীবনের প্রয়োজনে যতটুকু লাগে শুধু ততটুকু; তার বেশী সে চায় না। ট্রামখানা দাঁড়াতেই সে উঠে পড়ল।

—উঠুন মশাই। লেডিস সিট। লেডি। শুনছেন?

ভদ্রলোক মুখ না ফিরিয়েই পিছনে হাত দিয়ে 'লেডিস' লেখা প্লেটটা আছে কিনা পরখ করে দেখলেন। আবার কানাইকে তার মনে পড়ে গেল। কানাইবাবুও সেদিন এমনিভাবে পিছনে হাত দিয়ে প্লেটটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।

কানাইবাবুকে বরাবরই তার ভাল লাগে। অভিজাত বংশের কান্তিমান সবলদেহ তরুণটিকে দেখে সকলেরই ভাল লাগার কথা। মনে পড়ল তার কলেজ-জীবনের কথা। আজ বিকেলে কার্জন পার্কে যে ফুলটি তার জীবনে ফুটবে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই

কলেজ-জীবনে। তার সহপাঠিনীমহলে কানাইকে নিয়ে কত রহস্যালাপই না হত! বি. এ. পর্যন্ত তারা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়েছিল; তখন কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ হয় নাই, কারণ কানাই ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র, তা ছাড়া কথাবার্তা, আলাপেও সে বরাবরই অত্যন্ত সংযত। দাম্ভিক বলে অনেকে অপবাদ দিত। কিন্তু তবুও তাকে নিয়ে আপনাদের মধ্যে রসিকতা করতে তারা ছাড়ত না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা পর্যন্ত এ রহস্যালাপে যোগ দিত। একদিন কলেজের ছাত্র-সমিতির একটি সভায় কানাইয়ের ব্যঙ্গশ্লেষভরা তীক্ষ্ণ যুক্তিসম্পন্ন বক্তৃতা শুনে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বলেছিল—আমি তো আজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছি। অবিশ্যি চক্রবর্তীর চেহারা দেখেই অর্ধেকটা পরাজিত হয়েছিলাম আগেই; আজ তার বক্তৃতা শুনে আমার পরাজয়টা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

একটি মুখরা এবং প্রখরা বাঙালী সহপাঠিনী বলেছিল—দেখ, তুমি যদি বল, তবে চক্রবর্তীকে আমি কথাটা বলি।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ছিল নির্লজ্জ রকমের রসিকা, বলেছিল—দেখ, যে বাদাম ভাঙা যায় না—সে বাদাম দেখে জিভে জল পড়লেও, সে লোভ সংবরণ করাই ভাল। দাঁত ভেঙে আমি হাস্যাস্পদ হতে চাই নে। তার চেয়ে তোমার সুপুরিখেগো দাঁত, তুমি চেষ্টা কর। ভাঙতে যদি পার তো তখন দেখা যাবে। তা হোক না তোমার এঁটো।

নীলার প্রকৃতি অবশ্য কোন কালেই এ ধরনের নয়। কানাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ কলেজে কোনদিন হয় নি; কোনদিন এ ধরনের রহস্যালাপের মধ্যে সে বাক্যব্যয় করে নি, তবে শুনেছে এবং উপভোগ করে হয়তো মৃদু হাসিও হেসেছে। কানাইয়ের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ বাংলা দেশের ছাত্রসভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে। তারপর পার্টির অফিসে। সেদিন এই ট্রামেই কানাইয়ের সঙ্গে তার প্রথম ছাত্র-সমিতির এবং পার্টির গণ্ডীর বাইরে—নিছক পরস্পরকে উপলক্ষ করে আলাপ হয়েছিল। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই আলাপ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। কানাইয়ের নিশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ সে অনুভব করেছে। কানাই আজ তাকে তার জীবনের কথা বলবে। তার ওপর আজ বাপের ওই বেদনাদায়ক কথাটির মধ্য থেকে—অতি বিচিত্রভাবে তার মনে এক অভাবিত পুলকিত কল্পনা রসান্বিত হয়ে উঠেছে, বিদ্যুৎদীর্ণ আকাশের বর্ষণে সিক্ত পৃথিবীর বুকের মত।

শনিবারে অফিসের ছুটি অপেক্ষাকৃত সকালে।

তবুও সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ছুটির জন্য। ছুটি হতেই সে দ্রুত এল কার্জন পার্কে। প্রত্যাশা করেছিল, কানাই বসে থাকবে। কিন্তু কই কানাই? সে ক্ষুণ্ণ হয়েও নিজেকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলে—কানাই এলে সে বলতে পারবে—সে-ই আগে এসেছে। সে বসল। কিন্তু কানাই কই? ধীরে ধীরে আলো ম্লান হয়ে এল। লেডল' কোম্পানীর ঘড়িটায় প্রায় ছটা বাজে। সে বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল। কেন সে এমন ভাবে প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে? তবু সে আরও কয়েক মিনিট বসে রইল—অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে এসে সে ট্রামে চড়ে বসল।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় তার একাগ্র চিন্তান্বিত অন্তরের কল্পনা ভেঙে গেল। সত্যকারের ধাক্কা। ধর্মতলা ও এসপ্ল্যানেডের মোড়ে সারিবন্দী ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ট্রামের ড্রাইভারের হিসেবের ভুলে ট্রামখানা বাঁধতে বাঁধতে আগের ট্রামের পেছনে বেশ জোরেই ধাক্কা খেয়েছে। নীলা মাথায় একটু আঘাত পেলে, পাশের জানলার কাঠে ঠুকে গেছে। তবু ভাগ্য যে, লোহার বিটে ধাক্কা লাগে নি। ট্রামসুদ্ধ লোক ড্রাইভারের ওপর খড়্গহস্ত

হয়ে হৈ-হৈ করে উঠল। নীলা কিন্তু একটু হেসে নেমে পড়ল। তার মনে হল—তাকে সচেতন করে তুলবার জন্যই কৌতুক করে এ ধাক্কাটা দিয়ে গেল কেউ। বাংলা দেশে গরীব বাপের কালো মেয়ের নীড় রচনার কল্পনা—বিবাহ নিয়ে সুখস্বপ্ন—এমনি ভাবেই ভেঙে যাওয়া উচিত। অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান কানাই—মুখে যে কথাই বলুক, ছাত্রাবস্থায় যত বড় আদর্শবাদেরই বড়াই করুক, ঘর তাকে বাঁধতে হবে জড়োয়া গহনা এবং বহুমূল্য বেনারসী পরা, পায়ে আলতা-আঁকা, বাহ্যত নতমুখী কোন এক অভিজাত স্বজাতীয়া কন্যাকে নিয়ে: সে মেয়ে হয়তো থার্ড ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, বাঁকা অসমান অক্ষরে ইংরেজী এবং বাংলাতে নাম লিখতে পারে, হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু'চারখানা সিনেমা-সঙ্গীত গাইতে পারে, থিয়েটারের বইয়ের সমালোচনা করতে পারে, ঝি-চাকরদের কঠোর শাসন করতে পারে—তখন সে মেয়ের চোখে সত্যিই আগুন জ্বলে ওঠে—দয়া করে ভিক্ষুককে উচ্ছিষ্ট বিতরণ করতে পারে অকাতরে অন্নপূর্ণার মত। এরা ব্রত করে দূর্বাগুচ্ছ-বাঁধা রাখী ধারণ করে কামনা করে, এই সৌভাগ্য যেন তার জন্ম জন্ম হয়, এমনই ভাবে দীনদরিদ্র কাঙাল ভিক্ষুককে যেন সে জন্ম-জন্মান্তর তার সম্পদ-সমৃদ্ধ সংসারের উচ্ছিষ্টবিশেষ দিয়ে কৃতার্থ, সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতকে ধন্য, জন্মকে সার্থক ও জন্মান্তরের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করতে পারে। তার সৌভাগ্য এবং পুণ্যকে সার্থক করবার জন্য যেন কাঙাল ভিক্ষুকরা জন্ম-জন্মান্তর থাকে। আপনার মনেই সে একটু হাসলে। অন্যমনস্ক ভাবেই সে আবার চৌরঙ্গীর দিকে এগিয়ে চলছিল। বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না।

ধর্মতলায় রাস্তার ফুটপাথে সারিবন্দী ছেলের দল বসে গেছে জুতো পালিসের সরঞ্জাম নিয়ে। যুদ্ধের বাজারে এই একদল বালক-ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছে। বিদেশী সৈনিকের দল চলেছে ভিড় করে। তাদের জুতো পালিস করে দিয়ে এরা জীবিকার্জন করছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের অপঘাত-সমাপ্তি, বোধ করি, এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই ছেলেদের মধ্যে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুচি এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশী—কিন্তু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেও মধ্যে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বর্ণবিন্দু এমন কি ব্রাহ্মণ বৈদ্য কতজন আছে তার হিসেব কেউ রাখে নি। রাখবার আগ্রহও নেই—কারণ এ যেন এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মৃত্যু—স্নায়ু শিরা, সমস্ত ইন্দ্রিয় জরায় জীর্ণ হয়ে স্বাভাবিক বিলম্বিত মৃত্যু মরছে। জাতি ধর্ম বর্ণ সমস্তের অতীত, ধরিত্রীর বুকের রূপ হতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বহমান প্রাণশক্তির প্রবাহ একান্ত নিরাসক্ত ভাবেই মুক্তির আগ্রহে নবকলেবরে প্রয়াণ করছে। এসপ্লানেডের মোড়ের দক্ষিণ দিকের ফুটপাথের বাঁকের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে পথের উপর একটা ভিড় জমে গেছে। একটা লোক এখানে নিয়মিত ভাবে কোন সস্তা সেন্টের বিজ্ঞাপন প্রচার করে গন্ধসিক্ত একটুকরো অয়েল-পেপার হাতে দেয়; সে লোকটা হাত বাড়িয়ে কাগজ দিতে এল; বিরক্তিভরেই নীলা তার হাতটাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। আবার একটা এ্যাক্সিডেণ্ট!

একখানা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি মিলিটারী লরীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে! গাড়ির বা গাড়ির আরোহীদের কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু একটা ঘোড়া—অস্থি-কঙ্কালসার-মর্কট জাতীয় ঘোড়া—ঘোড়ার জুড়ি আবদ্ধ রাখবার লোহার ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে গেছে, গোটা গাড়িটা এখন ওই হতভাগ্য জীর্ণ জানোয়ারটার ওপর চেপে পড়েছে। ঘোড়াটার পিছনের পায়ের উপরের অংশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। সদ্য সদ্য ঘটেছে এ্যাক্সিডেণ্টটা। গাড়োয়ানটা সবে নীচে নামছে তার আসন থেকে। একটি বাঙালীর ছেলে কিন্তু এরই

মধ্যে চাকাখানা ধরে প্রাণপণে গোটা গাড়িখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। কে ও? নেপী! হ্যাঁ, নেপীই তো। এই তো সামনেই পড়ে রয়েছে নেপীর মান্ধাতার আমলের সাইকেলটা। আনন্দে অহঙ্কারে তার মনটা ভরে উঠল। কিন্তু একা নেপী বোঝাই গাড়িটা তুলতে পারছে না। আর কেউ যাচ্ছে না। অথচ চারপাশে ভিড় জমতে আরম্ভ হয়েছে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক দাঁড়িয়ে নেপীর বীরত্ব দেখছে। তার ইচ্ছে হল—হাতের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে সে এগিয়ে যায়। কাপড়ের আঁচলটা সে কোমরে জড়াতে শুরু করলে। কিন্তু তার আগেই দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল দু'জন সৈনিক। যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কেউ নয়, এরা দু'জন নূতন আগন্তুক। নেপীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে মুহূর্তে তারা গাড়িটা আলগোছে তুলে ফেললে।

রাস্তার ধারের জানোয়ারদের জল খাবার জন্য তৈরী চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে ঘোড়াটার রক্তের ধারা মুছিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে জল খাইয়ে, তারা ধুলো রক্ত এবং জল মাখা হাত বাড়িয়ে দিলে নেপীর দিকে। লাজুক নেপীও হাত বাড়িয়ে দিলে সলজ্জ হাসিমুখে। ততক্ষণে রাস্তা পার হয়ে নীলা নেপীর পিছনে এসে ডাকলে—নেপী!

পিছনের দিকে তাকিয়ে নেপীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—দিদি! সৈনিক দু'জন সম্ভ্রম-ভরেই নীরবে নীলার দিকে চেয়ে রইল। নেপী এতক্ষণে যেন বলবার কথা খুঁজে পেলে—হাসিমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে বললে—আমার দিদি!

তারা মাথা নীচু করে নীলাকে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বললে—আপনার ভাই খুব সাহসী ছেলে!

নীলা বললে—আপনারা যেভাবে কালা-আদমির বিপদে সাহায্য করেছেন—আমি দেখেছি; আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাদের একজন বললে—আমাদের দেশবাসী ওই যারা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাসছিল, তাদের ব্যবহারে আমরা লজ্জিত। তবে ওরা পেশাদার সৈনিক—টমীজ।

অপরজন বললে—আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বোধ হয় লোকের ভিড় জমাচ্ছি। একটু গিয়ে ঐ পার্কের মধ্যে দাঁড়ালে হয় না?

সৈনিকদের একজনের নাম জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট—অপরের নাম হেরল্ড ম্যাকেঞ্জি। যুদ্ধের পূর্বে তারা ছিল অক্সফোর্ডের ছাত্র। হেরল্ড হেসে বললে—ছেলেবেলায় শুনেছিলাম ভারতবর্ষের নাম—বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সে দেশ নাকি এক অদ্ভুত দেশ! সেখানকার মানুষ সম্বন্ধে শুনতাম অদ্ভুত গল্প, সে দেশের জঙ্গলে নাকি অসংখ্য বাঘ, পথে চলতে পায়ে পায়ে সাপ বের হয়। তখন থেকেই ইচ্ছা ছিল—বড় হলে ভারতবর্ষে যাব। অক্সফোর্ডে পড়বার সময় মহাকবি টেগোর, মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইভাবে ভারতবর্ষে আসতে হবে, তা ভাবি নি।

নীলা হেসে বললে—কেমন দেখছেন আমাদের দেশ?

জেম্‌স বললে—খুব ভাল লেগেছে আপনাদের দেশ—বিশেষ যখন ট্রেনে কোন দূর জায়গায় যাই তখন—মনে হয় জাদুর দেশ।

—মানুষ? গল্পের মানুষের সঙ্গে মিল পেয়েছেন?

হেরল্ড বললে—যখন প্রথম প্রথম এসেছিলাম, তখন সত্যিই অদ্ভুত মনে হয়েছিল। অসভ্য বর্বর ইত্যাদি যে সব বিশেষণ আমাদের দেশের রাজনীতিকরা প্রয়োগ করে থাকেন, তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে দেখছি আপনাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের দেশের

শিক্ষিত পণ্ডিতদের চেয়ে কোন অংশে ছোট বা খাটো নন। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের হার অবশ্য বেশী; সেটা পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। আর—কথা শেষ না করেই হেরল্ড যেন সঙ্কোচভরেই একটু হাসলে।

নীলাও হেসে প্রশ্ন করলে—অনুরোধ করছি—বলতে সঙ্কোচ করবেন না।

হেসে হেরল্ড বললে—আপনাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা বড় গরীব, এবং গরীব বলে তাদের আপনারা অস্পৃশ্য করে রেখেছেন। যার ফলে তারা অত্যন্ত ভীরু; এমন কি তারা নিজেরা নিজেদের মানুষ বলে ধারণা করতে পারে না।

লাজুক নেপী এবার মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল, বললে—কিন্তু আমাদের দেশ এককালে, এই ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল।

জেম্‌স এবার বললে—এই বিতর্কের ভয়েই বোধ হয় হেরল্ড কথাটা বলছিলেন না।

হেরল্ড বললে—কিন্তু মিঃ সেন, আমার ধারণা, যারা অস্পৃশ্য তাদের অবস্থা, তোমাদের দেশ যখন সমৃদ্ধিশালী ছিল, তখনও ভাল ছিল না। তারা চিরদিনই গরীব।

—ধনী-দরিদ্র আপনাদের দেশেও আছে। এবং ধনীর চাপে দরিদ্রেরা চিরদিনই ভয়ে বোবা হয়ে থাকে। পরাধীন দেশে সেটা আরও বেশী হয়েছে। দেখবেন লক্ষ্য করে একজন অশিক্ষিত গরীব দেশী খ্রীষ্টান তারই মত অশিক্ষিত গরীব হিন্দু বা মুসলমানের চেয়ে বেশী সাহসী। তার কারণ তারা আমাদের শাসকদের ধর্মাবলম্বী।

নেপী মুখ-চোখ লাল করে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নীলা বাধা দিয়ে বললে—ও আলোচনা আজ থাক; যদি আবার কোনদিন দেখা হয় আলোচনা করব। আজ আমি এইবার বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছে।

জেম্‌স বললে—আর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলছি, মার্জনা করবেন। একটা খবর জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে।

—বলুন।

একখানা খবরের কাগজ খুলে নীলার সামনে ধরে বললে—এই সমালোচনাটা কি নির্ভরযোগ্য? আপনাদের দেশের নাটক দেখতে চাই আমরা। এই বইটা কি আপনি দেখেছেন?

'সংঘর্ষ' নামক একখানি নাটকের সমালোচনা। আগামী কাল রবিবার বইখানার শততম অভিনয় হবে, সেই সংবাদ জানিয়ে বইখানির যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। এই নাটকের অভিনয় নীলা দেখে নি, তবে বইখানি পড়েছে। বইখানি সত্যিই ভাল বই, এবং অভিনয়ও নাকি ভাল হয়েছে বলে শুনেছে।

কাগজখানি ফেরত দিয়ে সে বললে—হ্যাঁ। বইখানি সত্যই ভাল বই, আমি পড়েছি। এবং অভিনয়ও ভাল হয়েছে বলে শুনেছি।

—আপনি দেখেন নি?

—না।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জেম্‌স নেপীকে বললে—সেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে নাটক দেখ—তবে ভারি খুশী হব। আমরা অবশ্য বাংলা পড়ছি, কিন্তু এখনও কিছুই বুঝতে পারি না। তুমি যদি বুঝিয়ে দাও আমাদের! অবশ্য অনুরোধ করতে পারি না—

নীলা বললে—আপনারা যদি আমাদের অতিথি হিসেবে আসেন থিয়েটারে, তবে নেপীর সঙ্গে আমি আসতে পারি।

মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে তারা দু'জনেই বললে—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছি।

বাড়িতে এল নীলা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। কিছুই যেন ভাল লাগছে না। কাপড় না ছেড়েই সে বিছানার শুয়ে পড়ল। মা এলেন।

—কি, তুই অমন করে শুলি যে?

—এমনি।

মা বললেন—ও ঘরে অমর শুয়েছে মাথা ধরেছে বলে। তুই শুলি—এমনি। একমাত্র বাঁদী আমি—জলখাবার পৌঁছে দি। আমার যেমন—

বাধা দিয়ে নীলা বললে—দাদার মাথা ধরেছে?

বেরিয়ে যেতে যেতে মা বললেন—মাথা ধরেছে কি না সেই জানে, তবে কপালে আগুন লেগেছে। চাকরিতে আজ জবাব হয়েছে।

পনেরো

রবিবার। ঘুম ভেঙে নীলা উঠল।

নীলা অবশ্য ভোরেই ওঠে। বাঙালী গৃহস্থঘরের মেয়েদের এটা আবহমান কালের অভ্যাস। শহরের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা রাত্রি থাকতেই উঠে থাকে। নীলারও সেই অভ্যাস। আজ কিন্তু নীলা বাইরে এসে দেখলে তখনও রাত্রি রয়েছে। সে বারান্দায় দাঁড়াল। রাত্রে তার ভাল ঘুম হয় নি।—কালকের দিনটা তার পক্ষে খারাপ দিন গেছে।

দাদার চাকরি গেছে। পঁয়ত্রিশ টাকা আয় কমে গেল। অথচ দাদার ছেলেমেয়ে নিয়েই সংসার। একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। মেয়েটির বয়স ছয়, তার জন্মে খরচ খুবই কম, তার দুধ এরই মধ্যে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, খায় সে অনেকবার—দাদুর পাতে, পিসীমার অর্থাৎ নীলার পাতে, ঠাকুমার পাতে—মোট কথা পাতের খেয়েই তার চলে যায়। নীলা প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু নীলার মা বলেছিলেন—থাক মা, ওকে আর আমি ইস্কুলমুখো হতে দেব না। ভয় নেই—ওর কোন কষ্ট হবে না।

নীলা জানে, তার মা তার এই এতটা বয়স পর্যন্ত কুমারীত্ব পছন্দ করেন না—মনে মনে মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করেন। তাঁর ধারণা সে অর্থাৎ নীলা যদি ইস্কুল কলেজে না পড়ত তবে এতদিন কখনই অবিবাহিত থাকত না।

তার বউদিদিও গোপনে নীলাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যেন মেয়ের পাতের কুড়িয়ে খাওয়া নিয়ে সে কোন বাদ-প্রতিবাদ না করে। নীলা দুঃখিত হয়েও চুপ করে থাকে। তার বউদিদির মনও সে বুঝতে পারে; বউদিদি নিজের স্বামীর অল্প উপার্জনের জন্য লজ্জিত।

দাদার মুখ দেখে সব চেয়ে বেশী দুঃখ হয় তার। শান্ত মানুষটির হাসিও নেই, দুঃখেরও কোন প্রকাশ নেই—বোবার মত থাকেন। ঘরে থাকলেও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। বাইরে এসে বাপের কাছেও কখনও বসেন না। ব্যর্থতার যেন জীবন্ত মূর্তি। কাল আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকেছেন আর বের হন নাই। রাত্রে খান নাই। মাথা ধরেছে বলে শুয়েছিলেন—ওঠেন নাই। বাবা নিজে এসে একবার ডেকেছিলেন। মৃদুস্বরে দাদা উত্তর দিয়ে-

ছিলেন—সত্যিই মাথা ধরেছে বাবা।

দেবপ্রসাদ আর কিছুই বলেন নাই। খেতে বসে হেসে স্ত্রীকে বলেছিলেন—সাপে ব্যাঙ ধরে খায় দেখেছ ?

নীলার মা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। দেবপ্রসাদ বলেছিলেন—আমাদের সংসারটা ব্যাঙ—আমাদের সাপে ধরেছে। প্রথমটা ব্যাঙগুলো লাফাতে চেষ্টা করে, চেঁচায়। ক্রমে সাপটা যত গিলতে থাকে ধীরে ধীরে ব্যাঙটা নির্জীব হয়ে পড়ে, চ্যাঁচানির বদলে কাত্‌রায় আস্তে আস্তে ; তারপর সব চুপ।

নীলার মনটা তিক্ত হয়েই ছিল ; কানাইয়ের ব্যবহারে সে আঘাত পেয়েছে। কানাই যে হৃদ্যতা এবং আবেগের সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল তাতে সে অনেক কিছু কল্পনা করেছিল। তার উপর বাপের কথা শুনে দুঃখ পাওয়ার চেয়েও বেশী কিছু পেলে—সারা অন্তরটা সকরুণ ভাবে শোকার্ত হয়ে উঠল। যতবার সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে—দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলি কেঁপে বেরিয়ে এসেছে। অনেকবার সে ভাবতে চেয়েছে, কানাইয়ের সঙ্গে যে তার দেখা হয় নি সে ভালই হয়েছে। নীড় গড়বার সকল কল্পনা মুছে ফেলে ভেবেছে, সে আজীবন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যাবে, দাদার ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলবে। সেই হবে তার জীবনের একমাত্র কাজ। মধ্যে মধ্যে ভেবেছে রাজনীতির সংস্রব সে ত্যাগ করবে।

এরই মধ্যে আর একটা চিন্তা তাকে পীড়িত করেছে। আজ সে উত্তেজিত মুহূর্তে অকস্মাৎ একটা ভুল করে বসেছে। জেম্‌স্‌ এবং হেরল্ড বলে যে সৈনিক দু'জনের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট এবং নেপীকে উপলক্ষ্য করে—তাদের সে কাল অর্থাৎ রবিবারের বাংলা নাটকের অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রণ করেছে। বার বার মনে হল, অন্যায় হয়েছে—অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। বিদেশী সৈনিক, নিতান্তই অপরিচিত, একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যে একটা আচরণ দেখে তাদের বিচার করা যায় না। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে সৈন্যদের উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতা একটা বিশেষ অধ্যায় রচনা করে আসছে। আজ সেটা হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে এমন ভাববার কারণ নেই। তা ছাড়া বাবা শুনলে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন। তিনি যতই উদার হোন, মেয়েদের সহশিক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করতে চান না। বিশেষ করে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে শুনলে হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন।

নীলা বাপের মতে সায় দিতে না পারলেও তাঁকে দুঃখ দিতে চায় না। তারা যখন লাখে লাখে এদেশে এসেছে, পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন পথে বের হলে আলাপ হবেই। পরিচয়ে বন্ধুত্বে নীলা দোষ দেখে না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে সেও নারাজ। ওদের মধ্যে ভদ্র শিক্ষিত সত্যকার ভাল লোক আছে, কিন্তু অশিক্ষিত অভদ্র মানুষেরও তো অভাব নেই। যারা ভদ্র শিক্ষিত তাদেরও তো জীবন আজ স্বাভাবিক নয়! যুদ্ধের আবহাওয়ায় জীবন-মরণের অনিশ্চয়তার দোলার মধ্যে নিষ্ঠুর হতাশার মধ্যে সর্ববিশ্বাস হারিয়ে জীবনের পেয়ালা ভোগরসে পূর্ণ করে নিয়ে পান করতে চাওয়াটা তো তাদের পক্ষেও অস্বাভাবিক নয়। হয়তো অনেকে সাময়িক ভাবে প্রেমেও অভিভূত হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের পরে—সে প্রেম নেশাভঙ্গের মত ভেঙে যেতে পারে এবং যাওয়াই স্বাভাবিক। নীলা জীবনের ও সমস্যাটাকে এমন লঘুভাবে গ্রহণ করতে রাজী নয়।···

—কে ? নীলা ?—দেবপ্রসাদ উঠেছেন।

—হ্যাঁ বাবা!—নীলা সচেতন হয়ে উঠল। ফরসা হয়ে এসেছে। সে ঘরের কাজে যাবার জন্য উদ্যত হল।

দেবপ্রসাদ বললেন—এত সকালে উঠেছিস মা ?

হেসে নীলা বললে—আজ একটু বেশী ভোরেই ঘুম ভেঙেছে বাবা।

"আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার,—জোর খবর!" খবরের কাগজের হকারেরা বেরিয়েছে; ময়লার গাড়ি চলেছে। প্রথম ট্রামখানা চলে গেল। অদূরস্থ ট্রামরাস্তা থেকে ঘর্ঘর শব্দ আসছে।

—আ-গিয়া বাবু! আ-গিয়া!

খবরের কাগজওয়ালা তাদের বাড়িতেই ডাকছে। 'আ-গিয়া' হাঁকটি ওর নিজস্ব!

নীলা দরজা খুলে কাগজখানা নিলে।

কাগজওয়ালা বললে—খুচরো পয়সা তিন আনা যদি দিতেন!

নীলা বললে—দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি। কিন্তু টাকার ভাঙানি দেবে তো ?

—ভাঙানি ? ভাঙানি কোথায় পাব ?

—তবে ?

লোকটা বকতে বকতে চলে গেল—ভাঙানি, ভাঙানি আর ভাঙানি! সবাই চায় ভাঙানি। ভাঙানি কি দেশে আছে রে বাবা!

নীলা একটু হাসলে। সত্যিই দেশে এক মহা-সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেজগি দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। বাসে ট্রামে ভাঙানি না থাকলে নামিয়ে দেয়; বাজারে গেলে খুচরো না থাকলে—জিনিস কেনা যায় না। কিনতে হলে পুরো টাকার কিনতে হয়। কাল তাদের বাড়িতেই সাগু আনতে হয়েছে এক টাকার। তাদের ঠিকে-ঝিয়ের নাকি কাল খুচরোর অভাবে বাজার হয় নি।

বাবার হাতে সে খবরের কাগজটা তুলে দিলে।

দেবপ্রসাদ কাগজ খুলে বসলেন, বললেন—ঝি তো এখনও আসে নি।

হেসে নীলা বললে—উনোন ধরিয়েই চা করে আনছি বাবা।

দেবপ্রসাদের ওই চায়ের নেশাটিই একমাত্র নেশা।

চা তৈরী করে বাপের কাছে কাপটি নামিয়ে দিলে।

দেবপ্রসাদ বললেন—তোর ?

নীলা নিজের চা নিয়ে এসে বসল। দেবপ্রসাদ তাকে কাগজখানা এগিয়ে দিলেন।

'আরাকান অঞ্চলে জাপানীদের সঙ্গে সংঘর্ষ।' 'রুশিয়ায় তুমুল সংগ্রাম।' 'আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের কৃতিত্ব।'

দেবপ্রসাদ বললেন—মিঃ বি. আর. সেনের রিপোর্টটা পড়।

প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান ডিভিশনের অ্যাডিশনাল কমিশনার মিঃ বি. আর. সেন আই-সি-এস্ মহোদয় মেদিনীপুরের সাইক্লোন-বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন।

"একটি গ্রামের একশো পঞ্চাশ জন অধিবাসীর মধ্যে একজন মাত্র বেঁচে আছে। অন্য একটি গ্রামে একশো ছত্রিশ জনের মধ্যে বেঁচে আছে চার জন; একশো বত্রিশ জন মারা গেছে। শতকরা পঞ্চাশ জন লোক পানীয় জলের অভাবে বাসভূমি ছেড়ে চলে গেছে। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে মানুষ বাস করছে। পানীয় জল, শীতবস্ত্র, পরনের কাপড় আর অন্নের জন্য মানুষ হাহা-কার করছে। বহু মাইল অতিক্রম করেও একটা গরু আমি দেখতে পাই নি।"

নীলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

দেবপ্রসাদ বললেন—আমরা তো স্বর্গসুখ ভোগ করছি মা!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—তাই তো কাল রাত্রে শুয়ে নিজেই লজ্জা পেলাম নিজের কাছে। আমার বাবা বলতেন, কখনও উপরের দিকে চেয়ো না, মানে তোমার চেয়ে বড়লোক যারা তাদের দেখে নিজের অবস্থা বিচার করো না, দুঃখের আর সীমা থাকবে না। চেয়ে দেখো নিচের দিকে। মানে, কতশত লোকের তোমার চেয়ে অবস্থা খারাপ সেই দিকে চেয়ে দেখো। তা হলে আক্ষেপ থাকবে না। সেই কথাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ল—"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" লজ্জা পেলাম নিজের কাছে।

বাপের কথায় নীলাও সান্ত্বনা পেলে। খবরের কাগজটা সে ওল্টালে। আমোদ-প্রমোদের বিজ্ঞাপনগুলো বড় বড় হরফে বিচিত্র ছাঁদে সন্নিবিষ্ট হয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যে তার নজরে পড়ল—"—থিয়েটার।——প্রণীত অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত নাটক 'সংঘর্ষ'। শততম অভিনয় উৎসব। দেশপ্রেমিক পণ্ডিতপ্রবর—সভাপতিত্ব করবেন।

সে অন্যায় করেছে। সে বিদেশীয়দের নিমন্ত্রণ করেছে। উচিত হয় নি তার। তবুও এক্ষেত্রে উপায় নেই। সে যদি না যায় তবে বিদেশী দুটি কি ভাববে? দেশে গিয়ে কি বলবে? তার সম্বন্ধে হীন ধারণা করবে এবং করলে অন্যায় হবে না।

সে কুণ্ঠিতভাবে বললে—বাবা!

—কি মা?

—আমি একটা কাজ করে ফেলেছি।

—কি?—দেবপ্রসাদ বিস্মিত হলেন।

—আমার দুটি বন্ধুকে কথা দিয়েছি আজ থিয়েটার দেখাব। সংঘর্ষ নাটকখানা নাকি খুব ভাল হয়েছে। আজ তার একশো রাত্রির উৎসব। —সভাপতিত্ব করবেন।

বন্ধু বলতে দেবপ্রসাদ বান্ধবীই বুঝলেন। হেসে বললেন—বেশ তো, যাবে। কথা যখন দিয়েছ, যাবে।

—নেপীকে নিয়ে যাব বাবা।

—বেশ।

নীলা উপার্জন করে সব তাঁকে এনে দেয়। এতে দেবপ্রসাদ গোপন লজ্জা এবং বেদনা দুই-ই অনুভব করেন। আজ সে থিয়েটার দেখে কয়েকটা টাকা অপব্যয়, হ্যাঁ তাঁর মতে অপব্যয়, করতে অনুমতি চাওয়ায় তিনি খুশী হলেন। সম্মতি দিয়ে যেন তৃপ্তি বোধ করলেন।

বাবার সম্মতি পেয়ে নীলা আশ্বস্ত হল—কিন্তু তবুও বার বার অন্য কারণে সে নিজেকে অপরাধী না ভেবে পারল না। নিমন্ত্রণ করে অভিনয় দেখাবার মত তার সামর্থ্য কোথায়। চারজনের অন্ততঃ আট টাকা লাগবে। এই দুর্মূল্যতার দিনে, তাদের বাড়ির কচি বাচ্চাদের যেখানে দুধ বন্ধ হয়েছে, দাদার চাকরি গেছে, সেখানে এই বিলাসের জন্য ব্যয়—নিজেকে সে কোনমতে সমর্থন করতে পারলে না।

তার আরও অনুতাপ হল অভিনয় দেখতে গিয়ে। ভিড়ে বুকিং অফিসের কাছে পৌছানো যায় না। চারিদিকে সাজসজ্জার সমারোহ। কোনমতে টিকিটের জানালায় গিয়েও নেপী ফিরে এল। দু'টাকার টিকিট নেই। কয়েকখানা আছে তাও একসঙ্গে নয় এবং সে সিটগুলির সামনে আছে থামের প্রতিবন্ধক। কৃতকার্যের জন্য নীলার আত্মগ্লানির সীমা রইল না। কিন্তু তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জেম্‌স এবং হেরল্ড। নীরবেই সে আরও একখানি পাঁচ টাকার

নোট বের করে নেপীর হাতে দিল।

তিন টাকার সিট অনেকটা আগে। সৌভাগ্যক্রমে সিটও পাওয়া গেল দ্বিতীয় সারিতে একেবারে মাঝখানে, বিদেশীদের পাশে নীলা বসল। কিন্তু সে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, অভিনয় দেখার আনন্দের চেয়ে মনের গ্লানি তার প্রবল হয়ে উঠেছে।

জেম্‌স তাকে প্রশ্ন করলে—আপনি কি অসুস্থ মিস্‌ সেন ?

নীলা চমকে উঠল। নিজের দুর্বলতা বুঝে সে আপনাকে সংযত করলে—হেসে বললে —না তো।

—কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

নীলা হেসে বলল—দেখুন, আমাদের দেশে মানুষের জীবন এত দুঃখকষ্টে ভরা যে এর ওপর বিয়োগান্ত নাটক আমাদের সহ্য হয় না। আমি বইখানার বিয়োগান্ত পরিণতির কথা মনে করে পীড়িত হয়ে উঠেছি।

ওদিকে তখন মঞ্চের পর্দা অপসারিত হচ্ছিল।

নেপী তার হাত ধরে আকর্ষণ করে বলে উঠল—কানুদা !

আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের উপর সভাপতি এবং সম্ভ্রান্ত অতিথিরা বসেছেন। শততম অভিনয় উপলক্ষে আনন্দ-অনুষ্ঠান হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হবে, নাট্যকারকেও অভিনন্দন জানিয়ে উপহার দেওয়া হবে। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাবেশের মধ্যে বসে আছে কানাই।

মুহূর্তের জন্য সকল বিষণ্ণতা তার দেহ-মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে গভীরতম বিষণ্ণতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

প্রথমে সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল—কানাই একদিনেই এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে ? পরমুহূর্তেই মনে হল, সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কি সে তার সঙ্গে দেখা করবার অবসর পায় নি অথবা দেখা করে নি ? কি সে বৈশিষ্ট্য ? কানাই বলেছিল, সে ব্যবসা করছে। এক-দিনেই প্রাচীনকালের ধনীবংশের সন্তান ধনোপার্জনের আস্বাদ পেয়েছে ! তার রক্তের সুপ্ত ধনীজনোচিত মনোভাব ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, যার জন্যে তার অভিজাত আত্মীয় বা বান্ধবদের সহায়তায় ওইখানে বসবার আসন সংগ্রহ করতে তার দ্বিধা হয় নি—সংগ্রহে বেগ পাবার অবশ্য কথা নয়।

তার পাতলা ঠোঁট দু'খানির মিলনরেখাটি ধনুকের মত বক্র হয়ে উঠল।

ষোল

কানাই কিন্তু এসেছিল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হয়ে। বিজয়দার প্রতিভূ হিসেবে। তাই সে আসন পেয়েছিল মঞ্চের উপর, বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে।

গতকাল থেকে অর্থাৎ শনিবারেই সে খবরের কাগজের চাকুরিতে ভর্তি হয়েছে। বিজয়দাদের সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশিষ্ট এবং বড় প্রতিষ্ঠান। একখানা ইংরেজী এবং একখানা বাংলা দৈনিক পত্র বের হয়। এ ছাড়া আছে মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্র। বাংলা

দৈনিকপত্র 'স্বাধীনতা'-র 'নাইট সাব-এডিটার' হিসেবে কানাই চাকরি পেয়েছে। রাত্রি দশটা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত তার কাজের সময়।

বিজয়দা তাকে বলেছিলেন—দেখ্ পারবি তো? রাত্রিতে কাজ। রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। অথচ এর মধ্যে সঞ্জীবনী সুধা প্রেম বা বিরহ নেই। দেখ।

কানাই হেসে বলেছিল—দুনিয়াতে অপ্রেমিক এবং অ-বিরহীদের দিয়েই কারখানার নাইট সিফ্‌টগুলো চলে বিজয়দা।

বার বার ঘাড় নেড়ে বিজয়দা বলেছিলেন—উঁহু! ওদের শতকরা নিরানব্বুই জন বিবাহিত। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর্—চাকরি নিয়ে বিয়ে করে ফেল্! দিব্যি তার মুখ মনে করবি আর কাজ করবি। একবারও ভুলে ঢুলবি না।

যাক্। কানাই শনিবারেই কাজে ভর্তি হয়ে গেল। নীলার সঙ্গে সে দেখা করবে না এই ঠিক করেছিল, তার জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে নীলাকে জড়িয়ে দুঃখ দেবে কোন্ অধিকারে? তার উপর নীলার সঙ্গে দেখা করার নির্ধারিত সময়েই কাগজের অফিসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাকে বিজয়দা নিয়ে গেলেন। বিজয়দার সুপারিশ ছিল, অধিকন্তু বিজয়দা কানাইয়ের কৃতিত্বের নিদর্শন হিসেবে দাখিল করলেন কানাইয়ের লেখা একটা প্রবন্ধ। সেদিনই সকাল থেকে বসে কানাই প্রবন্ধটা লিখেছিল। অমলের উপর ক্রোধটাই বোধ হয় প্রবন্ধটার মূল প্রেরণা। তাতে পুঁজিবাদীদের দয়ার অন্তরালে যে গোপন কূট মনোভাব খেলা করে সেইটাই সে প্রকাশ করেছে। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলেন। কানাই কাজ পেলে এবং তার প্রবন্ধটাও কাগজের সোমবারের সংখ্যায় অর্থ নৈতিক বিভাগের জন্য গৃহীত হল।

নূতন কর্মজীবন কানাই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলে। সংবাদপত্রের পাতায় তার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে উপলব্ধি তার হয়েছে, সেই উপলব্ধি এই সুযোগে সে মানুষের কাছে নিবেদন করবে। শুধু তাই নয়—কাজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাও সে করলে অনেক। প্রাণশক্তির স্বভাবধর্মগত আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা বা প্রেরণা থেকে সঞ্জাত তার জীবনস্বপ্ন আজ এই নূতন কর্মের অবলম্বনকে কেন্দ্র করে এক মহৎ ভবিষ্যৎ রচনা করলে। বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের কৃতিত্বের বলে সে তার এই সামান্য কাজকে অসামান্য করে তুলবে, তার জীবনের নিরলস ঐকান্তিক সাধনার সকল ফলে এই কাগজখানির সমৃদ্ধিকে সমৃদ্ধতর করে সে হয়ে উঠবে অপরিহার্য—অপ্রতিহত। একদা সে এই কাগজের সম্পাদক হবে। সমস্ত দেশকে প্রভাবিত করে তুলবে নূতন আদর্শে। জাতির নেতৃত্বের মুকুট তারই ইঙ্গিতে দেশবাসী পরিয়ে দেবে, তারই নির্বাচিত সত্যনিষ্ঠ দেশসেবকের মাথায়। আরও অনেক কল্পনা। স্বার্থপর রাজ-নীতিকদের কাছ থেকে কত লোভনীয় প্রস্তাব আসবে তার কাছে। সে প্রত্যাখ্যান করবে। শাসনতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও সে কঠোর সমালোচনা করবে—ক্ষুরধার এবং নির্ভীক সমালোচনা। তার জন্য সকল দণ্ড সে উঁচু মাথায়, হাসিমুখে গ্রহণ করবে। দণ্ডভোগ করে বিজয়ী হয়ে সে ফিরে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে এল একটা অবান্তর কল্পনার প্রশ্ন। সেদিন তাকে জেলের দরজায় নিতে আসবে কে?

বিজয়দাই তাকে প্রথম রাত্রে সঙ্গে নিয়ে এলেন। পাঁচজন কর্মী কাজ করছিল, তারাই তার ভাবী কর্মজীবনের সহকর্মী। একজন বয়স্ক, বিজয়দার বয়সী তিনি, কানাই তাঁকে আগে থেকেই চেনে, নাম গুণদাবাবু, এককালে বিজয়দার রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী—তিনিই রাত্রের আসরের প্রধান ব্যক্তি, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। বিজয়দা কানাইকে তাঁর হাতে দিয়ে

বললেন—নিন গুণদাবাবু, কানাইকে আপনার দলে ভর্তি করে নিন।

গুণদা-দা তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—দল নয়, বলুন পাল অথবা গোয়াল। এখানে প্রায় দাঁড়িয়ে ঘুমোতে হয় কিনা। সুতরাং চতুষ্পদ না হলে এখানে চলবে না।

বিজয়দা হেসে বললেন—সে ওকে আমি বলেছিলাম। কিন্তু ও রাজী হল না। বিয়ে ও কিছুতেই করবে না। দ্বিপদকে চতুষ্পদ করার ভার তা হলে আপনার ওপরেই রইল।

গুণদা-দা বললে—সে বিষয়ে অযোগ্যতা আমার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই বাঁদর দুটোকে কিছুতেই রাজী করতে পারি নি। অগত্যা গরুর বদলে বাঁদর বানিয়েছি। হাত পেতে হামা-গুড়ি দিতে বাধ্য করে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। ওকেও তাই করে নেব। আর পারি তো—। তিনি হাসলেন।

বিজয়দা হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কানাইয়ের বেশ ভাল লাগল নূতন জীবন। পরম হৃদ্যতার মধ্যে আসরটি বসেছে। গুণদা-দা রসিকতার পর রসিকতা করে আসর জমিয়ে রেখেছেন। তবে তাঁর রসিকতাগুলি কিছু আদিরসাত্মক। এগুলি কিন্তু আসরের লোকদের কাছে নেশার মত অভ্যাস হয়ে গেছে। গুণদা-দা গম্ভীর হলেই তাদের কারও ঘুম আসছে, কেউ হাই তুলছে, কেউ আড়ামোড়া ছাড়ছে। কানাই লজ্জিত ভাবেই দ্রুতবেগে কাজ করে যেতে লাগল। গুণদা-দা বললেন—কানাই তো বিয়ে কর নি। হ্যাঁ, বিজয় তো তাই বললে।

কানাই হাসলে।

—প্রেমেও পড় নি কখনও? সত্যি কথা বল ভাই।

—না।

—তুমি অতি হতভাগ্য। এমনভাবে তিনি কথাটা বললেন যে, কানাইও না হেসে পারলে না।—আরে ছি ছি! এই নারীপ্রগতির যুগ, কো-এডুকেশনের সমারোহের মধ্যে ছটি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরলে ফিরলে কি জন্যে তবে? তারপর সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললেন—এই দেখ, এই একেই বলে পর্বতের মূষিক-প্রসব। কানাইকে আবার বললেন—দেখ ভাই, এদের চারজনের দুজনে বিবাহিত। একজন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। একজন খাবার জন্যে ক্ষেপে উঠছে। এদের এই রাত্রি-জাগরণের বিরহের আসরে আমাকে রসিকতা করতে হয়—প্রেমপত্রবাহক পিওনের মত। নইলে ওদের ঘুম আসে। তুমি যেন এদিকে কান দিয়ো না।

মধ্যে মধ্যে চা আসে, বিড়ি সিগারেট চুরুটের—গুণদাবাবু চুরুট খান—ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে; রসিকতা চলে—কাজ চলে, রয়টার, এ-পি, ইউ-পি প্রভৃতি সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব টেলিগ্রাম আসছে সেগুলির দ্রুত অনুবাদ করা হচ্ছে, কাগজে ছাপা হবে। গুণদা-দা অনুবাদগুলি দেখে দিচ্ছেন। কানাইয়ের অনুবাদ দেখে গুণদা-দার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বললেন—কানাই, তুমি তো ভাই চমৎকার লেখ! বাঃ, বেশ হয়েছে!

কানাই খুশী হল, উৎসাহিত হল। মৃদু হেসে সে অনুবাদ করতে লাগল রয়টারের তারের খবর—

LONDON :—The German news agency announces that Colonge was attacked by the R. A. F. last night.

LONDON :—Last night heavy bombers caused great damage to industrial districts of Colonge. Fighters have made several night-raids on northern France and the low countries.

কানাই অনুবাদ করে গেল। অন্য কেউ কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করলে, তার কাজ সে নিজেই টেনে নিলে—দিন, আমি করে ফেলি।

কখনও কখনও জমে ওঠে তুমুল যুদ্ধালোচনা। স্টালিনগ্রাদ রাশিয়ানরা কেড়ে নিতে পারবে কি না? প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে যা ওরা রাখতে পারে নি, জার্মানদের অধিকার থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব।

কানাই প্রতিবাদ করে বললে—রাশিয়ানরা পুঁজিবাদীদের ভাড়াটে সৈন্য নয়। তারা যুদ্ধ করছে নিজের জন্যে। ভরোশিলভ কি বলেছেন জানেন?—"Whoever can lift a rifle, should have one."

গুণদাবাবু কিন্তু ওতে যোগ দেন না। আলোচনা তিনি থামিয়ে দিলেন, বললেন—দেখ, ওসব চলবে না এখানে। যে সমস্ত বলদে চিনির ছালা বয়ে নিয়ে যায়, তারা কখনও চিনি খায় না, চিনি তাদের খেতে নেই। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর অনুবাদ করছিস করে যা—যুদ্ধের আলোচনা তোদের করতে নেই। যদি করিস, তবে তোদের বউয়ের দিব্যি। তাতেও যদি না মানিস, তবে Night-Editorship ছেড়ে দেব আমি।

—ছেড়ে দেবেন?

—দেব না! দেখ, আমার বউ ভয়ানক ঝগড়াটে, দিনের বেলায় বউয়ের হাত থেকে রেহাই পাই কণ্ট্রোলের দোকানে—কিউয়ের সকলের শেষে দাঁড়িয়ে; রাত্তিরেও তার ঝগড়ার বিরাম নেই বলেই না এই চাকরি নিয়ে এখানে এসে তোদের নিয়ে রসিকতা করে আনন্দ করি। তোরাও যদি কচ্‌কচি আরম্ভ করবি, তবে আর এ চাকরি কেন করব? বলেই তিনি ঘণ্টায় ঘা মারলেন—ঠন-ঠন-ঠন। ঠন-ঠন-ঠন! অবশেষে ঠন-ন-ন-ন-ন। তারপর হাঁকলেন—ওরে জগুয়া—জ-গ—! চা নিয়ে আয়—চা!

আসলে গুণদাবাবুর এই সব আলোচনা পছন্দ হয় না। তিনি রাশিয়ার মত সাম্যবাদীর দেশের জয়ে যে আনন্দ পান না এমন নয়, তবে তাঁর বুকে এই দেশের দুঃখের বোঝা, এদেশের মানুষের বন্ধনের বেদনা এত গভীর যে, তাকে ছাপিয়েও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না।

হঠাৎ তিনি বললেন—কানাই ভাই, বিজয়কে আমি জানি, একসময় একসঙ্গে কাজ করেছি। তুই তার চ্যালা। তোকে একটা কথা বলি। রাশিয়ার জয় হোক ভাই। কিন্তু সে জয় উপলক্ষ করে আনন্দে যখন নাচতে যাই, তখন হাতে-পায়ের শিকলের বাঁধনে যে সমস্ত শরীর ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। সে বেদনা কোন্ মন্ত্রে তোরা জয় করলি বলতে পারিস্?

কানাই অবাক হয়ে গেল। গুণদাবাবুর চোখ ছলছল করছে। সে বলতে গেল তার কথা। গুণদাবাবু হাত তুলে ইশারা করে বললেন—থাক্। তারপর বললেন—শুনব একদিন। বুঝি না তা নয়। তবু মমতাকে জয় করতে পারি নে, বিশ্বাস করতে পারি নে। তবে তোদের আমি অবিশ্বাস করি নে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা কানাইয়ের ভালই লাগল। সে মনে মনে একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুললে।

•

পরদিন সোমবারের কাগজে কানাইয়ের একটা প্রবন্ধ বের হবে, যে প্রবন্ধটা তার কৃতিত্বের নজীর হিসেবে বিজয়দা কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেছিলেন, সেইটে। তাই রবিবার বেলা দুটোর সময়েই কানাই অফিসে এসেছিল, প্রবন্ধটার প্রুফ দেখবার জন্য। রবিবার

অধিকাংশ কর্মীরই ছুটির দিন। কর্মগুঞ্জনমুখর এতবড় অফিসটা আজ প্রায় স্তব্ধ। অর্থনৈতিক আলোচনা বিভাগের সম্পাদক বসে নিজে প্রুফটা ধরেছেন, কপি ধরেছে কানাই।

এই প্রবন্ধে, কানাই সেদিন অমলবাবুর সঙ্গে তাঁদের বাগানে গিয়ে যে ছবি দেখে এসেছে নিখুঁতভাবে তাই বর্ণনা করে—তুলনা করেছে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম আমলের অবস্থার সঙ্গে। বিদেশীয় শাসনতন্ত্রের নানা কূট-কৌশলের বাধায় যে বৈপ্লবিক অবস্থান্তর এতদিন ঘটতে পায় নি, আজ এই যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যে এ দেশে সেই অবস্থা দ্রুতগতিতে ঘটে চলেছে। গৃহহীন নরনারীর দল চলেছে তাদের সামান্য তৈজসপত্র মাথায় করে, ছাগল সঙ্গে নিয়ে; পথের মধ্যে কারখানার মালিক তাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে টাকা দিলেন—মনোরম আশ্রয় দেবার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গেলেন আপনার কারখানার গণ্ডীর মধ্যে; তাঁর শ্রমিক সমস্যার সমাধান হল। কারখানায় আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ম্যানেজার, সরকার—তারা কাজ আদায় করবে; কাজ না করতে পারলেও পালাবার পথ নেই। বাগানের ফটকে আছে—গুর্খা পাহারা, তার কোমরবন্ধে ঝুলছে কুকরী, হাতে আছে বন্দুক। গৃহহারা হতভাগ্য দলটির কর্তা বৃদ্ধটির সেই দন্তহীন মুখের ঠোঁট দুটি অবরুদ্ধ ভীত কান্নায় থরথর করে কাঁপবে, চোখ হতে দুটি বিশীর্ণ জলধারা গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে, মুক্তির জন্য ডাকবে বিধাতাকে।

সেই সুশ্রী তরুণী! তার কথা লিখতে গিয়ে কানাইয়ের বার বার মনে হয়েছে গীতার কথা। অমলবাবুর কারখানায় বন্দিনী ওই মেয়েটির ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে গিয়ে সে শিউরে উঠেছে।

তারপর সে ইউরোপ এবং ইংলণ্ডের সে আমলের কথা উল্লেখ করেছে।—

"Terrible cruelty characterised much of the development of industrial capitalism both on the Continent and the England. The birth of modern industry is heralded by great slaughter of the innocents."

কুটীরবাসীদের দলে দলে সংগ্রহ করে পাঠানো হত কল-কারখানায়। প্রলোভনে ভুলিয়ে, কৌশলে বাধ্য করে এ দেশেও এককালে চা-বাগানে কুলি চালান হত। চা-বাগানের কুলিদের বহু দুর্দশার কথা আমাদের অজ্ঞাত নয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপে সেকালে এই অত্যাচার হয়েছিল।—

"As Lancashire was thinly populated and a great number of hands were suddenly wanted, thousands of hopeless creatures were sent down to the north from London, Birmingham and other towns."

তারপর সে আরও আলোচনা করেছে—চড়া বাজার এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টাজড়িত কলকারখানায় প্রচুর অর্থাগমের ফলে কেমন করে দলে দলে মানুষ ছুটে যেতে বাধ্য হয়েছে ওই অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে—সেই সব কথা।

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। সম্পাদক রিসিভারটা তুলে ধরলেন।

—হ্যালো! কে? বিজয়বাবু?

বিজয়দা টেলিফোন করছেন এডিটোরিয়েল ডিপার্টমেণ্ট থেকে। এডিটোরিয়েল ডিপার্টমেণ্টে রবিবারে বিজয়দাই সর্বময় কর্তা।

অর্থনৈতিক আলোচনা বিভাগের সম্পাদক বললেন—লোক? আমার এখানে তো কেউ নেই। আজ ডিউটি ছিল নবেন্দুর। তার শুনেছি জর হয়েছে, আসে নি সে।

—আমি?—না, সন্ধ্যেবেলায় আমি ফ্রী নই! জরুরী কাজ আছে আমার।

—এখানে? এখানে আছেন নতুন ভদ্রলোক—কানাইবাবু। রাত্রে তো তাঁর ডিউটি।

—তাই নাকি? কানাইবাবু আপনার নিজের লোক? আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি ওঁকে।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে সম্পাদক হেসে বললেন—বিজয়বাবু আপনার আত্মীয়?

মৃদু হেসে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই কানাই বললে—পরমাত্মীয়। আমার সহোদরের চেয়েও বেশী।

—আপনার লেখার মধ্যেও বিজয়বাবুর ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে!

কানাই কোন উত্তর দিল না। সম্পাদক বললেন—বিজয়বাবু আপনাকে ডেকেছেন। প্রুফটা দেখা হয়ে গেলেই আপনি ওপরে যান। নিন, তাড়াতাড়ি নিন।

প্রুফ শেষ করে কানাই উপরে তেতলায় গিয়ে বিজয়দার ঘরে ঢুকল। সস্নেহে সম্ভাষণ করে বিজয়দা বললেন—আয়। প্রুফ দেখা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

হেসে বিজয়দা বললেন—কালই কানাইচন্দ্র একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কানাই চুপ করে রইল। বিজয়দা আবার বললেন—ওটার ইংরেজী করে একটা ইংরেজী দৈনিকে দিয়ে দি, ভাল হয়েছে লেখাটা, কিছু পেয়েও যাবি।

কানাই বললে—একটা কাগজে প্রকাশিত হয়ে গেল, তার ট্রানস্লেশন্ ছাপবে অন্য কাগজ?

বিজয়দা হাসলেন—ট্রান্স্লেশন্ বলে কি আর ছাপা হবে? সে আমি ঠিক করে দেব। আরও একটু হেসে বললেন—জার্নালিস্‌মের প্রথম ও প্রধান ট্যাক্‌টিক্‌স্—এক মুর্গী পাঁচ দরগায় জবাই দেওয়ার কৌশল। সে আমি তোকে তিন দিনে তালিম দিয়ে দেব। দ্বিতীয় ট্যাক্‌টিক্‌স্ হল—পরের প্রবন্ধ এমন কৌশলে আত্মসাৎ করতে হবে যে, যেন মূল লেখক আইডেন্টিফাই পর্যন্ত করতে না পারে এবং তার চেয়ে অনেক বেশী ঝাঁঝালো হয়। থার্ড ট্যাক্‌টিক্‌স্ হল প্রতিবাদে গাল দেওয়া—একবারে রাম গালাগাল। আর বাংলাতে যখন প্রবন্ধ লিখবি, তখন মহাকাল-টহাকাল একটু লাগিয়ে দিবি। তাণ্ডবনৃত্য, দিগ্‌বসনা, লোলজিহ্বা—এইরকম কতকগুলো কথা ব্যবহার করা অভ্যেস করে ফেল্।

কানাই হেসে ফেললে। তারপর বললে—ডেকেছেন কেন?

—ওই দেখ্! আসল কথাই বলি নি। একটা কাজ করতে হবে। একটু বাড়তি কাজ করে আয়। থিয়েটার দেখে আয় আজ।

—থিয়েটার? কানাই বিস্মিত হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। 'সংঘর্ষ' নাটকের আজ শততম অভিনয় হচ্ছে। নাট্যকার আমার বন্ধু। বিশেষ অনুরোধ করে কার্ড পাঠিয়েছে। আমার সময় হবে না, তুই যা।

—থিয়েটার সিনেমা আমি দেখি না বিজয়দা। তাছাড়া তোমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তুমি তাঁর বন্ধু—

বাধা দিয়ে বিজয়দা হেসে বললেন—বন্ধু হয়তো বটে কিন্তু অজুহাতটা এক্ষেত্রে বাজে। অনেক ঘনিষ্ঠতর বন্ধুকে 'সে হয়তো নেমন্তন্নই করে নি। সে নেমন্তন্ন করেছে বাংলার সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদককে—যাতে এই শততম অভিনয়ের একটা বিশেষ বিবরণের মধ্য দিয়ে তার প্রতিভার যশোগান দৈনিক পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হয়। আমি যেতে পারছি না, কাজেই তোকে যেতে হবে কাগজের রিপোর্টার হয়ে। আজ আর কেউ

নেই, তুই যা।

কানাই বিনা বাক্যব্যয়েই কার্ডখানি গ্রহণ করলে।

বিজয়দা বললেন—সন্ধ্যে ছটায় আরম্ভ। কিছু খেয়ে নে বরং। বিজয়দা ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারাকে বললেন—চা আর টোস্ট দু'খানা।

থিয়েটার সিনেমার প্রতি কোন আকর্ষণ কানাইয়ের ছিল না। তার বাল্যকালে তার বাপের কিছু অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তখন সে থিয়েটার দেখেছে। তখনও থিয়েটার দেখার রেওয়াজটা—বাদামের শরবতের মত কোন রকমে বজায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার মতই থিয়েটারের ওপরেও তার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। তারপর তার উপলব্ধির সঙ্গে শিক্ষার বিচারশক্তি যুক্ত হয়ে যে রুচি তার গড়ে উঠেছে, শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা তার হয়েছে, তাতে বর্তমান থিয়েটার ও সিনেমার অবস্থার কথা ভাবলেই তার চিত্ত পীড়িত হয়ে ওঠে। তাছাড়া বর্তমানে এই কঠিনতম দুর্দিনে প্রমোদবিলাসের কল্পনাতেও তার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে ওঠে। সিনেমার গৃহগুলির সম্মুখে সে যখন বিচিত্র বেশভূষার বিলাস সমারোহ দেখে, তখনই তার মনে পড়ে তাদের বাড়ির সামনের বস্তীর কথা। কল্পনাতীত দারিদ্র্য, নিপীড়িত মনুষ্যত্ব, পৃথিবীর বুকে জীবনধারার একাংশের চরমতম শোচনীয় পরিণতি। অন্য দিকে মানুষ মরছে বিলাসের বিষে; এক দিকে মানুষ কেঁদে মরছে, অন্য দিকে মরছে—হেসে নেচে। বিশেষ করে মনে পড়ল গীতাদের বাড়ির কথা।

আজ তবু চাকরির কর্তব্য পালন করবার জন্য তাকে সেই থিয়েটার দেখতেই আসতে হয়েছে।

সমারোহ—সত্যিই সমারোহ।

প্রবেশপথে ছাদের ওপর নহবৎ বাজছে। দরজায় গাঢ় লাল রঙের ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। দু'পাশে দুটি পূর্ণঘটের মাথায় আমের পল্লব—পল্লবের উপর সশীষ ডাব। সামনের করিডরের চারিপাশে থামগুলি রঙীন কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের দরজাগুলিতে ঝুলছে নেটের পর্দা। বক্স-অফিসের সামনে জনতার মত ভিড় জমে গেছে। সুসজ্জিত নরনারীর মেলা, প্রমোদ-বিলাসের হাট!

এত বড় পত্রিকার প্রতিনিধি—ভদ্রতার সঙ্গেই তার জন্যে ভাল আসন নির্দিষ্ট করে দিলে বক্স-অফিস। পাশেই থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁটায় তিলধারণের জায়গা নেই, ছোকরা চাকরগুলো চরকির মত ঘুরছে; বড় বড় ট্রের ওপর মাটির ভাঁড়, কেক, বিস্কুট এবং হাতে প্রকাণ্ড বড় কেৎলিতে তৈরী চা নিয়ে ভেতরে হাঁকছে—চা—কেক—বিস্কুট, পোটাটো চিপ্‌স্‌, সল্টেড বাদাম।

ভেতরেও চারিদিক রঙীন কাপড় দিয়ে সাজানো। দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে ফুলের রিং ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখভাগটা বিচিত্র বর্ণের রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজানো।

একজন ভদ্রলোক কানাইকে প্রশ্ন করলে—আপনি কি স্যর্‌ 'স্বাধীনতা' কাগজের লোক?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোকটি বেশ বিনয় প্রকাশ করেই বললে—তা হলে স্যার্‌ আপনি আসুন,—মিটিংএর সময় স্টেজের ওপর আপনাদের সিট।

ভেতরে নিয়ে যেতে সে আবার বললে—বেশ করে ঠেসে এক কলম ঝেড়ে দেবেন স্যার্‌!

কানাই হাসল। রঙ্গমঞ্চের ভিতর স্টেজের উপরেই সম্ভ্রান্ত অতিথিরা বসেছেন। তার মধ্যে সেও বসল। ধীরে ধীরে যবনিকা অপসারিত হল। সম্মুখে প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। স্টেজের উজ্জ্বল আলো সামনের দিকে দামী আসনগুলিতে উপবিষ্ট দর্শকদের মুখের উপর পড়েছে। সম্ভ্রান্ত অতিথি এবং ধনী দর্শকদের দল। সহসা তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দু'জন ইউরোপীয় সৈনিকের দিকে। মনটা তার খুশী হল। এরা ভারতবর্ষকে জানতে চায়। তার পাশে ও কে? নেপী? নেপীর পাশে—নীলা—হ্যাঁ, নীলাই তো!

নীলা তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টির সঙ্গে নীলার দৃষ্টি মিলিত হল। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঐ সৈনিকদের মধ্যস্থ নেপীর সম্মুখে ঝুঁকে—বোধ হয় নীলাকেই কিছু জিজ্ঞাসা করলে। ওই যে, নীলাও মুখ ফিরিয়ে তাকে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কানাইয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ঐ বিদেশী সৈনিকদের সঙ্গে নীলা থিয়েটার দেখতে এসেছে! সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সতের

সভাপতি দেশপ্রেমিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নাটকখানির সাফল্যে নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চের সকলকে অভিনন্দিত করে সর্বশেষে বললেন—"আজ পৃথিবীর উপর মহা দুর্যোগ আসন্ন। সেই দুর্যোগ আজ বাংলার ওপরেও ঘনীভূত হয়ে এসেছে। মানুষের জীবনই শুধু বিপন্ন নয়—যুগযুগান্তর ধরে মানুষের সাধনার সকল ফল, সকল সম্পদও আজ বিপন্ন। আজ সাহিত্যিক এবং শিল্পীর কর্তব্য গুরুভার হয়ে মহান্ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। মানুষকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারা যাতে বহন করতে পারে, সেই শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে সাহিত্য এবং নাট্যশিল্পের মধ্য দিয়ে। বর্তমান বাংলার নাটক এবং অভিনয়-শিল্পের গতি ও প্রকৃতি খুব আশাপ্রদ বলে যদি আমি স্বীকার করে নিতে না পারি, তবে আমাকে মার্জনা করবেন, সে নিয়ে আলোচনাও আজ করছি না। শুধু অনুরোধ করছি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীবৃন্দ অবহিত হোন।—দুর্যোগের পর নবপ্রভাত আসবে। সেই প্রভাতে মুক্ত স্বাধীন সবল জাতির আগমনী আপনারা রচনা করুন। মঙ্গল হোক আপনাদের।" নিমন্ত্রিত অতিথিদের সকলে এবং দর্শকবৃন্দ সাধুবাদ এবং করতালি দিয়ে তাঁর কথা সাগ্রহে সমর্থন করলেন। সভা ভঙ্গ হল। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে নেমে এসে দর্শকদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করবার জন্য উঠলেন—যবনিকা আবার নেমে এল। কানাই ঈষৎ চকিত হয়েই সকলের সঙ্গে উঠে পড়ল। সম্পূর্ণরূপে না হলেও, খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তিক্তচিত্তে সে ভাবছিল নাট্যকারটির কথা। লোকটা যেন আজ কৃতার্থ হয়ে গেছে। একান্তভাবে না হলেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সে বসে ছিল অবজ্ঞাতের মত। তার গলায় মালা দেওয়া হল সর্বশেষে। নাট্য-পরিচালক ও প্রধান অভিনেতাকে মালা দেওয়া হল তার আগে। সভাপতি ছাড়া অন্য বক্তারা—বিশেষ করে সেকালের একজন অধ্যাপক এবং নাট্যকার বক্তৃতায় নাট্যকারকে উপেক্ষা করেই নির্লজ্জভাবে স্তাবকতা করলেন প্রধান অভিনেতা ও নাট্য-পরিচালকের। সবচেয়ে সে পীড়িত হল—উপহারের নামে—পুরস্কার-গ্রহণোদ্যত নাট্যকারের হস্তপ্রসারণের ভঙ্গীর মধ্যে কাঙালপনার সুস্পষ্টতা দেখে। তার ছেলেবেলায়

শোনা বাংলার একটি বহুপ্রচারিত গল্পের কথা মনে পড়ে গেল—"নাকের বদলে নরুণ পেলাম, তাক্ ডুমা-ডুম্-ডুম্।" নাট্যকার হিসেবে ভদ্রলোক কালিদাস সেক্সপীয়র বার্নার্ড শয়ের জ্ঞাতি। তার মনে পড়ল, চক্রবর্তী-বাড়ির বড়লোক আত্মীয়কুটুম্বের বাড়িতে ক্রিয়া-কর্মে সমাগত তাদের গরীব আত্মীয় জ্ঞাতিদের অবস্থা। তাদের কাঙালপনায় এবং এদেশের নাট্যকারদের কাঙালপনায় কোন প্রভেদ সে দেখতে পেলে না। এদেশে নাট্যসমারোহের আসরে নাট্যকারেরা গৌণ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—সে ইউরোপীয় নাট্য সাহিত্যের আলোচনার একখানা বইয়ে পড়েছিল।

"If writers have still a great deal to learn from the theatre as regards technique, the dramatists are of greater importance to the actors and managers to understand problem."

হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য নাট্যকার! শুধু নাট্যকারকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি? কোন্‌খানেই বা দেশের ভাগ্য এতটুকু প্রসন্ন, এতটুকু উজ্জ্বল, এতটুকু উঁচু? আপনা থেকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নীলার উপর। এদেশের সবচেয়ে মন্দভাগ্য এই যে, দেশের মেয়েদের আজ ভবিষ্যৎ নেই। ভাবী মায়েদের নীড়ের ভরসা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—যে নীড়ের আশ্রয়ের মধ্যে প্রস্তুত হবে, গঠিত হবে ভবিষ্যৎ জাতি। বাঙালীর কালো মেয়ে আজ তার অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কূলকিনারা না পেয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করে বিদেশী সৈনিকের পাশে ওই তো বসে রয়েছে কাঙালিনীর মত। নীলার ওপর অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। এত অন্তঃ-সারশূন্য! নীলা কি ভাবে যুদ্ধশেষে ওই শ্বেতাঙ্গটি তার মত কালো মেয়েকে নিয়ে যাবে তার স্বদেশে—শ্বেতাঙ্গদের সমাজে? তিক্ত, তীব্র শ্লেষের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

ওদিকে যবনিকা অপসারিত হয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছিল; প্রেক্ষাগৃহে দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল মুগ্ধ সাধুবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠছে; নাটকখানি সত্যিই ভাল এবং অভিনয়ও সুন্দর হয়েছে। কানাইয়ের কিন্তু খুব ভাল লাগছিল না। ওই তিক্ত চিন্তাই শুধু মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরছে।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়ল। চায়ের দোকানের ছেলেগুলোর চীৎকারে দর্শকদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনার গুঞ্জনে স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ কলরবমুখর হয়ে উঠল। একটা ছেলে চায়ের ট্রে নিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল—চা গ্রোম—হট্ টি—চপ কাটলেট—পটাটো চিপ্‌স! কানাই সবিস্ময়ে তারই দিকে চেয়ে ছিল। হীরেন! গীতার ভাই হীরেন এখানে চা বিক্রী করছে!

—কানুদা! এক পাশ থেকে ডাকলে।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে—নেপী তাকে ডাকছে।

কানাইয়ের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হইতে মিষ্টি হাসি হেসে নেপী বললে—আমরাও এসেছি কানুদা।

কানাই বললে—দেখেছি। কিন্তু ও টমি দু'জনকে পাকড়াও করলে কি করে?

নেপী বললে—ওরা টমি নয় কানুদা। ওরা অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিল। টমি বললে ওরা চটে যায়। ভারি ভদ্রলোক।

হেসে কানাই স্নেহের সঙ্গে বললে—তাই নাকি!

—আসুন না আলাপ করবেন।

—থাক, এখন আলাপ করার সুবিধে হবে না।

নেপী একটু ক্ষুণ্ণ হল ; কানাইদার কথাবার্তার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন অনাত্মীয়তার সুর তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। তবু সে অপ্রতিভের মত আবার জিজ্ঞাসা করলে—বইটা বেশ ভাল হয়েছে, না ?

একটু হেসে কানাই উত্তর দিলে—কি জানি !

তার কথার এ উত্তরই নয় ; এ কথার অর্থ, কানাইদা তাঁর মত ব্যক্তই করতে চান না। নেপী এবার সত্যিই আহত হল, একটুখানি চুপ করে থেকে সে ধীরে ধীরে এসে আপনার আসনে বসল। কানাই খুঁজছিল হীরেনকে।

নীলা প্রশ্ন করলে—কি বললেন তোমার হিরো ? সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল।

নেপী একটু ম্লান হেসে চুপ করে রইল। বাংলা কথার মধ্যে ওই 'হিরো' ইংরেজী শব্দটা বিদেশীয়দের মনোযোগ আকৃষ্ট করলে, হেরল্ড বললে—নাটকের হিরো সত্যিই বেশ ভাল অভিনয় করেছেন।

নীলা হেসে বললে—হ্যাঁ, উনি একজন ভাল অভিনেতা। তবে আমি ওঁর কথা বলি নি। আমি বলছিলাম নৃপেনের হিরোর কথা। সে ঐ বিদেশীর কাছে কানাইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তার পরিচয় দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। দেখলেন না, নৃপেন এখুনি ওই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে এল, মিটিংয়ের সময় উনি স্টেজের ওপরেই ছিলেন—উনিই নৃপেনের হিরো।

—উনি নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ?

—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, আমাদের নবীন জাতির পরিচয় পাবেন ওঁর মধ্যে।

—খুব খুশী হব মিস্ সেন।

নেপী দিদির হাতখানির উপর হাত রেখে একটু চাপ দিয়ে ইঙ্গিত করলে। নীলা তার মুখের দিকে তাকাতেই সে মৃদুস্বরে বললে—উঁহু। 'না' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও থেমে গেল, ইংরেজীর 'নো' শব্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিল আছে শব্দটার।

ওদিকে তখন আবার যবনিকা অপসারিত হচ্ছিল। নীলা বিস্মিত হয়েও চুপ করে ছিল, সে বুঝতে পেরেছিল—নেপী যা বলতে চায়, সেটা ওই বিদেশীয়দের সম্মুখে বাংলাতেও বলতে তার দ্বিধা হচ্ছে। ও বিষয়টা সম্বন্ধে নিরুৎসুক হয়েই নীরবে অভিনয়ের দিকে মনোযোগী হতে চাইলে সে, কিন্তু মনে তার প্রশ্ন উদ্যত হয়ে রইল। কি বলেছে কানাই ?

অভিনয়ের অবসরে নেপী চাপা স্বরে বললে—কানাইদা এদের টমি বলছিলেন।

নীলার ভ্রূ দুখানি ধনুকের মত বেঁকে উঠল।

নেপী আবার বললে—আলাপ করিয়ে দিয়ো না তুমি।

—হুঁ।

—আমি আলাপ করতে বলেছিলাম, কানাইদা বললেন—থাক।

—হুঁ। কানাইয়ের এমন অভদ্র মনোভাবের পরিচয় পেয়ে নীলা অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। অন্ততঃ তার সঙ্গে দেখা করাও কানাইয়ের উচিত ছিল। একটা নমস্কারও সে কি জানাতে পারত না ? মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়কে উপেক্ষা করা নিম্নস্তরের দাম্ভিকের উপযুক্ত অভদ্রতা। কানাই অকস্মাৎ সেই দম্ভের মূলধন সংগ্রহ করলে কোথা থেকে ?

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়তেই তার ইচ্ছে হল, সে নিজে উঠে গিয়ে কানাইকে নমস্কার

জানিয়ে সবিনয়ে কয়েকটা কথা বলে তার এই দাম্ভিকতার জবাব দিয়ে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কানাই উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নেপী বললে—কানুদা চলে গেলেন।

নীলা কোন উত্তর দিলে না। অবজ্ঞা করবার প্রয়াসেই সে অন্যমনস্কের মত বসে রইল। নেপীও বললে—বইখানা কানুদার ভাল লাগে নি। আমি বললাম—বইখানা বেশ ভাল হয়েছে, না কানুদা? হেসে বললেন—জানি না।

নীলার অন্তর যেন জ্বালা করে উঠল। এমনভাবে নেপীকে তাচ্ছিল্য করে কানাই কিসের অহঙ্কারে? কয়েক মুহূর্ত পরেই সে উঠে পড়ল—হেসে জেম্স্ এবং হেরল্ডকে বললে—আমি আসছি—পাঁচ মিনিট।—বলেই সে বেরিয়ে এল করিডরে।

কানাই দাঁড়িয়ে ছিল থিয়েটারের সংলগ্ন রেস্তোরাঁটার সামনে। সে যেন কারও জন্যে প্রতীক্ষা করেই রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে চা-খাবারের একটা শূন্য ট্রে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁর একটি ছেলে চাকর। হীরেনের জন্যেই কানাই প্রতীক্ষা করে ছিল। অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে হীরেন কানাইকে লক্ষ্য না করেই চলে যাচ্ছিল—পাঁচখানা কাটলেট—চারটে চপ—জলদি।

কানাই তার হাত ধরে আকর্ষণ করে ডাকলে—হীরেন!

হীরেন চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কানাইদা। সে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল হিংস্র বন্য পশুর মত। হাতের শূন্য ট্রেখানা সে ফেলে দিলে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে পকেটে হাত পুরে একটা চাকু বের করে দাঁত দিয়ে খুলে লাফিয়ে পড়ল কানাইয়ের উপর।

ব্যাপারটা ঘটে গেল যেন চকিতের মধ্যে। নীলা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—কণ্ঠনালী দিয়ে স্বর পর্যন্ত বের হল না। করিডরে অন্য যারা উপস্থিত ছিল, তারা হাঁ-হাঁ করে উঠল। হীরেনের চাকু খোলা দেখেই কানাই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল—সে হীরেনের হাত ধরে ফেলতে চেষ্টা করলে—ধরলেও, তবুও তার বাঁ হাতে কব্জীর উপরে একপাশে ছুরির আঘাত লাগল। সস্নেহ স্বরেই সে বললে—হীরেন—হীরেন শোন—শোন!

হীরেন কিন্তু শুনলে না, একটা দুর্দান্ত ঝটকায় আপনার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে থিয়েটার থেকে ছুটে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। কানাইও তার অনুসরণ করে বেরিয়ে এল——হীরেন! হীরেন!

পিছন থেকে লোকজনে তাকে বারণ করেছিল—যাবেন না—যাবেন না।

তার মধ্য থেকে কানে এসে পৌঁছল নীলার উদ্বিগ্ন আহ্বান—কানাইবাবু, কানাইবাবু!

নীলার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই নেপীর কণ্ঠস্বরও এল—কানুদা! কানুদা!

ঠিক সেই মুহূর্তেই সমস্ত শহরটার অন্তরাত্মা যেন মর্মান্তিক আতঙ্কে ভয়ার্ত-স্বরে চন্দ্রালোকিত শীতের কুহেলি-রহস্যঘন আকাশ পরিপূর্ণ করে তুলে অকস্মাৎ কেঁদে উঠল—উঁ,—উ,—উ—!

সাইরেন!

সাইরেন বাজছে! কানাই থমকে দাঁড়াল। নেপী এসে তার হাত ধরে বললে—যাবেন না। ফিরে আসুন।

কানাইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উত্তেজনা বয়ে যাচ্ছে। সাইরেন বাজছে। সে তবু প্রশ্ন করলে—সাইরেন, না নেপী?

—হ্যাঁ। ফিরে আসুন।

—চল।

—কিন্তু ও ছেলেটা কে কানুদা?

—গীতাকে দেখেছিস তো? গীতার ভাই।

গীতাকে নেপী দেখেছে, সামান্য পরিচয়ও হয়েছে সেদিন। আবছা সে শুনেছে—গীতাকে নাকি খুব একটা বিপদ থেকে কানাইদা উদ্ধার করে এনেছে।

ফিরে আসতেই নীলা অসঙ্কোচে তার হাতখানা ধরে বললে—খুব বেশী কেটেছে?

কানু হাতখানা প্রসারিত করে দেখালে এবং নিজেও প্রথম দেখলে, হেসে বললে—সামান্য কেটে গেছে।

পিছনে উৎকণ্ঠিত দর্শকের মৃদু গুঞ্জন। সাইরেন এখনও একটা অশুভ ক্রন্দনকাতর সুরে থেমে থেমে বাজছে।

কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে জেম্‌স্ এবং হেরল্ডও বাইরে এসেছে। তাদের সাদা মুখ উত্তেজনার রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে।

জেম্‌স্ এবং হেরল্ড করিডরের বসবার আসনে নীলাকে বসতে অনুরোধ জানালে। কানাইও বললে—বসুন আপনি!

নীলা উদ্বিগ্ন হয়েই বললে—হাতটা কিন্তু ধুয়ে ফেলা উচিত আপনার।

কানাই সংক্ষেপে উত্তর দিলে—থাক। কিছু নয় ও। ওর চেয়ে বড় বিপদ মাথার উপর মিস্ সেন। এখন গরম জল টিঞ্চার আয়োডিন কিছুই পাওয়া সম্ভবপর নয়। আর উতলা হবার মত নয়ও কিছু।

ব্যাপারটার সমস্ত গুরুত্ব সাইরেন-ধ্বনির উদ্বেগ-আতঙ্কের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। সামনে একটা বেঞ্চের উপর কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। তাঁদের একজন কাঁপছেন। একটি মেয়ের মুখ বিবর্ণ, সে যেন মাটির পুতুলের মত বসে আছে। একজন প্রৌঢ়া বোধ হয় ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। একগাছি মালা ও একখানা নূতন শাল কোলে নিয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। শালখানা আজই গ্রন্থকারকে উপহার দেওয়া হয়েছে; মেয়েটি বোধ হয় গ্রন্থকারেরই কোন আত্মীয়া। পুরুষ যাঁরা বাইরে এসেছেন, তাঁরাও স্তব্ধ। ভিতরে এখনও অভিনয় চলছে।

হঠাৎ নীলা নেপীকে একটু ওপাশে ডাকলে—শোন্।

আড়ালে এসে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে—কানাইবাবু ছেলেটাকে চেনেন মনে হল, ও কে তুই জানিস্ নেপী?

—ও হল গীতার ভাই।

—গীতার ভাই! গীতা কে?

—ও, তুমি জান না বুঝি? গীতা একটি মেয়ে। কানাইদা তাকে কি বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন—বিজয়দার ওখানে রেখেছেন।

—উদ্ধার করে এনেছেন? বিজয়দার ওখানে রেখেছেন?

—হ্যাঁ, কানাইদাও যে এখন বিজয়দার ওখানে থাকেন। নিজেদের বাড়ি থেকে উনি চলে এসেছেন?

—চলে এসেছেন?

—হ্যাঁ। সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন বাড়ির সঙ্গে।

—ওই গীতা মেয়েটির জন্তে ?

নেপী তার দিদির মুখের দিকে তাকাল একবার। বললে—তা তো জানি না। একটু পরেই সে আবার প্রশ্ন করলে—তুমি কি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ ?

নীলা ভ্রূ কুঞ্চিত করে নেপীর দিকে চেয়ে বললে—কেন ? নার্ভাস কি জন্তে হতে যাব ? তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ বহুলোকের পদধ্বনি হয়ে উঠল। প্রেক্ষাগৃহের দরজা খুলে গেছে। অভিনয় শেষ হল, দর্শকেরা বেরিয়ে আসছে। করিডর উৎকণ্ঠিত জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কানাই দাঁড়িয়ে ছিল—একেবারে বাইরের ফটকের মুখেই। জনশূন্য, চন্দ্রালোকিত রাজপথ। ঊর্ধ্বলোকে কুয়াসার মত হিমবাষ্প জমে রয়েছে, তার উপর পড়েছে শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চন্দ্রালোক। রাজপথের দুই পাশে সারি সারি রিক্‌শা, ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি, মোটর—আলো নেই, চন্দ্রালোকের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

একখানা পুলিসের লরী চলে গেল।

দুটি মহিলা সঙ্গে করে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন—পিছনের হিতৈষীকে বলছিলেন—আমাদের মোটর আছে, আমরা চলে যাব।

থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কেউ বললেন—গাড়ি চলবার হুকুম নেই। যাবেন না।

ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ল একদল উৎকণ্ঠিত দর্শক। এরই মধ্যে তারা বেরিয়ে যাবে গলিপথে।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এ. আর. পি-র হুইস্‌ল বেজে উঠল। খাকী পোশাক পরা লোহার হেল্‌মেট মাথায় এ. আর. পি. এবং পুলিস পথরোধ করে দাঁড়াল।

কানাই ভাবছিল। জেম্‌স এবং হেরল্ডের দিকে তাকিয়েই সে ভাবছিল। আজ হয়তো সত্যিই বাংলার জ্যোৎস্না-পুলকিত আকাশে হিংস্র নৈশ অভিযানে এসেছে জাপানী বম্বারের দল। তাদের বিতাড়িত করতে যারা ধাওয়া করবে—আকাশযুদ্ধে মেতে উঠবে, তারা ওই জেম্‌স-হেরল্ডের জাতি। আত্মরক্ষা করবার অধিকারও এ হতভাগ্য দেশের মানুষের নেই। অথচ আজ এ কাজ করার কথা—এ কাজ করার অধিকার—তার, তাদের—এই এত বড় দেশ—চল্লিশ কোটি মানুষের বাসভূমি ভারতের লক্ষ লক্ষ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান যুবকবৃন্দের। তার মনে পড়ল লণ্ডন টিউব স্টেশনের আশ্রয়ে বসে এক ইংরেজ বৃদ্ধা বলেছিল—

"This night our lads are giving the Nazis a hot chase."

কথাটা মনে করে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আজ তা হলে তার পরিধানে থাকত জেম্‌স হেরল্ডের মত পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদ। তার সে পরিচ্ছদের উপরে আঁকা থাকত—বিমান-বিভাগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ওই ওদেরই মত উত্তেজনার রক্তোচ্ছ্বাসে তার মুখ থমথম করত। সে মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা বিস্মিত হয়ে যেত। 'অল ক্লিয়ার' সঙ্কেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদু একটু হাসি হেসে সে নীলার হাত চেপে ধরে বলত—চললাম আমি। কোথায় ?—সে প্রশ্ন নীলার কম্পিত অধর দু'টিতে আটকে যেত ; কানাই নিজেই বলত—To give them a hot chase ; নাগাল না পাই, এখান থেকে যাব সীমান্তের এরোড্রোমে, সেখান থেকে আবার নতুন প্লেন নিয়ে যাব ওদের এলাকায়—শোধ দিয়ে আসব, এর শোধ দিয়ে আসব।

নীলার মুখ আকাশের নীলাভ তারার মত জ্বলজ্বল করে উঠত—সঙ্গে সঙ্গে জল টলমল করত তার দুটি চোখে।···

নীলা আবার যেন অনেকটা অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—গীতাকে দেখেছিস তুই নেপী ?

নীলার পূর্ববর্তী উত্তরে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে নেপী একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তার দিদির এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে সে ভয় পায়। এই কণ্ঠস্বরে নীলা কথা কয় কদাচিৎ, কিন্তু যখন কয়, তখন তাদের বাড়ির সকলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে; সে নীলা আর-এক নীলা, কালো মেয়েটি তখন হয়ে ওঠে বিদ্যুৎশিখার মত জ্বালাময়ী। তাই নেপী শঙ্কিত ভাবেই বোকার মত একটু হেসে বললে—দেখেছি। বড় ভাল মেয়ে দিদি।

নীলা নেপীর মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরমুহূর্তে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল ব্যঙ্গবক্র ধারালো একটু হাসি। 'বড় ভাল মেয়ে', শান্তশিষ্ট! বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিজের বাড়ি পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন! তার ভাই বোনের উদ্ধারকারীকে ছুরি মারতে চায়! চমৎকার!

—মেয়েটি কি বিপদে পড়েছিল রে?

একটু ভেবে মনে মনে অনুমান করে নিয়েই নেপী বললে—খুব সম্ভব একটা বুড়োর সঙ্গে ওর বাপ-মা টাকার লোভে—

—বিয়ে দিচ্ছিল!—নেপীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীলা কথাটা সম্পূর্ণ করে দিলে। বাংলা দেশের চরমতম রোমান্স।

হঠাৎ শব্দ উঠল—দুম দুম! কয়েকটা দূরাগত বিস্ফোরণের শব্দ। সমস্ত জনতার গুঞ্জন, গবেষণা, হাসি, রসিকতা, কলরব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। নীলাও সচকিত হয়ে উঠল। নেপীও নীরবে তার মুখের দিকে চাইল। জেম্‌স হেরল্ড নীলার কাছে এসে দাঁড়াল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীলা তাদেরই মুখের দিকে চাইলে—ও কিসের শব্দ?

জেম্‌স বললে—মনে হচ্ছে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

ক্ষণিক স্তব্ধতার পর জনতাও আবার মুখর হয়ে উঠল।

—পালে বাঘ পড়ল নাকি?

—শব্দ শুনছ না?

—দূর! এ বোধ হয় স্টেজের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। এই কখনও বোমার শব্দ হয়?

কানাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোমা? বিশ্বাস করতে পারছে না সে। সাইরেন বেজেছে, বোমা পড়ার সম্ভাবনায় কোন বাধাই নেই, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজের যে ভয়ঙ্করত্ব মনের কল্পনায় আছে—এ আওয়াজের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। বহু মাইল ব্যাপ্ত করে মাটির মধ্যে বসে যাবে কম্পনের প্রবাহ। কিন্তু মাটি তো কাঁপছে না! বায়ুস্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ডতম বেগমান ঘূর্ণাবর্তের, যার টানে বড় বড় বাড়ি তাসের মত ভেঙে পড়বে। কই, তার ক্ষীণতম স্পর্শের আভাসও তো পাওয়া যাচ্ছে না! সমস্ত জনতাই উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে মিলিয়ে দেখছে। অশান্ত অস্থির পদক্ষেপে ওইটুকু স্থানের মধ্যেই ঘুরছে।

আবার কয়েকটা শব্দ হল।

জনতার উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে। শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

বাইরের রাজপথে এ. আর. পির হুইস্‌ল বাজছে।

চায়ের স্টলে ভিড়ের অন্ত নেই। কিন্তু কোলাহল নেই। লোকে নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। একজন দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললে—পেটে ছুরি মারলে মরে যাব, নইলে শালার পেটের আজ নিকেশ করে দিতাম। শালা—এমন বেহায়া ছোটলোক আর হয় না রে বাবা! —চায়ের স্টলওয়ালার মুখ পরিতৃপ্তির হাসিতে ভরে উঠেছে। এমন বিক্রি তার দোকানের ইতিহাসে নতুন।

অকস্মাৎ একজন চিৎকার করে উঠল—আমি যাবই—আমি যাবই।

বন্ধুরা তাকে ধরে রেখেছে।—না, পাগল নাকি ?

পাগলের মতই দুরন্ত ঝটকায় আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল—রোগা ছেলে আমার। ভয়ে হয়তো—। কথা তার শেষ হল না, সে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল।

রকেটের মত কি আকাশে মধ্যে মধ্যে উঠছে—ফাটছে, ফুলঝুরির মত ঝরছে।

জেম্‌স বললে—Air raid still going on.

নীলা কোন উত্তর দিলে না। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সে। নেপী শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কানাই এতক্ষণে কাছে এসে মৃদু হেসে বললে—বসে আছেন ?

নীলা উত্তর দিলে না।

আবার হেসে কানাই বললে—একটা নতুন অভিজ্ঞতা অবশ্য।

নীলার মুখে আবার একটু ব্যঙ্গবক্র হাসি ফুটে উঠল।

আবার সাইরেন বেজে উঠল। দীর্ঘ একটানা সুরে আশ্বাসের স্বতোচ্চারিত ধ্বনির মত মোক্ষধ্বনি বাজছে। 'অল ক্লীয়ার'! বিপদ কেটে গেছে, আকাশচারী হিংস্র মৃত্যুগর্ভ শত্রু-বম্বারের দল চলে গেছে।

কানাই ঘড়ি দেখলে—বারোটা পনেরো। সাইরেন বেজেছিল দশটা সতেরো মিনিটে।

চারিদিকে কলরব উঠে গেল, আশ্বাসের—উল্লাসের কলরব—অল ক্লীয়ার। নিরাপদ। বেঁচেছি—আমরা বেঁচেছি। হিংস্র লোভী মানুষের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুবর্ষী আক্রমণ থেকে বেঁচেছি! বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত ছুটল জনস্রোত!

নীলা নেপীর হাত ধরে দাঁড়াল।

জেম্‌স এবং হেরল্ড এতক্ষণে বললে—ভগবানকে ধন্যবাদ! আমরা কিন্তু আপনার কাছে মার্জনা চাইছি মিস্ সেন—আমাদের জন্যেই আজ এই দুঃসময়ে বাড়ি হতে দূরে থেকে অনেক বেশী উদ্বেগ ভোগ করতে হল আপনাকে।

নীলা পাণ্ডুর মুখে একটু হেসে বললে—ও কথা বলবেন না। আপনারা আমারই নিমন্ত্রিত অতিথি। এইবার কিন্তু আমি বিদায় চাইব।

—সে কি! চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব আমরা।

—দরকার নেই। অনুগ্রহ করে আপনাদের অসুবিধে বাড়িয়ে তুলবেন না। আমার বাড়ি এখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। নেপী আমার সঙ্গে রয়েছে। কথাগুলির মধ্যে ভদ্রতার অভাব ছিল না, কিন্তু তবু তার মধ্যে অনিচ্ছা বা এমন কিছু ছিল—যেটাকে লঙ্ঘন করা বিদেশীয়দের পক্ষে সম্ভবপর হল না। মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে তারা চলে গেল।

রিক্‌শা ছুটছে, ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে, ট্যাক্সি মোটর ছুটছে। মানুষ দর-দাম করছে না। গাড়িতে চড়ে বসেই বলছে—চলো।

অনেকে হেঁটে চলেছে। ছোট ছেলেকে বুকে নিয়ে বাপ হাঁটছে, মায়ের কোলে সবচেয়ে ছোটটি, অপেক্ষাকৃত বড়গুলি শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে।

অনেকে দাঁড়িয়ে আছে ট্রামের জন্যে। ট্রাম আসবে। যে ট্রামগুলো পথে আটকে আছে, সেগুলো ফিরবে।

কানাইকে ফিরে যেতে হবে অফিসে। কিন্তু তার আগে নীলা আর নেপীকে পৌঁছে দিতে হবে। জেম্‌স এবং হেরল্ডকে চলে যেতে সে লক্ষ্য করেছে। কানাই এগিয়ে এল।

নীলা বললে—নেপী আয়।

কানাই ডাকলে—দাঁড়ান। আমি যাব। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে—

নীলা এবার ঘুরে দাঁড়াল, জ্যোৎস্নার আলোতেও দেখা গেল তার মুখে সেই ব্যঙ্গবক্র ক্ষুরধার হাসি। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে কথার সঙ্গে হাসির আমেজ মিলিয়ে সে বললে—ভয় নেই কানাইবাবু, আমাদের বিপদে পড়বার সম্ভাবনা নেই। উদ্ধার করার প্রয়োজন হবে না। আপনি চলে যান যেখানে যাবেন।

কানাইয়ের মনে হল, নীলার ওই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন চাবুকের মত তার মর্মস্থলকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে। একটা কঠিন উত্তর তার মনের মধ্যে জেগে উঠল, কিন্তু সে পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করলে। একটু মৃদু হেসে ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে বললে—নমস্কার, তা হলে আসি।

আঠারো

পরদিন ২১শে ডিসেম্বর ভোরবেলায় কানাই অফিস থেকে বাসায় ফিরছিল। গতরাত্রের 'সাইরেন' অমূলক আশঙ্কার সাইরেন নয়। জাপানী বম্বার প্লেন এসেছিল। কলকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে কয়েকটা বোমা ফেলেছে। রাত্রেই সামরিক বিভাগ থেকে ইস্তাহার বেরিয়েছে, সরকারী প্রচার বিভাগ থেকে গতরাত্রেই সে ইস্তাহারের নকল সংবাদপত্রের অফিসে পাঠানো হয়েছিল। কানাই নিজেই সে ইস্তাহারের অনুবাদ করেছে।

অন্যদিন রাজপথে জনতা এখনও চলমান হয় না, এখনও জীবনের চাকায় কর্মশক্তি প্রবাহ পূর্ণোদ্যমে সঞ্চারিত হয় ন'টার পর। রাস্তার অধিকাংশ অংশই জনশূন্য থাকে, কেবল বাজারের মুখে, রেস্তোরাঁর সামনে, রাস্তার মোড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা জমে থাকে। আজ সর্বত্র একটা উত্তেজনা। পথে দ্রুত ধাবমান যানবাহনের সারি চলেছে—লোক পালাচ্ছে। কলকাতায় বোমা পড়েছে!

খবরের কাগজের হকারেরা উত্তেজিত উচ্চস্বরে হেঁকে ছুটছে—বোমা! বোমা! কলকাতায় বোমা পড়ল বাবু, জাপানী বোমা!

ঘোষণার স্থানের উল্লেখ করা হয় নি, সংবাদপত্রেও তার উল্লেখ নেই। জনতার মধ্যে যারা পলায়নপর নয়, পথের উপর নিত্যকার মত জমে আছে, তাদের মধ্যে উত্তেজিত গবেষণা চলেছে স্থাননির্ণয় নিয়ে। ট্রামের মধ্যেও সেই গবেষণা।

কেউ বলে—উত্তরে, কেউ বলে—পশ্চিমে, কেউ বলে—দক্ষিণে; একজন বললেন—পশ্চিম-দক্ষিণ কোণাংশে, আমি নিশ্চিত জানি। একেবারে একটা অঞ্চলের আর কিছু নেই। বড় বড় পুকুর হয়ে গেছে। একটা কুলীর দেহ পাওয়া গেছে—তার চামড়া খানিকটা ছিঁড়ে উড়ে গেছে।

কানাই মনে মনে হাসলে। সে সংবাদ পেয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা একেবারে মিথ্যা নয়; কিন্তু বাকী বিবরণটা সমস্ত গুজব।

ভদ্রলোক বলছিলেন—ঠিক রবিবার আরম্ভ করেছে। রবিবার হল ওদের আক্রমণের নির্দিষ্ট দিন। এইবার দেখুন না, এই যেতে যেতে না সাইরেন ককিয়ে ওঠে! ভোরবেলায়

সূর্যোদয়ের সঙ্গে না 'রেড' করে।

কানাইয়ের ইচ্ছা হল প্রতিবাদ করে। কিন্তু পরক্ষণেই নিবৃত্ত হল। ঠিক সেই সময়েই ট্রামখানা এসে দাঁড়াল কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে। স্থানটা মুহূর্তে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুললে নীলার ছবি। গতরাত্রের কথা মনে পড়ল। নীলা কি তার মনের বিরক্তির কথা বুঝতে পেরেছিল? বিদেশীয় সৈনিক দুটির সঙ্গে এমনভাবে অভিনয় দেখতে আসার কথা স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বিরক্ত হয়ে উঠল। নীলাকে এমন তরলচিত্ত বলে মনে করতে তার কষ্ট হয়। পৃথিবীতে যদি নবরাষ্ট্রধর্মই প্রচলিত হয়, জাতি ধর্ম ধন মান প্রভৃতির বৈষম্য যদি বিলুপ্তই হয়ে যায়—তবু সাদা-কালোর বর্ণভেদে যে বৈষম্য সে তো থাকবেই; ওগো কালো মেয়ে, পৃথিবীতে কালোর দলেই তোমার থাকা ভাল। কাকের ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হওয়ার গল্প কি জান না? সাদায় কালোয় বিবাহ অবশ্য বিরল নয়, নববিধানে মানবসমাজে এর প্রচলন আরও অনেক প্রসারিত হবে; তবু সুন্দর রূপের প্রতি অনুরাগ তো যাবার নয়। ওই বিদেশীদের অনুরাগ সত্য হতে পারে না এমন নয়, কিন্তু ও অনুরাগ সাময়িক মোহ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এর প্রমাণ তো তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন যদি থাকে—তবে সে প্রমাণ তোমার সম্মুখে ধরলেও তুমি বুঝতে পারবে না। "বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই।" নীলার কথা কয়টা মনে করে তার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। বিপদে তুমি পড়েছ, তুমি বুঝতে পারছ না। গাড়ি এসে দাঁড়াল বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে। কানাই নেমে পড়ল।

রাস্তায় মানুষের ভিড় বেশ বেড়ে গেছে। বোমার আলোচনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। অনেকে যেন প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

সর্বকালে মানুষ বর্তমান নিয়ে অসন্তুষ্ট। বর্তমানকে রদ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ আসে না। ভবিষ্যতের মধ্যেই স্বপ্নরাজ্যের মত রূপায়িত হয়ে আছে জীবনের কল্পনা। কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসে—সে যখন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমানে পরিণত হয়, তখন ভবিষ্যতের কল্পনা স্বপ্নের মতই অলীক হয়ে ওঠে। যে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সে চাইছে, কালের নিষ্ঠুর পদক্ষেপের চেয়েও তা কঠিন—দৃঢ়। কানাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেও একটু হাসলে। সুখময় চক্রবর্তীর পুরনো বাড়িটা অনেক আগেই ভেঙে পড়া উচিত ছিল, কত বড় বড় ভূমিকম্প গেছে, এই সেদিনও বয়ে গেল এমন প্রচণ্ড একটা সাইক্লোন—তবু সে বাড়ি ভাঙে নি। কাল ভাঙতে পারে নি, কিন্তু ভাঙবে মারোয়াড়ী মহাজনের ডিক্রী। পুরনো বাড়িখানা ভেঙে ঠিক ওই রকম প্ল্যানেই গড়বে নতুন বাড়ি, যা হবে সুখময় চক্রবর্তীর বাড়ির রূপান্তর।

রাস্তায় হকারেরা তারস্বরে চীৎকার করছে—কলকাতায় বোমা বাবু, কলকাতায় বোমা! একটা ছেলে এসে তার সামনেই ধরলে—একখানা 'স্বাধীনতা'।

কানাই হেসে ফেললে।

—কাগজ বাবু। কলকাতায় বোমা পড়েছে। স্বাধীনতা খুব জোর লিখেছে।

হেসে কানাই বললে—ওরে, ময়রাদের সন্দেশ খেতে নেই।

ছেলেটা অবাক হয়ে গেল। কানাই গলিপথে ঢুকে পড়ল।

বাসায় এসে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বিজয়দা বসে আছেন ডেক-চেয়ারটায়, পাশে তক্তপোশের ওপর বসে রয়েছে নীলা। তার পাশেই একটা স্যুটকেস, এক হাত তার স্যুটকেসটার হাতলে আবদ্ধ। যেন এইমাত্র ওই স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে এখানে এসেছে।

এক প্রান্তে বসে রয়েছে নেপী। গীতা ভাঙা নড়বড়ে টিপয়টার উপর চায়ের কাপে চা ঢালছে।

বিজয়দা হেসে সম্ভাষণ করে বললে—কি সংবাদ? পালে সত্যি সত্যি বাঘ পড়িয়াছে?

কানাইও হেসে বললে—আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী কানাই-রাখাল বলছ নাকি?

—না। তা বলি নি। বোস্। চা খা। তারপর গীতার দিকে চেয়ে বিজয়দা বললেন—হাসি-ভাই, আগে তোমার কানাইদাকে চা দাও। আমরা তো বোমা পড়ার পরও ঘুমিয়েছি, ও বেচারাকে বোমার পরও সমস্ত রাত্রি বোম্ বোম্ করে কাটাতে হয়েছে। কাল বোধ হয় এক চটকও ঘুমুতে পারিস নি?

—না।

—বেশ। চা খেয়ে নিয়ে শ্রীমান্ নেপীকে উদ্ধার কর তুমি।

—কেন নেপীর আবার কি হল?

—জনসেবা-সমিতির সভ্য, বেচারা জনসেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বোমাপীড়িত অঞ্চলে ও যাবে। তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে সেখানে। বসে আছে তোমার জন্যে।

নীলা স্যুটকেসটা হাতে করে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—আমি চললাম বিজয়দা।

—কোথায়? বিজয়দা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—কোন হোটেলে একটা ব্যবস্থা করে নেব আমি।

—আরে, হোটেল তো আমিই খুলব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি?

—না।

—না নয়। আমি যা বলছি শোন। বস। চা খাও। আজ এইখান থেকেই অফিসে যাও। ও বেলায় এসে যদি হোটেলের পাকা বন্দোবস্ত না পাও তখন যেখানে খুশী যেয়ো। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি বাড়ি দেখে আসছি। তিন-তিনজন অযাচিত খদ্দের পেয়েছি। হোটেল আমি খুলবই। 'ঘরছাড়াদের আস্তানা।' দেখ না কি রকম বন্দোবস্তটা করি।

নীলা হেসে বললে—বেশ, আপনার হোটেল খোলা হোক, ওপনিং-এর দিনেই আমি আসব। আজ আমি চললাম। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—নীলা! নীলা! বিজয়দা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

কানাই সবিস্ময়ে চেয়ে রইল, ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করাটা তার অধিকারসম্মত বলে মনে হল না। বিজয়দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কানাই চাইলে নেপীর দিকে। ম্লান হাসি হেসে নেপী বললে—দিদি বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

কানাই নেপীর কথাটাই প্রশ্নের সুরে পুনরুক্তি করলে—বাড়ি থেকে চলে এসেছেন?

—বাবার সঙ্গে—। নেপী বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

কানাই চুপ করে রইল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নেপী বললে—রাধিকাপুরে শুনেছি বোমা পড়েছে। বস্তীর ওপর। সেখানে যাওয়া দরকার কানুদা।

কানাই ভাবছিল নীলার কথা। বাড়ি ছেড়ে নীলা চলে এসেছে! তার বাপের সঙ্গে—কি হয়েছে বাপের সঙ্গে? ঝগড়া! কেন? বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। তিনি ওই বিদেশীয়দের সঙ্গে কন্যার ঘনিষ্ঠতার জন্য তিরস্কার করেছেন। নীলা চাকরি করছে, সে সক্ষম আধুনিকা—সে তা সহ্য করে নি। একটু হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

সত্যিই তাই। কানাইয়ের অনুমান নিষ্ঠুরভাবে সত্য। গতরাত্রে পিতা-পুত্রীর মধ্যে আকস্মিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে।

সাইরেনের উৎকণ্ঠার মধ্যে নীলা ও নেপীর জন্য দেবপ্রসাদবাবুর উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। সমস্তক্ষণটা তিনি অস্থির পদক্ষেপে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কতবার মনে হয়েছে তিনি থিয়েটারে ছুটে যান। নীলা অবশ্য বাপকে জানিয়েই এসেছিল। কিন্তু জেম্স এবং হেরল্ডের কথাটা বলে নি। বাপের মনের উদার প্রসারতার সীমারেখার পরিমিতি সে জানত। বিদেশীয় সৈনিকদের নিমন্ত্রণ করে থিয়েটার দেখানোটা তিনি কোনমতেই সহ্য করতে পারবেন না বলেই সে বলে নি। 'অল ক্লীয়ার' সঙ্কেতধ্বনি ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎকণ্ঠিত দেবপ্রসাদ থিয়েটারে ছুটে এসেছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে থিয়েটারের দূরত্ব নিতান্তই অল্প। থিয়েটারে এসে ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল—নীলা হাস্যমুখে জেম্স এবং হেরল্ডের কাছে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। জেম্স ও হেরল্ড নত অভিবাদনে বিদায় নিচ্ছে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আপনার অস্তিত্ব গোপন রেখেই তিনি ছেলে ও মেয়ের পিছনে পিছনে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির দরজায় এসে তিনি পুত্র-কন্যার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। নীলা বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলে—বাবা?

দেবপ্রসাদ স্থির দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নীলার তাতে সঙ্কুচিত হবার কারণ ছিল না, কোন অন্যায়ের স্পর্শ থেকে সঞ্চারিত গোপন দুর্বলতা তার মনে ছিল না, অসঙ্কোচেই সে আবার বললে—আপনিও বাইরে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন বাবা?

দেবপ্রসাদ দরজার কড়াটা সজোরে নাড়া দিয়ে ডাকলেন—দরজা খোল।

এবার নীলা দেবপ্রসাদের মনের অব্যক্ত বিরক্তির আভাস যেন অনুভব করলে। নেপী তার চেয়েও অধিক পরিমাণে অনুভব করেছিল, সে দেবপ্রসাদের এই ধারার ভঙ্গীগুলির সঙ্গে সুপরিচিত; দেবপ্রসাদের ইচ্ছা ও আদেশ নীরবে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লঙ্ঘন করে সে আপনার বেছে-নেওয়া কর্মপথে চলে, মধ্যে মধ্যে যখন দেবপ্রসাদ তার পথরোধ করে দাঁড়ান, তখন এই ধারার দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে ওঠে। নীলার হাত স্পর্শ করে একটু চাপ দিয়ে নেপী ইঙ্গিতে কথাটা জানাতে চাইলে। নীলা কিন্তু সে ইঙ্গিত বুঝতে পারলে না, বুঝতেও চাইলে না। তার বাপের অন্তরের উত্তাপের যে স্পর্শ সে অনুভব করলে—তাতে তার অন্তরও ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তেই তার মা দরজা খুলে দিলেন। নীলা এবং নেপীকে দেখে গভীর উৎকণ্ঠা ভোগের বিরক্তি থেকেই বলে উঠলেন—ধন্যি মা! ধন্যি মেয়ে তুমি!

নীলা উত্তপ্ত হয়েই ছিল, মায়ের এই কথায় তার মনের উত্তাপ আরও খানিকটা বেড়ে গেল, বললে—কেন মা?

—এই রাত্রি একটা পর্যন্ত, যুবতী মেয়ে তুমি—তুমি—

বাধা দিয়ে নীলা বললে—সাইরেন বাজবে জেনে তো বের হই নি। নইলে আমি—নইলে তো দশটার মধ্যে আমার বাড়ি ফেরবার কথা। অন্যায় তো আমি কিছু করি নি।

—অন্যায় কর নি?—দেবপ্রসাদ অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত যেন ফেটে পড়লেন—ঘরের বাইরে যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন, এবার তিনি কঠিন ক্রোধে গম্ভীরস্বরে প্রায় গর্জন করে উঠলেন—অন্যায় কর নি?

নীলা স্তম্ভিত হয়ে গেল; দেবপ্রসাদের মূর্তি দেখে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মুহূর্তের জন্য সে

হতবাক হয়ে গেল। সে জীবনে তার বাপের এমন মূর্তির সম্মুখীন হয় নি।

—নিজের বুকে হাত দিয়ে বল তুমি, অন্যায় কর নি তুমি?

এবার অভিমানে নীলার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল। সে উত্তরে দৃঢ়স্বরে বলতে চেয়েছিল—না; কিন্তু ঐ একাক্ষরিক শব্দটিও সে উচ্চারণ করতে পারলে না।

—ঐ ইউরোপীয়ান সোল্জার দুটি কে? ওদের সঙ্গে তোমার কিসের আলাপ? থিয়েটারের মধ্যে—! দুরন্ত ক্রোধে ক্ষোভে দেবপ্রসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

নীলার মনে হল, পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে। এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের অন্তরাল থেকে এক অতি জঘন্য কুৎসা যেন কুৎসিত মুখে নীরবে বীভৎস হাসি হাসছে।

—উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র টমি—

—না। টমি বলতে যা আমরা বুঝি, তারা তা নয়। তারা অক্সফোর্ডের ছাত্র, তারা যুদ্ধে সৈনিক হয়ে এসেছে—তাদের আদর্শের জন্যে। নীলা দৃঢ়কণ্ঠে এবার প্রতিবাদ জানালে।

—হোক তারা অক্সফোর্ডের ছাত্র। তারা বিদেশীয়। তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ কিসের?

স্থির দৃষ্টিতে নীলা বাপের মুখের দিকে চেয়ে বলল—তারা আমাদের বন্ধু। আমরাই তাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমাদের দেশের থিয়েটার দেখতে।

এবার দেবপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নীলা—তার অসীম স্নেহের পাত্রী নীলা! আপনার জীবনাদর্শের ভাবী মহনীয় রূপ যার মধ্যে মূর্ত দেখবার প্রত্যাশা করেন তিনি অহরহ —সে কি এই? এই কি তাঁর জীবনাদর্শের ভাবী রূপ? সমস্ত অন্তর তাঁর শিউরে উঠল।

নীলার মা এতক্ষণ অবাক হয়ে সমস্ত শুনছিলেন, বিদেশীয় সৈনিকের সঙ্গে কন্যার বন্ধুত্বের কথা—কন্যার মুখ থেকেই শুনে তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, বললেন—ছি, ছি, ছি, ছি! ছি আমার অদৃষ্ট!

নীলা আবার বললে—বাপ হয়ে আমার সবচেয়ে বড় অপমান করলেন আপনি।

দেবপ্রসাদ বললেন—কালই তুমি চাকরিতে রেজিগ্‌নেশন দেবে।

—রেজিগ্‌নেশন? কেন?

—আমি বলছি। তোমার প্রতি আমার যা কর্তব্য তা আমি অবিলম্বে শেষ করতে চাই। তোমার আমি বিবাহ দেব।

ধীরকণ্ঠে নীলা বললে—না।

—না? দেবপ্রসাদ যেন আতঙ্কিত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন।

—না।—বলেই নীলা দরজার দিকে অগ্রসর হল।

মা চীৎকার করে উঠলেন—নীলা!

—আমি চলে যাচ্ছি। এর পর তোমাদের সঙ্গে আমার থাকা অসম্ভব।

দেবপ্রসাদ বললেন—যেতে তোমায় আমি বারণ করছি। তবুও যদি যেতে চাও, তবে এই রাত্রে তুমি যেয়ো না। যা হয় কাল সকালে করবে।

নীলা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে ফিরল।

দেবপ্রসাদ ডাকলেন—নেপী!

কেউ উত্তর দিল না। নেপী ঘরে প্রবেশই করে নি, বাইরেই ছিল। দেবপ্রসাদ বাইরে বেরিয়ে দেখলেন বারান্দায় কেউ নেই, সামনের পথও জনশূন্য। তবু তিনি আবার ডাকলেন—নেপী!

নেপী কখন নিঃশব্দে চলে গেছে তার অভ্যাসমত।

ভোর হয়ে এল। একুশে ডিসেম্বর।

ট্রাম এখনও চলতে শুরু করে নি, সময়ও হয় নি এখনও। রাস্তায় কিন্তু আজ এরই মধ্যে লোক দেখা যাচ্ছে। লোক পালাচ্ছে—গাড়ি, রিক্‌শা, মোটরের সারি বের হয়েছে। কৌতূহলীর দল সন্ধান করছে, বোমা পড়ল কোথায়? নীলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি নীলা ঘুমোয় নি। অশ্রান্তভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। দেবপ্রসাদও ঘুমোন নি। নীলার মা অন্ধকারে কেঁদেছেন।

ছোট একটা স্যুটকেস, অল্প কয়েকখানা জামা-কাপড় নিয়ে নীলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে মা সামনে পড়লেন না। বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়, নীলা তাঁর সামনে দিয়েই বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে কোথায় যাবে ভাবতে গিয়ে বিজয়দার বাসার কথাটাই তার মনে পড়ল। নেপী নিশ্চয় রাত্রে সেখানে গেছে। বিজয়দার আশ্রয় নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু কানাই গীতা বলে মেয়েটিকে উদ্ধার করে বিজয়দার ওখানেই রেখেছে। সেখানে যাওয়া কি তার ঠিক হবে? অনেক ভেবে অন্ততঃ একটা বেলা থাকবার সংকল্প নিয়ে সে এসেছে। বিজয়দার উপদেশ নেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে গীতাকেও দেখবে—গীতা কেমন!

এখানে এসে বিজয়দাকে সমস্ত কথা বলেছে সে।

বিজয়দা হেসে বললেন—হরি, হরি, ভাগ্যটা দেখছি হঠাৎ খুলে গেল নীলা! আর কয়েকজন যদি এমনিভাবে পালিয়ে আসে, তবে যে ফলাও করে একটা হোটেলের ব্যবসা খুলি।

বিজয়দা আবার বললেন—তাই বলি, ভোরবেলায় শ্রীমান্ নেপী বাসার বাইরের দরজায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে কেন? জিজ্ঞেস করলাম তো হেসে বললে, যেখানে বোমা পড়েছে সেই-খানে যাবেন শ্রীমান্। সময় বুঝতে না পেরে একটু রাত্রি থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে, তাই এখানে এসে দরজায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরে রাস্কেল!

নেপী অপ্রতিভের মত হাসল।

বিজয়দা ষষ্ঠীকে ডেকে বললেন—ষষ্ঠীচরণ, এক সের জিলিপী গরম ভাজিয়ে নিয়ে এস। ওজনে ঠিক দিতে বলবে, জিনিস ভাল চাই, দর কিন্তু সেরের মাথায় আজ দু'আনার বেশী বাড়তি দিয়ো না। বুঝলে? ঠিক এই মুহূর্তেই গীতা এসে ঘরে ঢুকেছিল। নীলা তাকে দেখবামাত্র সে কে অনুমান করেছিল। তবু বিজয়দাকে প্রশ্ন করেছিল—এটি কে বিজয়দা?

সস্নেহে হেসে বিজয়দা বললেন—ওটি? আমার হাসি-ভাই। ওর সঙ্গে আমার কণ্ট্রাক্ট হচ্ছে আমাকে দেখবামাত্র ওকে হাসতে হবে।

স্মিত সলজ্জ হাসিমুখে গীতা নীলার দিকে চেয়ে ছিল। নীলাও হাসল একটু, করুণার হাসি—করুণার মধ্যে থাকে যে সস্নেহ অবজ্ঞা—স্নেহের আবরণে সেই অবজ্ঞাভরেই গীতার দিকে চেয়ে ছিল—এই গীতা!

বিজয়দা বললেন—হাসি-ভাই, হ্যাঁ, চা করে নিয়ে এস। দেখছ দুজন আগন্তুক হাজির! নেপীকে তো চেনই, তোমার খুনী-ভাই। আর ইনি হচ্ছেন নীলা—শ্রীমতী নীলা সেন—নেপীর দিদি।

গীতা টুপ করে নীলার পা দুটি স্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করল। নীলা চকিত হয়ে উঠল।—ও কি?

গীতা সলজ্জ হাসি হেসে নীরবেই চলে গেল ও-ঘরে।

বিজয়দা বললেন—বড় ভাল মেয়ে রে!

—মেয়েটি কে বিজয়দা?

—বড় দুঃখী। কানাই ওকে উদ্ধার করে এনেছে।

—উদ্ধার করে?

—সে বড় করুণ ইতিহাস।

এর পর নীলা আর প্রশ্ন করতে পারলে না। কানাই এসে ঘরে ঢুকল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল নীলার পরিবর্তন। সে ঘরে ঢুকবামাত্র নীলা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। কয়েকটা কথার পর সে স্যুটকেস হাতে করে উঠে দাঁড়াল। বিজয়দার অনুরোধ ঠেলেই সে বেরিয়ে গেল, বিজয়দাও পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ চলে গেল। বিজয়দাও ফিরলেন না, নীলাও না। কানাই বারান্দায় বেরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, বিজয়দা বা নীলা কাউকেই দেখতে পেলে না। মনে মনে সে নীলার উপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। যদি এখানে না-ই থাকতে চায় নীলা—তবে অনর্থক এখানে এসে বিজয়দাকে চঞ্চল করবার কি প্রয়োজন ছিল? আর যে-পথ নীলা বেছে নিয়েছে—সে যখন ওই বিদেশীয়দের মোহগ্রস্ত—তাদেরই একজনকে সে যখন জীবনে জয় করতে চায়—তখন তাকে তার উপযুক্ত স্থানই বেছে নিতে হবে। সে স্থান বিজয়দার এই সংকীর্ণ-পরিসর পলেস্তারা-খসা ঘরখানি নয়। সরাসরি তার যাওয়া উচিত ছিল—কোন প্রথম শ্রেণীর আধুনিক হোটেলে। রূপ-মাধুর্যবর্জিতা চিত্রাঙ্গদা যেমন অর্জুনকে জয় করতে বসন্তপুষ্পিত বনভূমির পটভূমিতে পুষ্পধনুর কাছে ধার-করা লাবণ্যে মণ্ডিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তেমনি ভাবে তাকেও দাঁড়াতে হবে কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে। সুনিপুণ প্রসাধনে মণ্ডিতা হয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে তাকে।

নেপী ডাকলে—কানুদা!

কানাই ফিরে তাকিয়ে দেখলে—নেপী সেই তক্তপোশের প্রান্তে বসে আছে।

নেপী বললে—রাধিকাপুর যাবেন না কানুদা? আপনার সময় হবে না?

নেপী? আশ্চর্য! নীলা চলে গেল—এতে তার কোন উদ্বেগ নেই। কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন করবারও প্রয়োজন তার মনে হল না। এই সুকুমার তরুণ বয়েস—ঘর-সংসারের মমতা-মায়া কেমন করে এমন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কর্মের নেশায় নিজেকে বিলুপ্ত করে নিয়েছে—সে এক বিস্ময়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হয়ে ফল যেমন বীজ হতে অঙ্কুর—অঙ্কুর হতে পত্রপল্লবঘন বনস্পতি জীবন কামনায় গাছের বৃন্তবন্ধনমুক্ত হয়ে খসে পড়ে, নেপীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এই কর্মের পথে যাত্রা তেমনি মুক্ত জীবনযাত্রায়, প্রতি পদক্ষেপে বোধ হয় তার জীবন বিকশিত হয়ে উঠছে—সার্থক বিকাশে। তার এ নিরাসক্তির মধ্যে কোন কিছুর প্রতি বিরাগ নেই একবিন্দু। কিন্তু সে নিজে ঘর ছেড়ে এসেছে—সংসারের প্রতি তিক্ত বিরাগের জন্য। নেপীর সঙ্গে তার এইখানেই প্রভেদ।

নেপী আবার ডাকলে—কানুদা!

প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের ফলে কানাইয়ের শরীর ক্লান্তি এবং অবসাদে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল—তবু নেপীর আহ্বান সে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ, যাব বই কি নেপী।

—তা হলে আর দেরি করছেন কেন?

—বিজয়দা, তোমার দিদি ফিরে আসুন।

—সে বিজয়দা যা হয় করবেন। দেরি করে গেলে সেখানে আমরা কি কাজ করব ?

কানাই আবার একটু হাসলে, বললে—পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি স্নানটা সেরে নি।

স্নান সেরে কানাই প্রস্তুত হয়ে বললে—চল।

নেপী বললে—আর একটু অপেক্ষা করতে হবে কানুদা। 'গীতা খাবার তৈরী করছে।

—আরে, এই তো জিলিপী-চা যথেষ্ট খাওয়া গেল।

—দুপুরবেলার জন্য গীতা খাবার তৈরী করছে।

পাশের ঘর থেকে গীতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আমার হয়ে গেছে কানুদা। আর একটুখানি।

কানুর মনে হল গীতার কথা। অহরহ ম্লানমুখী মেয়েটি যেন বিশ্বের দুঃখের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গভীর রাত্রে তার কান্নাভারাক্রান্ত উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসের শব্দ সে শুনেছে; গভীর রাত্রে গীতা কাঁদে। যে নিষ্ঠুর অত্যাচার তার উপর হয়ে গেছে, তার স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। মনে পড়ল, অমলবাবুর যে কর্মশক্তি সে দেখেছে—সে শক্তি বিস্ময়ের বস্তু, মানুষ হিসেবে ভদ্রতার তার অভাব নেই, যে প্রীতির পরিচয় ওই একদিনেই সে পেয়েছিল—সে প্রীতি অকৃত্রিম—কিন্তু তবু তার মধ্যে গুপ্ত ব্যাধির মত লালসার জঘন্য প্রকাশ তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল টলস্টয়ের—Resurrection-এর নায়ক প্রিন্স দিমিট্রির কথা। ধনী-সমাজের এক ব্যাধি পৃথিবীর সর্বত্র। আদর্শবাদী প্রিন্স দিমিট্রিও ধীরে ধীরে এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠল।—

"Now the purpose of women, all women except those of his own family and the wives of his friends, was definitely one; women were the best means towards an already experienced enjoyment."

গীতা একটা টিফিন-কেরিয়ার এনে সামনে নামিয়ে দিলে।

তাকে সস্নেহ উৎসাহে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য কানাই হেসে বললে—যে রকম লোভনীয় গন্ধ তোমার দেওয়া খাবার থেকে উঠছে গীতা, তাতে এক্ষুনি খেয়ে শেষ করতে ইচ্ছে করছে।

নেপী উঠে দাঁড়িয়েছিল—টিফিন কেরিয়ারটা হাতে নিয়ে সে বললে—উঠুন কানুদা।

কানাইয়ের এমন প্রশংসাতেও গীতার মুখে এতটুকু তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল না। তার মুখ যেন অস্বাভাবিক রকমের বিবর্ণ ম্লান। এতক্ষণ হয়তো কানাই লক্ষ্য করে নি, অথবা গীতাই হয়তো আত্মসংবরণ করে ছিল। কানাই বিস্ময়ের মধ্যেও সস্নেহ স্বরে প্রশ্ন করলে—কি গীতা-ভাই, কি হয়েছে ?

গীতার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল, কিছু বলবার চেষ্টা করতেই তার রুদ্ধ হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত আবেগে আত্মপ্রকাশ করলে, চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল ঝরতে লাগল।

কানাই বললে—কি গীতা ?

—নেপীদা বলছিল, কাল হীরেন আপনাকে—

আর সে বলতে পারল না।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন নেপী গীতার সামনেই গতরাত্রে কানাইয়ের উপর হীরেনের আক্রমণের কথা বলেছে। ব্যাপারটা বুঝে কানাই তার হাতখানা বাড়িয়ে গীতার সামনে ধরলে, বললে—এই দেখ। কিচ্ছু হয় নি। এই একটু ছড়ে গেছে মাত্র। হীরেনটা মনে করলে, হয়তো আমি তাকে মারব কি এমনি কিছু। নইলে হীরেন তো আমাকে খুব ভালবাসে।

তবু গীতার চোখ থেকে জল ঝরা বন্ধ হল না।

কানাই সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কেঁদো না গীতা। তা ছাড়া হীরেন তো শুধু তোমার ভাই বলেই কাঁদছ। আমার নিজের ভাইদের কেউ যদি আমাকে মারতে আসত তা হলে তো তুমি এমনভাবে কাঁদতে না! তা হলে তুমি আমায় পর ভাবছ? মোছ, চোখের জল মোছ।

গীতা চোখের জল মুছলে। কানাই বললে—শুধু চোখের জল মুছলেই হবে? মনকে প্রফুল্ল কর। তোমাকে নতুন মানুষ হতে হবে গীতা। আমি রাত্রে শুনেছি, তুমি কাঁদ! ছি! কাঁদবে কেন?

গীতা এবার বললে—বাবা-মা কেমন আছেন খবরটা কোন রকমে পাওয়া যাবে না কানুদা?

কানু সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—বাবার হার্ট বড় দুর্বল। কালকের রাত্রের সাইরেনের পর কেমন আছেন—। আবার তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল—চোখের জল আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে গড়িয়ে নেমে এল।

কানাইয়েরও মনে পড়ে গেল তার নিজের বাড়ির কথা। তার মাকে মনে পড়ল, ভাই-বোনদের মনে পড়ল। জীবনপথে বক্রগতিতে সঞ্চরমাণা ছোটখুড়ীকে মনে পড়ল। মনে পড়ল মেজকর্তাকে—রোগজীর্ণ দেহ—দাম্ভিক বৃদ্ধ। মনে পড়ল—সুখময় চক্রবর্তীর মৃতকল্প স্ত্রীকে—দৃষ্টিশক্তিহীনা, শ্রবণশক্তিহীনা বৃদ্ধা—নির্বাপিতশিখা প্রদীপের সলতের আগুনের মত জুগ্‌জুগ্‌ করে কোনমতে যে বেঁচে আছে। সাইরেনের ধ্বনি কি তার কানেও প্রবেশ করেছিল? এই উৎকণ্ঠা এই উদ্বেগের সময় এতগুলি অসুস্থ মানুষের একটিও সুস্থ সহায় কেউ ছিল না।

নেপী অসহিষ্ণু হয়ে ডাকলে—কানুদা!

কানু গীতাকে বললে—আজ ওবেলায় খবর এনে দেব গীতা। এখন যাই।

—দাঁড়ান। বলেই গীতা হেঁট হয়ে কানাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

—কেন? হঠাৎ প্রণাম কেন?

—আজ আমাকে বিজয়দা নিয়ে যাবেন নার্সের কাজ শেখবার অফিসে।

কানাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলে না। গীতা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তার জীবনের কল্পনা শৈশব থেকে যে পথ চিনেছে, সে পথ তার হারিয়ে গেল আজ।

উনিশ

শীতকাল। তার উপর নিউ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। সকাল না হতেই আটটা বেজে যায়। এরই মধ্যে অফিসের সময় হয়ে এসেছে। মোটর, ট্রাম, বাস, গাড়ি, ঘোড়া, রিক্‌শায় কলকাতার রাস্তা ভরে গেছে। ফুটপাথে জনতার ভিড়। কলকাতা যেমন ছিল তেমনি। গতরাত্রে বিমানহানার ফলে প্রত্যূষে যে উত্তেজনা বিচ্ছিন্ন জনতার মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল, সে উত্তেজনার প্রবাহ পর্যন্ত কাজের চাকার দ্রুত আবর্তিত জনস্রোতের মত বইছে। আলোচনা চলছে—তার মধ্যে উত্তেজনাও আছে, কিন্তু বোমার আঘাতে শৃঙ্খলা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। কানাই

খানিকটা আশ্চর্য হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাহীন নিরস্ত্র পরাধীন জাতির মধ্যে এ সহ্যশক্তি কেমন করে সম্ভবপর হল? অথবা উদরান্নের তাড়নায় মানুষগুলি এমনভাবে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে যে, বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার মত মানসিক সচেতনতাও তাদের নেই! না, তাই বা সে কেন ভাববে? সে নিজেও তো এর মধ্যে রয়েছে, নেপী রয়েছে, তারা চলেছে বোমা-বিধ্বস্ত বস্তীতে মানুষের সেবাকর্মে আপনাদের নিয়োজিত করতে যে প্রেরণায়—সে-বোধ, সে-প্রেরণা ওদের নেই, এ কথা সে মনে করবে কেন? কোন্ অধিকারে?

তারা শহরতলীর বাস্-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল।

খানকয়েক মিলিটারী লরী চলে গেল। চীনা সৈনিক বোঝাই লরী। ওপাশ থেকে শহরতলী হতে শহরে এসে ঢুকছে একসারি মিলিটারী লরী। নিত্যই যায়, নিত্য কেন অহরহই চলেছে, ক্লান্তিহীন সামরিক গতিশীলতার বিরাম নেই। আজ কিন্তু এই যাতায়াত অকস্মাৎ একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে মুহূর্তে যুধ্যমান অবস্থায় শঙ্কাজনক গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি জাগ্রত হয়ে উঠছে।

রাধিকাপুরের পথ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে এতক্ষণে তার মনে পড়ল—অমলবাবুদের বাগানে নবনির্মিত কারখানার কথা। পথের কথা শুনে মনে হল—এ তো সেই জায়গা। গৃহহীন মানুষগুলির কথা মনে পড়ল। গোরু, ছাগল, তৈজসপত্র নিয়ে গৃহহারার দল, সেই বৃদ্ধ, সেই বৃদ্ধা, সেই তরুণী মেয়েটি!—তার শরীরের মধ্যে রক্তস্রোতে একটা উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়ে গেল। হয়তো, হয়তো শত্রুবিমান-বর্ষিত বোমা অমলবাবুদের বাগানে তাদেরই উপর পড়েছে। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলে—কত দেরি বাস্ ছাড়তে?

ড্রাইভার উত্তরই দিল না। সময় হলে হুইসিল বাজবে—সে বাস্ ছাড়বে।

কানাই আবার ডাকলে—এ ভাইয়া!

নিস্পৃহ স্বরে ড্রাইভার এবার জবাব দিলে—হুইসিল হোগা তো ছোড়েগা।

দ্রুত ধাবমান যন্ত্রযানের সঙ্গে আপনার অস্তিত্ব মিশিয়ে দিয়ে—প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে স্টীয়ারিং, গীয়ার, ব্রেকের সঙ্গে সংযুক্ত করে আট ঘণ্টা তার ডিউটি। এর অবসরে যে সংক্ষিপ্ত স্থির মুহূর্তগুলি আছে, সেগুলি সে ক্লান্ত অলস আনন্দে উপভোগ করে। সে চেয়ে দেখছিল রাজপথের জনতা।

বেলা বাড়ার সঙ্গে রাজপথের জনতার চাপ বাড়ছে।

বাসগুলির চারধারে আরোহীদের কাছে ভিক্ষাপ্রত্যাশী ভিক্ষুকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—বাবা, রাজাবাবু! অনাথার দিকে তাকাও বাবা।

—অন্ধকে দয়া কর বাবা!

কানাই ভাবছিল,—রাধিকাপুরের কথা।

নেপী মৃদুস্বরে বললে—একটা আনি দিন না কানুদা। কানুদা!

কানাই পকেটে হাত পুরলে।

নেপী মৃদুস্বরে বললে—এ মেয়েটি ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে, পেশাদার ভিখিরী নয়।

কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখেই যেন পাথর হয়ে গেল। পকেটের মধ্যে পয়সা-অনুসন্ধানরত হাতখানা স্থির হয়ে গেল—হাতখানা যেন অবশ হয়ে গেছে। জীর্ণ কাপড়ের দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে

আপনাকে আবৃত করে সঙ্কুচিতভাবে শীর্ণ হাত পেতে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে-ছেলে; মধ্যে মধ্যে হাতখানা কাঁপছে। কে? অবগুণ্ঠনে আবৃত হলেও, অবয়ব দেখেই যে তাকে কত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে! তাদের বাড়িতে কতবার যে সে এই দীর্ঘ অবগুণ্ঠন-আবৃতা সঙ্কুচিতা মেয়েটিকে আসতে যেতে দেখেছে! এ যে গীতার মা! হ্যাঁ, তিনিই তো। কিন্তু এ কি—গীতার মায়ের হাত নিরাভরণ কেন? পরনেও একখানা থান কাপড়। তবে কি গীতার বাপ—? তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটি টাকা বের করে নেপীর হাতে দিয়ে বললে—তুই যা নেপী, আমার যাওয়া হবে না।

নেপী বিস্মিত হয়ে গেল—সে কি? কানুদা! কানুদা!

ভিক্ষার্থিনী মেয়েটি সত্যিই গীতার মা—সরোজিনী। নেপীর ওই কানুদা ডাক তার কানে যেতেই সে চকিতে মুখ তুলে অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসারিত করে দেখলে—কানাই-ই নেমে আসছে বাস থেকে। মুহূর্তে সে দ্রুততম পদক্ষেপে ফুটপাথ অতিক্রম করে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

সরোজিনীর ইতিহাস অতি মর্মন্তুদ।

বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে মহানগরী, প্রচণ্ড কর্মশক্তির এক বিরাট ঘূর্ণাবর্ত; সে আবর্তে আবর্তিত মানুষ আত্মহারা, দিশেহারা; সেখানে আপনার কথা ছাড়া অন্যের কথা ভাববার অবকাশ নেই। পথের মধ্যে মানুষ অকস্মাৎ মরে গেলে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বারকয়েক হায়-হায় করেই আবার তাকে ছুটতে হয়। পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সাহায্যের উপর ভিত্তি করে ধীরগতি জীবনের সমাজ এ নয়। সেখানে মানুষ অর্থহীন হলেও তার সাহায্যশক্তির একটা মূল্য আছে এবং সে সাহায্যশক্তি একটা অপরিহার্য বিনিময়-বস্তু। এখানে মানুষের আর্থিক ক্রয়শক্তির উপরেই তার পাওনা কতটুকু তা স্থির হয়। মানুষ মরে গেলে পর্যন্ত মানুষের সহানুভূতি বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, পয়সা দিলে ভাড়াটে বাহক মেলে, সৎকার-সমিতির গাড়ী পাওয়া যায়, দোকানে সৎকারের যাবতীয় জিনিস থরে থরে সাজানো আছে, যার যেমন শক্তি সে তেমনি কিনে আনে। সরোজিনী এবং তার স্বামীর জীবনের এই কয়দিনের মর্মন্তুদ ইতিহাস লোকের খোঁজ রাখবার অবসর হয় নি। খোঁজ রাখবার মত প্রবৃত্তিও ঘটে নি কারও।

সেদিন হীরেনের গৃহত্যাগের পর থেকে রুগ্ন ক্রোধী নিষ্ঠুর স্বামীকে নিয়ে সরোজিনী নিরুপায় হয়ে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। ভগবানকে ডেকে বার বার নিজের এবং রুগ্ন স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছিল, বলেছিল—নাও তুমি, আমাকে আর ওঁকে নাও। মুক্তি দাও আমাদের।—সাহায্য চাইবার মত মানুষ কাউকে সে খুঁজে পায় নি। পূর্বে, অভাব তখন অবশ্য এমন চরম সীমায় পৌঁছয় নি, তখন মধ্যে মধ্যে যেত চক্রবর্তীদের বাড়ি, কানাইয়ের মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াত। কানাইয়ের বোন উমা—গীতার বান্ধবী; গীতা প্রায়ই যেত উমার কাছে, সেই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্রটি ধরে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে গিয়ে সে দাঁড়াত। কানাইয়ের মা যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কিন্তু গীতাকে নিয়ে কানাই চলে যাওয়ার পর থেকে ও-বাড়ির দরজা মাড়াতে সে সাহস করে নি। মেজকর্তা, মেজগিন্নী, কানাইয়ের বাপ দোতলার বারান্দা থেকে তাদের নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়িটাকে লক্ষ্য করে যে গালিগালাজ করে, তা শুনে সে নীরবে চোখের জল ফেলেছে।

—খানকির বাড়ি! খানকির বেটী—ছেলেটাকে মোহিনী-মায়ার ভুলিয়ে নিয়ে গেল!

গীতার বাপ দাঁতে দাঁতে ঘষে গালাগালি দিয়েছে, কানাইকে এবং চক্রবর্তী-বংশকে— লোচ্চার বংশ, ছাগলের বংশ; তারপর অশ্লীলতম ভাষায় গালাগালি। দুপুরের খাবার সময় অতিক্রান্ত হলে গালাগালি দিয়েছে সরোজিনীকে, কাছে এলে প্রহার করেছে।

সরোজিনী প্রত্যাশা করেছিল—হীরেন ফিরবে। কিন্তু সে ফেরে নি। মা বাপ গীতার জন্ম দুঃখ তার অনেক; কিন্তু চরম অভাবের নিষ্ঠুরতম পীড়নের কষ্টে জর্জর এই অসুস্থ সংসার থেকে বেরিয়ে এসে তার জীবাত্মা অনেক বেশী স্বস্তি পেয়েছে, আরাম পেয়েছে, তাই সে আর ফেরে নি। কানাইকে দেখে আক্রোশে সে ছুরি মারতে চেয়েছে—সে আক্রোশ লজ্জায় হেঁট-মাথা তার দুঃখী মা-বাপের উপর সহানুভূতিরই এক বিচিত্র প্রকাশ, গীতার উপর প্রীতি এবং মমতারই বক্র রূপান্তর। তাদের সে ভালবাসে, কিন্তু তার তরুণ জীবন সে ভালবাসার জন্যে—ওই দুঃখকষ্টের মধ্যে কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না।

সরোজিনী মনে মনে কানাইকে আশীর্বাদ করেছে, আপন মানসলোকে গীতা ও কানাইকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, তাদের মঙ্গল কামনা করেছে। প্রৌঢ়া ঘটকীর কাছে সকল বৃত্তান্ত সে শুনেছে। ঘটকী তাকে বলেছে—তিরস্কার করে বলেছে— যেমন তখন চক্রবর্তীদের মেয়েটার সঙ্গে মেয়েকে ও-বাড়িতে যেতে দিয়েছিলি—তার ফল এখন ভোগ কর। ও ছেলে চক্রবর্তীদের ছেলে, ও এর আগে গীতাকে নষ্ট করেছে, গোপন পীরিত ছিল ওদের। নইলে ছোঁড়াকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল! সব বললে ছোঁড়াকে! আমি যাব কোথায় মা! বলে সে গালে হাত দিয়েছিল।

সরোজিনী মনে অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করেছিল। তার গীতা চরম লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। গীতা যখন কানাইকে সব খুলে বলতে পেরেছে, তখন ঘটকীর কথা সত্যি—গীতা কানাইকে ভালবাসে, আর কানাই যখন সব শুনেও তাকে নিয়ে ঘর-সংসার ছেড়েছে, তখন সেও গীতাকে ভালবাসে। তাদের সে ভালবাসা সত্যি হোক্। বিবাহের প্রত্যাশা সে করে নি, তবু তো তারা স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করবে ছোট একটি সংসার পেতে। এ শহরে তেমন নরনারীর তো অভাব নেই। তাদের বস্তির মধ্যেই তো কত ঘর রয়েছে! চোখে তার জল এসেছিল, সে জল তার শীর্ণ মুখ বেয়ে পড়েছিল—মুছে ফেলতেও তার মনে হয় নি।

ঘটকী সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—সে বাবু আজও এসেছিল, মস্ত বড়লোক, গীতার খোঁজ সে করছে। বলছে—পুলিসে খবর দিয়ে একটা কেস করে দে।

সরোজিনী শিউরে উঠেছিল।

—খরচপত্ত সে-ই সব করবে। বড়লোক—ঝোঁক পড়েছে, বুঝলি?

সরোজিনী ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করেছিল।

—তবে আর আমি কি করব?—বলে সেদিন সে চলে গিয়েছিল।

তারপর ক'দিন তাদের কেটেছে জীবনের চরমতম অভাবের মধ্যে। ঘরে একটা শূন্যগর্ভ সেকালের পুরোনো ট্রাঙ্ক ছিল। সেটা বিক্রী করেছিল এক টাকায়। যুদ্ধের বাজার—চালের দর আঠারো, রুগ্ন স্বামী রাত্রে সাগু খায়, ওষুধ এবং নেশার আফিং চাই, টাকাটার মূল্য আর কতটুকু? বাড়িওয়ালা এসেছিল, ভাড়া বাকী তিন মাস। রুগ্ন, তীক্ষ্ণ-মেজাজী স্বামী তাকে আইনের তর্ক তুলে ঝগড়া করে হাঁকিয়ে দিয়েছে। বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছে—আইন? তোর মত ভাড়াটে ওঠাতে যদি আইন লাগে তবেই আমি করে খেয়েছি! কালকের দিন সময় দিচ্ছি, পরশু তোকে গুণ্ডা দিয়ে বের করে দেব বাড়ি থেকে। আইন করতে চাস্—

তুই করিস্‌ !

বাড়িওয়ালা চলে যেতেই সে দুর্দান্তভাবে হাঁপাতে শুরু করেছিল, বহু শুশ্রূষায় সরোজিনী তাকে সুস্থ করে তুলতেই, সেদিনের মত সরোজিনীর হাতের পাখাটা কেড়ে নিয়ে নিষ্ঠুর প্রহারে তাকে জর্জরিত করে তুলেছিল। নিরুপায় হয়ে সে গিয়েছিল সেই বামুনদি ঘটকীর কাছে। সমস্ত দিনটা সম্মুখে, ঘরে এক কণা ক্ষুদ নেই, রুগ্ন স্বামী তাকে প্রহার করে ক্লান্ত হয়ে আবার হাঁপাচ্ছে। চাল চাই, সাগু চাই, আফিং চাই। অন্ততঃ একটা রাঁধুনীর কাজও ঘটকী যদি কোথাও জুটিয়ে দেয় !

বামুনদিদি আশ্বাস দিয়েছিল, এক সের চালও দিয়েছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ব্যস্ত হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘটকী এসে বলেছিল—যা বলি তাই কর্‌। কিছু পাইয়ে দি তোকে।

শঙ্কায় বিস্ফারিত চোখে বামুনদিদির মুখের দিকে চেয়ে সরোজিনী প্রশ্ন করেছিল—যেন তার কথা সে কিছুই বুঝতে পারে নি, একটি কথার প্রশ্ন—অ্যাঁ ?

কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা থান কাপড় বের করে সরোজিনীকে দিয়ে সে বলেছিল—এই কাপড়খানা পর্‌।

সরোজিনী থান কাপড়টার দিকে চেয়েছিল সবিস্ময়ে।

বামুনদিদি বলেছিল—হাতের কড় দুটো খুলে ফেল্‌। নোয়াটা খুলে ফেল্‌, সিঁথির সিঁদুরটা—। কথা অসমাপ্ত রেখেই সে সরোজিনীরই আঁচলখানা টেনে বিবর্ণ সিঁদুরচিহ্নটুকু মুছে দিতে উদ্যত হয়েছিল।

সরোজিনী দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিল—না।

—না নয়, শোন্‌ ! সেই বাবু এসেছে আজ। আমি বলেছি—গীতার বাপ মরে গেছে—কিছু সাহায্য করতে হবে আপনাকে। যা বলি তাই কর্‌। কুড়ি-পঁচিশটে টাকা পেয়ে যাবি।

সরোজিনী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

ঘটকী বলেছিল—শুধু শুধু ভিক্ষে কি লোকে দেয় ! দুঃখের কথা বলতে হয়; ভিক্ষে করতে গেলে মিছে করেও বলতে হয়।

ও-ঘর থেকে রুগ্ন প্রদ্যোত দাঁতে দাঁত ঘষে চীৎকার করে উঠেছিল—যা বলছেন—শোন্‌ না, হারামজাদী।

এর পর সরোজিনী মাটির প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে ছিল—ঘটকীই সিঁদুর মুছে কড় নোয়া খুলে দিয়েছিল, তারপর মাটি থেকে পড়ে যাওয়া থান কাপড়খানা তুলে হাতে দিয়ে বলেছিল—নে—পরে ফেল্‌।

তারপর নীরবে সে এসে ঘটকীর বাড়িতে অমলের সামনে নিস্পন্দ হয়ে আজকের মতই নিরাভরণ হাতখানি মেলে দাঁড়িয়েছিল। অমলও নীরবে তার হাতে দিয়েছিল দুখানি দশ টাকার নোট। নিস্পন্দ হাতের উপর নোট দুখানাও নিস্পন্দ—তার ওপর টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে পড়েছিল অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে দু ফোঁটা জল। অমল আরও একখানা নোট দিয়ে বলেছিল—পরে আবার দেখব, আজ আর নেই।

ঘটকী বলেছিল—পুলিসে খবর দেবে ও। বলে কয়ে রাজী করেছি। এমন দুঃখের সময়টা, দুদিন যাক। আয়, আয় লো বউ। বলে তার হাত ধরে টেনে রাস্তায় একখানা নোট সরোজিনীর হাত থেকে নিয়ে বলেছিল—এ আমার কমিশনি। এখন ওই কুড়ি টাকাই তোর ঢের। আবার আদায় করে দোব।—তারপর হেসে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল

—খেয়ে-দেয়ে শরীরটাকে একটু তাজা কর্ দেখি! পরিষ্কার থানকাপড়েই তোকে যা লাগ্ছে! কে বলবে তুই গীতার মত এত বড় মেয়ের মা!—ঘটকী হেসেছিল, সে হাসি দেখে সরোজিনী শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ঘটকী বলেছিল—যা এখন বাড়ি যা। বলে সে চলে গিয়েছিল। সরোজিনী সেই পথের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল—নির্বাক হয়ে। ঘটকীর কথাগুলো সে ভাবছিল। চন্দ্রালোকিত ব্ল্যাক আউটের রাত্রি, গলির মধ্যেও জ্যোৎস্নার প্রভা এসে পড়েছিল, অস্ফুট প্রদোষালোকের মত আবছায়ার মধ্যে সাদা কাপড় পরে অশরীরীর মত কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হয়েছিল সাইরেনের শব্দে। সচকিত হয়ে সে ছুটে বাড়িতে এসে ঢুকেছিল। রুগ্ন প্রদ্যোতের হার্ট দুর্বল!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল প্রদ্যোত। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। সরোজিনীকে দেখেই সে দুরন্ত ক্রোধে চীৎকার করে উঠেছিল—কি করছিলি এতক্ষণ?

সরোজিনী কি উত্তর দেবে ভেবে পায় নি।

—এত দেরি কেন হল?—তারপর সরোজিনীর দিকে চেয়ে বলেছিল—সিঁথির সিঁদুর মুছে ধবধবে থান কাপড় পরে বাহার যে খুব খুলেছে দেখছি!

সবিস্ময়ে সরোজিনী এবার বলেছিল—কি বলছ তুমি?

—কি বলছি? আমি কিছু বুঝি না, না? হারামজাদী ঘটকী—তোকে বিধবা সাজিয়ে—; —উঃ—! বলে সে নিজের চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল।

· ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে সরোজিনী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। উন্মত্ত প্রদ্যোত অকস্মাৎ নিজের চুল ছেঁড়া বন্ধ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সরোজিনীর ওপর। দুহাতে টুঁটি টিপে ধরে পেষণ করতে আরম্ভ করেছিল। তারপর সরোজিনীর আর মনে নেই। জ্ঞান হলে দেখেছিল সে পড়ে আছে মেঝের ওপর, প্রদ্যোত নেই, তার হাতের নোট দুখানাও নেই।

সেই সাইরেনের বিপৎকালের মধ্যেই প্রদ্যোত তাকে মৃত মনে করে তার হাতের নোট দুখানা নিয়ে কোথায় চলে গেছে।

সরোজিনীর দুঃখ হয়েছিল। তবু তার মনে হয়েছিল—সে মুক্তি পেয়েছে—সে মুক্তি পেয়েছে। সেও ভোরবেলায় তার জীর্ণ কাপড় দুখানা, একটা মগ, একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়মের গ্লাস, একখানা কলাই-করা থালা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সকালে বাড়িওয়ালা আসবে গুণ্ডা নিয়ে।

ঘটকীর বাড়িও যায় নি। বাড়ি থেকে বের হবার আগে থান কাপড়খানা বদলাবার এবং হাতে দু-টুকরো লাল সুতো বাঁধবার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন বিদ্রোহ করে উঠেছিল। এই বেশ-ই তার ভাল, তা ছাড়া, কালকের শিক্ষা তার মনের মধ্যে খানিকটা কাজ করেছিল, সে ওই থান কাপড় পরে নিরাভরণ হাত করে বাস্-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু কানাইকে দেখে আপনার মিথ্যাচরণের লজ্জা থেকে কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারলে না। পাশের গলিপথ দিয়ে ছুটে পালাল।

· ·

কানাই আর তাকে দেখতে পেল না। ফুটপাথের উপরেই সে তাকে খুঁজছিল। স্তব্ধ হয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গীতার বাবা তা হলে মারা গেছেন। বিধবা সরোজিনী দেবী পথে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন। প্রদ্যোতবাবু মারা গেছেন—তিনি অবশ্য নিষ্কৃতিই পেয়েছেন। কিন্তু মারা গেলেন কিসে? গীতার কথাটা তার মনে পড়ল, গত রাত্রের সাইরেনের কথা উল্লেখ করে ···। প্রকাশ করেই গীতা বলেছিল—বাবার হার্ট দুর্বল। হয়তো কালই ওই ভয়াবহ

উদ্বেগের সময় প্রদ্যোতবাবু হার্ট-ফেল করে মারা গেছেন। শ্মশান থেকে ফিরে কপর্দকহীন স্বজন-সহায়হীন সরোজিনী দেবী ভিক্ষার জন্য রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন, বাড়িওয়ালা হয়তো বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক থেকে যেন আপনি ঝরে পড়ল। বাসখানা তখন চলে গেল। যে-পথে বাসখানা চলে গেছে—সেই পথের দিকে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বাসখানার দ্রুতগতির মতই নেপীর জীবনের দ্রুতগতি দ্বিধাহীন, পিছনের প্রতি তার কোন মমতা নেই। সে চলে গেল—আহত বিপন্ন মানুষের সেবা করতে। তার জীবনের সমস্ত গতি পঙ্গু করে দিয়েছে গীতা। গীতার ভার সবই নিয়েছেন বিজয়দা, তবু গীতা তাকে ছাড়ে নি। সে ঢুকে বসল একটা চায়ের দোকানে। ফিরে গিয়ে গীতাকে সে কি বলবে তাই ভাবছিল। এখনও মা-বাপের জন্য তার গভীর মমতা। যে মা-বাপ উদরান্নের জন্য তাকে জঘন্যতম লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করে নি—তাদের কথা বলতে গিয়ে এখনও তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। খাঁটি বাঙালীর মেয়ের সনাতন রূপই এই। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে যারা সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর অক্ষম-অসহায়তার মধ্যে জীবন যাপন করে এসেছে—তারা এর বেশী আর কি করতে পারে? সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু ওই অধিকারটুকু তারা পেয়েছিল; পিতা-স্বামী-পুত্রের সেবা করার অধিকার। তাদের সমস্ত জীবনীশক্তি সহস্রধারায় ওই পথে বেগবতী হয়ে উঠেছে—স্নেহে, প্রেমে, ভক্তিতে, প্রীতিতে, মমতায়, সেবায়; জীবনের সকল বঞ্চনার দুঃখ সুগভীর বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে—আত্মত্যাগে কৃচ্ছ্রসাধনায়। মনে পড়ল তার নিজের মায়ের কথা, পিতামহী মেজোগিন্নীর কথা, প্রপিতামহী সুখময় চক্রবর্তীর স্ত্রী সেই নব্বই বৎসর বয়স্কা জড়পিণ্ডের মত বৃদ্ধার কথা। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের বাড়ি এখান থেকে বেশী দূরে নয়, একবার দেখে এলে হয় না? চায়ের শূন্য কাপটার দিকে চেয়ে সে বসে রইল। আবার একখানা বাস ছাড়ছে—সেই শহরতলীর দিকে। নেপী এতক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তার জীবনকে একদিকে টানছে নেপী, একদিকে গীতা। গীতার প্রভাবটাই যেন বেশী। নইলে সে-ই বা এই চায়ের দোকানে বসে গীতার মতই ভাবছে কেন, যাদের সে পরিত্যাগ করে জীবনে অগ্রসর হবার জন্য পথে বেরিয়েছে, তাদের কথা। গীতার কথাতেই কিছুক্ষণ আগেও তার একবার তাদের কথা মনে পড়েছিল। যদি ভাবছেই, তবে সে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে তাদের খোঁজ নিয়ে আসতে পারছে না কেন? নেপী হলে কি করত? সে অসঙ্কোচে গিয়ে সেখানে দাঁড়াত, যেটুকু তার কর্তব্য মনে হত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে চলে আসত। তার এ দুর্বলতা কেন? মুখে তার সকরুণ হাসি ফুটে উঠল। সুখময় চক্রবর্তীর বংশের অসুস্থ রক্তের প্রবাহ, তার সেই জীর্ণ অন্ধকার গোলকধাঁধার মত বাড়িখানা, যার মধ্যে সে এতকাল বাস করেছে, সেই বাড়িখানার প্রভাব; এসব যে তার চির-সঙ্গী! তবু সে মুহূর্তে নিজের অন্তরকে টেনে সোজা খাড়া করে তুললে। আগে চলবার জন্য সে প্রস্তুত হল। বাড়ির খোঁজ নিয়ে—যেটুকু তার করণীয় সম্পন্ন করে সে চলে আসবে। নেপী অনেক দূর এগিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ মনে হল নীলার কথা। বিজয়দা কি তাকে ফেরাতে পেরেছেন? না—নীলাও একাকিনী নির্ভয়ে যে পথ তার সম্মুখে প্রসারিত হয়ে রয়েছে সেই পথে এগিয়ে চলে গেছে?

কুড়ি

প্রৌঢ় মেজকর্তা গভীর আবেগের সঙ্গে অভিনয়ের ভঙ্গীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কিছু আবৃত্তি করছে। প্রাচীন চক্রবর্তী-বাড়ির অন্ধকার সিঁড়িতে কানাই উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। এই প্রাতঃকালেই মেজকর্তা মদ খেয়েছেন নাকি? দু-চারটে লাইন তার কানে এল।

"নারায়ণ—নারায়ণ,
ডুবেছে মৈনাক সাগরের জলে;
অভ্রংলিহ উচ্চশির বিন্ধ্য ভাই মোর,
তার শির লুটায়েছ ধরার ধূলায়;
তবু মেটে নাই সাধ? ·····"

মেজকর্তা স্তব্ধ হলেন।

মেজগিন্নীর সাড়া পাওয়া গেল—এত ভাবছ কেন?

—ভাবছি কেন?—মেজকর্তার কণ্ঠস্বরে আগ্নেয়গিরির গর্জনের আভাস ফুটে উঠল।

সবিনয়ে এবার মেজগিন্নী বললেন—যা হয় উপায় তিনিই করবেন।

—করবেন? তিনিই উপায় করবেন? না?—থিয়েটারী ভঙ্গীতেই মেজকর্তা হা হা করে হেসে উঠলেন। খানিকটা হেসে আবার বললেন—উপায় করেছেন তিনি। চক্রবর্তী বংশ ধ্বংস। বোমার আঘাতে ভাঙা বাড়ি চুরমার হয়ে যাবে, আর তারই তলায় গোষ্ঠীসুদ্ধ চাপা পড়বে। না হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরবে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—রাক্ষসের মত সব খাবে, পৈশাচিক আহার। কতবার বলেছি, দৈনন্দিন খরচের চাল থেকে একমুঠো করে কেটে রেখো। সঞ্চয় করো। শুনবে না, কিছুতে শুনবে না। নাও এইবার গেলো। ভাড়াটেরা সব চলে গেছে। কাল রাত্রেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। অল-ক্লিয়ার-এর পর সকলকে ডেকে বলেছি—ওহে, ভোর-বেলাতেই একবার বস্তিতে যাবে। ।— ঘুম কারও ভাঙল না। সব পালিয়ে গেছে। নাও, এইবার কি করবে কর? দুহাতে পেট পুরে খাও।

মেজগিন্নী বললেন—বড় তরফ—ছোট তরফ তো ওদের বস্তির অংশ বিক্রী করছে।

—বিক্রী করছে?

—হ্যাঁ, আজই বিক্রী করবে, তারা সব বেরিয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যেয়, নয়, কাল সব বাইরে পালাচ্ছে। বললে, বোমার আঘাতে মরতে পারব না।

মেজকর্তা ক্ষুব্ধ আক্ষেপে বললেন—যাক, যে যেখানে যাবে যাক। আমি—আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

মেজগিন্নী বললেন—বড় তরফ যাচ্ছে—

চীৎকার করে উঠলেন মেজকর্তা, যাক্—যাক্—যাক্! মেজগিন্নী সভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মেজকর্তা আবার বললেন—তারপর? বস্তি বিক্রী করছে, এর পর খাবে কি? বস্তি তো মর্টগেজ হয়ে আছে, মর্টগেজ শোধ করে কত টাকা পাবে? পঙ্গপালের মত ছেলে, তিন-চারটে মেয়ে। মেয়েগুলোর বিয়ে দেবে কি করে? বিক্রী করছে!

মেজগিন্নী বললেন—ভগবান আছেন, তিনি যা করবেন তাই হবে।

—হবে। ঠিক হবে। তাঁর ন্যায়বিচার। পাপের বিচার তিনি ঠিক করবেন। পাপ—মহাপাপ, প্রায়শ্চিত্ত হবে না! বি-এস্-সি পাস বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান—একজনের কুমারী মেয়েকে নিয়ে পালাল। মহাপাপ! এর প্রায়শ্চিত্ত কড়ায়গণ্ডায় হবে। পাপ আমরাও করেছি, বেশ্যাসক্ত ছিলাম, আজও মদ্যপান করি, লক্ষ্মীকে অবহেলা করেছি, পাপ আমরাও করেছি। কিন্তু এ হল মহাপাপ! মহাপাপ!

কানাইয়ের দেহের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল। তারই কথা হচ্ছে। সে সোজা উপরে উঠতে আরম্ভ করলে। মেজকর্তার কণ্ঠস্বর তখন সকরুণ হয়ে এসেছে। তিনি বলছিলেন, ভগবান, এত বড় কলঙ্কের ছাপ তুমি এঁকে দিলে চক্রবর্তী-বংশের কপালে? তাকে তুমি এমন মতি কেন দিলে? তার মাথায় তুমি বজ্রাঘাত—।—মেজকর্তা কথা শেষ করতে পারলেন না। সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করে সেই মুহূর্তেই তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল কানাই।

মেজকর্তা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে ক্রোধে স্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টে কানাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন, কানাই ধীর পদক্ষেপে তাঁর দিকে এগিয়ে এল, মেজকর্তা এবার চীৎকার করে উঠলেন—বেরিয়ে যাও, তুমি বেরিয়ে যাও। লজ্জাহীন লম্পট—কুলাঙ্গার—বেরিয়ে যাও তুমি।

মেজগিন্নী অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন কানাইয়ের মুখের দিকে। এতটুকু লজ্জা কি অনুতাপের চিহ্ন তাঁর মুখে নেই।

কানাই শান্ত স্বরে বললে—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আমার সঙ্গে তোমার কোন কথা নেই, থাকতে পারে না। বেরিয়ে যাও তুমি।

—না, আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার।

তার অসঙ্কোচ দীপ্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মেজকর্তা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, বললেন—তোমার লজ্জা করছে না?

—না। আমি লজ্জা পাবার মত কোন কাজ করি নি।

—কর নি?

—না। সেই কথাই বলতে চাই আপনাকে।

—তুমি বস্তির সেই গরীব ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়েটিকে—

বাধা দিয়ে কানাই বললে—আপনাকে সেই কথাই বলব।

—সে কি মিথ্যা কথা? তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও নি?

—গিয়েছি। কিন্তু—

অসহিষ্ণু মেজকর্তা বাধা দিয়ে বললেন—তবে? ও! তবে কি তুমি তাকে বিবাহ করেছ?

—না।

—তবে?

—সে কথা শুধু আপনাকে বলতে চাই আমি। গোপনে বলতে চাই।

আবার একবার স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে মেজকর্তা বললেন—বল।

—গোপনে বলতে চাই।

—এস।—বলে মেজকর্তা তাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করবার সময় মেজগিন্নীকে কঠোর স্বরে বললেন—ও এসেছে এ কথা কেউ যেন না জানে। খবরদার! তারপর কানাইকে বললেন—দরজা বন্ধ করে দাও।

কানাই দরজা বন্ধ করে দিলে। মেজকর্তা বিচারকের গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন—বল ;

কানাই তাঁর মুখের ওপর অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে চেয়ে আরম্ভ করলে—মেয়েটিকে আমি চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছি। উমার বন্ধু সে—উমার মতই তাকে আমি স্নেহ করি, সেও আমাকে উমার মত ভক্তি করে—ভালবাসে। সেদিন রাত্রি তখন দশটা—

মেজকর্তা নীরবে সমস্ত কথা শুনে গেলেন। স্থির গম্ভীর মুখ, অচঞ্চল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ; কে বলবে যে, অপরিমিত অমিতাচার উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে অসুস্থমস্তিষ্ক, নিদারুণ অভাবের তাড়নায় অধীরপ্রকৃতি সেই মানুষই এই। কানাইয়ের চোখেও তাঁর এ মূর্তি নতুন, সেও বিস্মিত হয়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে শান্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে মেজকর্তা বললেন—বল। তারপর ?

কানাই বললে—তাকে এই চরমতম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমি তাকে নিয়ে গিয়েছি। বাড়িতে থাকলে—এই লাঞ্ছনা তাকে নিত্য ভোগ করতে হত। পরিণাম হত—

মেজকর্তা বললেন—তুমি তাকে বাড়িতে নিয়ে এলে না কেন ? আমার কাছে এলে না কেন ?

কানাই বললে—ঠিক সেই সময় আমিও এ বাড়ি থেকে চিরদিনের মত বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

মেজকর্তা চমকে উঠলেন—কেন ?

কানাই বললে—এ বাড়ির ধ্বংস অনিবার্য। আমি বাঁচতে চাই। তাই আমি চলে গেছি।

মেজকর্তা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কানাই বললে—মেয়েটিকে আমি আমার এক দাদার বাসায় রেখেছি। তিনি একজন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার—বিবাহ করেন নি। তিনিই তার ভার নিয়েছেন। তাকে তিনি নার্সের কাজ শেখাবেন স্থির করেছেন। আজই সে ভর্তি হবে। কানাই স্তব্ধ হল।

মেজকর্তা তখনও তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। চেয়েই রইলেন।

কানাই আবার বললে—অন্যায় আমি কিছুই করি নি।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেজকর্তা ডান হাতখানি প্রসারিত করে কানাইয়ের মাথার উপর রাখলেন। অতি মৃদুস্বরে বললেন—তোমাকে আশীর্বাদ করছি।—টপ-টপ করে তাঁর চোখ থেকে বড় বড় ফোঁটায় কয়েক বিন্দু জল ঝরে পড়ল। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি আবার বললেন—কোন অন্যায় তুমি কর নি। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি।

কানাই এবার নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। মেজকর্তা বললেন—তুমি ঠিক বলেছ, এ বাড়ির পরিত্রাণ নেই, এর ধ্বংস অনিবার্য। চলে গেছ, বেশ করেছ ; তোমার মধ্যে চক্রবর্তী-বংশ বেঁচে থাকবে।

কানাই সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

মেজকর্তা খাড়া সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহের জীর্ণতা অসুস্থতাকে অভিভূত করে একটা মহিমা ফুটে উঠেছে তাঁর সর্বাঙ্গে। বহু মানুষকে বঞ্চনার অপরাধের বিনিময়ে চক্রবর্তী-বংশ যে আভিজাত্য অর্জন করেছিল—তার অবশেষটুকু আজ এই মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে। তিনি আবার বললেন—বাঁচার মত বাঁচবার জন্য যখন এ বাড়ি ত্যাগই করেছ, তখন চলে যাও, আর দাঁড়িয়ো না। তোমার মা—তোমার জন্য দুঃখে শয্যা নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আর তুমি বের হতে পারবে না। তিনি তোমায় ছাড়বেন না।

কানাই চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মা তার জন্য শয্যা নিয়েছেন!

মেজকর্তা বললেন—চঞ্চল হয়ো না। চক্রবর্তী-বংশের কল্যাণের জন্যই বলছি—। যখন চলে গেছ—যেতে পেরেছ—তখন আর ফিরো না। শোক দুঃখ সময়ে সব সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু যে মুক্তি তুমি পেয়েছ—তাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলে আর জীবনে ফিরে পাবে না।

কানাই ফিরল।

মেজকর্তা বললেন—কি করছ, কি করবে, তা জানি না। কিন্তু খুব বড় একটা কিছু করো—যাতে চক্রবর্তী-বংশের সমস্ত পাপ ক্ষালন হয়। আর—তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বললেন—আমরা ম'লে অশৌচটা পালন করো।—তারপর আবার বললেন—এবার তাঁর মুখের হাসি আরও একটু বিকশিত হয়ে উঠল এবং যেন রূপান্তর ঘটল—বললেন—বিয়ে করলে—নাত-বউকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

কানাই বেরিয়ে এল—এক পরম আনন্দময় লঘু মন নিয়ে; সে লঘুতার মধ্যে চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাস নেই, নিরুচ্ছ্বসিত শান্ত আনন্দের মধ্যে তার জীবনের গতিবেগ সদ্য নীড়ত্যাগী আকাশসন্ধানী তরুণ পাখীর লঘু পক্ষের গতির মত দ্রুততর হয়ে উঠেছে। চক্রবর্তী-বংশের ওই অন্ধকার মোহময় বাড়ি থেকে আজ পেয়েছে সে সত্যিকার মুক্তি। এ মুক্তি যেন পরম মুক্তি বলে মনে হচ্ছে। আজ তার মনে হল—তার পদরেখায়-রেখায় পৃথিবীর বুকে রাজপথ গড়ে উঠবে। তার অসুস্থ পূর্বপুরুষদের গলিপথে আনাগোনার কলঙ্ক চাপা পড়ে যাবে নতুন রাজপথের ইট-পাথরের বিছানার তলায়। তার মেজদাদুকে সে কোন কালে ভাল চোখে দেখত না। তার পূর্বপুরুষের কীর্তির ইতিহাসকে সে এতদিন শুধুই কৌশলময় শোষণে পরস্ব-অপহরণের ইতিহাস বলেই ভেবে এসেছে। জীবন-যাপনের ধারার মধ্যে দেখেছে শুধুই বিলাসবিশ্রামের উপভোগের ধারা, যে ধারা তার দেহরক্তের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিয়েছে বিষ। কিন্তু আজ মেজদাদুর উদার কথাবার্তা শুনে, তাঁর অকপট আশীর্বাদের গভীরতায়, সস্নেহ স্পর্শে তার মনে হল, তার দেহমন যেন জুড়িয়ে গেছে। তার মনের জর্জরতা যেন এক মুখর শীতলতার মধুর শান্তির মধ্যে বিলীন হয়ে আসছে। আজ সে প্রথম ভাবলে, মনে মনে স্বীকার করলে—মানুষের জীবনপ্রবাহের ধারাবাহিকতার মধ্যে তার পূর্বপুরুষ উদ্ভূত হয়েছিল জীবনেরই তাগিদে—প্রয়োজনবশে; সুখময় চক্রবর্তীর আবির্ভাব না হলে সে আসত না পৃথিবীতে। তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে গেছেন—যার মধ্যে কল্যাণ ছিল—যে কল্যাণের শক্তিতে আজ কানাই এসে পৌঁছেছে—আজকের উপলব্ধিতে। সে মনে মনে তাঁদের প্রণাম করলে। বললে—ক্রোধী দুর্বাসার ক্রোধটাই তাঁর পরিচয় নয়, অভিশাপটাই তাঁর একমাত্র দান নয়—সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল যে অমৃত, ধন্বন্তরি এবং ওষধি—সেও তাঁর দান। বিজয়দা ঠিক এই মত পোষণ করেন। তিনি কতবার বলেছেন কানাইকে। কানাই এ সত্যটা স্বীকার করে নি, কোনদিন ক্ষমা করতে পারে নি সে তার পূর্বপুরুষকে। আজ সে স্বীকার করলে মনে মনে।

চৌরাস্তার মোড়ে বিখ্যাত একটা মিষ্টির দোকানের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। জন আট-দশ পল্লীবাসীর একটি জনতা ফুটপাথের ওপরে বসে আছে। কাঁধে কাঁথা চট, ভাঙা স্টীলের কয়েকখানা থালা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রাস্তার চলমান যন্ত্রযানগুলির দিকে। মিলিটারী লরী এক সারি যাচ্ছে দক্ষিণ মুখে, দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে আসছে এক সারি। পূর্বদিকেও চলছে মধ্যে মধ্যে। পশ্চিম দিকের বড় রাস্তাটা ধরে তো অহরহই যাচ্ছে আসছে।

এ ছাড়া চলছে বাস ট্রাম। তারা অবাক হয়ে গেছে। কয়েকটা শিশু কাঁদছে—ক্ষিদে, ক্ষিদে!

কানাই বুঝতে পারলে পল্লীগ্রামের নিরন্ন মানুষের দল অন্নের আশায় বোমার আতঙ্ক মাথায় করেও মহানগরীতে এসেছে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে।

মেদিনীপুর, দক্ষিণ-বঙ্গ এসব স্থানের অন্নাভাবের কথা, যারা দেশের সামান্য সংবাদও রাখে—তাদের অবিদিত নেই। সমস্ত বাংলার অবস্থাই ক্রমশ শোচনীয় হয়ে আসছে। জুয়াখেলার আসর বসে গেছে ধানচালের বাজারে। দিন দিন দর চড়িয়ে যাচ্ছে মহাজনেরা দ্বিগুণিত দান-ধরার মত। চাষী আর কতক্ষণ ধরে রাখবে তার ঘরে? যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য করে তোলে মানুষ।

তাজা শাকসব্জী ফলমূল বোঝাই লরী কয়েকখানা চলে গেল সামনে দিয়ে। ওদিকে চোখের সামনে মিষ্টান্নের দোকানে থরে থরে সাজানো মিষ্টান্ন। একটা উপাদেয় মিষ্টির নাম আবার—'আবার খাবো'। কানাই একটু না হেসে পারলে না। এ লোকগুলি যা খেতে পাবে এখানে, তার নাম—'আর খাবো না' দেওয়া হবে ভবিষ্যতে।

সোজা এসে সে উঠল বিজয়দার বাসায়। ট্রামে উঠতেও মন হল না। হেঁটে গোটা পথটা অতিক্রম করে এল।

বাসাতে ষষ্ঠীচরণ একা। ষষ্ঠীচরণ তাকে দেখে বিস্মিত হল, বললে—কানাইবাবু?

সংক্ষেপে কানাই উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

তারপর প্রশ্ন করলে—বিজয়দা, গীতা এঁরা কোথায়?

—গীতাকে কোথা ভর্তি করে দিতে গিয়েছেন। 'নার্সিং' শিখবে না? বাবু ফিরবেন একেবারে আপিস সেরে।

—ও।—কানাই গায়ের জামা খুলতে আরম্ভ করলে।

ষষ্ঠী শঙ্কিত স্বরে বললে—খাবেন নাকি আপনি?

—খাব বইকি।

—ভাত তো নেই।

—ভাত নেই?

ষষ্ঠী অভিযোগ করে বললে—কোথায় গেলেন আপনি নেপীবাবুর সঙ্গে, কি করে জানব যে এরই মধ্যে আপনি ফিরবেন! তা ছাড়া নীলা দিদিমণি খেলেন রাঁধা ভাত। আর কত থাকে?

—নীলা? নীলা এইখানেই খেয়েছে?

—হ্যাঁ গো। ওই দেখুন না স্যুটকেস। খেয়ে আপিসে গেলেন।

নীলা তা হলে ফিরে এসেছে! কানাই জামাটা খুলে স্তব্ধ হয়ে বসল।

একুশ

ষষ্ঠী বললে—তা হলে পয়সাকড়ি দেন, খাবার নিয়ে আসি। হোটেল থেকে ভাত আনব? না লুচি তরকারী আনব?

কানাই বললে—লুচি তরকারী? দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পার না ষষ্ঠী? ভাত খেতে বড় ইচ্ছে করছে।

—উনোনে আঁচ নেই।—নির্বিকার ষষ্ঠীর কণ্ঠস্বরে কোন সঙ্কোচ নেই।

—আঁচ দাও না!

—আঁচ? দোব কিসে? কয়লা দু'টাকা মণ, তাও মিলছে না। যা ছিল সবই পেরায় এ বেলায় ফুরলো। ও-বেলার জন্যে চারড়ি রয়েছে। কাল যদি কয়লা মেলে তো রান্না হবে—নইলে হবে না।

বাজারে কয়লা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। চাল ডালের অবস্থাও তাই। কোথাও কোথাও নাকি জিনিসপত্র খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে শোনা যাচ্ছে। বোমার ভয়ে সব দোকানী পালাচ্ছে, তারাই নাকি যা দর পাচ্ছে তাতেই মাল দিচ্ছে। কিন্তু শোনাই যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না।

কানাইয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কিনছে বোধ হয় অমলবাবুর দল!

অমলবাবুর সংসারে কি দাম আছে?

মনে পড়ল—রায় বাহাদুরের বাড়ির বাইরের দুখানা আউট হাউস—পাবলিক এয়াররেড শেণ্টার।

সুখময় চক্রবর্তীর কালে যাদের প্রয়োজন ছিল বর্তমান কালে তাদের উপযোগিতা গত হয়েছে; They have played out their part—তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাই আজ অমলবাবুরা হয়ে দাঁড়িয়েছে অকালে বর্ষার মত। বর্ষাকালের বর্ষণে ফসলে ভরে ওঠে পৃথিবীর বুক; অকালের বর্ষণ পাকা ফসলে ধরিয়ে দেয় পচন।

ষষ্ঠী বললে—কি আনব? পয়সা দেন। হোটেলের ভাত কিন্তু খেতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং খাবার নিয়ে আসি। নীলাদিদির খাবার আনতে হবে, ফিরে এসে খাবে; একেবারেই বরং নিয়ে আসা হবে।

জামার পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ষষ্ঠীর হাতে দিয়ে কানাই বললে—যা হয় নিয়ে এস। নীলা তাহলে ফিরে এসেছে। সে বিছানাটার ওপর শুয়ে পড়ল। সমস্ত রাত্রি জেগেছে, তার ওপর সকাল থেকে ঘোরাঘুরি কম হয় নি; উত্তেজনার মধ্যে ক্লান্তি এতক্ষণ সে অনুভব করতে পারে নি; এখন অবসাদে তার স্নায়ুমণ্ডলী যেন অসাড় হয়ে আসছে।

ষষ্ঠীচরণ এসে দেখলে—কানাই অগাধ ঘুমে ঢলে পড়েছে, কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজেও সে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার নাক ডাকতে শুরু করল। কড়া নাড়ার শব্দে কানাইয়ের ঘুম ভাঙল, ষষ্ঠীর তখনও নাক ডাকছে। দেওয়াল-আলমারির তাকের উপরের টাইমপিসটার দিকে তাকিয়ে কানাই দেখলে—পাঁচটা বেজে গেছে। ষষ্ঠীকে সে ডাকলে—ষষ্ঠী! ষষ্ঠী!

শুয়েই রক্তচক্ষু মেলে একবার তাকিয়ে ষষ্ঠী আবার ঘুরে শুল।

—ওঠ ষষ্ঠী, দেখ নীচে কে ডাকছে!

—উঠছি।—ষষ্ঠী জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল; কিন্তু উঠল না।

নীচে কড়া ঘন ঘন নড়ছে। কানাই এবার বেশ জোরেই ডাকলে—ষষ্ঠী, ওঠ! পাঁচটা বেজে গেছে। বলে নিজেই সে নীচে নেমে গেল। দরজা খুলেই দেখলে—দাঁড়িয়ে আছে নীলা। আপিস থেকে নীলা ফিরেছে।

নীলা বললে—আপনি?

ভদ্রতাজ্ঞাপক হাসির সঙ্গে কানাই শুধু বললে—হ্যাঁ।

—নেপী ? নেপীও ফিরেছে ?

—না। আমার যাওয়া হয় নি।

নীলা আর কোন কথা না বলে উঠে গেল। কানাই নীচেই দাঁড়িয়ে রইল। নীলা আপিস থেকে ফিরল—সে মুখহাত ধোবে—মুখহাত কেন—ভাল করে স্নানই করবে হয়তো, প্রসাধন করবে, তারপর যাবে হয়তো কোন সিনেমায়। অথবা কোন ভোজনালয়ে, যেখানে তার সেই বিদেশীয় বন্ধু দুটি আসবে। এখন তার উপরে যাওয়া উচিত হবে না। এদিকে তার ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছে। সে বেরিয়ে একটা দোকানে গিয়ে বসল, মাখন রুটি এবং চায়ের বরাত দিল। চায়ের দোকানটা লোকে ভরে রয়েছে। শীতের দিন, বেলা পাঁচটাতেই অপরাহ্ণ গড়িয়ে এসেছে, সূর্যের শেষ রশ্মি মহানগরীর বড় বড় বাড়িগুলোর আলসের মাথায় উঠেছে। সন্ধ্যা আসন্ন। দোকানের মধ্যে আলোচনা চলছে গত রাত্রির বিমান-হানার, আসন্ন রাত্রিতে বিমান-হানার সম্ভাবনার গবেষণাও চলছে। উত্তেজনার মধ্যে আতঙ্কের আভাস ফুটে উঠছে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরের উদ্বেগে, মুখের চেহারায় সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। রাজপথে পথিকদের পদক্ষেপ অস্বাভাবিক দ্রুত। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো—! খাওয়া শেষ করে কানাইও তাড়াতাড়ি উঠল। সন্ধ্যার পর তাকে অফিসে যেতে হবে।

বাসায় এসে সে ঘরে ঢুকল না, বারান্দায় বিজয়দার পুরনো ডেক-চেয়ারটায় বসে ষষ্ঠীকে বললে—ষষ্ঠী, আমার অফিস আছে।

ষষ্ঠী সাড়া দিলে—হুঁ।

নীলা বেরিয়ে এল। কানাই উঠে দাঁড়াল। নীলা বললে—আপনি উঠলেন কেন ?

কানাই উত্তর না দিয়ে একটু হাসল।

নীলা প্রশ্ন করলে—কোথায় গিয়েছিলেন ? চা তৈরী করে খুঁজলাম আপনাকে, পেলাম না।

—একটু বাইরে গিয়েছিলাম—চা খেয়েছি আমি।

—ও !—নীলা ভেতরে চলে গেল।

পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে এল। কানাইয়ের বোধ হল, নীলা কিছু বলতে চায়। বোধ হয় নেপীর কথা। সেই অনুমান করেই সে নিজে থেকেই বললে—ভাববেন না, নেপী ঠিক ফিরবে।

—নেপী ? নীলা একটু হাসলে।—নেপীর জন্য ভাবা নিরর্থক কানাইবাবু ; মাও আর তার জন্য ভাবেন না। হয়তো রাতদুপুরে এসে কড়া নাড়বে, নয় দরজার গোড়াতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকবে। হয়তো তিনদিন পরে ফিরবে।

কানাইও একটু হাসলে।

নীলাই আবার বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবেন না ?

হেসেই কানাই বললে—স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করুন, কিছু মনে করব না।

—গীতাকে আপনি নার্স ট্রেনিং দিচ্ছেন কেন ?

কানাই বললে—কি করব ? বিজয়দা ব্যবস্থা করেছেন, গীতাও তাই চাইলে। আমি আপত্তি করব কেন ?

নীলা অনুযোগ করেই বললে—ওকে আপনার পড়ানো উচিত ছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কানাই বললে—প্রথমে আমারও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বিজয়দার ব্যবস্থাই ঠিক। পড়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে অনেক দিন

লাগবে। তা ছাড়া সেও একটা অনিশ্চিত কথা।

—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে শিক্ষাটা অনেক বড় কথা।

—বড় কথা নিশ্চয়! কানাই হেসে বললে—কিন্তু অবস্থাভেদে অনেক আদর্শকেই আমাদের বলি দিতে হয়। গীতার ক্ষেত্রেও তাই। দীর্ঘদিন পরের ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকা তার উচিত হবে না। নিজের পায়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। নইলে যে লাঞ্ছনা তার একবার—। বলতে গিয়ে কানাই থেমে গেল।

নীলা সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইলে।

কানাই ম্লান হেসে বললে—মেয়েটির ইতিহাস বড় মর্মন্তুদ, বড় করুণ মিস্ সেন।

নীলা নীরব হয়েই রইল, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নের ব্যগ্রতা ফুটে উঠল। কানাই একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আবার বললে—বড় দুঃখী মেয়ে, দুঃখীর ঘরেই জন্ম, কিন্তু তার যে মাশুল ওকে দিতে হয়েছে, সে শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা বস্তি—অবশ্য গরীব ভদ্রলোকের বস্তি, সেখানেই থাকত ওর মা-বাপ। ছেলেবেলা থেকেই দেখছি ওকে। শান্ত-শিষ্ট মেয়ে—কথায়-বার্তায় চলায়-ফেরায় ওকে দেখলেই মনে হত—পৃথিবীর কাছে বেচারার কত অপরাধ! আমার বোনের সঙ্গে এক-বয়সী, ছেলেবেলায় দেখেছি আমার ভাই-বোনেরা ছাদের ওপর খেলা করত, গীতা পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখত। আমিই ডেকে আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর পাড়ার স্কুলে আমার বোনের সঙ্গে একসঙ্গেই পড়ত, পড়ায় মেয়েটি ভাল ছিল না; কিন্তু ওর শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির জন্যে হেড মিস্ট্রেস ওকে ফ্রি করে দিয়েছিলেন। বই কিনতে পারত না, আমার বোনের বই নিয়ে পড়া-শুনা করত। আমার নিজের বোনের মতই ওকে স্নেহ করি। তবুও বিজয়দার কথাই ঠিক। কেন, আমার অনুগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করবে কেন?

বলতে বলতে কানাইয়ের কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠেছিল। নীলাও মনে মনে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল মেয়েটির জন্য। বারান্দার রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে সে ম্লান দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে রইল। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আপনাদের অজ্ঞাতসারে তারা পরস্পরের খানিকটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল; নতুন পথের বন্ধুরতা যেমন পথিকের চলায়-চলায় সহজ সমান হয়ে আসে, তেমনিভাবেই এই আলাপের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্কোচ ও বিরূপতা অনেকটা কেটে গিয়েছিল; নীলাও এবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—মেয়েটিকে ঐ জন্যেই আপনি তার বাপ-মার কাছ থেকে নিশ্চয় নিয়ে আসেন নি। একবার বলেছিলেন যেন লাঞ্ছনার কথা—অবশ্য যে দুঃখকষ্টের কথা বললেন, সেও মানুষের জীবনের লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু নয়; কিন্তু আমাদের দেশে—

বাধা দিয়ে কানাই বললে—মিস্ সেন, অনুগ্রহ করে সে-কথা আপনি শুনতে চাইবেন না।

নীলা বললে—থাক্, সে শুনতে চাই নে আমি। কিন্তু একটা কথা বলব, মনে কিছু করবেন না।

—বলুন।

—মেয়েটিকে আপনি যখন তার মা-বাপের আশ্রয় থেকে এইভাবে নিয়ে এসেছেন, তখন আপনার তাকে বিয়ে করতে দেরি করা উচিত নয়।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে কানাই বললে—না।

—কেন?

এবার তার দিকে মুখ তুলে চেয়ে কানাই বললে—আমাদের বংশের রক্তই রুগ্ন রক্ত, মিস্

সেন। ভবিষ্যতে আমার পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আমাদের বংশে দশ-বারোজন পাগল।

নীলার বিস্ময় এবং বেদনার আর অবধি ছিল না।

কানাই হেসে বললে—আমাদের বংশ কলকাতার এককালের অভিজাতের বংশ। এ রোগ আভিজাত্যের অভিশাপ।

নীলা নীরব হয়ে নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে রইল, কানাইও কিছুক্ষণ নীরবে থেকে হেসে বললে—কাল রাত্রে আপনার বন্ধু দুটি—আমি সেই ইংরেজ সৈনিকদের কথা বলছি—তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয় নি। একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন।

নীলা বললে—আমার সঙ্গেও তাদের পরিচয় অতি সামান্য। তবে আবার যদি দেখা হয়, দেব।

কানাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চাইল—যে পরিমাণ পরিচয়ে বিদেশীয়দের সঙ্গে রঙ্গালয়ে যাওয়া যায়, সে কি পরিমাণে সামান্য? নীলা চেয়ে ছিল সেই নীচের রাস্তার দিকে, সারাদিনের পরিশ্রমের অবসাদে অথবা গীতার করুণ কাহিনীর প্রভাবে সে যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কানাইয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সে দেখতে পেল না।

নীলা তেমনি নীচের দিকে চেয়ে বলল—বড় ভদ্রলোক, সত্যিকারের ভদ্রলোক—টমি বলতে আমরা যা বুঝি ওরা তা নয়। যুদ্ধে যোগ দেবার আগে একজন ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র, আর একজন পড়া শেষ করে ওখানেই চাকরি—

তাদের কথায় বাধা দিয়ে ষষ্ঠীচরণ আবির্ভূত হল—কানাইবাবু, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, আপনি খান নি?

—খাবার?

—হ্যাঁ। খাবার এনে দেখলাম ঘুমুচ্ছেন আপনি। ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম।

নীলা ব্যস্ত হয়ে উঠল—আপনি সারাদিন কিছু খান নি?

হেসে কানাই বললে—সকালে গীতা অবশ্য পেট পুরে খাইয়েছিল, আবার বিকেলবেলাও খেয়ে এসেছি দোকানে।

ষষ্ঠী বললে—এগুলো তাহলে খেয়ে ফেলুন!

—নাঃ। ও আর খাব না।

—তবে? ষষ্ঠীচরণ একটু ভাবিত হয়ে পড়ল।—পয়সার মাল নষ্ট করবেন বাবু? খেয়ে ফেলুন—পেটে গেলেই গুণ দেখবেন।

—না-না। কাউকে বরং দিয়ে দিয়ো।

—দিয়ে দোব!

—হ্যাঁ, দিয়ে দিয়ো।

নীচে কড়া নড়ে উঠল। কানাই ঝুঁকে দেখলে—নেপী দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার করে ডাকা নেপীর অভ্যাস নয়। তার নিজের বাড়িতে চুপি চুপি কড়ার ইঙ্গিতে ডাকে—ওইটাই যেন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কানাই বললে—নেপী! বলেই সে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল।

নেপী ঘরে ঢুকল। তার মূর্তি দেখে কানাই শিউরে উঠল। রুক্ষ, ধূলিধূসরিত চুল, ক্লান্ত অবসন্ন শুষ্ক মুখ, রক্তের দাগে কাপড়-জামা ভরে গেছে। কানাইয়ের চোখের দৃষ্টি দেখে নেপী একটু ম্লান হাসি হাসলে।

কানাই প্রশ্ন করলে—কাপড়ে জামায় এত রক্তের দাগ কেন নেপী?

ম্লান হেসে নেপী বললে—বোমায় উণ্ডেডদের রক্ত কানুদা।

—উণ্ডেডদের রক্ত ?

—হ্যাঁ। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য কানুদা! একটা বস্তির ওপরে বোমা পড়েছে। কতকগুলি নিরীহ হতভাগ্য—উঃ, সে কি দৃশ্য—কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে; কারও বুক কারও পিঠে স্প্লিণ্টার ঢুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে। বস্তির মধ্যে কাটা হাত-পা আঙুল এখনও পড়ে আছে।

কানাই একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। কলকাতার বুকে যুদ্ধের বলি আরম্ভ হয়ে গেছে।

নেপী আবার বললে—একটি জোয়ান লোকের যে যন্ত্রণা দেখলাম, সে আপনাকে কি বলব? অচেতন লোকটি আহত জানোয়ারের মত গোঙাচ্ছে। আর তার স্ত্রী—মেয়েটি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে—বসে আছে বোবার মত, চোখেও তার একফোঁটা জল পড়ে না। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে।

—কজন মরেছে নেপী ?

প্রশ্ন শুনে নেপী এবং কানাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে—নীলা কখন সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

নেপী বললে—মরেছে বেশী নয়; ঠিক ডিরেক্ট হিট হয় নি; স্প্লিণ্টারে উণ্ডেড হয়েছে কয়েকজন। জন বিশেকের আঘাত বেশী রকমের।

নীলা বললে—স্নান করে ফেল নেপী।

নেপী যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল, বললে—কাল কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে কানুদা।

কানু কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছিল—যে নিঃস্ব রিক্ত অসহায় মানুষগুলি মরল তাদের কথা। মরে হয়তো তারা খালাসই পেয়েছে। যদি কোন রকমে বেঁচেই যেত তবু কি তাদের উদ্ধার ছিল? আকস্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরিবর্তে সম্মুখে এগিয়ে আসছে অনাহারে তিলে-তিলে মৃত্যু। দুর্ভিক্ষ আসছে—নিষ্পলকদৃষ্টি মন্থরগতি অজগরের মত। সাইক্লোন—রপ্তানী—মজুতদার! তার মনে পড়ে গেল রাধিকাপুরে অমলবাবুদের গুদামে মজুত চালের কথা। চোখের ওপর ভেসে উঠল—রাস্তার ফুটপাথে কঙ্কালসার চাষী ছেলেটার পরিবারের কথা;—মরদার বস্তা বোঝাই লরীর তলার রক্তাক্ত ছবি। বিজয়দা বলেন—যুদ্ধ নয়—বিংশ শতাব্দীর মহা মন্বন্তর; এর পরই নাকি আসবে নব বিধান! কানাইয়ের হাসি পায়। আটলাণ্টিক চার্টার! আটলাণ্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর অনেক দূর!

নেপী বললে—ব্লাড ব্যাঙ্কে যেতে হবে। আমি রক্ত দেব কানুদা। আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে। সে বোকার মত একটু হাসল।

নীলার মুখও দীপ্ত হয়ে উঠল, সে বললে—আমিও যাব নেপী। আমিও দেব রক্ত।

নেপী ম্লানমুখে এবার বললে—ব্লাড সিরাম পেলে এই জোয়ান লোকটি হয়তো বাঁচত! উঃ, তার স্ত্রীর দুঃখ দেখে আমার যে কি কষ্ট হল কি বলব।

নেপী নীলা উপরে উঠে গেল। কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভাবছিল—তবু বাঁচতে হবে; মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও মানুষ মহৎ। আজ তার দাদুকে দেখে সে-বিষয়ে সে নিঃসংশয় হয়েছে। ওই মানুষের ভেতর আজ অকস্মাৎ যার দেখা সে পেয়েছে—সেই মানুষ আছে সকল মানুষের মধ্যে। সেই মানুষকে বাঁচাতে হবে।

আজই সে সেই আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে তার দাদুর কাছে। সেও রক্ত দেবে। কিন্তু তার দেহে সুখময় চক্রবর্তীর রক্তধারা প্রবাহিত। অসুস্থ রক্ত। রোগের বিষে জর্জরিত রক্তকণিকা। রক্ত দিয়েও আজ মানুষের সেবা করবার তার অধিকার নেই। আজ এই প্রয়োজনের সময় ব্লাড ব্যাঙ্ক হয়তো রক্তের সুস্থতা অসুস্থতা বিচার করবে না। কিন্তু সে দেবে কি বলে? তা ছাড়া এ পরীক্ষায় তার নিজের প্রয়োজন আছে। সে সুস্থ মানুষ হবে। অকলঙ্কিত রক্তধারার মানুষ, যে মানুষ পৃথিবীতে আনবে ভবিষ্যতের মানুষ। নীলার দিকে একবার চেয়ে দেখলে সে; আপনা থেকেই যেন তার চোখ ফিরল তার দিকে। নীলা বিস্মিত হল, বললে—কি কানাইবাবু?

কানাই একটু চমকে উঠল; পরক্ষণেই সে বেরিয়ে পড়ল। এখন সবে সাড়ে ছটা। এখনও ক্লিনিক বন্ধ হয় নি। সে তার রক্ত পরীক্ষা করাবে। তার রক্তে রোগের বিষের পরিমাণ নির্ণয় করিয়ে সে ইন্‌জেকশন নিয়ে তার রক্তকে সুস্থ করে তুলবে। সে হবে নতুন মানুষ। প্রথমে সে তার রক্ত দেবে আহত মানুষের সেবায়। দীন, অসহায় মানুষ যারা আহত হবে, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পুরুষানুক্রমে সঞ্চয় করেছে যে রক্তের প্রাচুর্য—তাদের জন্য তারই কতকটা অংশ সে চিহ্নিত করে দেবে।

বাইশ

একুশে ডিসেম্বর। প্রায় শেষরাত্রি।

নেপী উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকলে—দিদি! দিদি!

তার আগেই নীলার ঘুমন্ত মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়ুর স্পন্দন জেগেছে সাইরেনের শব্দে। সাইরেন বাজছে। নীলা উঠে বসল। সাইরেন বাজছে, উঁচু পর্দায় উঠে নীচু পর্দায় নামছে, আবার উঁচু পর্দায় উঠছে। মহানগরীর আত্মা তার মাথার উপর মরণলোকের শিকারী বাজপাখীর শব্দে মরণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিলম্বিত ছন্দে কাতর কান্না কাঁদছে, মধ্যে মধ্যে শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে আসছে। নীলার চোখে তখনও ঘুম-বিহ্বল দৃষ্টি।

নেপীর চোখ উত্তেজনায় জ্বল-জ্বল করছে। সে বললে—ওঠ, সাইরেন বাজছে—সাইরেন।

নীলার চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে সহজ হয়ে এসেছে। সে একটু হাসলে।

ঘরের বাইরের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন বিজয়দা, তাঁর পিছনে ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর ঘাড়ে কম্বল—বগলে বিছানা, বিজয়দার এক হাতে ফার্স্ট-এডের বাক্স, অন্য হাতে কাগজ কলম। বোধ হয় এখনও বসে তিনি কিছু লিখছিলেন। বিজয়দা বললেন—নেমে এস।

নীলা উঠল এবার। হেসে বললে—কোথায় যাবেন?

—কোথায় আর, সিঁড়ির নীচে। মাথার ওপর তবু একটা ছাদ বেশী হবে।

নীলা বেরিয়ে এসে বললে—তা হলে ছাতাটিসুদ্ধ নিন। ওটা খুলে বসলে—মাথার ওপর আরও একটা আচ্ছাদন বেশী হবে।

বিজয়দা হেসে বললেন—ভাল বলেছ। ষষ্ঠীচরণ, কাল বড় টেবিলটা, যেটা জায়গার অভাবে ছাদে পড়ে আছে, ওটা সিঁড়ির তলায় পাতবে। দিব্যি আর একটা তলা বানানো যাবে।

সাইরেন থেমেছে।

হঠাৎ শব্দ উঠল—দুম্‌-দুম্‌-দুম্‌। দূরাগত বিস্ফোরণের শব্দ।

সিঁড়ির তলায় বেশ আমিরী চালে বিজয়দা আসর করে বসলেন। নেপী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ষষ্ঠী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসেছে। স্তব্ধ আসরে নীলাও স্তব্ধ হয়ে রইল। কান পেতে রয়েছে প্লেনের আওয়াজের জন্য; বিস্ফোরণের শব্দের জন্য।

বাড়িটার ওপাশের অংশের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কে বলছে—কাঁপছিস কেন, এই মণি, কাঁপছিস কেন? বস, বস।

ভারী অথচ মৃদু গলায় কোন পুরুষ বললেন—বোধ করি, তিনি সংসারের অভিভাবক, কণ্ঠস্বরে তাঁর আদেশ এবং উপদেশের সুর—দুর্গা নাম জপ কর, দুর্গা নামে দুঃখ হরে, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। বল, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! জপ কর।

বিজয়দা বললেন—ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার থাকলে বড্ড ভাল হত।

নীলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে—রাত্রি কত? কটা বেজেছে বলুন তো?

—সাইরেন বেজেছে তিনটে পঁচিশে। ক্ষিদের দোষ নেই। তোমারও বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

হেসে নীলা বললে—কেন বলুন তো?

—নইলে কটা বেজেছে এ খবর জানতে চাচ্ছ কেন? ক্ষিদে পাওয়ার ন্যায়-অন্যায় বিচার করছ তো!

নীলা এবার সশব্দেই হেসে উঠল।

কার ইতিমধ্যে নাক ডাকছে। আর কার, বিজয়দা টর্চটা জ্বেলে ষষ্ঠীর মুখের উপর ফেললেন। ষষ্ঠীরই নাক ডাকছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে বেশ ঘুমুচ্ছে।

বিজয়দা হেসে টর্চের আলো বন্ধ করে বললেন—কর্তৃপক্ষ বলেছেন এ সময় গ্রামোফোন বাজাতে। গ্রামোফোন যখন নেই—তখন তুমিই একখানা গান শুনিয়ে দাও না নীলা!

নীলা হাসলে—গান?

—কিংবা ভূতের গল্প। কানাইটা আপিসে, সে ভূতের গল্প বলে ভাল।

ওপাশের বাড়িতে অকস্মাৎ সশঙ্কিত গুঞ্জনধ্বনি উঠল।—মণি, মণি!

—এ কি?

—কি?

—মণি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—আলো! আলোটা জ্বালো।

—টর্চ—টর্চ! সুইচের আলো জ্বেলো না।

—মণি! মণি!

—জল! জলের ঘটিটা কই?

—আনা হয় নি তো? জানি, আমি জানি এইরকম একটা কিছু হবে। ইডিয়ট রাস্কেলের দল সব। সব চেয়ে ইডিয়ট হচ্ছে ওই মাগীটা।

বোধ হয় ওই 'মাগী' বলে সম্বোধিতা মহিলাটিই মৃদু করুণ স্বরে ডাকছেন—মণি মণি!

—এই জল এনেছি।

—মা, সর, সর, দেখি। জলের ছিটে দি মুখে।

বিজয়দা টর্চ জ্বেলে স্মেলিং-সল্টের শিশিটা বের করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—নীলা, তুমিও এস।

ঠিক এই মুহূর্তেই বেজে উঠল 'অল-ক্লিয়ার' সাইরেন-সঙ্কেত। একটানা দীর্ঘ শব্দ। শহরটা যেন পরম আশ্বাসে বলছে—আঃ!

ওপাশের কথা শোনা গেল—ভয় নেই, ওই দেখ, মণি চোখ মেলেছে। ভয় নেই মণি, অল-ক্লিয়ার বেজে গেল। ভয় নেই। মণি!

বিজয়দা এবার হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সুরেশবাবু! সুরেশবাবু!

ওপাশ থেকে সাড়া এল—আজ্ঞে?

—কি হল মণির? সাহায্যের কোন প্রয়োজন আছে?

—না না না। ছেলেমানুষ—ভয় পেয়েছিল, আর কিছু না, ভয় পেয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে গেছে।

নীলা প্রশ্ন করলে—ছোট ছেলে বুঝি?

বিজয়দা বললেন—তুমি তো আজ এসেছ, কয়েকদিন থাকলে মণীন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় পাবে। পাঁচ বছরের বাঙালী বীর। যত দুরন্ত—তত ভীতু। বাইরে থেকে এসে—মধ্যে মধ্যে আমাকে বা ষষ্ঠীকে ডাকে—সিঁড়িতে দাঁড়াতে হয়। বিজয়দা হাসতে লাগলেন।

নীলার মনে পড়ে গেল—তার বড় ভাইপোটির কথা। তার বয়স ছ'বৎসর। সে দুরন্ত নয়, শান্ত এবং ভীতু। তার বড়দাদা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ, বউদিদিটি রুগ্ন দুর্বল, ছেলেটিও তাই। শরীরেও দুর্বল, প্রকৃতিতেও অত্যন্ত ভীতু। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে। মনে পড়ল তার বাবার সেই নিষ্ঠুর তিরস্কারের মর্মান্তিক আঘাতের স্মৃতি। তার শিক্ষা, তার স্বভাব, তার প্রকৃতিকে জেনেও তিনি তাকে অন্যায়ভাবে অবিশ্বাস করে অতি নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছেন; কন্যা হিসাবে পৃথিবীর সর্বোত্তম ন্যায়ধর্মসম্মত যে মর্যাদা তার আছে পিতার কাছে, পিতৃত্বের দাম্ভিকতায়, দুর্বল চিত্তের আশঙ্কায় তিনি তার সে মর্যাদাকে পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই তীব্র অন্তর্বেদনায় ক্ষুব্ধ অভিমানে এ সময় পর্যন্ত একেবারের জন্যও সে বাড়ির কথা মনে করতে চায় নি। কিন্তু এই মুহূর্তে পাশের বাড়ির ওই ছেলেটির কথা শুনে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল—মায়ায় মমতায় গভীরভাবে অভিষিক্ত আশঙ্কা। হয়তো এদের এই ছেলেটির মত—।

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে বিজয়দা বললেন—হঠাৎ থমকে দাঁড়ালে কেন নীলা? এই তো চারটে বাজে। যাও শুয়ে পড়, এখনও রাত্রি আছে।

বিছানায় শুয়েও তার ঘুম এল না। বার বার মনে হচ্ছে বাড়ির কথা। ভাইপোটির কথা, বাবার কথা, মায়ের কথা, শান্ত নিরীহ দাদাটির কথা, রুগ্ন বউদিদিটির কথা—নানাভাবে মনে পড়ছে। আকস্মিক উত্তেজনার আশঙ্কায় কে কখন কেমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেই সব কথা মনে করে সে উত্তরোত্তর চঞ্চল অধীর হয়ে উঠতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ জলে ভরে এল; চোখের জল মুছে সে মৃদুস্বরে ডাকলে—নেপী!

নেপীর কোন উত্তর এল না। নেপী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বিজয়দাও ঘুমিয়েছেন নিশ্চয়। নইলে নেপীর পরিবর্তে তিনিই সাড়া দিতেন। ষষ্ঠীর নাক-ডাকার শব্দ আসছে। পাশের বাড়িতেও কারও কোন সাড়াশব্দ উঠছে না। আবার সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাল সকালেই সে বাড়িতে একবার যাবে। নেপীকেও ধরে নিয়ে যাবে।

২২শে ডিসেম্বর সকালবেলায় সে যখন উঠল—তখন সাড়ে আটটা বাজে। অল-ক্লিয়ারের

পর অনেকক্ষণ তার ঘুম আসে নি—তারপর একেবারে ভোরের মুখেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেক চিন্তার পর ঐ সময়টায় মন তার আশ্বাসের শান্তি পেয়েছিল। সে ভাবছিল বাড়ির কথা। মনের অনেক ক্ষোভের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে তার মনে হয়েছিল বাড়িতে ফিরে গেলেই এই অশান্তিপূর্ণ বিচ্ছেদের অবসান হবে। এই প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশায় তার মন শান্ত হতেই ধীরে ধীরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে দেরি হয়ে গেছে। বিজয়দা বারান্দায় চায়ের আসর জমিয়ে বসেছেন, কানাইবাবু পর্যন্ত নাইট ডিউটি সেরে অফিস থেকে ফিরেছেন। বিজয়দা তাকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছেন। এই কাগজগুলোই কাল রাত্রে সাইরেনের সময়েও তাঁর হাতে ছিল। বোধ হয় বিজয়দা ওটা সারারাত্রি ধরেই লিখেছেন। ও-ঘরে ষষ্ঠীর খন্তা নাড়ার শব্দ উঠছে, রান্না পর্যন্ত চেপে গেছে। সে স্বভাবতই লজ্জিত হল। পাঠ্যজীবন থেকে তার চাকরি-জীবনের বিগত পরশু পর্যন্তও সে ভোরে উঠে মায়ের গৃহকর্মে সাহায্য করেছে। চাকরি থেকে ফিরেও অনেক কাজ করেছে। সেলাই-ফোঁড় বা ঝাড়া-মোছা, কি ঘরসাজানো ইত্যাদির মত শৌখীন কাজ নয়, রীতিমত রান্নাশালার কাজ করেছে। দেরি করে উঠলে আজও তার লজ্জা হয়। তাড়াতাড়ি সে মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল। ফিরে আসতেই বিজয়দা তাকে সম্ভাষণ করে বললেন—সুপ্রভাত! এস, মজলিসে বস। একটা প্রবন্ধ লিখেছি কাল রাত্রে, কানাইকে পড়ে শোনাচ্ছি। তুমি এখন শেষটাই শোন। পরে গোড়াটা পড়ে নেবে।

নীলা বললে—পড়ুন।

রাজনীতির প্রবন্ধ। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেবের 'সাম্রাজ্য বিসর্জন দেবার জন্য আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি নাই'—এই উক্তির সমালোচনা করেছেন বিজয়দা।

পড়া শেষ হলে নীলা প্রশ্ন করলে—নেপী কই ?

—নেপী ?—বিজয়দা হাসলেন—ভোরবেলাতেই সে বেরিয়ে গেছে।

—বেরিয়ে গেছে ?—নীলা ক্ষুণ্ণ হল।

—ফিরবে শীগ্‌গির। জনসেবা-সমিতির অফিসে গেছে, কোথায় কি হচ্ছে খবর জানবার জন্যে। শীগ্‌গির ফিরবে। আমায় বলে গেছে, কানাইকে আটকে রাখতে। কানাইকে নিয়ে যাবে Blood Bank-এ, রক্তদান করবে। তুমিও নাকি যাবে এবং রক্তদান করবে শুনলাম ?

নীলা শুষ্ক মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

বিজয়দা বললেন—বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? চা খাও। কানাই, দে তো টি-পটটা এগিয়ে ?

কানাই আপন মনে কিছু ভাবছিল। বিজয়দার কথায় সচেতন হয়ে সে বললে—এই যে, আমি ঢেলে দিচ্ছি।

নীলা বললে—না-না, আমি তৈরী করে নিচ্ছি।

বিজয়দা হেসে প্রশ্ন করলেন—কানাইচন্দ্র, তুমি রক্তদান করছ না ?

কানাই বিজয়দার মুখের দিকে তাকাল।

নীলার মনে হল বিজয়দার প্রশ্নের মধ্যে ব্যঙ্গের শ্লেষ রয়েছে। চা ঢেলে শেষ করে কাপটি তুলে নিয়ে সে বললে—আপনি কি এটা অন্যায় কিংবা হাস্যকর মনে করেন বিজয়দা ?

—না। আমি নিজেই যে আগে দিয়েছি। তবে কি জান—Blood Bank-এর কথায়

আমার মনে পড়ে, আমরা একটা Bank করেছিলাম এককালে, সেই Bank-এর কথা। যারা টাকা দিয়েছিল, তাদের পঞ্চাশ টাকার বেশী কারুর আয় ছিল না। ফলে Bank-টা গজাতে গজাতে ক্যাপিটালিস্টরা ফেল পড়ে গেল। অর্ধাশনের দেশের মানুষ; চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ—হলদে, রক্তহীন। Blood Bank-এর কথা ভেবে যখন donor খুঁজি, তখন ওই পঞ্চাশ টাকা আয়ের Capitalist-দের কথাই মনে পড়ে আমার।—বিজয়দা হাসতে লাগলেন। আবার অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে বললেন—তবু বাঁচতেও হবে, বাঁচাতেও হবে মানুষকে। নেপীকে যখন দেখি—তখন মনে হয় আবার একবার রক্ত দিয়ে আসি Bank-এ এবং চিহ্নিত করে দিয়ে আসি যে, নেপী যদি কখনও কোন রকমে আহত হয়—তবে আমার এ রক্তদান তার জন্যে করা রইল।

কানাই উঠে পড়ল; বললে—শরীরটা ভাল নয় বিজয়দা, আমি উঠলাম, স্নান করে শুয়ে পড়ব। তার মন গত রাত্রি থেকেই উদ্‌গ্রীব এবং চঞ্চল হয়ে রয়েছে; সে গত সন্ধ্যাতেই তার সেই পিতৃবন্ধু ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল—তাঁর পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য রক্ত দিয়ে এসেছে। তারই ফলাফল জানবার জন্যই তার এ উদ্‌গ্রীব অধীরতা। কল্পনা করতে গিয়ে সে কল্পনা করতে পারে না। তার রক্তের মধ্যে হয়তো রক্তকণিকার পরিমাণের চেয়েও বিষশক্তির পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে। তারই মধ্যেই তো এ বিষের ক্রিয়া প্রবলতমভাবে বর্তমান—সুখময় চক্রবর্তীর বড় ছেলের বড় ছেলের বড় ছেলে সে। তিন পুরুষের সম্ভোগ-লালসার ফলে অর্জন করা ব্যাধির বিষশক্তি তার মধ্যেই যে প্রবল তেজে বয়ে যাচ্ছে।

একে একে বেরিয়ে গেল নীলা, বিজয়দা। নেপী এখনও ফেরে নি। শুয়েও কানাইয়ের ঘুম আসছিল না। তন্দ্রার মধ্যে রক্তপরীক্ষার ফলাফলের উৎকণ্ঠিত কল্পনা বার বার তার ঘুম ভেঙে দিচ্ছিল। একবার দেখলে, ম্লান মুখে ডাক্তার তার হাতে তুলে দিচ্ছেন Blood-report; বলছেন—টেন বাই টেন। কানাই শিউরে জেগে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবার দেখলে নীলা তার Blood-report-টা পড়ছে। কানাই চীৎকার করে উঠল—না—না—না! অর্থাৎ পড়বেন না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল।

আবারও যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। এমন সময় ডাকলে ষষ্ঠী—দাদাবাবু!

—কি?

—একজন লোক এসেছে একটা চিঠি নিয়ে। বাবুকে কিংবা আপনাকে খুঁজছে।

লোকটা একজন হিন্দুস্থানী। গুণদা-দাদার বাড়ির সামনে থাকে; সে চিঠি নিয়ে এসেছে। গুণদা-দাদা লিখেছেন—"বাড়ি সার্চ হচ্ছে। বোধ হয় পুলিস এ্যারেস্ট করবে—ইণ্ডিয়া ডিফেন্স। খবরটা জানালাম।"

কানাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

গুণদাবাবুর বাড়ির দোরে সে যখন পৌঁছল—তখন গুণদা-দা পুলিসের গাড়িতে উঠেছেন। একা গুণদা-দা নয়—গাড়িতে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে দেখতে পেলে কানাই। গুণদা-দা তার দিকে চেয়ে একবার হাসলেন—তারপর উঠে পড়লেন গাড়িতে।

কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গুণদা-দা এককালের প্রচণ্ড শক্তিমান্ বিপ্লবী কর্মী। কিন্তু ইদানীং বিশেষ করে আগস্ট মুভমেণ্টের পর বেদনাহত অন্তরে স্তব্ধ হয়ে দ্রষ্টার মত বসেছিলেন। কিন্তু তবুও পুলিস তাঁর

গত ইতিহাসের কথা এবং তাঁর মতবাদের কথা স্মরণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার না করে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। ওই গাড়ির মধ্যে আরও যাদের কানাই দেখেছে—তারাও ওই গুণদা-দাদার শ্রেণীর মানুষ। বাংলার মাটির শ্রেষ্ঠ ফুল।

উপরে জানালায় তার দৃষ্টি পড়ল। দেখলে গুণদা-দাদার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মত।—মাথার অবগুণ্ঠন খসে গেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই,—চোখের দৃষ্টি স্থির নিষ্পলক—কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু বেদনা বা হতাশা নেই; নিষ্ঠুর কঠোর দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রয়েছেন।

হিন্দুস্থানীটি গুণদা-দাদার দ্বারা উপকৃত; দাদার বাড়ির সামনেই পানের দোকান করে। সে-ই কানাইকে নিয়ে গেল ভিতরে।

বউদি ফিরে দাঁড়ালেন—মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বললেন—আপনি কানাইবাবু? আপনার কথা উনি বলেছেন আমার কাছে।

কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

বউদি বললেন—এই চিঠিখানা তিনি দিয়ে গেছেন—অফিসে দেবার জন্যে। আপনার বা বিজয়ঠাকুরপোর হাত দিয়ে পাঠাতে বলেছেন।

কানাই চিঠিখানা নিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বিজয়দাকে নিয়ে ওবেলায় কি কাল সকালে আসব।

বউদি বললেন—চিঠিখানা অফিসে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার।

এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পর কানাই আর দাঁড়ালে না। সে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। নীচে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলে—বউদি ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক সেই ভ্রূক্ষেপহীন নিষ্ঠুর দৃষ্টি আবার তাঁর চোখে ফিরে এসেছে।

কানাইয়ের মনের মধ্যে চকিতের মত ভেসে গেল—গুণদা-দাদা যে গাড়িতে উঠলেন—সেই গাড়ির ভিতরের আরও কয়েকজনের মুখ। তাঁদের বাড়ির খোলা জানালাতেও এই বউদিদির মতই চেয়ে রয়েছে—তাঁদের মা—বোন—স্ত্রী। তাঁদের চোখেও এমনিই দৃষ্টি—নিষ্ঠুর নিষ্করুণ। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

অফিসে খবর এবং চিঠিখানা দিয়ে সে তখনই ফিরল। তার মন অত্যন্ত চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছে। ট্রামখানা পথে এক জায়গায় দাঁড়াতেই হঠাৎ সে নেমে পড়ল।

সামনেই তার পিতৃবন্ধু ডাক্তারের ক্লিনিক।

ব্লাড-একজামিনেশন রিপোর্ট। আজই রিপোর্ট পাবার কথা।

সন্ধ্যার দিকে নীলা অফিস থেকে ফিরছিল।

আজ নাকি প্যাম্ফলেট পড়েছে। সিঙ্গাপুরে ডুবিয়ে দেওয়া যুদ্ধ-জাহাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ছবি নাকি তাতে আঁকা আছে। অনেকে বলেছে—জাপানের সম্রাট এবং তোজোর ছবি আছে; কেউ বলছে—ম্রিয়মাণ চার্চিল সাহেবের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা আছে। দেখে নি কেউ, তবে সকলেই যার যার কাছে শুনেছে—তারা স্বচক্ষে দেখেছে। যে ছবিই থাক্—কথা এক,—'keep away from Calcutta'—'কলকাতা থেকে সরে যাও।'

জোর গুজব—বড়দিনের রাত্রি থেকে নিউইয়ার্স-ডে পর্যন্ত কলকাতা তারা সমভূমি করে দেবে। মানুষের মনে গোপনে গোপনে আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছে। আতঙ্কিত মানুষ প্রতি কথায় বিশ্বাস করে পালাবার যুক্তিকে প্রবল করে নিচ্ছে।

হাওড়ায় শিয়ালদহে বিপুল জনতার সৃষ্টি হয়েছে। স্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্মে তিল ধারণের স্থান

নেই। ছেলে-মেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে চাপ বেঁধে বসে আছে পতঙ্গের মত। কোলাপ্‌সিবল গেটে রেল-কর্মচারীর বদলে ইউরোপীয় সৈনিক মোতায়েন হয়েছে। কুলিদের দর পয়সায় আনায় কুলুচ্ছে না, পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। ধনীদের রাশীকৃত মাল ঢুকে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ থেকে কুলি-কামিনের এক দশা। পড়ে আছে। ট্রেনের পর ট্রেন চলে যাচ্ছে। কতক ঢুকছে মরীয়ার মত; বাকী সব পড়ে থাকছে। চীৎকার করছে। মুহূর্তে মুহূর্তে আসছে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা, আকণ্ঠ যাত্রীবোঝাই মোটর-বাস। হাওড়া ব্রীজ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। দেশোয়ালীরা দেশে পালাচ্ছে; মাড়োয়ারীরা চলেছে মাড়োয়ার; ধনীরা চলেছে মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা, বেনারস; কেরানীরা পালাচ্ছে নবদ্বীপ, কাটোয়া, বর্ধমান, বোলপুর, নলহাটি। নিজের বাড়িতে, ভাড়াটে বাসার সাজানো সংসার, আসবাবপত্র—মানুষের যথাসর্বস্ব পড়ে রইল—মানুষ পালাচ্ছে প্রাণের ভয়ে। বনে আগুন লাগে, জানোয়ার পালায়—পাখি পালায়—পতঙ্গ পালায়; মানুষ আজ পালাচ্ছে সেই রকম ভাবে; জীবনের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে মানুষ। যারা এখনও পালায় নি—তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অধীর হয়ে অন্তরের ভয়কে বাড়িয়ে তুলেছে, যে ভয়ে তারাও সর্বমানবীয় সংস্কৃতিকে লঙ্ঘন করে জ্ঞানশূন্যের মত ছুটতে পারবে, কোন সঙ্কোচ বোধ করবে না। অফিস বন্ধ হয়েছে ঠিক চারটেয়। নিম্নভূমি-অভিমুখী জলস্রোতের মত মানুষ দ্রুত-গতিতে বাড়ি ফিরছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে, আকাশে এখন অপরাহ্ণের আলো ম্লান হয়ে আসছে, পূর্বদিকের আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

ট্রাম থেকে নেমে নীলার মনে পড়ল—আজ সে ফেরবার পথে বাড়ির খবর জেনে আসবে মনে করেছিল। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে।

বিজয়দার বাসায় ষষ্ঠী ছাড়া কেউ ছিল না। বিজয়দা অফিসে গেছেন। কানাইবাবুও বেরিয়েছেন খাওয়ার পর—এখনও ফেরেন নি। কিন্তু বিজয়দার কাছ থেকে একজন অফিসের পিওন একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। কানাইবাবুর নামে একখানা খোলা চিঠি। কানাইবাবু নেই। ষষ্ঠী চিঠিখানা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। তার বাবু কানাইবাবুকে অবিলম্বে চান—অথচ কানাইবাবু নেই—এখন সে করে কি? নীলাকে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—দেখুন তো দিদিমণি কি লিখছেন বাবু?

একবার দ্বিধা হল তার, কিন্তু খোলা চিঠি দেখে দ্বিধা পরিত্যাগ করে সে চিঠিখানা পড়লে। বিজয়দা কানাইবাবুকে অবিলম্বে অফিসে যেতে লিখেছেন। আজ সকালেই রাত্রিকালের সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান সম্পাদক গুণদাবাবু ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাত্রির সম্পাদকীয় বিভাগের ব্যবস্থার প্রয়োজনে কানাইকে ডেকেছেন। গুণদাবাবু গ্রেপ্তারের সময়ে কর্তব্যবোধে কাগজের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে গেছেন—তাঁর প্রত্যেক সহকর্মীর কর্মক্ষমতার কথা; তাতে তিনি কানাইয়ের অনুবাদশক্তির এবং কর্তব্যনিষ্ঠার বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন। কর্তৃপক্ষ পনেরো দিনের জন্য কানাইয়ের হাতে ভার দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। ফল সন্তোষ-জনক হলে কানাইকে ওই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হবে।

নীলা একটা স্লিপে লিখে দিলে কানাইবাবুর অনুপস্থিতির কথা এবং তিনি ফিরলেই চিঠি দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেবে—একথাও লিখে দিল।

ষষ্ঠী বললে—অনেক দেরি হয়েছে ফিরতে। চা-খাবার তাহলে তো খেয়ে এসেছ দিদিমণি?

ঠিক সেই সময়েই এসে উপস্থিত হল নেপী। মুখে-চোখে ক্লান্তির ছাপ—মাথার চুল উড়ছে—দেখলেই বোঝা যায় সমস্তদিন স্নান হয় নি। খাওয়াও বোধ হয় হয় নি।

নীলা নেপীর দিকে তাকিয়ে বললে—না। আমাদের দুজনেরই চা-জলখাবার খাওয়া হয় নি।

—এই মুসকিল হল। উনানে যে ভাত ফুটছে গো।

—তবে কিনে আন দোকান থেকে।

সে একটি সিকি বের করে দিলে। দু'আনার চা, দু'আনার খাবার।

কাপড় বদলাবার ও মুখ-হাত ধোবার জন্য সে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল। নেপী তখনও হাত-মুখ ধোয় নি। কানাইয়ের চিঠিখানা নাড়াচাড়া করছিল।

নীলা বললে—তুই বসে রয়েছিস নেপী? হাত-মুখ ধুস নি?

নেপী বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—গুণদা-দাকে arrest করে নিয়ে গেল?

নীলা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলে না। সে চুপ করে রইল।

নেপী বললে—গুণদা-দা কিন্তু কোন politics-এই ছিলেন না আজকাল।

নীলা এবার বললে—তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয় ভাই। ষষ্ঠী চা কিনে আনছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর গরম করা যাবে না। উনুনে ভাত ফুটছে। দাঁড়া, ভাতে জল লাগবে কিনা দেখি।

জলের প্রয়োজন ছিল। জল ঢেলে দিয়ে হাঁড়ির গায়ের ফেনের ধারাগুলি মুছে দিলে। তার চোখে পড়ল রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্নতা। অথচ কাল সকালে সে যখন খেতে বসেছিল এই ঘরে—তখন লক্ষ্য করেছিল রান্নাঘরটি পরিচ্ছন্নতায় তকতক করছে। গীতা তাকে পরিবেষণ করেছিল। গীতা ছিল। সে পরিচ্ছন্নতা গীতার হাতের পরিমার্জনার ফল। গীতা গেছে কাল—আর আজ ষষ্ঠী অপরিচ্ছন্নতায় চারিদিক একেবারে ভরিয়ে তুলেছে। সে ঠিক করলে চা খেয়ে রান্নাঘরটি পরিষ্কার করে ফেলবে। সিঁড়িতে ষষ্ঠীর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাত ধুয়ে সে এ ঘরে এসে বসল।

ষষ্ঠী চা ঢেলে খাবার দিলে। নীলা বললে—রান্নাঘরটা কি নোংরা করে রেখেছ ষষ্ঠী! অথচ গীতা মাত্র কাল গেছে। সে কেমন পরিষ্কার রেখেছিল বল তো?

ষষ্ঠী বললে—গীতা-দিদি এসেছিল দিদিমণি। তারপর হেসে বললে—আহা, ছেলেমানুষ—মন টিকছে না আর কি—

—কানাইবাবু বুঝি তার সঙ্গেই গেছেন?

—ওই! কানাইবাবু যে খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছে গো! বিকেলে তাকে পাবে কোথা? বাবুও ছিল না। গীতা-দিদি ফিরে গেল। আর একটি মেয়ে, সেও নার্স বটে,—তাকেই সঙ্গে করে এসেছিল।

নেপী এসে বসল।

নীলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে—সেই সায়েব দুজনের সঙ্গে তোর আর দেখা হয় নেপী?

—না। তবে বিকেলে এস্‌প্ল্যানেডের ওখানে গেলে দেখা হবে বোধ হয়। সেদিন তো তুমি তাড়াতাড়ি চলে এলে—ওদেরও ঠিকানা নেওয়া হল না, আমাদের ঠিকানাও দেওয়া হল না।

নীলা একটু চুপ করে থেকে কানাইয়ের চিঠিখানা তুলে নিলে। আবার একবার বললে —কানাইবাবু একটা lift পেয়ে যাবেন।

নেপী বললে—কানাইদা কেন যে এমন মনমরা হয়ে থাকে কে জানে? অথচ এমন powerful লোক—কেমন বলে বল তো?

নীলা হাসলে। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও নীলা কানাইয়ের সহপাঠিনী। কত হাসি-রসিকতা তাকে নিয়ে তাদের সহপাঠিনীদের মধ্যে হয়েছে—নেপী জানে না। গীতাকে নিয়ে কানাইয়ের পরিণতি কেউ কল্পনাও করে নি। এইবার কানাইয়ের মাইনে বাড়বে—; হঠাৎ মধ্যপথে চিন্তায় তার ছেদ পড়ে গেল, গতকালকার কানাইয়ের একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। সে নেপীকে প্রশ্ন করলে—হ্যাঁরে, কানাইবাবুদের বাড়িতে গিয়েছিস তুই?

—উঃ, প্রকাণ্ড বাড়ি। কিন্তু এখন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এককালে কানাইদার ঠাকুরদাদা একেবারে খাঁটি বুর্জোয়া ছিল।

—কানাইবাবুর বাবা কি মা পাগল নাকি?

—পাগল নয়—তবু যেন কেমন এক রকম। ওদের বাড়ির মেয়েরা যা সুন্দর দিদি, কি বলব। কানাইদার চেহারা কত সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর। আর যা আব্রু, বাপ্‌রে বাপ্!

নীলা অকারণে হাসতে আরম্ভ করলে।

নেপী বললে—হাসছ কেন?

হাসতে হাসতেই নীলা বললে—বোরখা পরে!

—বোরখা?

—হ্যাঁ, কানাইবাবুদের বাড়ির মেয়েরা বোরখা পরে!

ষষ্ঠী এসে বললে—দিদিমণি, কানাইবাবু এল কই গো? অফিস যাবে! খাবার তৈরী।

নীলা বললে—কি জানি।—সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের টাইমপিসটার দিকে চাইলে। তাই তো! রাত্রি নটা বাজছে যে! কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? সমস্তদিন খান নি। কি হল তাঁর?

নেপী উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে গিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সকলে শুয়েছিল। কানাই এখনও ফেরে নি। বিজয়দাদাও না।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল। নীলা উঠে বসল বিছানার উপর।—নেপী! নেপী!

নেপী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নীলা বেরিয়ে এল বারান্দায়।

বারান্দা থেকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলে—কে? কানাইবাবু?

—হ্যাঁ!

—কোথায় ছিলেন? অফিস যান নি? অফিস থেকে লোক এসেছিল। গুণদা-দাকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিসে। দাঁড়ান যাই।

সে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির মধ্যপথ পর্যন্ত এসেছে—এমন সময় আতঙ্কিত তীব্র সাইরেন-ধ্বনিতে সমগ্র মহানগরটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। নীলা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল—তারপরই ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দিল। কিন্তু দরজার সম্মুখটা শূন্য। চন্দ্রালোকিত রাজপথ, সেখানেও কানাইকে দেখা গেল না। নীলা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল—সেখান থেকে নেমে পড়ল পথে—ডাকলে—কানাইবাবু! কানাইবাবু!

কোন উত্তর এল না, কানাইকেও দেখা গেল না। সাইরেন তখনও বেজে চলেছে। শীতের রাত্রি—সকল বাড়িরই প্রায় জানালা-দরজা বন্ধ—একটা দুটো জানালা যা খোলা ছিল—সেগুলি সশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; খড়খড়ির মধ্য দিয়ে আলোর আভাগুলি দেখা

যাচ্ছিল—সেগুলি নিভে যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নেই। নীলা উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার ডাকলে—কানাইবাবু!

ভিতর থেকে ডাকলে নেপী—সাইরেনের শব্দে ঘুম ভেঙে সে নেমে এসেছে বোধ হয়, সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকলে—দিদি!

ভিতরের দিকে চেয়ে নীলা বললে—কানাইবাবুকে পাচ্ছি না নেপী। এসেই কোথায় চলে গেলেন।

নেপী দরজার মুখে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কাউকে দেখা গেল না, চিৎকার করে সে ডাকলে—কানাই-দা, কানাই-দা!

কানাই অত্যন্ত দ্রুতপদেই চলেছিল পথ দিয়ে। সাইরেন বেজে উঠতেই তার উত্তেজিত স্নায়ুশিরাগুলি গভীরতম উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল—যেন উন্মত্ত টঙ্কারে। সে বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিল সাময়িক ভাবে। জাপানী প্লেন আসছে—মৃত্যুগর্ভ বোমা নিয়ে, সেই বোমা কোথায় পড়বে—সে তারই সন্ধানে চলেছিল—সেইখানে সে মাথা পেতে দাঁড়াবে। সন্ধ্যার পর থেকেই এমনি উন্মত্ত মানসিকতার মধ্যে একা বসে ছিল একটা পার্কে। সেখান থেকে গিয়েছিল—গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে সে গিয়েছিল আত্মহত্যা করবার জন্য।

অফিস থেকে ফিরবার পথে নেমে পড়েছিল পিতৃবন্ধু সেই ডাক্তারটির ক্লিনিকে। তার রক্ত পরীক্ষার ফলাফল জানবার অধীর উৎকণ্ঠায় আর সে বাড়ি ফিরতে পারে নি। বিকাল ছটায় রিপোর্ট দেবার নির্দিষ্ট সময়। কানাই ট্রামে বারকয়েক উদ্দেশ্যহীনভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে—সাড়ে তিনটের সময় আবার সেখানে গিয়েছিল। ডাক্তার একটু হেসে বলেছিল—এখনও কিছুক্ষণ দেরি আছে। বস—অপেক্ষা কর।

সে নীরবে ঐ ভীষণ ঘৃণিত ব্যাধি সংক্রান্ত একখানা ডাক্তারী বই টেনে নিয়ে বসেছিল। তার হাত কাঁপছিল—সে পড়ছিল বংশানুক্রমিক রক্তসঞ্চারিত এই ব্যাধি-বিষের পরিণতির কথা। উঃ, কি না হতে পারে! সে অন্ধ হয়ে যেতে পারে, বধির হয়ে যেতে পারে, স্মৃতি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে পারে, পক্ষাঘাত, উন্মত্ততা—সব হতে পারে। সুখময় চক্রবর্তীর বংশের তিন পুরুষের তরুণ বিষশক্তি তার রক্তকে ছেয়ে রেখেছে।

ডাক্তারটি বললেন—তুমি Science student, তুমি এ প্রয়োজনীয়তাটা বুঝেছ—I am glad; তোমার বাবা স্কুলে আমার class-friend ছিলেন, ছোটবেলায় কতবার তোমাদের বাড়ি গেছি। তখন তোমার কাকা, পিসিমারা খুব ছোট। রোগা ক্ষয়া চেহারা দেখে মায়া হত। ছোটকর্তা, তোমার বাবার ছোটকাকা, হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন। লোকে বলত—চক্রবর্তী মশায়ের পূর্বজন্মের অভিসম্পাত। তারকনাথে ধর্না দিয়ে নাকি ঐ কথাটা জানা গেছে। তারপর ডাক্তার হয়ে যখন তোমার পিতামহের শেষ সময়ে চিকিৎসা করলাম—ডাক্তার Bose-এর assistant হিসাবে, তখন সব বুঝলাম। তোমার বাবার তখন দাঁত পড়তে আরম্ভ হয়েছে। বেচারার বয়স তখন সবে বাইশ-তেইশ। বললাম—রক্ত পরীক্ষা করাও। কথাটা শুনে বলল—হুঁ, তা হলে বাবার রক্তের দোষেই আমার ব্যামোটা হয়েছিল।—রক্ত পরীক্ষা করালে, কিন্তু injection নিলে না ভয়ে—সালসা খেতে আরম্ভ করলে। তুমি ঠিক করেছ। রক্তে যে দোষ আছে—তাকে পরিশুদ্ধ করে নাও। Be a new man, জগতে সুস্থ রক্ত-ধারার বংশ স্থাপন করে যাও।

কানাই স্তব্ধ হয়েই বসে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিল। 'জগতে সুস্থ রক্তধারার বংশ

স্থাপন করে যাও।' ব্যাধিহীন রক্ত কি মানুষ থাকতে দেবে? বৈষম্যপীড়িত মানবসমাজের মূল ব্যাধি যে ক্ষুধা। উদরের ক্ষুধা—রক্তমাংসের ক্ষুধা। যাদের উদরের ক্ষুধা নেই—ক্ষুধা মিটিয়েও যাদের প্রচুর আছে—তারা রক্তমাংসের ক্ষুধার বিলাসে—পেটের ক্ষুধায় পীড়িত মানবীদের ক্রয় করে তাদের মধ্যে অবাধ ব্যভিচারে এই বিষের সৃষ্টি করেছে; উদরান্নপীড়িত মানুষ বঞ্চনায়, অশিক্ষায়, অসুস্থ জৈবপ্রবৃত্তিতে এই বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে—অন্ধকারচারী সরীসৃপের মত। তবু এককালে যখন সভ্যতা বা সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য ছিল, পরলোকের মোহ ছিল, যখন সমাজ পার হয় নি সামন্ততান্ত্রিক যুগ, তখনও রাজার ছেলে গৃহত্যাগ করে নির্বাণ অন্বেষণ করেছে; রাজা সর্বস্ব দান করে চীরবস্ত্র পরিধান করেছে। এই সেদিন পর্যন্তও এদেশে সমাজে কবি, নেতা, ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়েছেন ওই শ্রেণী থেকে। কিন্তু তারপর বণিকপ্রধান সমাজে সে-সবের কিছু অবশিষ্ট নেই। তারা ধর্মগ্রন্থ পড়ে না—বিক্রী করে; মন্দিরে পূজো করে না—ঠিকেদারী করে; স্বর্গে যাবার কথা তারা ভাবেও না, কারণ স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরীর কণ্ট্রাক্ট কোনদিন পাওয়া যাবে না।

ডাক্তার বললেন—আমার এক বন্ধু তার মেয়ের জন্যে আমাকে তোমার কথা বলেছিলেন। He is a big man—তিনি ভাল ছেলে চান। কিন্তু আমি একথা জেনে—তোমার বাবাকে কিছু বলতে পারি নি।

একজন সহকারী ডাক্তার Blood-report নিয়ে এসে ডাক্তারকে দিলেন। Report-টার দিকে চেয়ে দেখে—ডাক্তারের মুখে গভীর বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তিনি বললেন—strange! ঠিক হয়েছে তো? চল আমি দেখি।

কাগজখানা হাতে করেই তিনি উঠে গেলেন। ফিরে এসে বললেন—কানাই, তোমার Blood-এ কিছুই পাওয়া যায় নি। Negative—এই নাও রিপোর্ট।

রক্তে কিছুই পাওয়া যায় নি? নির্দোষ রক্ত? কলের পুতুলের মত হাত বাড়িয়ে সে রিপোর্টখানা পকেটে পুরে পাংশু মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজা অতিক্রম করবার সময় ডাক্তারের অতি বিস্মিত কণ্ঠের কথা তার কানে এল—strange!

Strange! Strange! Strange! কথাটা কানের কাছে বার বার বেজে উঠছিল। চক্রবর্তী-বংশের সন্তান সে—চক্রবর্তীদের লালসা-বিলাসের অর্জন করা বিষ তার রক্তে নেই! তার ভাই-বোনদের অসুস্থতার মধ্যে সে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তার বাপ-কাকারা সে বিষের উপরেও সঞ্চয় করেছেন নূতন বিষ—সে ইতিহাস সে শুনেছে। চক্রবর্তীদের রক্ত, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থিতে সংক্রামিত বিষ তার রক্তে নেই—Strange! Strange! Strange!

তবে? তবে সে কি চক্রবর্তী নয়?

তেইশ

পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপছিল। চোখের সম্মুখে শহরের ঘরবাড়ি সব যেন দুলছে। এ কথা কাকে সে বলবে? সে গিয়ে বসেছিল পার্কে। তারপর গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। আত্মহত্যা করবার কামনা বার বার তার মনে জেগে উঠেছিল। দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে মনের

নিশিপদ্ম

প্রথম পর্ব

এক

আজকের নয়, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের নয়; উনিশ-কুড়ি বছর আগের, ১৯৪২ সালের ঘটনা। বর্ধমানের নামকরা কীর্তনওয়ালী কাঞ্চনমালা নিঃস্ব অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। প্রথম ছিল দেহ-ব্যবসায়িনী খেমটাওয়ালী—তারপর হয়েছিল কীর্তনগায়িকা। বড় বড় আসরে সে কীর্তন গান করে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিল। গ্রামোফোন রেকর্ডে তার গানও উঠেছিল—সে গান আজও কখনও-সখনও শোনা যায়।

পাশে বসে কাঁদছিল তার মেয়ে—নাম মুক্তামালা, ডাকনাম মুক্তো। সুন্দরী মেয়ে; তার সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু একটি নয়—ছুটি, ছুটি চোখ। তের-চৌদ্দ বছর বয়স—কিন্তু তার ওই চোখ যেন বলে দেয় সে আজও শিশু, মনের দিক থেকে বাড়ে নি; এবং ওই চোখ ছুটি দেখেই মানুষের মন স্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মায়ের পাশে একটি পা মাটির উপর ভেঁজে অন্ত পাখানি উঁচু করে ভেঁজে সেই হাঁটুর উপর মাথা রেখে নীরবে কাঁদছিল। কোন ভাষা বা রব তো ছিলই না—বারেকের জন্তেও সে ফোঁপায় নি, শুধু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল হাঁটুর উপর—এক চোখের ধারা কাত-করা মুখের জন্ত নাকের ডগা বেয়ে মাটিতে পড়ছিল টোপায় টোপায়।

কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর জ্ঞান ছিল টনটনে। ক্ষয়-রোগের রোগী; আন্ত্রিক ক্ষয়রোগ। প্রথমটা হয়েছিল পায়ের হাড়ে; ডাক্তাররা বলেছিলেন টি বি অফ বোন্স্; কলকাতার মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা পাখানা হাঁটুর নিচে থেকে কেটে দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তাতে কাঞ্চনমালা রাজী হয় নি। আলট্রা-ভায়লেট রে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল—তাতে ফল হয় নি—তারপর করেছিল হোমিওপ্যাথি; সেও যখন নিষ্ফল হল তখন ক্ষতের চিকিৎসাটাকে বড় করে চাঁদসীর শরণাপন্ন হয়েছিল। চাঁদসীর চিকিৎসায় ক্ষতের মুখটা প্রায় বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তার আক্রমণ স্থানান্তরিত করলে পেটে। দেড় বৎসর রোগভোগ। শরীর শীর্ণ হয়ে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মত হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি ছিল সমান সতেজ। বয়স কাঞ্চনমালার বেশী হয় নি—বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। সে কয়েকদিন ধরেই বেশ বুঝছে দিন তার বেশী নেই—বোধ করি সেই কারণেই কীর্তনগায়িকা কাঞ্চন তার বিশ্বাসমত নাম করে যাচ্ছে—গোবিন্দের।

ক'দিন ধরে এর আগে মুক্তামালাকে বলেছে তার নিজের জীবনের কথা। শুধু তাইই বলে নি, বলেছে—এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছরের জীবনে সে কত দেখেছে; বলেছে—যা দেখেছে তা তার জীবনের ঘটনা থেকেও বিচিত্র। আর ভাগ্যক্রমে গুরুর কৃপায় যা পেয়েছে তা আবার যা দেখেছে তা থেকেও অপরূপ। তাই তার আজ আর কোন খেদ নেই।—মুক্তো রে, খেদ নেই আমার, কোন খেদ নেই। তোকে রেখে যাচ্ছি তাতেও খেদ নেই; ভয় নেই—কোন ভয় নেই। তবে—

চুপ করে ছিল কিছুক্ষণের জন্ত। তারপর বলেছিল—ওরে ভয় হচ্ছে কালের জন্ত। কালের এমন চেহারা কখনও দেখি নি; শুনি নি; ভাবি নি। ওঃ! যেন সেই কালের স্বরূপ মনে মনে প্রত্যক্ষ করে সে ওঃ বলে শিউরে উঠল!

*　　　*　　　*

সে যেন চোখে দেখলে—১৯৪২ সালে—কাল থেকে কালান্তরে পদক্ষেপের লয়ে তাণ্ডব-ছন্দে শূন্যলোকে ললিতবঙ্কিম ভঙ্গিমায় শূন্যে-উত্তোলিত-দক্ষিণপাদ মহাকাল নিমীলিত রক্তিম বামচক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছেন সম্মুখের দিকে। দক্ষিণপাদ শূন্যলোকে উত্তোলিত—বামপদখানি বর্তমান কালে স্থিত—কিন্তু আনন্দসুধা-প্রমত্ততায় অস্থির। টলছে—নিজে যেন দুলছেন ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাতে পৃথিবী কাঁপছে; শূন্যলোকে তাণ্ডবের ছন্দ জেগেছে, সেই ছন্দে এসেছে আশ্বিনের সাইক্লোন; পিছনে পিছনে এসেছে মহামারী; প্রাণজগতের চৈতন্য-লোকেও বেজে উঠেছে তাঁর হাতের ডমরুধ্বনি। প্রতিধ্বনির মত মানুষ বাজিয়েছে রণবাদ্য। নীলকণ্ঠের কণ্ঠগরলের মত্ততার ছোঁয়াচে মরণে তার নেশা লেগেছে, মরণে তার উল্লাস জেগেছে। মহাকালের হাতের আগুন থেকে আগুন সংগ্রহ করে পৃথিবীর বুকে শূন্যলোকে আগুন লাগিয়ে সেও নাচতে শুরু করেছে। জীবন হয়েছে তুবড়ির আগুনের ফোয়ারার মুখের ফুলকির মত। মুহূর্তের জন্য ঝকমকিয়ে জলেই নিভে যাচ্ছে।

বড় বড় জমিদার—ভূসম্পত্তিবানেদের বাড়ি ফাটছে—যার ফাটেনি তার বাড়িতে নোনা ধরেছে, শ্যাওলা পড়েছে। ব্যবসায়ীরা কাঁপছে। আবার দু'চারজন রাতারাতি ফকির হচ্ছে। তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করে রাতারাতি দু'চারজন পথের মানুষ লক্ষপতি হয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসছে। মধ্যবিত্তেরা সব হারাচ্ছে। গরীবেরা পথে পড়ে মরছে। তার নিজের জীবন? শুধু তার নিজের নয়—তাদের—মানে সমস্ত বারবিলাসিনীদের সমাজজীবন? সে নিজে অবশ্য এদের থেকে খানিকটা—খানিকটা কেন—অনেকটাই পৃথক; তবু তার জীবনে তার আঘাত কম লাগে নি, বরং বেশী লেগেছে।

ওঃ—সে কত কথা, কত বিচিত্র কথা!

তার প্রথম জীবনে,—কত বয়স তখন? সাত-আট—তখন দেখেছে কলকাতা, বর্ধমান, সিউড়ি, বহরমপুর, পূর্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী, রংপুর—বড় বড় শহরে, এ দেশের গ্রামের জমিদারবাড়িতে, ঝরিয়া রানীগঞ্জে কলিয়ারীতে—কত বায়না; খেমটানাচের আসর বসত। কত প্যালা পড়ত। ঝাড়লণ্ঠন, ঘোড়া, হাতী, বজরা—সে সব কত ব্যাপার! সে সব কত গান! সন্ধ্যার আসরে একরকম গান, রাত্রি বারোটার পর আর এক রকম গান। সে তার মায়ের আমল। মা খ্যামটা নাচত—কীর্তনও গাইত। বিয়ে-সাদী অন্নপ্রাশন—এমন কি ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়িতে ছেলের পৈতেতেও খ্যামটা নাচ হয়েছে। মা বলে—কোথাকার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময়—সাহেবদের দেখাবার জন্যে—খ্যামটা নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল—তার মায়ের তখনও সন্তান হয় নি—সে সেই আসরে নেচে এসেছিল।

আবার এই সব বাবুদের বাড়িতে—রাসে দোলে ঝুলনে ঢপকীর্তনের আসর হত। ওরই মধ্যে একদিন ঢপওয়ালীরাই খ্যামটা নাচত। শ্রাদ্ধে ঢপ-কীর্তন হত—তখন আর খ্যামটার আসর বসত না। কলকাতায় বাগানবাড়ি ছিল। এতে জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার—সব জাতের মানুষের আনাগোনা। সে নিজেও বাগান-বাড়ি দেখেছে, না-দেখা নয়। সে সব আবু-হোসেনি কাণ্ড। সে আলিবাবা নাটকে থিয়েটারে পার্টও করেছে। ওঃ! ওই নাটকে পার্ট করতে গিয়েই জীবনের মোড় ফিরল তার।

সে উনিশশো একুশ সাল। দেশে গান্ধী মহারাজ জেগেছেন। তাঁর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন হচ্ছে। দেশের মোড় ফিরল। যে ঢেউ বা জোয়ার বইছিল তাদের সমাজে, তাতে ভাটা পড়ল। সেই ভাটার টান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তাদের সমাজে, জীবনে চড়া পড়েছে, বালি জেগেছে। নাচগানের আসরের চেহারা পাল্টাতে শুরু করলে। আজ এমন

পাল্টেছে যে তাতে আর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ভদ্রঘরের মেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে নাচগান শিখে আসরের সঙ্গে নাচগানের ঢং পাল্টে দিয়েছে। এবং বাড়িতে বায়না করে নাচগান শোনার রেওয়াজ উঠে গিয়ে থিয়েটার হলে টিকিট বিক্রি করে নাচগানের দিন এসেছে। বায়নাও আছে—নেই এমন নয়, সেও সভা হয়, সেই সভায় নাচিয়ে-গাইয়েরা যায়—দুখানা চারখানা গান গেয়ে, এক বা দু দফা নেচে টাকা নিয়ে চলে আসে। বড়লোকের রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ অবশ্য পালটায়নি, তবে তারও ধরন বদলেছে। এই বদলের মধ্যে মার খেয়েছে সে বেশী। কারণ কীর্তন, শ্যামাসংগীত এসব প্রায় উঠেই গেল। কীর্তন থাকলেও ঢপ-কীর্তন কেউ শোনে না। পান্না দাসী, বেদানা দাসী গেছে—তাদের পথ ধরে কাঞ্চন-মালাও যাচ্ছে, যাচ্ছে কেন সেও গিয়েছে। তাতে তার খেদ নেই। কোন খেদ নেই। খেদ তার অনেক দিন ঘুচে গেছে। না-হলে এই যুবতী সুন্দরী মেয়ে মুক্তামালা মূলধন থাকতে তাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হত না। তা হোক—বিনা চিকিৎসায় সে মরুক—সে মুক্তা-মালাকে মূলধন করে তার দেহ বিক্রির টাকায় চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে চায় না; তার থেকে এ মৃত্যু তার মুক্তি। সে কি তাই পারে? তার গুরু তাকে দুটি দান দিয়ে গেছেন। ওই মুক্তামালা আর গোবিন্দভক্তি। পঙ্কের মধ্যে তার যে জীবন চাপা পড়েছিল তাকে তিনি পঙ্কজের মত ফুটিয়ে তুলেছেন।

কলকাতার রামবাগানে তার জন্ম। তার মা ছিল ব্রাহ্মণকন্যা, বালবিধবা। অদৃষ্টচক্রে বল অদৃষ্টচক্রে, অথবা নিজের ভুলে কুলত্যাগ করে এসে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছিল রাম-বাগানে। মায়ের রূপ ছিল। নাচগান জানত না। ওই দেহের কারবারের ফল হিসেবে সে এসেছিল মায়ের কোলে। সে একা নয়, আরও একটি মেয়ে—তার আর এক বোন—চাঁপা—চম্পকমালা। সে বড়, চাঁপা ছোট। চৌদ্দ-পনের বছর থেকেই মা তাকে নিয়ে শুরু করেছিল ব্যবসা। চাঁপা তখনও ছোট—এগার-বারো বছর বয়স। তখন প্রথমবার যুদ্ধ লেগেছে—এই জার্মানী আর ইংলণ্ডে। মাড়োয়ারী আর বাঙালী ব্যবসাদাররা বাগানবাড়িতে মেতেছে। এদিকে হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত, ওদিকে খড়দ' পর্যন্ত বাগানবাড়ি ছিল অনেক। শনিবার তারা সেখানে যেত—খাবারদাবার, মদ, পান, গোলাপজল সঙ্গে যেত—আর তাদের সমাজের দুজন চারজন মেয়ে। রবিবার রাত্রি দশটায় বা সোমবার ভোর ভোর ফিরত। অন্যবারে—সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত তাদের রামবাগানের বাসায় চলত ব্যবসা। তার রূপের মোহে পড়েছিল এক বাঙালীবাবু। সে তাকে আলাদা ঘর ভাড়া করে বছর তিনেক রেখেছিল—এবং সে-ই তাকে শিখিয়েছিল গানবাজনা—নাচ। ওস্তাদ রেখে দিয়েছিল। তিন বছর পর তাকে সেই বাবুই ঢুকিয়েছিল থিয়েটারে। সখীর দলে নাচত। অভিনয়ের দিন বাবু বসে থাকত সামনে—ফুলের তোড়া হাতে। সে স্টেজে বের হলে সেই তোড়া ছুঁড়ে দিত। তারপর থিয়েটার শেষ হলে বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতে বাবুর সঙ্গে ফিরত বাসায়। তিন বছর পর সেই বাবুই তাকে ছেড়ে পড়ল চাঁপাকে নিয়ে। তাতে তার খুব আক্ষেপ ছিল না, কারণ ওই বাবুর এক বন্ধু তাকে নিয়ে বাসা বদলেছিল। তারপর সে হয়েছিল স্বাধীন। স্বেচ্ছাচারিণী। থিয়েটারে প্রেমিক কম জোটে নি। সে তখন সব থেকে ঝলমলে ফুল থিয়েটারের মধ্যে। চাঁপাও তখন থিয়েটারে ঢুকেছে। তারও নাম হচ্ছে। হঠাৎ এল জীবনের গতিপরিবর্তন। আলিবাবা বই খুলেছিল বড়দিনের বাজারে। তখন বলত বড়দিনের বাজার। নানা জায়গা থেকে কলকাতায় আসত বড়লোকের দল। দিল্লী থেকে বড়লাটের সঙ্গে রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসাদার থেকে সাধারণ লোক

পর্যন্ত। ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পড়ত, থিয়েটারে থিয়েটারে নতুন বই খুলত। নাচগানের বই, অপেরার ওপর বেশী ঝোঁক ছিল। সেবার ভাল নতুন অপেরার অভাবে পুরনো আলিবাবা খুলেছিল তাদের থিয়েটার, সে পেয়েছিল মর্জিনার পার্ট। আবদালার পার্ট করেছিল—বিখ্যাত ড্যান্সিং মাস্টার অ্যাক্টর মণ্টু মাস্টার। সেদিন থিয়েটারে ঠাসা বিক্রী। গোটা সামনের সারিটায় বসেছিল একদল কালো মানুষ। সঙ্গে তাদের রাশি রাশি ফুল। থিয়েটারের ম্যানেজার—মালিক—দুপাশে দাঁড়িয়ে তটস্থ হয়ে তাদের কখন কি দরকার দেখছে। স্টেজের ভিতরে গুঞ্জন উঠছিল—লালপাহাড়ীর রাজা এবং কুমার এসেছেন। সঙ্গে জন তিরিশেক পারিষদ। তাঁদের সঙ্গে জন পঁচিশেক কয়লার ব্যবসাদার। লালপাহাড়ীর রাজা বনপাহাড় অঞ্চলের রাজা। তাঁর এলাকাটা কয়লায় ভরতি। কয়লার জমির মালিক হিসেবে লাখে লাখে টাকা আসে তাঁদের। বিশ পঁচিশ ত্রিশ লাখ। উজ্জ্বল পোশাক আর দুহাতে আটটা আংটি—কানে মুক্তো হীরের টব্। গায়ের সেণ্টের গন্ধে গোটা হাউসটা প্রতিমুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করছিল। আর সে কি উল্লাস! কি হাততালি! কত এনকোর, একসেলেণ্ট, বাহবা, বহুতাচ্ছা চীৎকার! তার পায়ের কাছে ঝুড়ি দুই ফুল পড়েছিল। তার ইচ্ছে হয়েছিল 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানখানা বার বার গাইতে। "বার বার লাগাতা ঝাড়ু, তবভি এইসা হাল।" মনে বলেছিল তাই বটে। প্লে শেষ হয় হয়—সে গ্রীনরুমে বসেই খবর পেয়েছিল রাজা আর কুমার তার ঠিকানা লিখে নিয়েছেন। সে মুখ মিচকে হেসেছিল। মরণ! রাজা আর কুমার একসঙ্গে? যে খবর এনেছিল সে বলেছিল—রাজা কুমার বাপ বেটা নয়, খুড়ো ভাইপো। বছর দু-তিনের ছোটবড়। সব ওদের একসঙ্গে। পাপ পুণ্য, ভালো মন্দ সব। তীর্থ থেকে তাদের আলয় পর্যন্ত একসঙ্গে যাত্রা! কথাটা সত্যি। সেদিন থিয়েটারের অফ ডে। বাড়ির দরজায় মোটর এসে দাঁড়াল। তখন ১৯২০ সাল। মোটর দেশে এলেও দু-দশখানা। কয়লার পয়সায় রাজা কুমার নতুন মোটর কিনেছেন সেই দিন। সেই মোটরে চেপে প্রথম এসেছেন তার দরজায়।

তারপর সারারাত মাইফেল। রাজা কুমারেরা জন পাঁচেক, সুতরাং আরও সখীর প্রয়োজন হয়েছিল। তার মায়ের ব্যবস্থায় চাঁপা এসেছিল—এবং আরও তিনজন—তাদের ওরাই এনেছিল বাছাই করে। সে পড়েছিল কুমারের নজরে। কুমারের খাতির রাজার থেকে বেশী। সম্পর্কে সেই খুড়ো। তার দুদিন পর কুমার আর রাজা দুজনে এসেছিলেন, সঙ্গে একজন পারিষদ। উপঢৌকন দিয়েছিলেন হীরের দুল—তাকে শুধু নয়, চাঁপাকেও। এবং মোটরে চড়ে হাওয়া খেয়ে ফিরবার সময় ফারের ওভারকোট এবং জিরো পাওয়ার সোনার চশমা কিনে পরিয়ে একেবারে বিবি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই মায়ের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন—তাকে আর চাঁপাকে খুড়ো ভাইপোতে লালপাহাড়ী নিয়ে যেতে চান; স্থায়ীভাবে। পাকাবাড়ি—বছরে ছ হাজার টাকা তনখা—চাকর ঠাকুর দারোয়ান—খাইখরচ—এসব আলাদা। অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে—যার নামে তারা চায় তার নামে। মায়ের নামে বলে মায়ের নামে, মেয়েদের নামে নামে বলে তাই। এ ছাড়া গয়নাগাঁটি যা দেবে—তা দেবে। তার সঙ্গে ওই ছ হাজারের কোন সম্পর্ক নেই। কাপড়চোপড়—সায়া ব্লাউজ বডিস এসব তো আছেই। মা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়েছিল—ছ ছ হাজার—দুই মেয়ের বারো হাজার—এ যে এক জায়গীর। এ কি ছাড়া যায়! এরপর রাজা কুমারকে খুশী করে তাদের মোহিনী মায়ার ফাঁদে ফেলে কলকাতায় বাড়ি করিয়ে নিতে কতদিন লাগবে! টাকাটা দশ হাজার মায়ের নামেই ব্যাঙ্কে জমা হয়েছিল। এবং তারা মাসখানেকের মধ্যেই লালপাহাড়ীর বাগান-

বাড়িতে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। সত্যিই সে রাজার ঐশ্বর্য। এরা সব পুরনো কালের বনদেশের রাজা। সে আমলে এসব বাড়ি ঘর ঐশ্বর্য কিছুই ছিল না। বাড়ি ছিল খাপরার চালের। চালচলন ছিল মোটামুটি। নতুন ইংরেজের আমল আর মাটির তলা থেকে কয়লা বের হতে এরা হয়ে পড়ল অতুল ঐশ্বর্য আর বিপুল বিলাসের মালিক। কলকাতা শহরে যে ঐশ্বর্য যে বিলাস তার কিছুর অভাব রাখেন নি রাজাসাহেব আর কুমারসাহেব। শালবনের মধ্যে বাগান তৈরি করে তার মধ্যে ছোট দোতলা প্রাসাদ। পাশে ঝিল, তাতে সুন্দর নৌকা। ইলেকট্রিক লাইট, দামী ভারী পর্দা, মেঝেতে কার্পেট, সোফা কুশন—তেমনি বাথরুম। মধ্যে বড় হলে নাচ-গানের আসর। ঝি চাকর দারোয়ান। বছর তিনেক এখানে কেটেছিল। রাত্রে কুমারসাহেবের আসর বসত। প্রথমে গানবাজনা; তারপর মদ; তারপর বিলাসের পাশবিকতা। বাগান থেকে ঝিলে নৌকায় লুকোচুরি খেলা থেকে অনেক কিছু। তারপর মধ্যরাত্রি পার করে কুমারসাহেব চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠতেন—বাড়ি ফিরতেন। কোন কোন দিন এখানেই থেকে যেতেন। সকাল হত বেলা নটায়। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে একদফা ওস্তাদের কাছে গান শিখত। কুমারসাহেব লোকটা তাদের সমশ্রেণীর মত দেহ-সর্বস্ব পাশবিক চরিত্রের হলেও তার একটা কোমলবৃত্তি ছিল। লোকটার গানে শখ ছিল। গান শেখার প্রথম পর্ব শেষ করে দুপুরে একটার পর স্নান খাওয়া সেরে আসত একটি ঘুমের পালা; বিকেলে পাঁচটায় উঠে গা ধুয়ে প্রসাধন সেরে সন্ধ্যায় আবার বসত ওস্তাদকে নিয়ে। যতক্ষণ কুমারসাহেব না আসতেন ততক্ষণ চলত। কুমার এসে বসতেই সে গান ছেড়ে গ্লাস পূর্ণ করে কুমারসাহেবের হাতে তুলে দিত। কুমারসাহেব বলতেন—আন—। অর্থাৎ বোতল গ্লাস। আর একটা গ্লাস ভ'রে সেটি তার হাতে তুলে দিত—পিয়ো।

গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে পানের পর্ব শুরু হত। খাবারের থালা চাকরে—না চাকর নয়—বয়, বয় সাজিয়েই রাখত—তারা সেটা টেনে নিত।

চাঁপার বাগান বাসা ছিল আলাদা। বেশ খানিকটা দূর। মধ্যে মধ্যে দুপুরে চাঁপা আসত, নয়তো কাঞ্চন যেত; কখনও কখনও রাজাসাহেব নিমন্ত্রণ করলে কুমারসাহেব কাঞ্চনকে নিয়ে যেতেন। কখনও তার ওখান থেকে কুমারসাহেবের নিমন্ত্রণ যেত রাজাসাহেবের বাগানে চাঁপার বাসায়। গানবাজনা খাওয়াদাওয়া সেরে তারা চলে যেত। গানবাজনায় রাজাসাহেবের শখ ছিল না—চাঁপার নিজেরও না। ওস্তাদ একজন ছিল, সে থাকতে হয় বলে ছিল। ওরা দুজনেই ছিল স্থূলদেহসর্বস্ব। শুধু তাই নয়, রুচিটাও ছিল বড় নিচু। কুৎসিত। রাজার একটা শখ ছিল শিকার। শিকারে চাঁপাও যেত। বন্দুক ছুঁড়তেও শিখেছিল। আরও অনেক কিছু শিখেছিল। রাজার মদে নেশা হত না। কোকেন খেত। চাঁপাও শিখেছিল। যাক—সে হতভাগীর কথা যাক।

তিন বছর পর ওখানেই তার অদৃষ্টক্রমে সে পেলে তার গুরুকে।

লালপাহাড়ীর রাজবাড়ি। রাজারা ওদেশের মানুষদের মত ঘোর ঘন কৃষ্ণাঙ্গ হলেও জাতিতে ছিল ক্ষত্রিয়। বাড়িতে ঠাকুর ছিল। এবং ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে উৎসব হত। বড় বড় উৎসব। সে সব একটা বিরাট সমারোহ। কলকাতার যাত্রা—কখনও থিয়েটার, নামকরা বাইজী, খেমটা, বড় বড় গাইয়ের জলসা। সারা রাজ্য জুড়ে, কয়লার কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণ। সাহেব থেকে বাঙালী, কাচ্ছি, মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী—কুঠির মালিক-ম্যানেজারদের উপস্থিতি ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। না এলে কৈফিয়ত লাগত। কলকাতা থেকে উকীল

ব্যারিস্টার অ্যাটর্নীরা আসত ; দু-চারজন নামকরা লোকও আসত। পাটনা থেকে আসত। সরকারী কর্মচারীরা আসত। সমারোহের দুটো ভাগ ছিল। আর একটা ভাগে বসত কবির পাল্লা—ঝুমুর নাচ সাধারণ যাত্রার আসর। এসব ছিল স্থানীয় লোকদের জন্য। গোটা লালপাহাড়ী শহরটায় দশ-পনের দিন ধরে দিনেরাত্রে মানুষের প্রায় বিশ্রাম থাকত না। রাত্রে ঝলমল করত আলো।

লালপাহাড়ীর রাজা বলতেন অহংকার করে—লালপাহাড়ী শহর ছোঁয়ে কলকাতাটো টুকরা ঠস্ পড়িছে। অর্থাৎ লালপাহাড়ী শহর জমে ওঠায় কলকাতা কিছু নিষ্প্রভ হয়েছে। এই অহংকারের মর্যাদা রাখতে খরচখরচা এবং উৎসবের আয়োজনের বাকী রাখতেন না তাঁরা।

সব থেকে বড় উৎসব ছিল কালীপুজো, কালীপুজো থেকেই উৎসবের আরম্ভ। পনের দিন ধরে চলত কালীপুজোর উৎসব। তারপরই ছিল দোল—হোলি। রাজারা ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের দাবি করে ; ওদের বাড়িতে দেবতা ছিলেন—কালী এবং কৃষ্ণ। কালীপুজো বৎসরে একবার। কার্তিকের অমাবস্যায় একসঙ্গে দেয়ালি এবং শ্যামাপূজা। ফাল্গুনে বা চৈত্রে দোল হোলি—তারপর শ্রাবণে ছিল ঝুলন। এ ছাড়া ছোটখাটো উৎসব ছিল অনেক—কার্তিকে বা অগ্রহায়ণে রাস, পৌষমাসে ওদেশের উৎসব বাঁধ্না। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন চড়ক। আষাঢ়ে রথযাত্রা।

কালীপুজোর উৎসব ছিল বিরাট বিপুল। দোলের উৎসব ছিল তার পরেই। কিন্তু দোলের উৎসবে ছিল মদ বেশী, রাজাসাহেব কুমারসাহেবের উল্লাস বেশী, তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে সে উৎসব ছিল তামসিক। কলকাতা থেকে আসত চার-পাঁচ দল খেমটা। ওখানকার শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে গাইয়ে এবং রূপসীদের বেছে বেছে আনা হত। এক সপ্তাহ ধরে চলত রঙের খেলা—নাচের আসর—বিলাস—ব্যভিচারের পালা। ঠাকুরবাড়িতে প্রতিদলের জন্য একদিন সন্ধ্যায় আসর বসত ; রাজাসাহেব কুমারসাহেব আধঘণ্টার জন্য সেখানে উপস্থিত থেকেই উঠে আসতেন। তারপর বাকী দল আর অন্তরঙ্গ পারিষদ এবং বিশিষ্ট অতিথি নিয়ে পালা বসত নানান স্থানে। কোন দিন কুমারসাহেবের বাগানে, কোন দিন রাজাসাহেবের বাগানে, কোন দিন কোন নির্জন শালবনে, কোন দিন কোন জোড় বা ঝর্নার পাশে। পিকনিক থেকে শুরু, সন্ধ্যার পর সেখানেই আসর, উন্মুক্ত আকাশতলে পাথরের অসমতল বন্ধুর চত্বরে পাশবিক নৃত্য। এসবে তারাই ছিল গৃহিণী। এবং সাধারণ জীবনে রাজাসাহেব কুমারসাহেবের গৃহিণীদের যেমন তাদের সংসর্গের জন্য কোন কথা বলার অধিকার থাকে না—এই কয়েকটি দিন তাদেরও রাজাসাহেব কুমারসাহেবের স্বেচ্ছাচারে কোন কথা বলার অধিকার থাকত না। অবশ্য অধিকারই বা কি থাকতে পারত বা পারে এক্ষেত্রে! ব্যভিচার-সঙ্গিনী—বিশেষ করে যেখানে তারা মাসে মাসে তাদের দেহমূল্য গ্রহণ করত সেখানে—যে মূল্য দিয়ে ব্যভিচার করে—তার ব্যভিচারের সীমানায় গণ্ডী টানবে কি দিয়ে? তাদের ঠিক অর্থাৎ অকৃত্রিম বেদনাও ছিল না এতে। ভালবাসা ছিল না যে! কেনাবেচার কারবারে ভালবাসা অচল জিনিস। কৃষির সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে ভালবাসা আগাছা। ও নিড়িয়ে তুলে না ফেললে দেহ-ভাঙানো ফসলের চাষে ফসল ফলবে না। মায়েরা এ বিষয়ে মেয়েদের সেই ছেলেবেলা থেকে কানে মন্ত্রের মত ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে। আর ভালবাসা হবে কার সঙ্গে—ক্রীতদাসীর সঙ্গে ক্রেতার? ভালবাসা অনবুঝ—অবুঝ ; রাজকন্যা রাখালকে ভালবাসে—ভিখারিনী রাজপুত্রকে ভালবাসে। কিন্তু রাজপুত্র রাজকন্যাকে কুলগৌরব রাজগৌরব বিসর্জন দিতে হয়! না-হলে হয় না। কুমারসাহেব ধনগৌরব বংশগৌরব কখনও ভোলেন নি। মনে আছে যেদিন প্রথম সে ওই লালপাহাড়ীর বাড়িতে

ঢুকল সেদিন কুমারসাহেব তাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে ড্রইংরুমে বসে বয়কে বলেছিলেন—পেগ দে। বাইসাহেবকেও দে।

মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আবার বয়কে ডেকেছিলেন—বয়!

—হুজুর!

—আরে চাবুকটো যেন কেমোন লাগ্‌ছে হে! দেখি—দেখি। আন্‌তো-ব।

শংকরমাছের লেজের চাবুক। দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—বার কয়েক শূন্যে আস্ফালন করিয়ে বলেছিলেন—না। ঠিক রইছে। দে, রেখে দে! তারপর কাঞ্চনকে বলেছিলেন—জানো হে, আগে যে মেয়্যাটা ছিল না—ঐখানে—সি—

সে কথা অশ্লীল—সে অশ্লীলতা কুমারসাহেবের জিহ্বার বন্যভাষায় অশ্লীলতম হয়ে উঠেছিল। কথাটা হল—পূর্বে যে এখানে ছিল তার কাছে তার কলকাতার একজন প্রিয়জন ছদ্ম পরিচয়ে আসা যাওয়া করত। পরিচয় দিয়েছিল সে তার ভাই। টাকা নিতে আসত। যেদিন আসল পরিচয় পেয়েছিলেন কুমারসাহেব সেদিন তাকে এবং সেই মেয়েটিকে এই চাবুক দিয়ে চাবকে ছিলেন। পিঠ কেটে রক্ত পড়েছিল। আটকে রেখে ক্ষত সামলে তাদের বিদায় করেছিলেন। বলেছিলেন—পিঠের দাগ পিঠে থাকল হে, উ আর দেখায়ো না কারুকে। দেখায়ে যদি হুজ্জোত কর তবে কলকাতায় লোক আছে আমার—সাবাড় করে শেষ করে দিবেক। হঁ।—সেই তখন থেকে ইটা উখানেই থেকে গেইছে। তা এখন উটা—এই বয়, উটা সামিলে রাখ হে—ওই আলমারিটোর পিছাতে রেখে দাও হে! হঁ!

অর্থাৎ তাকে বলে দিয়েছিলেন—তোমার দেহ আমি মাসিক পাঁচশো টাকা মূল্যে কিনেছি। ওর উপর আমার অধিকার। সে অধিকার ভালবাসার বলে রক্ষা করি না, চাবুকের জোরে রক্ষা করি। কিন্তু সে তো কুমারসাহেবকে টাকা দিয়ে কেনে নি, মন্ত্র পড়ে কেনে নি; এবং তার চাবুকও নেই। ওখানে ভালবাসার স্থান কোথায়? ভালবাসার কথাই ওঠে না, ওঠে আর একটা কথা। সেটা হল—কুমারসাহেব যখন হোলির সময় অন্য নারী নিয়ে উল্লাস করতেন তখন একটা ভয় হত;—কুমারসাহেবের মত মাসিক পাঁচশো টাকায় দেহক্রেতার আশ্রয় হারাবার ভয়। সেই ভয়টাই ছিল মনে, সেইটেই খানিকটা ঈর্ষা বা ক্ষোভের চেহারা নিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু তারও মূল্য আছে—তাকে অস্বীকার করা চলে না। চাঁপা অনবুঝের মত এই নিয়ে রাজাসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। রাজাসাহেব তার মুখে এমন করে হাণ্টারের বাঁট দিয়ে মেরেছিলেন যে তার ঠোঁট কেটে দুফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেলাই করতে হয়েছিল। রাজাসাহেব তাকে অবশ্য দাম দিয়েছিলেন। একখানা খুব দামী মুক্তোর নথ। বলেছিলেন—উটাতে কাটা দাগটো ঢাকা পড়বেক। এই লে!

দোলের সময়টায় এই দ্বন্দ্বে পড়তে হত। মা বলত—দোলের ফাঁড়া।

মা থাকত কলকাতায় মাস কয়েক, বিশেষ করে গরমের সময়টায়; লালপাহাড়ীতে প্রচণ্ড গরম; পাথর পাহাড়ের দেশ, তার উপর কয়লাকুটির জন্য হাজার হাজার বয়লারের আঁচ—এবং লক্ষ কয়লার অনির্বাণ চুল্লীর উত্তাপ ও কালো কালির মত ধোঁয়া! গরমের সময় কোন কোন বছর তারাও কুমারসাহেব রাজাসাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে কি সমুদ্রের ধারে যেত। মা আসত বর্ষা কাটিয়ে পুজোর পর কালীপুজোর আগে, ফিরত বৈশাখে। দোলের সময়টায় মা লালপাহাড়ীতে থেকে মেয়েদের শাস্ত রাখত, সামলাত।

ঝুলনের উৎসবটি ছিল বড় ভাল। চমৎকার লাগত তার। বর্ষার সময় বলে শামিয়ানা খাটিয়ে মেলা বসিয়ে উৎসব করা চলত না। ঐ সময়ে নাটমন্দিরের মধ্যেই উৎসবের গণ্ডী আবদ্ধ থাকত এবং উৎসব হত বড় বড় ওস্তাদ এবং বাইদের বৈঠকী গানের জলসায়। কলকাতা কাশী লক্ষ্ণৌ অঞ্চল থেকে নামী ওস্তাদ এবং বাই আসত। সমঝদার শ্রোতা বসত তিন দিকে—রাত্রি দেড়টা দুটো পর্যন্ত চলত গান। ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী ভজন কীর্তন ; বীণা সেতার এস্রাজ বেহালার বাজনা। মদ না-হলে রাজবাড়ির উৎসব হয় না ; মদ থাকত কিন্তু তার পরিমাণ অত্যন্ত কম—অবশ্য লালপাহাড়ীর রাজবাড়ির মাপ অনুযায়ী। তাদের স্থান হত ওই ওস্তাদ গাইয়েদের একপাশে। চাঁপা গাইতে জানত কাজ-চালানো গোছের। থিয়েটার যাত্রায় সখীর ব্যাচে চলতে পারত, হয়তো বা দুজন খেমটাওয়ালীর সাধারণ আসরেও খানকয়েক শেখা টপ্পা-গজল গেয়ে চালাতে পারত, কিন্তু এ মজলিসে গান চলত না। সে ওস্তাদ বাইদের পানটা এগিয়ে দিত, আতরের তুলোটা তুলে ধরত, গোলাপফুলের বোকে বিলি করত ; গোলাপজল ছিটুতো ; সে ছিল রাজাসাহেবের পিয়ারী—ও অধিকারটা চাঁপাই পেত। সেও একপাশে থাকত। কুমারসাহেব তাকে বলতেন—কাঞ্চন বিবি, তুমি ঠাকুরের গান গেয়্যা দিয়া কৌলিকটো সেরে দাও !

সে কোনবার গাইত ভজন। কোনবার গাইত কীর্তন। প্রশংসাও পেত। কণ্ঠস্বর তার ভালই ছিল, গ্রামোফোন রেকর্ডে মানুষ তা তো স্বীকার করে নিয়েছে। শেখাটাও তখন নিন্দের ছিল না কিন্তু সে জানে কীর্তন বা ভজনের আসল বস্তুটুকু তার মধ্যে ছিল না। ও শুধু খোসা ; রাঙা টুকটুকে পাকা আম আছে এক জাতের—তার সেই রাঙা খোসা শুধু। দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির আসরে একরাত্রির নাগরের কাছে যত্নে-শেখা ভালবাসার কথা বলার মতই তার আসল দাম কিছু ছিল না।

এই ঝুলনের আসরেই তার জীবনের আবার মোড় ফিরল।

সেবার ঝুলনের আসর বসেছে—তারিখ শ্রাবণের বিশে। পূর্ণিমার চাঁদ আর মেঘে লুকো-চুরির খেলা চলছিল আকাশে। কয়েকদিন ধরে বাদলার পর বিকেলবেলা থেকে মেঘ কাটছিল কিছুক্ষণের জন্য ; আবার ছেয়ে আসছে আবার কাটছে। পূর্ণচাঁদের আলো এখনি ঝলমল করে উঠছে আবার মেঘ আসছে—জ্যোৎস্না ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে। আসরের ব্যস্ততার মধ্যে মন চোখ ওই খেলার শোভায় যেন বাইরে ছুটে যাচ্ছিল। ভুল হচ্ছিল।

মনেরও খানিকটা ছুটি। সেবার রাজাসাহেব কুমারসাহেব দুজনেই লালপাহাড়ীতে ছিলেন না। বড় একটা স্বত্বের মামলা চলছিল হাইকোর্টে—তার জন্যে দুজনেই গিয়েছিলেন পাটনায়। সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে মামলা, বড় বড় উকীল ব্যারিস্টার নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত। মামলায় হার হলে তিন চার লাখ টাকা যাবে।

ঝুলনের উৎসব সেবার নমো নমো করে সারবার ব্যবস্থা। বাই বায়না নাকচ হয়েছে টেলিগ্রামে। বড় ওস্তাদ এসেছিলেন মাত্র দুজন। কলকাতা থেকে ঢপ-কীর্তনওয়ালীদের সঙ্গে বাঁধা বায়না অনেক দিন থেকে, তারা যথানিয়মে এসেছিল। আসরটা ফাঁকা ফাঁকাই ঠেকছিল। মন বাইরে যাবার অবকাশও পাচ্ছিল। রাজাসাহেব কুমারসাহেব গানের আসরে যে স্তরের মানুষই হোক—আসরে মজলিসে তাঁদের দাম আছে। অতি সহজে তামসিক রাজসিক উল্লাসে আসর জমিয়ে তুলতে পারেন। তাঁরা না থাকাতে শ্রোতার আসরও ফাঁকা ফাঁকা ; বড় বড় কলিয়ারির মালিক ম্যানেজার এরা অনেকেই আসে নি। এসেছিল শুধু তারাই, যাদের গানে অনুরাগ আছে। মধ্যবিত্ত লোকই বেশী ছিল সেবার। যথানিয়মে সে

মন্দিরের সামনে রাজবাড়ির মাইনে-করা নামসংকীর্তনের দলের সঙ্গে একখানা কীর্তন গেয়ে নিয়ে আসরে বসেছিল, চাঁপা ওদিকে পান আতর বিলি করছিল, লক্ষ্ণৌএর খাঁসাহেবের সংগতকারেরা তানপুরা পাখোয়াজ নিয়ে সুর বেঁধে নিয়েছে—খাঁসাহেব সুর ধরেছেন, এমন সময় খবর হয়েছিল কুমারসাহেব এসে পৌঁছেছেন। পাটনা থেকে মোটর হাঁকিয়ে চলে এসেছেন—খেয়াল হয়েছে—সঙ্গে গেস্ট। আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন। গেস্ট গেস্টহাউসে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করছেন, কুমার গেছেন অন্দরে। স্নান সেরে কাপড়-চোপড় বদলে আধ-ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন। গান হচ্ছিল, বড় ওস্তাদের গান—কথাটা হৈ চৈ করে নয়, কানা-কানি করে ছড়িয়ে পড়ল—প্রথম এল তার কানে—তাকে উঠতে হবে। কারণ, কি জানি মরজি হলে কুমারসাহেব যদি বাগানবাড়িতে যান! কে বলতে পারে!

ত্রস্ত হয়ে সে বাগানবাড়িতে ফিরেছিল। কিন্তু কুমার আসেন নি। সে প্রতীক্ষা করছিল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। মুগ্ধ হয়ে বর্ষণধৌত নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ঝলমল জ্যোৎস্নার শোভা দেখছিল। মন যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তখনও মেঘ সম্পূর্ণ কাটে নি, কিন্তু ছিল চাঁদ থেকে অনেক দূরে। রাত্রি প্রথম প্রহর। চাঁদ পূর্বদিকে উঠে খানিকটা মধ্যাকাশের দিকে এগিয়েছেন; মেঘ জমে আছে দিগন্ত ঘেঁষে; মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে কিছু কিছু মেঘ খানা খানা হয়ে খুব দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যাকাশ ঝলমল করছে—যেন নীল রঙ থেকে ঠিকরে বা পিছলে পড়ছে আলো। ঘন সবুজ গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে, মাটির বুকে ঘাসের ভিজে পাতায় ছটা বাজছে, এখানে ওখানে পুকুরে খানায় ডোবায় জমা জলে চাঁদ ভাসছে। ঝকমক করছে জল গলা রুপোর মত। দূরে নালায়, জোড়ে অর্থাৎ ছোট পাহাড়ী নদীতে জলের ঢল নেমেছে, কলরোল উঠেছে। একটা ঝোরা দেখা যাচ্ছে, ছোট ঝোরা—তার জলও গলা রুপো হয়ে গেছে। এমন মনহারানো রাত, ভুবনভরানো জ্যোৎস্না সে জীবনে আর দেখে নি। সে ভুলেই গিয়েছিল কুমারসাহেবের কথা, আসরের কথা। মনে হচ্ছিল—বর্ষার বাদলে অভিষিক্ত ঝিরঝিরে বাতাসে এমন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই ভিজে ঘাসে দেহ এলিয়ে দিয়ে নিষ্পলক হয়ে উপরে ওই চাঁদা-আঁকা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা ওই ঘন বনভরা পাহাড়ের মাথায় চড়ে হাত বাড়িয়ে চাঁদকে নাগাল পেতে চেষ্টা করে। এমনই আবোলতাবোল অসম্ভব অর্থহীন কল্পনা। চিন্তাহীন কল্পনা, শুধু সাধ, চাঁদ-চাওয়া শিশুর মত সাধ।

হঠাৎ চাকরের ডাকে বাস্তবে ফিরে এসেছিল সে। সে খবর এনেছিল—হুজুর তো বরাবর হুঁয়া ক্যা নাম হ্যায়—জলসাকে আসরমে আগিহিস্। বিবিসাহেবকে পর হুকুম হুয়া হুঁয়া যানে কে লিয়ে! দারোয়ান খাড়া হ্যায় নিচে।

তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন ছুটে গিয়েছিল—আশ্চর্য, দেহমন চঞ্চল ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। যেতে বলেছেন? চল যাই! ও মা! দেরি হয়ে গেল হয়তো!

নাটমন্দিরে তখন কার গান সবে শুরু হয়েছে।—আ—!

কে গাইছে? কোন্ গায়ক! আহা! বড় মধুর কণ্ঠ! বাঃ।

* * *

অল্পবয়সে মোর, শ্যামরসে জরজর,
না জানি কি হবে পরিণামে—
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি—

নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে।

কীর্তন গাইছিলেন এক অচেনা গায়ক। পাশে কুমারসাহেব বসে আছেন। আসরের আশ্চর্য ব্যবস্থা। সুবেশ সুদর্শন গায়ক—আশ্চর্য দরদের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন। চোখ বন্ধ করে গাইছেন। গোটা আসরটা যেন স্তব্ধ, মগ্ন। কারুর হাতে সিগারেট নেই। কোথাও কোন ফিসফাস নেই। চাঁপা তাকে ইশারায় চুপিচুপি একপাশে বসতে বললে। সে বসে পড়েছে বিস্ময়ের সঙ্গে। চাঁপা উচ্ছলা—তার সব-তাতে-হাসি-মুখে হাসি নেই। কাঞ্চন বসল বিস্ময়ের সঙ্গে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অভিভূত হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত কাঁদল। 'মার্গসংগীতে যা আছে কীর্তনে তার সব আছে, কিন্তু তার কারু বড় নয়, তার ভাব বড়। সেই জন্মে আখর আপনি আসে। গানের কথা বলেই কথার শেষ হয় না। ভাবের জোয়ার কথার ফেনা তুলে বেরিয়ে আসে। যখন তাতেও কুলায় না তখন যে গায় সেও কাঁদে, যে শোনে সেও কাঁদে। তফাতটা কি জান কাঞ্চন,—জ্ঞানী আর ভক্তে যা তফাত সেই তফাত।'

অনেক দিন পর বলেছিলেন তার গুরু।

ওই উনিই তার গুরু। নাম তাঁর করবে না। তার গুরু, তার স্বামী, তার সব। জীবনটাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। আজ যে এই অবস্থায় মরতেও কোন খেদ নেই—এর মূলধন তিনিই দিয়ে গেছেন। মুক্তামালা—ও-ও তাঁর দান। ওর আর একটা নাম আছে—তাঁর দেওয়া নাম—মালতীমালা। শ্যাম-মনোহর গোবিন্দ মালতীমালায় পরিতৃপ্ত।

লেখাপড়া-জানা, শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ, ভালঘরের ছেলে—একসময় প্রথম যৌবনে ছিলেন দুরন্ত সাহেব। পেশায় ছিলেন উকিল। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, লম্বা মানুষ, টিকলো নাক, শ্যামবর্ণ মানুষটির সারা দেহে যত কান্তি তত পৌরুষ। তার উপর এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর। গানে জন্মগত অধিকার ছিল ; গান তিনি যত্ন করে শিখেও ছিলেন। প্রথম বয়সে উল্লাস করে ঘুরেই বেড়াতেন। মেয়েরা তাঁর পিছনে ছুটেছে। বাপ মারা গিয়েছিলেন ছেলেবয়সে—মায়ের অঞ্চলের নিধি ছিলেন, লেখাপড়া শেষ করে উকিল হয়েও বিয়ে করেন নি। মা পারেন নি রাজী করাতে। তিনি বলতেন—জান—তখন সভ্যসমাজে বিলেতফেরত মহলে খুব খাতির জমিয়েছি, ওদের সমাজের ঘরের স্বাধীন জেনানাদের দেখে চোখে ঘোর লেগেছে। বিয়ে করতেও বেগ পেতে হত না। মেয়েরা আমার জন্মে পাগল এমন কথাটা আর বলব না—কিন্তু তাদের অধিকাংশের চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের নিমন্ত্রণ দেখতাম। কিন্তু পছন্দ কাউকে হয়নি। মন যাকে চায়—যাকে পেলে সব পাওয়া হবে—সে কই ?

হঠাৎ একদিন মনে হল—তাকে দেখতে পেয়েছেন। মস্তবড় বিলেত-ফেরত ডাক্তারের মেয়ে। বাধা হল—সজাতি নয়। তিনি কায়স্থ—তারা ব্রাহ্মণ। তাদের কাছে সে বাধা বাধাই নয় তখন। বাধা শুধু মায়ের কাছে।

বিলেতঘোরা মেয়ে। বাপের সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছে। এ দেশে বি-এ পাস করেছিল। মারীচ হয়েছিল মায়ামৃগ—মায়ামৃগের অপর নাম স্বর্ণমৃগ। এ মেয়ে ছিল স্বর্ণমৃগী—মায়ামৃগী। একে ধরা যায় না কিন্তু ধরা দেবার ভানে থমকে দাঁড়ায় ; তার পিছনে না ছুটিয়ে ছাড়ে না।

স্বর্ণমৃগীও যে বাঁধা পড়েছিল। তাঁকে দেখে না ভুলে তো পারে নি। শেষ পর্যন্ত ধরা দিলে।

তিনি বলতেন—আশ্চর্য কাঞ্চন—সে মদ খায় দেখেও আমার মোহ ছুটল না, মোহ বাড়ল।

মনে হল জন্মজন্মান্তর ধরে একেই খুঁজে এসেছি।

তার বাপ অবশ্য তাকে মানা করেছিলেন। অমতও করেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ—আমার মেয়ের জন্যে পাত্র চাই আই-সি-এস্‌, আই-পি-এস। আমি তেমনি করেই ওকে মানুষ করেছি। ওকে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলে দুজনের কেউ সুখী হবে না। না, এতে মত আমি দেব না। দিতে পারি না।

কিন্তু তখন ওই স্বর্ণমৃগী বাঁধন পরেছে স্বেচ্ছায়। নেশায় পড়েছে। দড়ি হল—গান শেখা।

ইনি বৎসরখানেক ধরে ছুতায়নাতায় ছুটে যেতেন বম্বেতে। বম্বেতে প্র্যাকটিস করতেন কর্নেল সাহেব। শেষবার—সেবার পুজোর ছুটিতে বম্বেতে গেলেন; প্রথম দিন ওদের বাড়িতে বেড়াতে যেতেই সে ঠোঁট মচকে বলেছিল—এসেছেন! আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি নৈনীতাল।

এঁর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে উঠেছিল।

সে ব্যঙ্গ করে বলেছিল—বেচারা!

উনি চলে এসেছিলেন হোটেলে। ভাবছিলেন—তিনিও নৈনীতাল যাবেন কি না।

পরের দিন ভেবে-চিন্তে—না—নৈনীতাল যাবেন না, কন্যাকুমারী যাবেন এবং সেখান থেকে কলকাতা ফিরবেন স্থির করে টাইমটেবল দেখছেন এমন সময় বেয়ারা খবর দিয়েছিল টেলিফোন আছে।

—টেলিফোন?

—হ্যাঁ—কোন মেমসাহেব কথা বলবেন।

—মেমসাহেব?

তবে সে? টেলিফোন তখন সুলভ হয় নি। তবে কর্নেল সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন আছে। নিশ্চয় সে।

হ্যাঁ সেই। বলেছিল—কি করছেন? নৈনীতাল যাচ্ছেন নাকি?

—না।

—না?

—হ্যাঁ। যাচ্ছি—কুমারিকা।

—ও বাবাঃ। আমি উত্তরে যাব বলে আপনি একেবারে উল্‌টোমুখে—দক্ষিণে? তা—কবে?

—সম্ভবতঃ কাল।

—সম্ভবতঃ কেন? Why not—certain?

—কারণ বার্থের চেষ্টা করব। পাওয়া চাই।

—পাবেন না।

—মানে?

—সে ফোনে বলা যায় না, আপনি আসুন না!

—সন্ধ্যের সময় চেষ্টা করব। এ বেলাটা মাফ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ হয়েছিল। ইনি একটু অপ্রতিভ হয়ে ভাবছিলেন—হয়তো ঠিক হল না। ও বেলায় যাবেন কিনা তাও বিবেচনা করেছিলেন। কারণ হয় শুনবেন বেরিয়ে গেছেন, নয় শুনবেন—শরীর খারাপ, শুয়ে আছেন—মাফ

চেয়েছেন—এটা নিশ্চিত।

কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে-না-যেতে স্বর্ণমৃগী নিজেই এসে হাজির হয়েছিল। এবং বিনা ভূমিকায় বলেছিল—নৈনীতাল ক্যান্সেল করে দিলাম।

—ক্যান্সেল করে দিলেন? মানে?

—Yes, ওতে যা মানে হয় তাই। টিকিট রিফাণ্ডেড, হোটেলে arrangement cancelled—আমি যাচ্ছি না—

—কিন্তু কেন?

—আমার ইচ্ছা—আমি সোসাইটিতে গ্যাদারিঙে গাইবার জন্যে চারখানা গান শিখতে চাই।

বাঁ হাতের চারটি চম্পককলির মত আঙুল তুলে দেখিয়েছিল। এবং একটি রহস্যময় মৃদু হাসি মুখে টেনে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল কোন জাদুকর বা জাদুকরীর মত।

হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু এঁর হাসি পায় নি। অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিলেন স্বর্ণমৃগীর দিকে। মুখের হাসিটি একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল সে—এবং সে শেখাবেন আপনি।

ইনি সেটা অনুমান করেছিলেন, বলেছিলেন—বেশ তো।

—Thank you! কি বলব? মাস্টার মশাই?

—যা খুশি!

—কি চাই দক্ষিণা?

ইনি বলেছিলেন—আপনাকে মালা পরাবার ফুল যোগাবার অধিকার দেবেন। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার। আপনি হবেন রানী।

স্বর্ণমৃগী মায়াময়ী অকস্মাৎ উঠে তাঁর বুকের উপর পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—আমাকে তুমি নাও। আমাকে তুমি নাও। নইলে আমি বাঁচব না!

শুধু কথা নয়, কথার সঙ্গে কান্না।

এরপর তার বাপের বাধা হয় নি। তাঁরা দুজনে গোপনে বিয়ে করে মাদ্রাজে পালিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে গয়া। গয়াতে ছিল এঁর বাড়ি—গয়াতেই করতেন প্র্যাকটিস।

তিনি বলতেন—গয়াতে পাটনাতে এ গল্প মোটামুটি জানে সকলে। কিন্তু জানা আর বোঝা তো এক নয়। লোকে হাসে ব্যঙ্গ করে, আমাকে বলে ক্লীব! নির্বীর্য। তা বলতে পারে। বলবারই কথা কর্নেল চ্যাটার্জী—আমার শ্বশুরও আমাকে বলেছেন এ কথা। বিয়ের পর আমাকে বলেছিলেন—আমার কথা শুনলে না, বিয়ে করলে। কিন্তু এই কথাটা শুনো। আমার মেয়ে হরিণী নয় বাঘিনী, ময়ূরী নয় ঈগল। তুমি খুব সফ্‌ট্ (soft)—শক্ত হতে হবে। *She is a tigress—you be a tiger.* কিন্তু—

পুরনো কথা বলতে বলতে তিনি হাসতেন; আশ্চর্য হাসি। হঠাৎ চাঁদ মেঘে ঢেকে গেলে যে জ্যোৎস্না হয় সেই জ্যোৎস্নার মত হাসি; বলতেন—মানুষ কি বাঘ হতে পারে কাঞ্চন? অন্ততঃ যাকে ভালবেসেছি তার কাছে হতে পারি নে। তা পারি নি।

আবার কিছুক্ষণ থেমে বলতেন—তার জন্যে আমি মরতে পারতাম। বিয়ের পর গয়ায় এসে দেখলাম—এ তো তার থাকবার মত বাড়ি নয়, ঠাঁই নয়, তা ছাড়া বাড়িতে মা। আর গয়ায় যে আয়—বাবার রেখে-যাওয়া যে টাকা—তাতে তার শখ মিটিয়ে, আমার সাধ মিটিয়ে তাকে সাজিয়ে কদিন চলবে? চলে এলাম পাটনা—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করব। কদম-

কুয়াঁর দিকে বড় বাড়ি নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগলাম। মাস ছয়েক তার ভালই লেগেছিল। তারপর শুরু করলে আমার সঙ্গে ঝগড়া। যুদ্ধ! আমি কখনও আঘাত করি নি, সয়েই গেছি। সে রাগ করে আজ বম্বে, কাল কলকাতা ছুটতে লাগল। গরমের সময় পাহাড়। বাড়ি খালি। আমি একা। আমার তখন প্র্যাকটিস জমেছে। এর উপর মদের মাত্রা বাড়ল। তার বাপ তাকে গহনা দিয়েছিল—আমিও কম দিই নি। সেই নিয়ে একদিন সে চলে গেল। আর ফিরল না। বছর চারেক পর পালাল এক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে। ইংল্যাণ্ড চলে গেল। আমার সব ভেঙে গেল। পাটনায় থাকতে পারি নি। তখন লজ্জাবোধ হয়েছিল। প্র্যাকটিস তখন আমার জমাট তবুও চলে গেলাম ছেড়ে। কি হবে? গয়াতেও যেতে পারি নি—ভেবে-চিন্তে আমাদের দেশ বর্ধমানে এলাম। তারপর শান্তি কোথায় খুঁজতে খুঁজতে পেলাম পদাবলী। নিজে গাইতে জানি। এবার বুকের দুঃখ দিয়ে পদাবলীর স্বাদ পেলাম; ভগবানের শ্রীঅঙ্গের সুরভি পেলাম। বার-কয়েক যেন তাঁর ইশারা কৌতুক অনুভব করেছি। তখন থেকে কীর্তন গাই। এবার এসে-ছিলাম পাটনায় কেস নিয়ে। কলিয়ারির কেস। দাসসাহেব ব্যারিস্টার কীর্তনভক্ত। পাটনায় গেলেই ওঁর বাড়ি যেতাম। কীর্তন গাইতাম। সেবার আলাপ হল কুমারসাহেবের সঙ্গে। দাসসাহেবের বাড়ি গানের আসরে এসেছিলেন। গান শুনে ধরলেন—যেতেই হবে ওঁর বাড়ি, আজই, ঝুলনে—ওস্তাদ আসবে, জলসা হবে। না বলতে পারলাম না; ভগবানের আসর। চলে এসেছিলাম। ওস্তাদ খাঁসাহেব চিনতেন। তিনিও বললেন,—গান বাবুজী, বহুৎ রোজ গান শুনি নি আপনার।···কি করব! গাইলাম। এত বড় গুণীর অনুরোধ। তা ছাড়া সামনে মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ!

*   *   *   *

গুণীরা বাহবা দিয়েছিল, তিনি গাইতে গাইতে কেঁদেছিলেন।

"কহিনু তোমার আগে   দাগা পেলাম শ্যাম দাগে,
এ ছার জীবনে নাহি দায়।
তিল তুলসী দিয়া   সমর্পণ কৈনু হিয়া
জনমের মত রাঙা পায়।"

গাইতে গাইতে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধারা বয়ে গিয়েছিল। কেঁদেছিল অনেক—তার সঙ্গে সেও কেঁদেছিল। এক অনাস্বাদিত রস অনুভব করেছিল সে। সংগীতের ভাবরস যে এমন বস্তু তা সেদিন প্রথম অনুভব করেছিল।

পরের দিন ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেহ ছিল পরিচ্ছন্ন, মন ছিল কেমন উদাস প্রসন্ন। সেদিন ওই ওঁর জন্যেই গোটা আসরটাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছিল।

তাঁর গানের পর অবসর পেয়ে চাঁপা তাকে বলেছিল—মস্ত মানী লোক আর ভক্তলোক দিদি। আসরে গান গাইবার আগে বললে কি জানিস? বললে—একটি অনুরোধ করব হাত-জোড় করে। আমি কীর্তন গাইছি—ভগবানের নাম—সামনে গোবিন্দের মন্দির। এ আসরে আমাদের দেশের বিধানমতে ধূমপান করতে নেই। তাতে গান আর নামগান থাকে না—গান বিলাস হয়। ব্যস—কুমার বললেন—নিশ্চয়। তারপর একেবারে ভোল পালটে গেল। নিরিমিষ নয়—একেবারে হবিষ্যির আসর। শেষ কথাটা বলে সে হাসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাসতে পারে নি। হাসি যেন ঠোঁটের ডগায় এসেও আটকে গেল।

কুমারসাহেব মদ না খেয়ে থাকতে পারতেন না, তিনি উঠে গিয়ে মদ খেয়ে আর আসরে

বসেন নি—নাটমন্দিরের বাইরে চেয়ার নিয়ে আলাদা বসেছিলেন। উনি আরও গান গেয়েছিলেন। ওস্তাদের অনুরোধে তাঁদের পর হিন্দীতে বেহাগ গেয়েছিলেন—তাও ছিল রাধাকৃষ্ণের গান ; তারপর ভজন ; ঢপ-কীর্তনের সময় উঠে গিয়ে তাদের মধ্যে বসে দোয়ারকি করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনিই হয়েছিলেন মূলগায়ক।

গানের আসর শেষ হয়েছিল রাত্রি দেড়টায়। কুমারসাহেব অতিথিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গেস্টহাউসে ; সে ফিরে এসে তাঁর প্রতীক্ষা করে বসেছিল, বয়কে বলেছিল, মদের বোতল সোডা খানা সাজিয়ে রাখতে, কারণ সে লক্ষ্য করেছিল কুমারসাহেব ক'বার উঠে গিয়েছিলেন পানীয়ের ঘরে। যে ক'বার গিয়েছিলেন কুমারসাহেব তাতে তাঁর তেষ্টা মেটার কথা নয়। তিনি তেষ্টা নিয়ে আসবেন—এবং তেষ্টার ব্যবস্থা ঠিক নেই দেখলে চটে যাবেন। কিন্তু কুমার আর সেদিন আসেন নি। তার নিজেরও গলা ভিজিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হয় নি। মন যেন ভরপুর হয়ে ছিল। চোখের জল কিছুক্ষণ পড়লেই মনে হয় ভিজে মাটির মত, মেঘলা-আকাশ-দিনের মত। সেই মন নিয়েই সে শুয়ে পড়েছিল। তার ঘুম সাধারণতঃ ভাঙে একটু বেলায়, কিন্তু সেদিন ঘুম ভেঙেছিল ভোরে। তার কারণ ছিল। কানে এসে ঢুকেছিল তানপুরার ঝঙ্কারের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের রাগিণী আলাপ। ভৈরবীতে আলাপ করেছিলেন। সে আলাপের বাণী শুধুই ছিল—"রাধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—রাধা রাধা রাধা কৃষ্ণ।"

ছোঁয়াচ লেগেছিল তারও মনে। সে নিজেও গুনগুন করতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ পর ডেকেছিল তার নিজের ওস্তাদকে। ওস্তাদ বাগানবাড়িতেই থাকত। ওস্তাদকে বলেছিল —দেখুন তো ঠিক হচ্ছে কিনা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গান শেখার আসরটি জমে উঠেছিল। আসর ভেঙেছিল চাকরদের তাগিদে। বেলা হয়েছে অনেক। বিকেলবেলা কুমারসাহেবের হুকুম এসেছিল—আসর পাততে। অতিথিকে নিয়ে তিনি আসছেন।

বুকটা দুরদুর করে উঠেছিল। উনি আসবেন! উল্লাস ভয় দুই মিশে সে এক আশ্চর্য দুরু-দুরু আবেগ। কত ভাবনা ভেবেছিল! উনি কি মদ খাবেন? উনি কি—?

সন্ধ্যেবেলা কুমারসাহেব তাঁকে নিয়ে এলেন। বললেন—সকালে গান গেয়েছিলি তুই, উনি শুনেছেন। গলার সুখ্যাত করলেন—তো বললাম—চলুন শুনিয়ে দিই!

মিষ্টি হেসে তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, কণ্ঠস্বরটি ভাল। চমৎকার কণ্ঠস্বর। ঘষামাজাও হয়েছে—আরও দরকার অবশ্য।

কুমার বসেই মদ খেয়েছিলেন, তিনি খান নি। তাকে খেতে হয়েছিল। লজ্জা তার হয়েছিল। কিন্তু কুমারসাহেবের সামনে না বলার সাহস ছিল না।

তারপর কুমার বলেছিলেন—লে ধর, গান ধর।

তিনিই বরাত করেছিলেন—যা তোমার খুব ভাল শেখা আছে তাই শোনাও।

শুরু করেছিল সে খেয়াল দিয়ে। ভালই গেয়েছিল। প্রশংসা করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর কুমার তাঁকে ধরেছিলেন—আপনার একখানা হোক।

তিনিও ধরেছিলেন—খেয়াল। সেখানা শেষ হতেই সে বলেছিল—একটা কথা বলব?

হেসে তিনি বলেছিলেন—বল!

একখানা কীর্তন—

তিনি শিউরে উঠে বলেছিলেন—না। কীর্তন এখানে হয় না।

ওই এক কথাতে সব যেন কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন

—দেখ—কীর্তনের গানের কথা সুর সব ভগবানের সঙ্গে ; মানুষের সঙ্গে নয় ; শ্রোতা ওখানে উপলক্ষ। উপযুক্ত স্থান নইলে ও গান গাইতে নেই। গাইলেও আসে না। পয়সা নিয়ে আসর করে যারা কীর্তন গায়, মানুষকেই শোনায়—তাদের গানে সেইজন্য প্রাণ থাকে না। কণ্ঠে সুর, শিক্ষার জ্ঞান যতই থাক মনে ভক্তি আর পবিত্রতা না থাকলে কীর্তন হয় না ; সে মিথ্যা গাওয়া হয়। তার থেকে অন্য কিছু শোন। একটু থেমে বলেছিলেন—মির্জা গালিবের গজল জান ? শোন—এমন গজল আর হয় না। মস্ত কবি। প্রেমিক পাগল কবি। প্রিয়ার জন্যই কেঁদে গেলেন সারা জীবন। আর মজা কি জান, ওঁর সেই প্রিয়া আত্মগোপন করে—ওঁর খুব কাছাকাছি বাড়িতে থেকে ওঁর খাওয়া-পরা সেবা সব করে গেলেন—কিন্তু সামনে এলেন না। কেন জান ? উনি যদি সামনে ধরা দেন তো কবি হাতে স্বর্গ পাবেন—আর গান লিখবেন না। বলবেন—আবার কেন ? কিসের জন্য ? সুখের জন্যে গান কেন ? গান তো দুঃখের জন্যে ! দুঃখ নইলে গান হয়—কাব্য হয় ? দেওয়ানা কবি। কাঁদছেন—কেউ বারণ করেছে—তা বলেছেন—এই যে হৃদয়—এ ইটও নয়, পাথরও নয় ; এ কাঁদে কাঁদবে—কাঁদব আমি হাজার বার—তোমরা আমাকে কেউ মানা করো না। ওগো আমাকে তোমরা কাঁদতে দাও।

"রুয়েঙ্গে হম হাজারো বার হমে কই মানা না কিয়ো।" বলেই হারমোনিয়ামের রিডের উপর অত্যন্ত হাল্কা অথচ অতিক্ষিপ্র চালনায় আঙুলগুলি বুলিয়ে সুরের একটি চকিত লহরী তুলে সা থেকে নি-য়ে পৌঁছে আবার ফিরে এসে মা-এ কণ্ঠ মিলিয়ে ধরলেন—আ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা যেন স্বরমাধুরীতে ভরে গেল। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বহুজনেরই আছে ; অনেকে ঘষেমেজেও অর্থাৎ মার্জনা করেও সাধারণ স্বরকে মধুর করে তোলেন ; মধুর কণ্ঠস্বরও মার্জনায় মধুরতর হয়। কিন্তু সাধারণ মিষ্ট বস্তুর স্বাদে এবং মধুর স্বাদে একটি পার্থক্য আছে—মধুর স্বাদের মধ্যে সৌরভের আমেজ আছে, আভাস আছে ; তেমনি স্বরের মধ্যেও মাধুরীর পার্থক্য আছে ; এক এক দুর্লভ কণ্ঠস্বর আছে—যার মধ্যে পুষ্পসৌরভের আভাসের মত একটি কিছু আছে। হয়তো এক একটি রসের সৌরভ। ওঁর কণ্ঠ তেমনি একটি দুর্লভ কণ্ঠ ছিল—এবং তাতে করুণা রসের সৌরভের আমেজ। বেদনার গান হলে ওঁর গলা থেকে কান্না যেন ঝরে পড়ত।

"রুয়েঙ্গে হম্ হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।" কাঁদব আমি হাজারবার, ওগো তোমরা আমাকে কেউ মানা কয়ো না। মনে হল সত্যিসত্যিই তিনি কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন—আর সেই কান্নার দুঃখ থেকে মধু বল মধু—অপার তৃপ্তি বল তৃপ্তি—সুখ বল সুখ—আনন্দ বল আনন্দ—ঝরে পড়ছে এবং তাতে যারা শুনছে তাদের অন্তর টনটন করছে তবু অপার তৃপ্তি, অকল্পিত সুখ, আশ্চর্য আনন্দ অনুভব করছে।

হৃদয় তো মানুষের ইট নয় কাঠ নয় পাথর নয়, এই হৃদয় মানুষের বিচিত্র হৃদয়—এখানে কান্না পায়—কান্নাতেই সময়ে সময়ে শ্রেষ্ঠ সুখ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

ওঁর চোখে জলের ধারা ঝরতে চোখে দেখা যায় নি কিন্তু বুঝতে বাকী থাকে নি যে দরদর চোখের জলের ধারা ওঁর বুজে থাকা চোখের পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইবার এবং সুরে ঢংএ বৈচিত্র্যের ফুলঝুরি ফুটাবার অবকাশ যেমন গজলে আছে তেমন বুঝি আর কিছুতেই নেই ; আর মানুষের মন তাতেই মেতে ওঠে। সাধারণ গজল হলে কুমারসাহেব নাচতে শুরু করতেন কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বরে ওই বেদনার আমেজ, করুণ রসের সৌরভের আভাস অপেক্ষা করে নাচতে পারেন নি। কিন্তু হায়, হায়, সাবাস, সাবাস, আহা-হা!

এ করেছিলেন অনেক।

কাঞ্চন নিজে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

সে নিজে গান গাইত যে। বুঝত যে। তার উপর সে যে মেয়ে।

এমন গান! এমন কণ্ঠ! এত দরদ! তার উপর সে কসবীর মেয়ে হলেও তার হৃদয় ইটও নয় কাঠও নয় পাথরও নয়—তার হৃদয় নারীহৃদয়। হায় রে নারীহৃদয়! বাঁশির সুরে সে হৃদয় নিজেকে সমর্পণ করে দাসীত্ব বরণ করে নেয়।

* * *

এতকাল পরে রোগশয্যায় শুয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী আবেগ সংবরণ করতে পারলে না। হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে গুনগুন করে সেই গজলের সুরটি ভাঁজতে চেষ্টা করলে। রুয়েঙ্গে হম্ হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।

কিন্তু মুক্তামালা বারণ করলে—থাক মা। একটু চুপ করে ঘুমাও।

মা কাঞ্চন বিচিত্র হাসি হেসে বললে—সে-ই আমি মরলাম।

দুই

বারণ যে-ই করুক আর যেমনভাবেই করুক—এই কথা বলতে শুরু করে কি থামা যায়? ও হল বাঁধ-বাঁধা নদীর বাঁধ ভেঙে জল বের হতে শুরু হওয়ার মত ব্যাপার। জল বের হতে শুরু হলে আর রক্ষা নেই। ভাঙনকে খুলে খুলে প্রশস্ত এবং গভীর করে নিয়ে সে বেরিয়ে বেয়ে চলে যাবে।

কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী খানিকটা চুপ করে ছিল; দেহটা ক্লান্ত হয়েছিল; মনটাও উদাস হয়েছিল; মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল—থাক, মেয়ের কাছে এ সব কথা না বলাই ভাল। কিন্তু আসল কথাটা তো বলা হয়েই গেছে। আর যেটুকু আছে তার মধ্যে লজ্জার কি আছে, কলঙ্কের কি আছে? কিছু নেই—সে তো গৌরবের কথা। তার জীবনের তপস্যার কথা! সে কথা বলবে না কেন? সে কথা না বললে আসল কথা যে বলাই হবে না।

তিনি বলতেন—"কাঞ্চন, মানুষ হল পুণ্যের সৃষ্টি। জন্ম থেকেই তার সন্ধান পুণ্যের, আনন্দের, অমৃতের। ভুল করে পাপ সে করে, পা পিছলে পাপের পঙ্কে পড়ে; ভুল ভাঙলেই সে ফিরে আসতে চায়—অনেক সময় লজ্জায় হতাশায় পারে না—কিন্তু পারলে তাকে পাপ ধরে রাখতে পারে না। পুণ্যের দরজা খোলা ফটক—ওর দরজা কখনও বন্ধ হয় না। পাপ হল পাঁক, পুণ্য হল জল। গঙ্গার দুই তীরে আকণ্ঠ পাঁক—ওই পাঁক থেকে একটু স'রে ঠেলে গিয়ে গঙ্গার স্রোতে নামলে—সেই জলে সব ধুয়ে যায়, পায়ের তলায় বালি মেলে। সাগরসঙ্গমে তীর্থের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।"

মানুষ ভগবানের পুণ্যের সৃষ্টি। তার দেহে সব আছে—কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, কিন্তু মনে আছে পুণ্য। পাপ করে তাই শান্তি নেই, সুখ নেই—আছে লজ্জা, আছে মনস্তাপ। এই কথাটিই সে বলবে যে মেয়েকে। এ কথা বলতে গেলে—নিজের পাপের কথা বলছে—পাপ থেকে পরিত্রাণের কথাটা না বললে চলবে কেন?

মুক্তা তার পুণ্যের তপস্তার ফল।

মুক্তা তার জীবনের তপস্তা দেখেছে। তার পূজা দেখেছে—তার নামগান করা দেখেছে—তার ব্রত পালন দেখেছে। সে জেনে এসেছে তারা বৈষ্ণব। কাঞ্চনমালা যে কোন কালে দেহব্যবসায়িনী ছিল—সে যে দেহব্যবসায়িনীর কন্তা এ তো সে জানতই না। সেইটুকুই যখন জেনেছে তখন বাকীটুকু না বললে চলবে কেন ?

কাঞ্চন বললে—জানিস মুক্তো—আমি মরলাম সেদিন—সে কথাটা আমি লুকিয়েও রাখি নি—একরকম খোলাখুলি বলেছিলাম। তাঁর সামনে, কুমারের সামনে, ওস্তাদের সামনে, তবলচির সামনে বলেছিলাম। অবিশ্যি গানে।

ওঁর গান শেষ হলে কুমারসাহেব বলেছিলেন—দে, তু ইবার তুর একখানা গান শুনায়ে দে। শুধু গান লয়—নাচ সমেত। জানেন বোসসাহেব, কাঞ্চন থিয়েটারে নাচত—অ্যাক্‌টিং করত। ভাল! ভাল করত! ওঃ, মর্জিনার পাটখানা যা চুঁটায়ে করেছিল—ওঃ সি যেন কলিজের ভিতরে রক্ত ছল্‌কায়ে ছল্‌কায়ে উঠত। শরীর যেন চম্‌কায়ে চম্‌কায়ে শিরশির করত! লে—গান কর—ঘুঙুর বাঁধ! মদের গেলাস লিবি নাকি মাথায় ?

তিনি তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

হেসে বলেছিলেন—কিন্তু আমি যে নিরিমিষ বষ্টুম বোরেগী মানুষ কুমারসাহেব। গান-বাজনা ভালবাসি, ভগবানের নাম করে আসতে বললেন, নামগান—তাই এসেছিলাম লাল-পাহাড়ীর ভগবানের দরবারে; সকালে এখানে এসেছি—কাঞ্চনের গলা শুনে। ও গান গাইছিল—গেস্টহাউসে বসে শুনে ভাল লাগল—জিজ্ঞাসা করলাম—কে গাইছে? আপনি বললেন, ভাল বাঈ এখানে থাকে। শুনবেন ? মদের গেলাস কিন্তু বেশী হয়ে যাবে। তুমি এমনি নাচ।

কুমার অপ্রস্তুত হন নি—রাগও করেন নি। ওটা তিনি পারতেন। অন্ততঃ সাহেব-সুবো-উকীল-ব্যারিস্টার, বন্ধু-ইয়ার এদের সম্পর্কে পারতেন। পারতেন না চাকর-বাকর, প্রজা-খাতক, কর্মচারী মোসাহেব এদের সম্পর্কে। বোস সাহেবের কথা শুনে বলেছিলেন—এই স্থাখেন রেগে গেলেন ত? তা মিছা বলেন নাই—আপনি বোরেগী। বেরসিক লোক। জানেন—বোরেগীরা তরকারি কাটাকে বলে তরকারি বিনোনো! কাটা বললে সি তরকারি আঁষ হয়ে যায়। আপনার তাই—মদের গেলাস মাথায় করে নাচলে মদের ছোঁয়াচ লাগবে। তা লে কাঞ্চন—শুধুই নাচ।

খুব প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন কুমারসাহেব।—লে থিয়েটারের পালার একটা গান গা। সেই—ছি ছি এত্তা জঞ্জাল। এত্তা বড়া বাড়ি-মে এত্তা জঞ্জাল।

তখন কাঞ্চন তার মনের কথা-গাঁথা গান খুঁজে পেয়েছে। তার মনে পড়ে গেছে সাজাহান নাটকের সখীদের গান—

আজি এসেছি আজি এসেছি বঁধু হে
লয়ে এই হাসি রূপ গান
... ...
তোমার চরণ তলে শরণ লভিব বলে
আসিয়াছি তোমারই নিদান।
এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

চাঁদের আলো ছিল না—দিনের বেলা—তা হোক, তবুও ওই গানের কথায় আর তার মনের কথায় কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। সত্যই সেদিন সে মরলে মনে হত তার স্বর্গ। যদি তিনি তাকে তার আগে বলতেন—কাঞ্চন তোমাকে আমি ভালবাসি!

প্রাণ ঢেলে সে গেয়েছিল এবং নেচেছিল। তিনি বুঝেছিলেন কিনা তিনিই জানেন। তবে প্রশংসা করেছিলেন। কুমারসাহেব খুব খুশী হয়েছিলেন! আবার অখুশীও হয়েছিলেন। বোস-সাহেব চলে গিয়েছিলেন সেই দিনই বিকেলবেলা। সন্ধ্যেবেলা কুমারসাহেব এসে ধপ করে বসে সটান শুয়ে পড়ে বলেছিলেন—মদ আন তো কাঞ্চন।

মদের গেলাস সামনে ধরতেই কুমার বলেছিলেন—উ বেলা গান নাচ আচ্ছা হয়েছিল মাইরি। বোসবাবু খুব তারিফ করেছে।

—সত্যিই উনি খুশী হয়েছেন?

—তা হয়েছে। কিন্তুক—

স্থিরদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কুমার।

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল কাঞ্চনের। সে বুঝতে পেরেছিল চাউনি দেখে।

ভুরু নাচিয়ে কৌতুক করে কুমার বলেছিলেন—কি বেপার বল দেখি? মজেছিস? লয়?

কাঞ্চনের মনে হয়েছিল সে যেন ভয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। তবুও সে ছলাকলাপটীয়সী দেহ-ব্যবসায়িনীর মেয়ে—নিজে অভিনয় করেছে। সে বলেছিল—আপনি ক্ষ্যাপা কুমারসাহেব। মরণ আমার! মজতে যাব কেন?

কুমার খপ করে হাতখানা টেনে নিয়ে নিষ্ঠুর একটা চিমটি কেটে ধরে স্ক্রুর প্যাঁচ কষার মত চিমটিতে-ধরা মাংসটুকু ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলেন—মজবি ক্যানে? ওই শালার রূপে! শালার গুণে! বল্—বল্!

চীৎকার করে কাঁদতে ওখানে মানা। রাজাদের বাগান শুধু প্রমোদভবনই নয়—একাধারে প্রমোদভবন কারাগার দুইই। ত্রিসীমানায় লোক হাঁটে না। চীৎকার করে কাঁদলেও কেউ শুনতে পায় না, ফল হয়—বেয়াদপির অপরাধ যোগ হয় মূল অপরাধের সঙ্গে। শাস্তি বাড়ে। রুদ্ধকণ্ঠ, মর্মবিদ্ধ মানুষের মত অথবা পাখীর মত তার দেহখানা এঁকেবেঁকে গিয়েছিল—ফুঁপিয়ে লুটিয়ে পড়েও সে বলেছিল—না—না—না।

—তবে উয়ার ছামুতে তোর গান নাচ এত ভাল হল ক্যানে রে? অঁ? উঃ—একবারে রসে ঢলঢল। বান ডেকে গেল! বল্।

কাঞ্চন তবু বলেছিল সেই আর্তকণ্ঠে—না—না—না।

এবার কুমার ছেড়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু প্রশ্ন করেছিলেন—সত্যি করে বল্। লইলে সেই চাবুকটো বার করব।

কাঞ্চন সুযোগ পেয়ে শুধুই কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—উত্তর দেয় নি।

কুমার বলেছিলেন—কাঞ্চন! বল্—বলছি।

—কি বলব?

—বেপারটো কি তুর? না মজলি তো গান এমন খুলল কি করে বল্? অঁ?

কাঞ্চন বলেছিল—গানের আড়াআড়িতে। উনি এমন ভাল গাইলেন—আমি ভাল না গাইলে আমার ইজ্জত থাকবে কোথা? আপনি আমাকে রেখেছেন—আপনার ইজ্জত থাকবে কোথা?

—হুঁ! ই কথাটো তো ভাবি নাই। হুঁ! তা হলে তো অন্যায় হল। লে—এক ঢোঁক

মদ খা! লে লে কাঁদিস না মাইরী। লে এই আঙুটি টো লে। কেমন চুনি পাথরটো দেখ! লে। কাঁদিস না!

* * *

কিন্তু এ কথা লুকানো থাকে ক'দিন! একদিন না একদিন প্রকাশ হয়েই থাকে এবং তাই হল। পিঠে তার শঙ্কর মাছের চাবুক পড়েছিল সেদিন। প্রথম ঘা খেয়েই সে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল এবং স্বীকার করলে। কিন্তু সেদিন তারই ছিল জিত-পাল্লা।

কুমার তখন নতুন একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেছেন। সে মেয়ে বাঙালী নয়। হিন্দুস্থানী মেয়ে—হামিদন বাঈ। মাত্র আঠার-উনিশ বছর বয়স। বাড়ি তার কানপুর—এখানে এসে বাসা নিয়েছিল—বউবাজার স্ট্রীটে; কুমারসাহেব তার নেশায় পড়ে গেছেন। প্রথম ঘন ঘন কলকাতায় যেতে লাগলেন। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কলকাতা থেকে তার মা তাকে খবর দিলে। রাজাসাহেবের কাছে খবর পেয়ে চাঁপা খবর দিলে। মা, চাঁপা দুজনেই শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু কাঞ্চন শঙ্কিত হল না। খুশী হল।

কুমারসাহেবকে রহস্য করে সবিনয়ে জানালে যে সে জেনেছে কথাটা কিন্তু ওই পর্যন্তই—মান অভিমান কিছু করবার চেষ্টা করলে না। কুমার একটা গয়না এনেছিলেন তার জন্য—সেটা তাঁরই কাছে থেকে গেল।

রাসযাত্রার সময় লালপাহাড়ীতে আর এক ধুমধাম, সেই ধুমধামে হামিদন এল। মেয়েটা গাইতে ভাল পারে না—নাচতে পারে—আর আছে রূপ। অপরূপ রূপ।

কুমারসাহেব তাকে পাকাভাবেই এনে তুলেছিলেন বোধ হয়, কারণ বাইজীদের, ওস্তাদদের বা যাত্রাওয়ালা থিয়েটারওয়ালা যারা এই সব উৎসবে লালপাহাড়ী আসে তাদের বাসা দেবার জন্য ব্যবস্থা করা আছে। বাড়িঘরের অভাব লালপাহাড়ীর রাজ এস্টেটে নেই। রাজাসাহেব এবং কুমারসাহেবের খাস বাগানবাড়ির ইজ্জত তাঁদের অন্দরের পরেই। ওখানে সাধারণ বাইজী খেমটাওয়ালীদের থাকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু হামিদনকে বায়না করে আনা হয়েছে বলে প্রচার করেও তোলা হল কাঞ্চনের বাড়িতে। একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন কুমার-সাহেব। বললেন—শুনছ হে কাঞ্চন, এ বাইজী বড় ভারী বাইজী—বহুত আচ্ছা নাচ—তেমনি খান্‌দানী আদমী। তা ইনাকে এই বাড়িতে রাখতে হবেক। ওই উধারকার ঘরটোতে হামিদন বিবি থাকবেক, লোকজন সব নিচে থাকবেক। বুঝেছ?

ফিক্ করে হেসে সে বলেছিল—খুব বুঝেছি!

চটে গিয়েছিলেন কুমারসাহেব। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মানে?

—উনি এইখানে থাকবেন।

—হুঁ।

—আগে বললে যে আমার ঘরটাই খালি করে রাখতাম।

চমকে ওঠেন নি কুমার—সে লোক তিনি নন, তবে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—না—না; ওই উপাশের ঘর হলেই হবে।

কাঞ্চন হেসে বলেছিল—যেতে তো হবেই আমাকে, তা দুদিন আগে ঘরখানা ছেড়ে ওঁকে দিলে কি ক্ষতি হত?

—যেতে হবে মানে? তু চলে যাবার মতলব ফেঁদেছিস?

—তা চিরকাল কি একজনাতে মন ওঠে, আপনি বলুন না? আপনি হামিদনকে দেখে মজেছেন—আমিও তো কাউকে দেখে মজতে পারি! পারি না?

—তু কাকে দেখে মজলি ? বোসবাবু ?

—তা মজলে কি নিন্দের হবে ? বলুন আপনি ?

কুমারসাহেব লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর হনহন করে কোণের দিকে গিয়ে লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে আলমারির পিছন থেকে চাবুকটা বের করে এনে পিঠে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অতর্কিতে নয়—তাই নিষ্ঠুর আঘাত হলেও দাঁতে দাঁত টিপে সে সহ্য করেছিল। এবং মাথা উঁচু করেই বলেছিল—চাবুক রাখুন। আমাকে যা ঘা মারবেন শয়ে শয়ে তার খেসারত লাগবে। মরে গেলে লাশ সামলাতে পারবেন কিন্তু পুলিসে অনেক টাকা খাবে। তার উপর নমুনা দেখে হামিদন বিবি ভড়কে যাবে। তা ছাড়া এতদিন আপনার কাছে থাকলাম—আপনি পুষলেন—ছাড়াছাড়ির সময় কেন মিছে ঝগড়া করছেন বলুন! ভালয় ভালয় চলে যাব, এর পর দেখা হলে হাসিমুখে কথা বলব ; তাই ভাল নয় ? এখন রাসের সময় নানান ঠাঁই থেকে লোক এসেছে—চাবুক রাখুন। যদি ছুটে পথে বের হই তো কি হবে ভাবুন তো!

কুমারসাহেব সত্যিই চাবুক রেখেছিলেন।

এর পরে কিন্তু কুমার তাকে বলেছিলেন—না, হামিদনকে আমি রাখবার জন্যে আনি নাই কাঞ্চন। তু যাস নাই। উটা তুকে আমি পরখ করছিলাম।—এবং হে-হে করে হেসেছিলেন।

এর অবশ্য কারণ ছিল। রাজাসাহেব বলেছিলেন—ইটা খুড়া তুমি ভাল কর নাই। কলকাতা দিল্লী, লক্ষ্ণৌ যাই—জাত ধরম বাছি না—গান শুনতে যাই, রাত কাটাই, সি এক কথা, আর ই তুমি ঘরে এনে পিতিষ্ঠা করছ,—ই কেমন কথা হে! বাড়িতে ঠাকুর রইছে। জাত জাত রইছে। না, না, ই ক'র নাই।

থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল কুমারকে। কারণ এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সম্পত্তির অধিকার পর্যন্ত। সুতরাং কুমার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কাঞ্চনকে ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু কাঞ্চন বলেছিল—আর হয় না কুমারসাহেব—আমার মন উঠেছে। আপনার টাকা আছে—অনেক মেয়ে আসবে—আমি আর থাকব না।

টাকা বাড়াতে চেয়েছিলেন কুমার—তবু থাকে নি কাঞ্চন। ওই চাবুকের ঘা খেয়ে তার ভয় কেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাকে সে ভালবেসেছে তার জন্যে পাগল হয়েছে। সে যাবেই। তাকে তার পেতেই হবে। না পেলে এ জীবনে কি ফল ? কি হবে বেঁচে ? কি হবে টাকায় ? কিন্তু সেই কি সহজ ? পথে দাঁড়িয়েছিল তার মা। ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা থেকে খবর পেয়ে মা ছুটে এসেছিল।

আশ্চর্য!

এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কাঞ্চন তার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আশ্চর্য রে মুক্তো ; তাই আমি আজও ভাবি। মা আমার ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে—বিয়ের এক বছর যেতে-না-যেতে বিধবা হয়েছিল। তারপর ললাটের লেখন আর পাড়াগাঁয়ের সমাজ—তার সঙ্গে গরীবের ঘর—কপালে কলঙ্কের দাগ পড়ল—বাধ্য হয়ে এল কলকাতায়—হল কসবী খানকী। কিন্তু কসবী খানকীর অভ্যাসটা এমনভাবে পেয়ে বসল যে আমি কসবী মায়ের মেয়ে কসবী হয়েও ওই অভ্যেসটায় এত পোক্ত হতে পারি নি। ওঃ!—বলে সে শিউরে উঠল।

মা এল—ছুটে এল—শর্তমত ছাড়াবার সময় যে টাকা দেবার কথা তাই আদায় করতে।

চাবুক যখন মেরেছে তখন তার দাম পেতে হবে তাই আদায় করতে। কলকাতায় তার মা তখন দুই মেয়ের টাকায় বাড়ি কিনেছে। বাড়িউলি হয়েছে। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না।। এখানে এসে সমস্ত দেখে সে নিলে কুমারসাহেবের পক্ষ। বললে—পাগলামি করিসনে কাঞ্চন। রাজার ছেলে—ওরা• নিজের সাতপাকের পরিবারকে ঠেঙায়, পাঁচ-সাতটা বিয়ে করে—তুই তো কসবী—রক্ষিতা। এক ঘা চাবুক মেরেছে বেশ করেছে। কিছু টাকা নে। থাকতে বলছে—থেকে যা। এ রাজভোগ কোথায় মিলবে লা? আর মাসে মাসে এই টাকা?

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বলেছিল—উঁঃ-হুঁ, আমার মন উঠেছে। এ আমার ভাল লাগছে না। আমি আর থাকব না।

—হারামজাদী রাজকুমারী আমার—মন উঠেছে! মন উঠেছে কি লা? কুমার যদি এখানে মেরে পুঁতে দেয়?

—দেবে। তুমি ক্ষতিপূরণ নিয়ে বাড়ি করবে।

মা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল—শোন্। ভাল ভাল লোক বড় বড় লোক বলেছে—আমার কথা নয়; আমাদের, যারা এই বৃত্তি করে তাদের ভালবাসা মানা; তাদের প্রেম করতে নেই। করলে সর্বনাশ হয়। শেষ জীবনে ভিক্ষে করতে হয়। মনস্তাপ সার হয়, যার প্রেমে পড়ে সে শেষ পর্যন্ত একদিন ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে ফেরে। আমি শুনেছি কাঞ্চন—যার প্রেমে তুই পড়েছিস সে লোকটা উকীল। তুই ভালবাসলে সে তোকে তো ভালবাসতে পারবে না! সে তো দুর্নামের ভাগী হবে না! আমি শুনেছি তার পরিবার নেই, পালিয়েছে। বিয়ে করে নি। না করুক—করতে কতক্ষণ? ও হল সোনার হরিণ, ও ধরতে যাসনে। ভাল বললাম, মন চায় শোন—না চায় যা খুশি কর। কিন্তু দুঃখে পড়লে আমার দোরে যেন যাসনে। গেলে ঝাঁটা মেরে বিদায় করব বলে দিলাম।

বলেই মা রাগ করে চাঁপার ওখানে চলে গিয়েছিল। সে যাওয়াটা প্রায় থিয়েটারের বইয়ের চলে যাওয়ার মত। বলতে বলতে চলে যাওয়া। উইংসের ভিতরে কথা শেষ হওয়ার মত।

কাঞ্চনের মন তবু মানে নি। সোনার হরিণ—সে মায়াই হোক আর ছায়াই হোক—সে যে দেখে, তার যে ওর পিছনে না ছুটে পরিত্রাণ নেই। ভগবান ভুলেছেন সোনার হরিণে, স্বয়ং লক্ষ্মী ভুলেছেন সোনার হরিণে, সে তো সামান্য মেয়ে। ও মানা যায় না! কিন্তু ভাগ্যের ফাঁকি তপস্যায় পূর্ণ হয়। সোনার হরিণের তপস্যা যদি প্রাণপাত ক'রে করে কেউ তবে সোনার হরিণ সে পাবে—তাকে পেতে হবে। সে পেয়েছে। সেই কথাটাই তো মরণকে শিয়রে করে বলতে বসেছে মেয়েকে।

—তপস্যায় বসলে তপস্যা পূর্ণ হবার আগে নানান বাধা আসে মুক্তো। লোভ দেখায়। বলে—ধন দেব, রত্ন দেব, রাজ্য দেব, সিংহাসন দেব, সুখ দেব;—ওঠ। এ তপস্যা ছাড়।

কুমারসাহেব তাই বললেন—ওসব মতলব ছাড় কাঞ্চন। ওসব ছাড়। দেখ আমরা পুরুষমানুষ, তায় রাজা-রাজড়ার ঘরের ছেল্যা। আমাদের স্বভাব উড়নচণ্ডে। তা তোদেরও মনে কি হয় না উসব? হয়। বল তো মাইরি দিব্যি করে? হ্যাঁ। উসব জানা আছে।—উ উকীল তুকে কি দেবে রে? মুরদটা কত? শালা! এমন দশগণ্ডা উকীল আমি এক হাটে কিনে আর হাটে বেচতে পারি। শুন—তুর মাসোহারা পঞ্চাশ টাকা বাড়ায়ে দিবা

আমি। আর গয়না একটো দিব খেসারত। তুর মা বলছে—কুমারসাহেব, উকে একটো বাড়ি করে দাও। আমি বুলেছি—তাও দিব, কিন্তু কলকাতায় লয়। এইখানে পাকাবাড়ি করে দিব লালপাহাড়ীতে—শুধু বাড়ি লয়—ধানীজমি দিব দশ বিঘা। আমি মরে গেলে উই থেকে খাবি তু বুড়া বয়সে! ছেলেপুলে হয় তোর ভোগ 'করবেক; না হয়—মরে গেলে সে আবার ঘোরত হবে আমার এস্টেটে।

কাঞ্চন বলেছিল—না।

ওই একটি কথা। না। অত্যন্ত শক্ত তার কণ্ঠস্বর। সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এসেছিল—ভয়।

কুমারসাহেব তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বললি?

—না।

—না?

—হ্যাঁ।

—চোপরাও হারামজাদী কসবী। চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

শান্ত কণ্ঠে কাঞ্চন বলেছিল—দেন। পিঠ তো পাতাই আছে। এবং একটু হেসেছিল এর উপর। কুমারসাহেব বনদেশের রাজার ছেলে—বুনো বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন। —তবে রে ··অশ্লীল গালাগালি দিয়েছিলেন। এবং চাবুকটা পাক দিয়ে টেনে বের করে নিয়েছিলেন। কাঞ্চন আজও বলতে পারে না—এত বড় দুঃসাহসের জেদ সে কোথা থেকে পেয়েছিল সেদিন। বলতে পারবে না কেন? হায় মানুষের অবিশ্বাসী মন! সোনার হরিণ ছোটে—মানুষ ছোটে পিছনে। সে ছোটে পাহাড়ের মাথায় মাথায়—বনে অরণ্যের মধ্য দিয়ে। মানুষও ছোটে—লাফ দেয়, এ পাথর থেকে ও পাথরে; পড়লে অতল খাদে পড়ে প্রাণ যায়। কিন্তু প্রাণ যাবার ভয়ে সে থমকে দাঁড়ায় না, ফেরে না। বনে অরণ্যে কাঁটা কোটে—বাঘ সাপ ওত্ পেতে থাকে; সোনার হরিণ—মায়া, সে তারা দেখতে পায় না, তারা দেখে—যে মানুষ পিছনে ছুটছে তাকে। মানুষ তাদেরও ভয় করে না তখন। তাদের মুখের সামনে দিয়েই ছোটে। সে যে তখন উন্মাদ! না—। তপস্যা। তপস্যাতেই উন্মাদ করে। কাঞ্চনও তখন উন্মাদ! সে চাবুক হাতে কুমারসাহেবের সামনে একটু কাত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এই নিন। মারুন। মা—।

শেষ 'মারুন' শব্দটার 'মা'-এর পর আর উচ্চারণ করতে হয়নি। কুমার মেরেছিলেন চাবুক। লম্বা সাপের মত—না—সাপ বরফের মত ঠাণ্ডা, এ আগুনের জ্বালার মত জ্বালা ছড়িয়ে পিঠের ব্লাউজ কেটে—হাতের হাতা কেটে—থুতনির গোড়ায় ডগার গিঁটটা জ্বলন্ত পেরেকের মত বিঁধে গিয়েছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা অবাধ্য অধীর অস্থিরতা বেয়ে গিয়েছিল—চীৎকার একটা গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল। কেঁপেও সে উঠেছিল—কিন্তু আশ্চর্য একটা উন্মত্ত শক্তিতে সে অবাধ্য অস্থিরতাকে বাধ্য স্থির করতে পেরেছিল, চীৎকারকে সে টুঁটি টিপে ধরেছিল। এবং ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থেকেছিল। তখন থুতনি থেকে রক্ত পড়ছে—সে অনুভব করছিল, হাত থেকেও পড়ছিল। পিঠের কথা বুঝতে পারে নি। কিন্তু পিঠও খানিকটা কেটেছিল। কুমারসাহেব এই সহ্য করা দেখে বোধ হয় থমকে গিয়েছিলেন। কাঞ্চন আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলেছিল—থামলেন কেন? মারুন!

—কাঞ্চন! গর্জে উঠেছিলেন কুমার।

—মেরে ফেললেও হ্যাঁ বলব না।

—বলবি না!

—না। আমার জবাব ওই না।

—কাঞ্চন!

—না। •

আবার চাবুক পড়েছিল।

কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করেছিল—না।

আবার চাবুক পড়েছিল।

এবার কাঞ্চন হুবার না বলেছিল—না—না।

আবার চাবুক।

এবার বার বার 'না' বলে চীৎকার করেছিল সে—না—না—না—না—না।

ওদিকে চাবুকও আরও হুবার পড়েছিল।

সাতখানা চাবুকের দাগ তার পিঠে পায়ে আঁকা আছে। আরও পড়ত। কিন্তু সাতবারের বার খোদ রাজাসাহেব ঘরে এসে কুমারের হাত চেপে ধরে বলেছিল—কাকাসাহেব, ই কি করছ? ছি। ছাড়।

—না—ছাড়। উকে চাব্‌কিয়ে আমি মের‍্যা ফেলব। পুঁতে দিব গাড়া করে! উ বলে কি না—।

—বলুক; তুমি রাজা। উ কসবী খানকী। উয়াকে চাব্‌কিয়ে কি হবেক! উয়ার থেকে একটা কুত্তার দাম বেশী।

—উ বলে—না বলেছি—হাঁ আর বলব নাই। হাঁ উকে বলাব আমি।

—উ ঠিক বলেছে। তার লেগ্যা উকে বকশিশ দাও তুমি। মুখের থুতু তুমি ফেলা দিছ মাটিতে। মুখের থুতু তো–থুতুই গো কাকাসাহেব—মুখে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অমৃতি। মাটিতে ফেললে তখুনি থুতু—তখুন কি আর চেটে তোলা যায়? খানকী রেখেছিলে—ছিল। তুমিই হামিদনকে এনে উকে ছাড়বে ঠিক করলে—তখুনিই তো উ মাটিতে ফেলা থুতু হয়ে গেল। মদ খেয়ে নেশার বশে মাটির থুতুকে অমৃতি ভেবে তুলতে গিয়েছি—থুতু বলেছে না—না। ঠিক বলেছে উ—উকে বকশিস দাও। এস তুমি। ভাল মেয়্যা এন্যা দিব। না হয় ওই হামিদনকেই রাখ তুমি। লালপাহাড়ীর এলাকার বাইরে ওই—ওই পলাশটুঙির ঢিবিটোর মাথায় বাড়ি বানায়ে রেখে দাও। ঠিক পাহাড়ের মাথায় বাড়ির মতুন লাগবে। এ তো চার মাইল পথ। চলে যাবেক—গাড়িতে ভোঁ করে পাঁচ মিনিটে। ব্যস। রাখ, ই সব রাখ। মশা মারতে কামান দাগা। ছারপোকা মেরে হাত-গন্ধ করা। লাও ছাড়। চল এখুনি যাব কলকাতা—নিয়ে আসব হামিদনকে। ছাড়।

কুমারকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন রাজাসাহেব।

কাঞ্চন এবার ক্ষতবিক্ষত দেহে উপুড় হয়ে পড়েছে ফরাশটার উপর।

* * *

কথাটা রাজাসাহেব হয়তো তাঁদের মতে ঠিকই বলেছিলেন। তারা হয়তো থুতুই বটে। কিন্তু ওরা যে থুতু চেটেই আনন্দ পায় তাতে সন্দেহ নেই। সে সত্যটা ওরা বুঝেও বুঝতে চায় না। সংসারে যারা মানুষকে ঘৃণা করে এই কথা বলে, তাদের থেকে হীন মানুষ সৃষ্টিতে নেই। তারাই কলুষিত করেছে ভগবানের পৃথিবীকে, গোবিন্দের সংসারকে। কিন্তু আসল কথাটা কি জান কাঞ্চন—আসল কথাটা হল থানা-পুলিস।

কথাটা পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—অর্থাৎ বোস সাহেব—তার গুরু, তার ভালবাসার বিগ্রহ। বলেছিলেন—কুমারসাহেব আগে একটা খুন করেছিলেন প্রথম জীবনে। তখন ষোল-সতের বছর বয়স। এই দেশের একটি বুনোমেয়েকে নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন। সে মেয়েটিও তাঁকে ভালবেসেছিল। তাকে রেখেওছিলেন রাজবাড়িতে। তখন বাগানবাড়ি হয়নি। একদিন মেয়েটির কয়েকজন আত্মীয় এসেছিল মেয়েটির কাছে। তার মধ্যে ছিল একটি আকর্ষণীয়া মেয়ে। কুমার ক্ষেপলেন তাকে দেখে। এবং মেয়েটিকেই বললেন—নিয়ে আয় ডেকে ঘরের মধ্যে। তিনজনে বসে বিলিতি মদ খাব। বুনোমেয়েরা হাঁড়িয়া খায়, খেতে ভালবাসে। মদে লোভ আছে। তার উপর বিলাতি মদ! এ মেয়েটিও সন্দেহ করে নি—ও মেয়েটিও না। তারপর মদ খানিকটা পেটে পড়তেই কুমারের খোলস খসল। ঘরে খিল দিয়ে—ওই মেয়েটির সামনেই এই নতুন মেয়ের উপর ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু এ মেয়েও বুনোমেয়ে। কুমার চিতাবাঘ—মেয়েটা বন্যশূকরী। সেও ঝাঁপ দিল কুমারের উপর। তারপর—কিসের মধ্যে কি হল—মেয়েটা খুন হয়ে গেল। জেলাটা তো জান—ননরেগুলেটেড এলাকা। ধরলেন ডেপুটি কমিশনার। কুমার অনেক কষ্টে খালাস পেলেন। অনেক টাকা গেল। ওই কুমারেরই রাজা হবার কথা! এতেই স্থির হল—রাজা ও কখনও হবে না। আরও কথা হল—ভবিষ্যতে কুমার যদি এই ধরণের কোন অপরাধ করেন তবে সরকার আর কোন বিবেচনা তো করবেনই না, বরং নিষ্ঠুর সাজা দেবেন।

রাজাসাহেব কাঞ্চনের মায়ের কাছে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না কুমারের মেজাজ। কাঞ্চনও জানত না। জানলে এইভাবে জেদ ধরে দাঁড়াতে পারত কি না এ প্রশ্ন অন্য কেউ করে নি, কাঞ্চন নিজেই করেছিল। করেই আবার হেসেছিল। সোনার হরিণের পিছন ধরে যে ছোটে বা ছুটবার নেশায় যে ঘর থেকে ছুটে বেরুতে যায়—তার সম্মুখে সেই বের হবার মুহূর্তটিতেই যদি রাক্ষস ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দাঁড়ায় তবে সে কি করে? ভয়ে পিছন ফিরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল দেয়? না—কি করে?

হায় হায় হায়।

> পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে গড়িল কে।
> পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে তিতায় তিতিল দে।

ওই পিরিতি—ওই প্রেমেই সেই সোনার হরিণের নেশা।

সোনার হরিণ মানুষ নয়—জন্মজন্মান্তরের মনের মানুষ। ধ্যানের ধন। মনের মানুষ মনেই থাকে—হঠাৎ কোন এক জন্মে বাইরে এসে কোন ভাল-লাগা মানুষের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, প্রেম অমৃত, প্রেম গঙ্গাসাগর-সঙ্গম। ওতে যে ডুবতে পারে তার মৃত্যু নেই, সে অমর, তার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়—অপূর্ণ থাকে না। অশুচিকে শুচি করে, মর্ত্যকে স্বর্গ করে, সকল গ্লানি নাশ করে রে মুক্তো! আমার জীবনে এই ঘটেছে, আমার মরতে খেদ নেই, নরকের ভয় নেই—স্বর্গে আমি যাবই; কোন বাসনা অপূর্ণ নেই। ভক্তে আমাকে প্রণাম করেছে, পুণ্যাত্মারা আমাকে আশীর্বাদ করেছে—পাপাত্মা দুরাত্মা সংসারে কেউ জন্মায় না, কর্মদোষে পাপসংসর্গ ঘটে—দুষ্ট কাজ করে—তেমন লোক, তারাও আমাকে ভালবেসেছে; হিংসে করতে গিয়েও করে নি। সবের মূলধন আমার ওই। মানুষকে ভালবাসলাম, সে মানুষে আর ভগবানে ভেদ রইল না, আমার ভগবানকে ভালবাসা হয়ে গেল। জীবনে যাকে পাই নি মরণে তাকে পাবই।

দেহে রোগ—সম্মুখে মৃত্যু—জীবনের ভাবাবেগ মুক্তধারায় বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তারেরা

বেশী কথা বলতে বারণ করেছিল, সে কথা কাঞ্চনের মেনে চলবার সাধ্য ছিল না। মেয়ে মুক্তো কচি মেয়ে; ও যদি তার মায়ের মত পরিবেষ্টনীতে ও সংস্কারে মানুষ হত তবে এরই মধ্যে অনেক শিখত, অনেক জানত, অনেক বুঝত। দেহব্যবসায়িনীর ঘরের পরিবেশ ও সংস্কার অত্যন্ত বাস্তব, কঠিনতম ভাবে নিষ্ঠুর; রাত্রে তাদের ঘরে যত বাতি জ্বলে, যত রঙের ফুল ফোটে, যত ধনসম্পদ লুটিয়ে যায়—উড়ে যায়—সকালে তার কিছু থাকে না। এতে প্রথম বয়সে ওরা নিশ্চয় দুঃখ পায়—আঘাত লাগে; এ-জীবনে ঢুকবার আগে থেকে এসব শিক্ষা দেখে দেখে, শুনে শুনে পাওয়া সত্ত্বেও দুঃখ লাগে—কিন্তু তাতে তারা ভেঙে পড়ে না, প্রথম দু দশ দিন পরেই সয়ে যায়, তখন ওরা এতেও হাসতে শেখে—সে-হাসি যেমন-তেমন হাসি নয়, ব্যঙ্গ-কৌতুকের হাসি। কাঞ্চনও সে শিক্ষা পেয়েছিল কিন্তু মুক্তামালা পায় নি। মায়ের কথা শুনতে শুনতে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

বিবর্ণমুখে সে বললে—থাক মা থাক, আর বলো না। আর বলো না।

হাসলে কাঞ্চন। বললে—শোন মা, শুনতে হয়—শুনতে হবে। রাত্রির কথা—দুঃখের কথা—পাপের কথা শেষ হয়ে এসেছে। দিনের কথা এল। আর দুঃখ নেই। এটুকু না শুনলে মনে বল পাবি কোথা থেকে, কেমন করে?

কুমারসাহেব ভয় পেয়েছিলেন ভাইপো রাজাসাহেবের কথায়। আবার যখন হামিদনকে রাখবার কথা বললেন তখন তার সঙ্গে পেলেন উৎসাহ সান্ত্বনা। আসল জ্বালা তো তাঁর কাঞ্চন থাকছে না বলে নয়, আসল জ্বালা হামিদনকে পাচ্ছিলেন না বলে। সব রাগ তাঁর জল হয়ে গেল, ঠিক হল—সেই রাত্রেই যাবেন কলকাতা বরাবর মোটরে চেপে।

কাঞ্চন বলল—আমাকে বললে, এক হাজার টাকা নগদ পাবি—নিজের গয়নাগাঁটি পাবি, নিয়ে কাল পর্যন্ত থেকে চলে যাবি। বেঁচে গেলি!

রাজাসাহেব বললেন—না। এখন এক মাস আটক রইল—বরং আমার বাগানে চাঁপার কাছে থাকবেক। পিঠের দাগগুলা মিলাক আগে। ভূপীন্দর সিংকে বলে দিছি সে তার চাপান-টাপান লাগায়ে দাগগুলানের বেবস্থা করুক।

সে কাল ছিল আলাদা মুক্তো। ভূপীন্দর সিং ওই বাড়িতে ছিল ওই একটি কাজের জন্যে। ওর একটি বিদ্যে ছিল—সে বিদ্যেটি হল নানান পাহাড়ী গাছগাছড়ার ওষুদের বিদ্যে। ওই গাছগাছড়ার বিষবড়ি দিয়ে জানোয়ার মানুষ সব মারতে পারত। সব থেকে বড় কাজ ছিল দুটি—রাজা কুমারের হুকুমে সে নষ্ট করত সেই সব সন্তানদের, যাদের এঁরা মাটির ধুলো ছুঁতে বা আলো দেখতে দিতে চাইতেন না; আর একটি হল—মারপিট হয়ে দাগরাজি হলে—কালসিটে পড়লে—প্রলেপ চাপিয়ে দিন-দুয়েক রেখে ধুয়ে দিলে বুঝবার জো থাকত না যে সেখানে কেউ আঙুল দিয়েও টোকা মেরেছে। রাজারা মারপিট করত—ভূপীন্দর প্রলেপ লাগিয়ে দাগ মিলিয়ে দিত। বেমালুম মিলিয়ে দিত। কিন্তু মুক্তো, কেটে গেলে সে দাগ মাংস কেটে বসে; তার দাগ যায় না রে; এই দেখ—এই থুতনিতে। এই দেখ এই উপর হাতে।

হাসল কাঞ্চন।

এক মাস নয়, এক সপ্তাহ আটক ছিলাম।

রাজাসাহেব বলেছিলেন তাই ছিলাম। বলেছিলেন—এতকাল ছিলি কাঞ্চন, এই ভাবে যায় না, যাস নে।

আমি বলেছিলাম—রাজাসাহেব, ভগবানের মন্দিরে নিয়ে চলুন, সেখানে মন্দিরে হাত রেখে বলছি—আমি কারুর কাছে কোন নালিশ করব না। নালিশ যে করাবে সে তো এখানে—মা।

—আর একজন যে আছে রে।

—না। বিশ্বাস করুন রাজাসাহেব, তিনি বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তিনি ভুলেও আমার দিকে এ মন নিয়ে তাকান নি। তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয় নি, ইশারা না! রাজাসাহেব, আমি তাঁকে পাবার আশাও করি না! তবু—তবু মন মানছে না। আকাশের চাঁদ দেখে অনবুঝ মন যেমন হাত বাড়ায়, এ হাত বাড়ানো আমার তেমনি।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—হুঁ—তাই তো বড় তাজ্জব লাগছিল হে। বোস উকীলের নামটি তো অনেকদিন থেকে জানা বটে। উকীল খুব বড় নয়—তবে নিন্দের নয়। কিন্তুক মানুষটি ভাল বলে যে সবাই সুখ্যেত করে হে। তবে—তবে ইটা কি হল?—হুঁ। শুনলম যখন তাই মনে হল হে কাঞ্চন। ভাবলাম কি জান—হুঁ হুঁ বাবা মাছ সব শাখপাখুরীতেই খায় গ, ধরা শুধু পড়ে মাছারাঙাগুলা! তাই বল! ই তো তু কি বলে বিল্বমঙ্গল হয়ে যাবি গ! এঁ্যা। তা যা, হাঙ্গামা হুজুত করবি না জানি। চাঁপা রইছে ঐখানে, তবু মায়েরও সাহস হবে নাই। তা যা। এখুন তার সঙ্গে বুঝাপড়া করগা। কাকাও লিখেছে—বিদেয় করতে তুকে। সে হামিদনকে নিয়ে আসবেক।

কুমারসাহেবের চাবুকের জ্বালা আমার সব চেয়ে বড় জ্বালা নয়, তার হাতে খুন হবার ভয়ও বড় ভয় নয়, তার চেয়েও বড় জ্বালা এর পরে; আমার মায়ের কথার জ্বালা—বিষ দিয়ে মেরে দেবার ভয়, ওষুধ খাইয়ে গলা নষ্ট করে দেবার ভয়।

এলাম কলকাতা। কলকাতার আশ্রয় মায়ের আশ্রয়। মা বাড়ি করেছে আমাদের দুই বোনের পাপের টাকায়, কিন্তু সে বাড়ি তো তার।

নিজের মা, গর্ভে ধরেছে—মানুষ করেছে, অবিশ্বাস তো করি নি। মুখে মা বলেছিল—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব কিন্তু নিজের মা কি তাই পারে—এই ভেবে মনে মনে হেসেই বাড়ি এসেছিলাম। মা সঙ্গেই এসেছিল লালপাহাড়ী থেকে। পথে মুখ ভার করেই এসেছিল। কিন্তু লোকসান ভবিষ্যতের হিসেবে যত হোক—তখন আমার গায়ে গয়না—হাজার তিনেকের, আসবার সময় হাজার টাকা নগদ—পিঠের চামড়ার দাগ, এ তো ছিল। এ নিয়ে তখনকার দিনে কলকাতাতেও দু তিন বছরের জন্তে ভাবনা হবার কথা নয়। মা বলেছিল—চল আবার থিয়েটারে ঢুকবি।

আমি বলেছিলাম—না। ও আর আমার হবে না।

—হবে। মোটা একটু হয়েছিস—বসে খেয়ে খেয়ে। খাওয়া কম কর আর ফের নাচ অভ্যেস কর। শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।

—না।

মা কুচ্ছিৎ কথা বলেছিল—আমার দেহের ব্যাখ্যান করে।

আমি কথা বলি নি।

ক দিন পর মা ডেকে বলেছিল—আজ দালাল এসেছিল, বলে গিয়েছে—কয়লাকুঠির বাবুরা ক'জনা আসবে। তারা লালপাহাড়ীতে কুমারের মাইফেলে তোকে দেখেছে। আমি বলেছি ঘণ্টা ধরে কারবার আমার মেয়ের। প্রথম ঘণ্টা একশো বলব পঁচাত্তর নেব—তারপর

তিরিশ টাকা করে ঘণ্টা।

আমি বলেছিলাম—না।

—না! বাঘিনীর মত গর্জে উঠেছিল মা।

—হ্যাঁ, না। বলেছি তো বরাবর। কতবার বলব?

—তোকে পুষবে কে? আমি পারব না। বেরিয়ে যা—

—যাব। কালই চলে যাব।

—আজই যা, এখুনি যা। এই মুহূর্তে।

মুক্তো, আমি আর সইতে পারি নি রে। আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমার রোজগারের টাকা সে তো মাকেই দিয়েছি। সেই তো সব নিয়েছে। কুমারের কাছে ছিলাম, মাসকাবারে টাকা পেতাম—সব পাঠাতাম মাকে। আমি চাঁপা দুজনেই পাঠিয়েছি। মা বুঝিয়েছিল, টাকা নিজের কাছে রাখিস নে—গয়নাও না, নেহাত যা না-হলে নয় তাই রাখবি কাছে—আর কিছু রাখবি নে। খানকী কসবীর জীবন—পদ্মপত্রের জল। এই আছে এই নেই। তাছাড়া কবে কি হয় কে জানে! ধর ঝগড়া হল ঝাঁটি হল—রাজারাজড়ার ব্যাপার—গলায় ধরে বের করে দিলে—এক কাপড়ে! কি করবি? কি করবি? আমার কাছে থাকবে—আমি যার যা আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে রাখব। মা নিজের জীবন ভাড়ার বাড়িতে কাটিয়েছে। আমরা দুজনে বড় হলাম—রোজগার শুরু হল; বছর দুয়েকের মধ্যে মা বাড়ি কিনেছিল—ছোট বাড়ি, তারপর ভাগ্য খুলল—রাজা কুমারের নজরে পড়ে। সে পুরনো বাড়ি বেচে নতুন বাড়ি হল। এ বাড়ি সেই বাড়ি। মা বেরিয়ে যেতে বললে সেই বাড়ি থেকে আমি ছুটে উপরে গেলাম—আমার টাকা গয়না বের করে নেব আলমারি থেকে—খানকয়েক কাপড় নেব—নিয়ে চলে যাব।

আলমারিতে হাত দিয়েছি—আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবি পরিয়েছি, মা পিছন থেকে এসে খপ করে চাবির রিঙ চেপে ধরে খুলে নিয়ে—আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললে—বেরো, বেরো এখুনি, বেরো বাড়ি থেকে। ঘরের দরজায় মায়ের অনুচরটা। সে এক বদমাশ গুণ্ডা। ঘর সংসার ছেড়ে অনেককাল আগে মায়ের ঘরে বাসা গেড়েছিল। এককালে সে পারত সব। একালে বয়স হয়ে মায়ের বাড়ির কর্তা হয়ে ভদ্রলোকের মত কাপড় জামা পরলেও প্রয়োজনে পুরনো মানুষ বের হয়ে আসত। সে মাকে টেনে বের করে নিয়ে আমাকে ঘরে বন্ধ করে শেকল দিলে। তিন দিন ভরে রেখেছিল। খেতে দেয় নি। আমি 'হাঁ' না বললে খেতে দেবে না।

তিন দিন পর—একদিন—পেলাম সুযোগ।

সেদিন ওরা দুজনেই খেয়েছিল মদ। এই জীবনে মুক্তো মধ্যে মধ্যে মদ খাওয়ার পাগলপালা আসে। মদ নিত্যই খেত। হঠাৎ একদিন পরিমাণ, সময়—সবের ছেদ মুছে দিয়ে বোতলের পর বোতল, দিন রাত্রি খেয়ে চলত। খেতে খেতে মারামারি হত। মারামারি না হলে বেহুঁশ হয়ে পড়ত; হুঁশ হলেই আবার শুরু হত—দু দিন তিন দিন; তারপর ক্ষান্ত হত। এমনি সেদিন সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যেবেলা হল দুজনের ঝগড়া। প্রচণ্ড ঝগড়া। সেই ঝগড়ার মধ্যে মায়ের অনুচরটি দিলে আমার ঘরের শিকল খুলে। আমি পালালাম। তখন বিকেলবেলা। রাস্তায় বেরিয়ে চলেই ছিলাম; কোথায় যাব ঠিকানা ছিল না। পথে পথে ঘুরছিলাম। সম্বলের মধ্যে আট টাকা দশ আনা—একটা কাচের বাটিতে আমার ড্রয়ারে ছিল—সেটা মা জানত না—সরাতে পারে নি; নইলে প্রথম যেদিন

আমাকে ঘরে বন্ধ করে, সেই দিনই সে আমার গায়ের গয়না হাতের চুড়ি পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল। আঙুলে থেকে গিয়েছিল একটা আংটি। একটা রিক্‌শায় চেপে বললাম—চল। একবার ভাবলাম থিয়েটার যাই। একবার ভাবলাম থিয়েটারের কোন বন্ধুর কাছে যাই। কিন্তু কি করে পরিত্রাণ পাব মায়ের হাত থেকে কলকাতায় কোথাও গিয়ে! মুখ দিয়ে বের হল—হাবড়া পুলের পাশে জগন্নাথঘাট। রিকশাওয়ালাকেও বিশ্বাস করতে পারি নি। জগন্নাথঘাটে নেমে হেঁটে পুল পার হয়ে স্টেশনে এলাম।

স্টেশনে এসে বর্ধমানের টিকিট কাটলাম।

বর্ধমানে এসে কিন্তু তাঁর কাছে যাবার ভরসা হল না। কি বলে যাব? কি বলব—ভালবেসে এসেছি আমাকে আশ্রয় দাও! কিন্তু সে তো বলবে—সে কি? তুমি ভালবাস কিন্তু আমি তো—।

তিনি যে মানুষ—তিনি তো মুখে বলতে পারবেন না—ভালবাসি না। থেমে যাবেন একটু—বেদনার হাসি হাসবেন। তারপর বলবেন—তুমি সমুদ্রমন্থন করা বিষ—এ গলায় রাখতে পারেন যিনি তিনি আমি নই। সে শক্তি তো আমার নেই! তখন আমি কি বলব? কি করব? পৃথিবীকে দুভাগ হতে বললেও পৃথিবী তা হবে না—আমি কোথায় গিয়ে লুকোব?

পড়ে রইলাম বর্ধমানে সারারাত।

আকাশপাতাল ঘুরলাম মনে মনে। কোথায় যাব? মনে মনে গোবিন্দকে ডাকলাম—বললাম—যাকে ভালবাসলাম তাকে তো রূপ দেখে শুধু ভালবাসিনি, ভালবাসার মূলকথা—তাঁর মুখে তোমার নামগান শুনে। তোমাকে ভালবেসে সে কাঁদল—সেই কান্নার ছোঁয়াচ লেগে আমি কাঁদলাম। তুমি বলে দাও কোথা যাই!

মনে মনে কূলকিনারা না পেয়ে মুসাফেরখানায় অনেক কাঁদলাম। সকালবেলা মনে হল চাঁপার কাছে যাই, তারপর ভেবে ঠিক করব কোথায় যাব। দশটার সময় চড়লাম লালপাহাড়ীর ট্রেনে।

কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলাম। চারিদিক কূলকিনারাহীন বলেই নয়; যার জন্যে এত, তার দোর থেকে ফিরে এলাম। ঢুকতে ভরসা হল না, বল পেলাম না। সে আমাকে ভালবাসুক না-বাসুক—আমি তো তাকে ভালবাসি! গিয়ে সেই কথাটা বলেও আসতে পারলাম না। মুক্তো—ভাবতে ভাবতে নেমে পড়লাম আসানসোল। বেলা তখন দুটো। ফিরে যাব, বর্ধমানেই ফিরে যাব। কিন্তু হাতে টাকা কই? আট টাকার পাঁচ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। ভুলের উপর ভুল করলাম—আসানসোলে নেমে লালপাহাড়ী যাবার টিকিটখানা টিকিট কলেক্টরকে দিয়ে বেরিয়ে এলাম মুসাফেরখানায়। বর্ধমানের টিকিট করতে গিয়ে আবার কে যেন হাত চেপে ধরল।

আমি বেশ্যার মেয়ে, আমি পতিত—আমি নরকের কীট—কি করে যাব—কোন অধিকারে সেই পুণ্যাত্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর পুণ্য অঙ্গে আমার নরকের পাঁকের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে আসব? টিকিট করতে গিয়ে করতে পারলাম না, ফিরে এলাম। চুপ করে একপাশে বসে রইলাম। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম—বিপদে পড়েছি। বেলা পড়ে এসেছে, শীতের দিন। সন্ধ্যে হয়-হয়। বয়েসে তখন যুবতী; তার সঙ্গে রূপ ছিল; সে রূপকে সাজানো মাজাঘষাই তো শুধু জীবনের কাজ; যৌবন রূপ এই তো ছিল জীবনের ব্যবসার মূলধন; মাজাঘষা রূপোর বাসনের ঝকমকানি—ধুলোতে দু-চারদিন পড়ে থাকলে তো যায় না; ক'দিনের অযত্নে তা আমারও যায় নি। চুল বেঁধেছি কত বাহার করে—পাতা

কাটার কাল তখন, পাতা কেটে কেটে চুলে একটা ছাঁদ হয়ে গিয়েছিল—তাই বা যাবে কোথায় ? ধুলোমাখা চুলের মধ্যে তাও ছিল। দেখলাম—লোকের চোখ পড়েছে আমার উপর, তারা ঘুরছে-ফিরছে। শিষ কাটছে। নিজেদের মধ্যে ইশারা করছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। লালপাহাড়ীতে ছিলাম—আসানসোলের কথা শুনেছিলাম।

আসানসোলে পয়সা অনেক—পাপ অনেক—পাপী অনেক। এখানে দেশদেশান্তরের গুণ্ডা ডাকাত গোপনে আড্ডা গেড়ে থাকে। ভয় পেয়ে মুসাফেরখানা থেকে স্টেশন প্লাটফর্মে যাব বলে উঠলাম। হঠাৎ পুলিস এসে পথ আটকাল। খাকী পোশাক পরা ভদ্রলোক—বললে—থানায় যেতে হবে তোমাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ?

বললে—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। চল থানায় চল। এজাহার দিতে হবে।

আমি বললাম—আমি লালপাহাড়ী রাজবাড়ি যাব। সেখানে আমার বোন আছে। আমি ভুল করে নেমে পড়েছি। পরের ট্রেনে যাব। আমি থানায় যাব কেন ?

—যেতে হবে। আমরাই তোমার বোনকে খবর দেব। ওঠ, ওঠ। নইলে কনেস্টবল ডাকতে হবে। ওঠ।

কি করব ? ভগবানকে ডাকলাম। আবার মনে হল ভালই হল—দুষ্ট লোকের হাত থেকে তো বাঁচলাম ! রাত্রিটা তো থানায় থাকতে পাব ! কিন্তু তখন কি জানি—?

তখন জানতাম না—মুক্তো—যে ওরা পুলিস নয়। পাষণ্ডেরা পুলিস সেজে এসেছে। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—।

একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে—

ওঃ বনে এত জন্তু-জানোয়ার নেই, নরকে এত অন্ধকার নেই মুক্তো, এত প্রহার নেই, এত ভয় নেই ! তারা পাঁচজন। কি ভয়ঙ্কর তাদের হাসি—কি জ্বালা দাহ তাদের স্পর্শে। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

পরের দিন পুলিস আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল রাস্তার ধারে। রক্তাক্ত দেহ। দেহটার উপর আর অত্যাচারের শেষ ছিল না।

একটু চুপ করে গেল কাঞ্চন। মুক্তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মা বলে চলেছে এই সব কথা—তাকে—তার পেটের মেয়েকে বলে চলেছে—কিন্তু কোন অনুশোচনা নেই, কোন দুঃখ নেই—কোন ক্ষোভ নেই—খেদ নেই।

কাঞ্চন আবার বললে—ভগবান আমাকে ওই চরম শাস্তি দিলেন। বললেন—যাকে ভালোবেসেছিস তার দেহের জন্যে যে লোভ তোর, তার শাস্তি এই নে। তোর দেহের পাপের চরম শাস্তি দিলাম। সেদিন বুঝিনি মুক্তো—পরে বুঝেছি।

তিন

সে মামলা বিখ্যাত মামলা আসানসোলের।

খবরের কাগজে মস্ত হৈ-চৈ।

কাঞ্চন কিছু গোপন করে নি। সব বলেছিল। সব, অকপটে। সে বেশ্যার মেয়ে। বেশ্যাবৃত্তিই করে এসেছে। চৌদ্দ বছরে শুরু করেছিল—আজ চব্বিশ বছর। অর্থ ছাড়া কিছু চায় নি। ভোগ ছাড়া বোঝে নি। মদে ছিল প্রবল লোভ। দেহভোগের কামনা—বহু পুরুষের সঙ্গ-লালসা ছিল বিলাস; ওই ছিল সুখ। হঠাৎ কি হল তার। সমস্ততে তার অরুচি হল। এ জীবন মনে হল কণ্টকশয্যা। মনে হল—এই বিলাস এই ভোগে যেন বড় অশান্তি, বড় জ্বালা।

সে গোপন করলে না—সে একজনকে ভালবাসলে। ভালবাসলে—তার গান শুনে। কীর্তন গান শুনে। কীর্তন গান শুনে সে কেঁদেছিল—অনেক কেঁদেছিল। তারই সঙ্গে সব যেন গলে ধুয়ে মুছে গেল। সে ঠিক করলে এই পাপ সে আর করবে না। সে মস্ত এক বড়লোকের কাছে ছিল—তার আশ্রয় ছাড়লে; তার মা এর জন্যে তার গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, সে পথে বের হল।

যে-জনকে সে ভালবাসে তার কাছে সে যায় নি—তার নাম কলঙ্কিত হবে ব'লে। কোথায় বেরিয়েছিল তার ঠিক ছিল না। বেরিয়েছিল পরিত্রাণ পেতে তার মা'র চাপানো এই পাপ ব্যবসা এই ঘৃণিত জীবন থেকে। কিন্তু পৃথিবীতে পাপী ব্যভিচারী সমাজবিরোধী কুৎসিত ভয়ংকর মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পঙ্ককুণ্ড করে রেখেছে পৃথিবীকে। তারা পথে এই অসহায়া মেয়েটিকে রক্ষকের ছদ্মবেশে অপহরণ করে তার উপর পৈশাচিক অত্যাচার করেছে। মেয়েটি হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। পুলিস জোর তদন্ত করছে।

খবরের কাগজে ফলাও করে সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তার ছবি সমেত।

সে সব প্রকাশ করেছিল—কিন্তু তাঁর নাম প্রকাশ করে নি, কুমারের নামও সে বলে নি।

কুমার কিন্তু এসেছিলেন।

এসে বসে বলেছিলেন—হুঁ। তু একটো দেখালি বটে কাঞ্চন। হুঁ। তা—খুব ভাল লাগল আমার। পুলিস বল্‌বেক—

কাঞ্চন বলেছিল—আমি তো আপনার নাম করি নি কুমারসাহেব।

হেসে কুমার বলেছিলেন—তু করিস নাই কিন্তুক পুলিসের কাছে কি ছাপি থাকে গ? উয়ারা একটুকুন গন্ধ পেলে—নাড়ি নক্ষত্র সব টেনে টুনে ঠিক বার করবেক। তুর মায়ের নাম তো শুনেছে। ব্যস আর কি চাই? সব জেনেছে, তুর বোসবাবুর নাম সমেত; হুঁ তাও জেনেছে উরা।

কাঞ্চন বলেছিল—না—না—কুমারসাহেব—

—হুঁ। সে নাম উঠবে নাই—সি ভয় তু করিস নাই। আমার লাজলজ্জা নাই কাঞ্চন। আমি সিধা মানুষ। বেটাছেলে পয়সা আছে—করি—করি। হুঁ—বেআইনী হয়, দাও সাজা দাও। মামলা কর। পাপটাপ উসব আমি বুঝাপড়া করব ঠাকুরদেবতার সঙ্গে।

কিন্তু রাজাসাহেব বলে—না। মামলাতে নামটাম উঠলে চলবে নাই, উ চাপা দাও। টাকা দিয়া চেপ্যা দাও হে। হুকুম হয়ে গেছে। আমাদের নাম চাপা পড়লে বোস উকিলের নামও চাপা পড়বেক। তবে আমি যাব উয়ার কাছে। বলব—কি হল দেখ। ইটার লেগে দায় তুমার আছে কি না বল!

কাঞ্চন আকুতিভরে বলে উঠেছিল—না—না কুমারসাহেব, না। আপনার পায়ে ধরছি।

অনেকক্ষণ অভিভূতের মত বসে থেকে কুমার বলেছিলেন—তু আমার কাছে কিছু চেঁয়ে লে কাঞ্চন। আমি তুকে দিব। দিতে আমার খুব সাধ হছে রে!

একটু হেসে কাঞ্চন বলেছিল—কি নেব? বলুন কি দেবেন? যা দেবেন তাই নেব আমি!

—বেশ। আমার মন হছে কাঞ্চন তুকে আমি বর্ধমানে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে দি। আর তিরিশ টাকা করে মাসে দিব। তু বর্ধমানে থাক। মাসে একদিন করে তু লালপাহাড়ী আসবি, এই পুন্নিমেতে পুন্নিমেতে—। কীত্তনে তুর মন গলেছে—তু ঠাকুরকে কীত্তন শুনায়ে যাবি।

কেঁদে ফেলেছিল কাঞ্চন।

বলেছিল—আপনি আমার সত্যি রাজা। রাজা নয় বাদশা। নইলে দাসী বাঁদীকে এত দয়া করে কে? নোব—কুমারসাহেব নোব। আপনি যখন ডাকবেন—যাব। তবে—

হাত জোড় করে বলেছিল—মদ খাব না। নাচব না।

—বেশ, কথা রইল!

কুমার চলে গিয়েছিলেন।

দিন সাতেক পর, তখন কাঞ্চন সুস্থ হয়েছে অনেকটা। কুমারসাহেব এলেন দলিল নিয়ে। বর্ধমানে বাড়ির দলিল। তিন হাজার টাকায় ছোট একটি বাড়ি—একটা পুকুরের পাড়ে। তিনি একা নন—সঙ্গে কাঞ্চনের প্রিয়তম মানুষটি। বোসবাবুকেও নিয়ে এসেছেন। এ দলিলের কারবার তাঁর হাত দিয়েই হয়েছে। স্থির গম্ভীর মুখে সারাক্ষণ বসে থাকলেন। বুঝতে পারলে না কাঞ্চন—তিনি বিরক্ত কি প্রসন্ন। কথাও বিশেষ বললেন না। ওই দুটো চারটে।

প্রথম কথা বললেন—এখন ভাল আছ?

উত্তর দিতে গিয়ে কাঞ্চনের চোখে জল গড়িয়ে এল। মুখে কথা বলতে পারলে না—ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

এরপর কুমারসাহেব কলরব শুরু করে দিলেন। বিচিত্র মানুষ, প্রাণের উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ভরা।—এই তুর দলিল। টাকা আমার, ওই বোসসাহেব করে দিলেন। উকে বললাম—আমি মশায় মাথা গুঁজবার জাগা করে দিলাম, ইবার মনের মাথা গুঁজবার বেবস্থা আপনাকে করতে হবেক। নইলে ধম্মে পতিত হতে হবে আপনাকে।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় কথা বললেন তিনি—কাজটা ভাল কর নি তুমি। এইভাবে ঘর থেকে পালিয়ে আসা—.

সে চুপ করে ছিল।

তারপর তিনি আবার বললেন—বর্ধমানে যদি নামলে তবে তাই আমার ওখানে গেলে না কেন?

তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। বলতে পারে নি—আপনি ফিরিয়ে দিলে কি করতাম? বলতে পারে নি—কি করে বলতাম—আপনাকে ভালবেসে আপনার কাছে এসেছি। দেহের ব্যবসা যারা করে তারা ছলনা করে অভিনয় করে বলতে পারে—গলা জড়িয়ে ধরে বলতে পারে—আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সত্যিই যখন ভালবাসে তারা—তখন তা পারে না, মুখ থেকে ও কথা বের হয় না।

আবার তিনি বললেন—কি বিপদ ঘটালে বল তো?

আবার কাঁদলে কাঞ্চন।

কুমার সাহেব এবার কলরব করে উঠলেন—সব তো আপনার লেগ্যা মশায়! হুঁ। আপুনি আবার বকতে লাগলেন।

হেসে তিনি বললেন—আমার জন্যে হলে সেটা আমার লজ্জা কুমারসাহেব। তবে কীর্তন শুনে কেঁদে যদি মনে হয়ে থাকে এ পাপ করব না—যাকে ভাল লেগেছে তাকেই ভালবাসবে—তবে আলাদা কথা। তাতে আমারও কলঙ্ক নেই—ওরও পুণ্য আছে—মুক্তি আছে।

—উসব আপনাদের ভাল ভাল কথা, পুঁথির কথা, কেতাবের কথা। মানুষের কথা লয়। বুঝলেন! আপনাকে দেবতা বলে ভজেছে—

—মানুষকে দেবতা বলে ভজা ভুল কুমারসাহেব। দেবতা দেবতা, মানুষ মানুষ। তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যেও দেবতা উঁকি মারে মধ্যে মধ্যে। ওর কাছে দেবতা উঁকি মেরেছে আপনার মধ্যে দিয়ে। আপনিই ওর সত্যিকারের পথ করে দিলেন। যা ব্যবস্থা করে দিলেন—তাতে যদি ও কীর্তন শিখে শুদ্ধভাবে পেটের ভাতটা জুটিয়ে জীবন কাটাতে পারে তবে ওর মুক্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

—এই গ্যাখেন। আমার মত লোককে দেবতা বানায়ে দিলেন। একটা মাতালকে বেশ্যাখোরকে দেবতা! তা আপনারা সব পারেন মশায়—উকিল লোক—। হা-হা করে খানিকটা হেসে কুমার আবার বললেন—তো কীর্তন উ গাইবেক—তো শিখাবার ভারটো আপুনি লেন। মজালেন তো আপুনি গো! ওঃ কী গেঁয়েছিলেন—মাইরি—হ-হ-হ!

হেসেছিলেন একটু তিনি। বলেছিলেন—দেবতা নেই কোথায় কুমারসাহেব। সর্বত্র আছে—সবার মধ্যে আছে। নইলে সেই মেয়েটিই বা এই মেয়ে হয় কি করে? সব ছেড়ে পথে বের হয় কি করে? দেখুন ওর মধ্যে থেকে যে দেবতা বের হল তাকে মারবার জন্যে কি-ভাবে দল বেঁধে পিশাচরা জুটল—কি অত্যাচারটা করলে। কিন্তু মরল সে? আর আপনি? তোষামোদ তো করি নে, সে জানেন আপনি। অনেক পাপ, অনেক গলদ আপনার আছে—আবার অনেক পুণ্যও আছে। শেষ পর্যন্ত কোনটা টেঁকবে কোন্‌টা টেঁকবে না জানি না—তবে যদি দেবতা পাথর ফাটিয়ে বের হয় তবে সে দেবতা অনেক কিছু করবে দুনিয়ার জন্যে। আপনাদের রাজাসাহেব পারবেন না, আপনি পারবেন। সংসারে যারা হিসেবী তারা জীবনের ব্যালান্স শীটে হিসেব মিলিয়ে চলে; দেউলে হয়ে পিশাচও হয় না, আবার পুণ্যের ক্রেডিটে পাহাড় তুলতেও পারে না।

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেন নি। রাজাসাহেবই অনেক তদ্বির করে মামলাটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন। আসামী পুলিস বের করেছিল কিন্তু ওই তদ্বিরের ফলে তারাও খালাস হয়েছিল। তার কারণ ছিল। রাজাসাহেবের হিসেব।

লালপাহাড়ীর রাজবাড়ির অনেক কেলেঙ্কারি বের হবে। কুমারের নাম তো উঠবেই খবরের কাগজে, আদালতেও টানতে পারে! হয়তো কাঞ্চনের কাটা থুতনি পিঠের কাটা দাগও বের হতে পারে। কুমার বলেছিলেন—হোক ক্যানে হে, তাই হোক। তাই আদালতেই বলব। লাজ কিসের ইতে? আঃ! জানাজানি হল তো আমার বেগুনবাড়ি ভেসে গেল। কিসের কার ধার ধারি গ!

তবুও রাজাসাহেব হতে দেন নি।

কাঞ্চনকে হাসপাতাল থেকে ক্রীশ্চানদের আশ্রমে রাখা হয়েছিল। তার মা এসেছিল নিতে। কাঞ্চন যায় নি। রাজাসাহেব কাঞ্চনকে বলেছিলেন—শুন্ কাঞ্চন, তু লোক-গুলানকে দেখে চিনতে পারলেও চিনিস না। বুঝলি! কুমারের কেলেঙ্কারি হবে—চাঁপা আমার কাছে রইছে—আমার হবে, বোসবাবুরও হবে। আর তুকে নিয়ে আদালতে খিস্তি করবেক রে!

সে-খিস্তির নমুনাও তিনি তাকে শুনিয়েছিলেন। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়েছিল। বলেছিলেন—উয়ারা বলবেক কি জানিস? বলবেক তু নিজে গিয়েছিলি—টাকার লাগ্যে। তু তো খানকীর বেটি খানকী। তুদের তো এই করণ—এই করে তো খাস!

সে বলেছিল—না—না রাজাসাহেব। কাজ নেই। আমি চিনব না। আমি চিনব না।

রাজা বলেছিলেন—হঁ। তবে তুকে আমি কথা দিছি—উ শালার লোচ্চাদিগে আমি সাজা দিব। হঁ। কঠিন সাজা দিব। তুকে ছামুতে রেখে সাজা দিব, তুর পায়ে ধরাব।

—না। তাতেও কাজ নেই রাজাবাহাদুর! সেও চাই না আমি। কাঞ্চন বলেছিল। মনে মনে সে বলেছিল—যে পাপ জীবনে করেছি এতদিন—এ আমার সেই পাপের সাজা। এতেই যেন তার মুক্তি হয়।

তাই হয়েছে মুক্তো। ওই সাজাতেই মুক্তি আমার হয়েছে।

এর পর আমার আরম্ভ হল নতুন জন্ম রে—নতুন জন্ম। বর্ধমানের বাড়িতে এসে শাক অন্নে দিন কাটাতে লাগলাম। উনি আমার কীর্তন শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। বর্ধমানের রাজলক্ষ্মী ঢপ গাইত; ভাল গাইত। তার দলে দোহারকি করবার কাজ করে দিলেন। কিন্তু নিজে চলে গেলেন বর্ধমান থেকে। কথাটা চাপা থাকে নি। সংসারে কিছু মানুষ আছে মুক্তো, যারা দুনিয়াতে মিথ্যে অত্যাচারের প্রতিবাদ করে না, সয়েই যায়, বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি কেউ স্নেহাস্পদ জড়ানো থাকে। এই মানুষটি সেই দলের মানুষের একজন, হয়তো বা তাদের মধ্যে সেরা মানুষ। যারা ভাগ্য মানে তারা বলে এরা এই ভাগ্য নিয়েই এসেছে। আরও তাই বলতে ইচ্ছে হয়—ওঁর ভাগ্যই এই। ওঁর ভাগ্যে যে মেয়ে ওঁকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসবে সেই তাঁকে আঘাত করবে আর দুর্নামের ভাগী করবে।

একটু হেসেই কাঞ্চন মেয়েকে বললে—ঠাকুরদেবতাতে তোর বিশ্বাস তো তেমন নেই মুক্তো, আমি তো জানি। ক্রীশ্চানদের ইস্কুলে তোর যখন পড়বার ব্যবস্থা উনি করে যান, তখন আমার মত ছিল না। কিন্তু ওঁর কথার তো না আমি বলি নি কখনও। উপায়ও ছিল না। এখানকার ইস্কুলে নেবে না বলেছিল। নিলেও পাঁচজনে দশকথা কইত, সে সহ্য করা তো সহজ হত না।

মুক্তো হেসে বলেছিল—এতে আর ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছ কেন? ভাগ্য মানি আর না মানি যেমন মানুষের কথা বললে—বাবার কথা—তেমন মানুষ আছে—নিশ্চয়

আছে। মিথ্যে দুর্নাম অপবাদ সহ্য করে যায় চুপচাপ—প্রতিবাদ করে না; বরং মিষ্টি হাসি হাসে। আছে বই কি। তারা বড় মানুষ।

—না। তারা হল ভক্তমানুষ, ভগবানের কৃপা-হওয়া মানুষ। এইটেই তুই বিশ্বাস করবি কি না করবি তাই বলেছিলাম। জানিস মা—কলঙ্ক—মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েই তো ভগবান সংসারের কাছ থেকে ভক্তকে আলাদা একা করে দিয়ে নিজেই তার সর্বস্ব হয়ে বসেন। দেখ—ওঁর দেখ! তাই হল। মানুষটা তো মনে মনে সন্ন্যাসীই ছিল। তবু কাজকর্ম করছিল—সংসারেই ছিল। ভগবান বললেন—দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি। বলে আমার মত কলঙ্কিনীকে দিয়ে ভালবাসালেন—সংসারকে দিয়ে কাদা ছোঁড়ালেন—ঘর ছাড়ালেন।

কাউকে কিছু বলেন না; ওঁর কাছে যে অল্পবয়সী উকিল কাজ করত, কাজ শিখত তার হাতে কাজের ভার দিয়ে, 'কিছুদিন ঘুরে আসি, শরীর খারাপ' বলে চলে গেলেন; ওই উকিলই আমাকে মাসে কুড়ি টাকা করে দিত।

লালপাহাড়ীতে পুন্নিমেতে কেত্তন গাইতে যেতাম, তিরিশ টাকা হিসেবে পেতাম; উনি দিতেন কুড়ি, মধ্যে মধ্যে রোজগার হতো রাজলক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে ঢপ গাইতে গেলে; চলে যেত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঞ্চন বলেছিল—যা হল তার জন্যে দুঃখ ছিল না মুক্তো—খেদ ছিল—খেদ হত আমার জন্যে ঘর ছাড়লেন উনি। আর আমি ওঁর জন্যে ঘর ছেড়েও ওঁকে পেলাম না। ভগবানকে ডাকতাম—নাম গান করতাম, মনে মনে ভগবানকে চাইতাম না, চাইতাম ওঁকে। তা—। তা সে চাওয়া আমার মিথ্যে হয় নি—ওঁকে পেলাম। কিন্তু সে কি পাওয়া মুক্তো! তার থেকে—।

চুপ করে গেল কাঞ্চনমালা। এত দীর্ঘ কাহিনী বলতে গিয়েও বারেকের জন্য এমন অভিভূত হয় নি। এমন অনর্গল ধারায় চোখ থেকে তার জল পড়ে নি এই দু দিনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করে সে বললে—তিন বছর পর ঝুলন্ পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় লালপাহাড়ী গিয়েছি গান গাইতে। লালপাহাড়ীতে আমার থাকবার জায়গা করে দিয়ে ছিলেন ওঁরা ওই ঠাকুরবাড়ীতেই একপাশের একখানা ঘরে। নিরিবিলি ঘর। সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে তিলক আঁকছি—আসরে যাব, হঠাৎ লোক এসে খবর দিলে কুমারসাহেব কলকাতা থেকে একটু আগে এসেছেন—গেস্ট-হাউসে আছেন—খবর পাঠিয়েছেন যেন দেখা করি—আসরে যাবার আগেই।

বুঝলাম বরাত আছে। ফরমাশ কিছু হবে। গেস্ট-হাউস থেকে যখন ডাক এসেছে তখন গেস্ট আছে। হয়তো বরাত হবে বৈঠকী শোনাতে হবে। হয়তো বা গজল ঠুংরি—। কে জানে রাজারাজড়ার খেয়াল কখন কি হয়। হামিদনের রূপই আছে কিন্তু গাইতে হুকুম করবেন না তো। ভাবতে ভাবতেই গেলাম। ভরসার মধ্যে এই, তিন বছরের মধ্যে কুমার কথার খেলাপ করেন নি।

বারান্দায় কুমার দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—আইচিস? আর, কাকে এনেছি দেখ—। বোসবাবুকে ধরে নিয়ে আইচি। হুঁ, কলকাতাতে দেখা।

বুকখানা ধড়াস করে উঠল, তারপর সে যেন খাঁচায় বন্ধ, দম-বন্ধ-হওয়া পাখীর মত খাঁচার গায়ে ঝটপট করে মাথা কুটতে লাগল। হাত ঘেমে উঠল—পা কাঁপতে লাগল।

কুমার বলেই চলেছিলেন—শরীরটা খুব খারাপ করেছে বোস। সন্ন্যাসী হওয়া কি উন্নার

সয় ? তার উপরে যত সব আনখাই কথা। কলকাতার ডাক্তারগুলান ভালও বটে আবার মন্দও বটেক। যত সব—

ঘরের ভিতর থেকে সেই মুহূর্তটিতেই ঠিক তিনি এসে দরজায় দাঁড়ালেন—চাপা গলায় ডাকলেন—কাঞ্চন!

আমি পাথর হয়ে গেলাম মুক্তো।

সেই লম্বা মানুষ, রোগা হয়ে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। মুখের সে লাবণ্য নেই—শ্রী নেই, সোনার মত বর্ণ—সেই বর্ণের উপর যেন কে কালি-মাখা হাত বুলিয়েছে; কালিপড়া চিমনির মধ্যে আলোর রঙ যেমন দেখায়—তাই। পরনে বহির্বাসের মত থান কাপড়, গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি। সে মানুষই যেন নয়। আমার মুখে কথা ফুটল না; তিনিই আবার চাপা গলায় বললেন—ভাল আছ ?

তারপর একটু হেসে বললেন—তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। সুন্দর হয়েছ তুমি। ধবধবে সাদা লালপেড়ে গরদ পরেছ—কপালে তিলক—চমৎকার লাগছে।

আমি লজ্জা পেলাম। যত লজ্জা তত আনন্দ।

মনে মনে সারা মন যেন বলে উঠল—সব তো তোমার জন্যে। তোমার ভাল লেগেছে—আমার সব সাজ সার্থক হয়েছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—কিন্তু আপনি ? এ কি শরীর হয়েছে ? কি হয়েছে আপনার ?

চাপা গলাতেই বললেন—গলার ক্যান্সার হয়েছে। মৃত্যু-ব্যাধি কাঞ্চন।

গলায় ক্যা-ন্সা-র! মৃত্যুব্যাধি!

তিনি বলে গেলেন—চাপা গলা শুনছ না ? গলার এখন এই অবস্থা। গান গাইতাম বলে বোধ হয় অহংকার ছিল। তাই সে অহংকার তিনি চূর্ণ করে দিলেন। জল খেতেও যন্ত্রণা হয়। কলকাতা এসেছিলাম ডাক্তার দেখাতে, দেখা হল কুমারসাহেবের সঙ্গে। উনি বড় ভালবাসেন আমাকে। তোমার উপরেও মমতা খুব। জোর করে ধরে নিয়ে এলেন।

বলতে বলতে হাসলেন। হেসে এবার বললেন, ধরে নিয়ে এলেন লালপাহাড়ীর জলহাওয়ায় উনি সব সারিয়ে দেবেন আমার। গাড়িতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা। আজ পূর্ণিমা, তুমি কীর্তন গাইবে। তুমি নাকি বড় ভাল গাইছ আজকাল। শুধু ভাল গাইছ না, গাইতে গাইতে কাঁদ, সঙ্গে সঙ্গে যারা শোনে তারাও কাঁদে। তাই শুনতে এলাম—কাঁদতে এলাম। গান শুনে কাঁদবার ভাগ্য তো সহজে হয় না; নিজে না কাঁদলে তো পরে কাঁদে না। কিন্তু গাইতে গাইতে কাঁদতে পারে এমন গাইয়ে কোথায় ?

মুক্তো, গাইবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় নি—তখনই সেই মুহূর্ত থেকে কাঁদতে শুরু করেছিলাম। এ কি হল ? এ কি দেখলাম ? হে গোবিন্দ!

গোবিন্দ নাম করলে তোর মুখ অপ্রসন্ন হয় কেন মুক্তো ? নামটা মিষ্টি লাগে না, অসভ্য মনে হয়, নয় ? অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী। এক টুকরো হাসি—হ্যাঁ এক টুকরোই বটে—পড়ন্ত বেলায় অন্ধকারপ্রায় ঘরে পশ্চিম দেওয়ালের কোন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে একটি রেখার মত একটু আলো যেমন পড়ে—তেমনি সামান্য একটু হাসি তার রোগক্লিষ্ট মুখে ঠোঁটের রেখায় রেখায় ফুটে রইল।

একটু পর বললে—থাক—তোর যে নাম ভাল লাগে সেই নামেই তাঁকে ডাকিস। কিন্তু

কাউকে ডাকিস। আজ জীবনে দেখছি তো ওই একটি নামই আছে—আর কিছু নেই—কিছুই নেই। তুইও নেই।

বলে চুপ করলে কাঞ্চন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সে দিন আমি সত্যিই প্রাণ ঢেলে কীর্তন গেয়েছিলাম। তিনি বসেছিলেন সামনে। চোখ বুজে কোলের উপর হাত দুটি রেখে ধ্যানী যোগীর মত। বন্ধ চোখ দুটির কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যে মধ্যে আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল—কান্নার জন্যে। উনি একবার বলেছিলেন—গান গাইতে গাইতে কাঁদবে—তাতে গলা বন্ধ হলে তো চলবে না। এ কান্না আনন্দের কান্না।

আমার সঙ্গে ছিল বর্ধমানের আর একটি মেয়ে—রাজলক্ষ্মী মায়েরই দলের মেয়ে। সেই আসর রেখেছিল আমার গলা বন্ধ হলে।

রাত্রে গান শেষ হল। আমি গোবিন্দকে প্রণাম করে ঘরে বসলাম। তিনি হেসে অনেক প্রশংসা করে চলে গেলেন। আমি থাকতে পারলাম না। আমার সব বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

লালপাহাড়ীর পথঘাট সব আমার চেনা। তিন বছর এখানে কাটিয়েছি, এখানকার দারোয়ান চাপরাসী সকলে আমাকে চেনে। বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। গেস্টহাউসের ফটকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। থমকে যেতে হল।

বারান্দায় কুমার দাঁড়িয়ে। আরও ক'জন লোক। যেন কি কথাবার্তা হচ্ছে।

দারোয়ান বললে—বাবু—ওই বোসবাবু ফিরে এসে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।

পড়ে গিয়েছিলেন মাথা ঘুরে! আর বাধা রইল না। ছুটেই গেলাম। বললাম—কই? উনি কেমন আছেন? কুমারসাহেব!

কুমারসাহেব বললেন—এসেছিস? ভাল হইছে। আমি ভাবছিলাম তোকে ডাকি। আয়।

সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন বিছানার পাশে। বললেন—থাক, সেবা কর। বাইরে লোক থাকল। ডাক্তারবাবু, বুঝিয়ে দাও হে কখন কি করতে হবেক।

উনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—মথাটা ঘুরে গিয়েছিল। হয় নি কিছু। মধ্যে মধ্যে মাথা ঘোরে। দেহটা দুর্বল হয়েছে। তোমার থাকবার দরকার হবে না।

কাঞ্চন বলেছিল—না।

কুমারও বলেছিলেন—না মশয়—উ থাকুক। না লয়।

বেয়ারাকে বললেন—আলোটা নিবায়ে নীল আলোটা জ্বেলে দে হে!

সকালবেলা দেখলাম—

শেষরাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দেখলাম—ওঁর বুকের পাশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ওঁর হাত আমার গায়ের উপর। উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন একদৃষ্টে।

লজ্জায় মরে গেলাম।

তুই আমার মেয়ে, তুই বুঝবি না, জানবি না। আমি আমার দেহব্যবসায়-করা-মায়ের মেয়ে; আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি—এতে লজ্জা নেই; মা বলত—এতেই ভাত এতেই কাপড়। লক্ষ্মী আমাদের এতেই। এতে লজ্জা নেই আমাদের। কিন্তু—

সেদিন কিন্তু সে যে কি লজ্জা হয়েছিল আমার! শুধু লজ্জা নয়, আনন্দ। আনন্দ না হলে তো এ লজ্জা হয় না—আসে না। এ বড় মধুর! বড় মিষ্টি!

ফল ধরলে গাছ নুয়ে পড়ে।

জীবনের গাছে জীবনফল না জন্মালে তো এমন লজ্জার ভার ঘাড়ে চেপে ঘাড় নুইয়ে দেয় না।

আমার লজ্জা দেখে তিনি আশ্চর্য হেসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—যেয়ো না।

মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘেমে উঠছিলাম, একটু অপেক্ষা করে বললাম—বলুন!

—বলুন নয়, বল—বল।

পারলাম না। বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। কান্না যেন উথলে উঠল সে সমাদরে। কিন্তু কাঁদব কেমন করে তাঁর সামনে!

তিনি বললেন—সারাজীবন তো বিচ্ছেদের আঘাত পেলাম, যাকে ভালবেসেছিলাম তার—। অকৃতজ্ঞতার আঘাত—আর তার কলঙ্কের লজ্জা মাথায় করে ভগবানকে ভালবাসতে গিয়েছিলাম। গান অনেক গেয়েছি—অনেক কেঁদেছি। কিন্তু সে নিজের দুঃখে নিজের লজ্জায়। তুমি আমাকে ভালবাসলে সব ছেড়ে, অনেক দুঃখ পেলে, ঠিক আমারই মত। কাল সারারাত ঘুমুই নি, চোখ বুজে পড়েই ছিলাম। তুমি একসময় ঘুমিয়ে পড়লে—মাথাটা খাটের বাজুর উপর লুটিয়ে ছিল। বড় মমতা হল—তোমাকে টেনে বুকের কাছে নিলাম, তুমি একবার চোখ মেললে—বললাম—খাটে উঠে একপাশে শোও। তুমি হয়তো বুঝলেও না কিন্তু তাই শুলে। তোমাকে বুকে চেপেও ধরেছিলাম। মানুষের দেহ —কাঞ্চন—এ দেহে কামনাই হল কালিন্দীর স্রোত—দিন রাত—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বইছে। এরই তটে ভগবানের বাঁশি বাজে কিনা জানি না—শুনি নি—তবে বাঁশি বাজে, সেই আত্মাপুরুষের বাঁশি বাজে। সে ডাকে। কাকে ডাকে তা জানি নে—তবে এক একজনকে দেখে মনে হয় এর মধ্যেই তার বাস, একে পেলেই তাকে পাব। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া হয়ে যাবে। কাল তোমাকে মনে হয়েছে তাই। জীবনে বাকী বেশী দিন নেই, যে কটা দিন আছে, সে কটা দিন নিজেকে আমাকে দাও।

আর সহ্য করতে পারি নি। হা-হা করে কেঁদে ভেঙে পড়েছিলাম।

তুই আমার জীবনের সেই অমৃতফল মুক্তো।

তিনিই আদর করে নাম রেখেছিলেন—কাঞ্চনমালার জীবনের ফল মুক্তামালা।

তোর ভাগ্য তুই তাঁকে পেয়েও পাস নি। আট মাস বয়স হতে-না-হতে তিনি চলে গেলেন।

মুক্তো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মুখ তার যেন মাটির মূর্তির মত অথবা পাথরে গড়া। এই কয়েকদিন ধরে এ কাজ ও কাজ, মায়ের সেবার মধ্যে এই কাহিনী সে শুনে এসেছে। প্রথম দিকটায় সে আঘাত পেয়েছে। যখন সে শুনেছে তার মায়ের প্রথম দিকের কথা তখনকার আঘাত তাকে প্রায় বিহ্বল করে দিয়েছিল। যখন সে প্রথম তার বাবার আসরে এসে গান গাওয়ার কথা শুনেছে—তাঁর জীবনের লাঞ্ছিত প্রেমের কথা শুনেছে, তাঁর অসাধারণ ধৈর্যের কথা শুনেছে—তখন শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তার মন ভরে উঠেছে। তার মায়ের শেষজীবনের কথাতেও তার মায়ের উপর শ্রদ্ধা হয়েছিল। কিন্তু তারপর?

মা কাঞ্চন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। তার অন্তর যেন কঠিন কিছুর স্পর্শে

শিউরে উঠল। সে ডাকলে—মুক্তো!

মুক্তো মুখ ফেরালে তার দিকে।

মা বললে—বলবার আমার কিছু নেই আর। মরতেও খেদ নেই। এত কথা তোকে বললাম—তিনি তোকে সব কথা বলতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—কাঞ্চন, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা আমি করে গেলাম; কিন্তু ও বড় হলে ওকে অন্ধকারে রেখো না। ওকে সব কথা বলো। তাই বললাম—আর—

সে চুপ করলে।

মুক্তো তবু কোন কথা বললে না।

কাঞ্চন বললে—আর বলা এই জন্যে মুক্তো—তোকে শক্ত করে তো দাঁড় করিয়ে যেতে পারলাম না, শুধু বলে গেলাম—তোর মা আমি—আমার যে কুলেই জন্ম হোক আমি মহৎ আশ্রয়ে থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। সেই মহৎ মানুষ থেকেই তোর জন্ম। তোর বাপ যিনি—

মুক্তো বললে—তিনি আমার বাপ, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলেন না কেন বলতে পার?

কাঞ্চনকে কে যেন চাবুক মারলে। সে আর্তস্বরে বলে উঠল—মুক্তো!

মুক্তো বললে—তিনি যদি তোমাকে বিয়ে করতেন—

—বিয়ে তিনি করতে চেয়েছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে মালাচন্দন—

—মালাচন্দন! ব্যঙ্গভরে কথাটা বলে উঠল মুক্তো।

—আর কি মতে হতে পারত বল? তিনি কায়স্থ—

—কেন রেজেষ্ট্রী করে—

—হত না। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলেও তিনি তাকে ছাড়েন নি—।

—তা হলে—।

—কি বল?

—কিছু না মা; চুপ করে একটু ঘুমোও। আজ ক'দিন ধরে তো বকেই যাচ্ছ। বারণ করলেও শোন নি। এবার তো কথা শেষ হয়েছে। এবার একটু বিশ্রাম কর।

—বিশ্রাম করব রে। একেবারে বিশ্রাম।

একটু চুপ করে থেকে কাঞ্চন বললে—আজ তো বেস্পতিবার, চাঁপাকে লিখলাম—সে এল না!

—না এলে কি করবে বল? কি হবে মিথ্যা ভেবে?

—ভাবনা তোর জন্যে। সেও তো আজ গেরস্ত হয়ে ঘর বেঁধেছে। একটা ছেলে, একটি মেয়ে—তারাও ইস্কুলে পড়ছে।

একটু হেসে মুক্তো বললে—আমার জন্যে ভেবো না তুমি। আমি মিশনে চলে যাব। ক্রীশ্চান হয়ে যাব।

—মুক্তো! চীৎকার করে উঠল কাঞ্চন।

মুক্তো বলে উঠল—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম করে তোমরা অন্যায় করেছ। আমার পরিচয় কি বলতে পার মা? কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর মেয়ে—এক বোসবাবু-উকিলের এক—; বল মা বল, তুমি তার কে—কি?

কাঞ্চন রুদ্ধ রোষে উঠে বসল ধড়মড় করে, মুখ চোখ তার লাল হয়ে উঠেছে—সে বললে—আমি তাঁর দাসী। দাসী। তিনি প্রভু। আমি ভালবেসে তাঁর চরণে বিকিয়েছিলাম—

আমি তাঁর দাসী—

মুক্তো বললে—আমি সে পরিচয় আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই। নিজে কারুর দাসী হব না। তোমার প্রভুর মেয়ের পরিচয়েও আমার কাজ নেই। আমি মানুষ। আমি মেয়ে।

বলেই সে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঞ্চন একদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। থাকতে থাকতে বোধ করি আর পারলে না। ঘাড়টা লুটিয়ে দিলে বালিশের উপর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাঞ্চনমালা সেই যে ঘাড় লুটিয়ে পড়ল—সে-ঘাড় সে আর তুলতে পারলে না।

দেহ জীর্ণ হয়েছিল, মৃত্যুর পদধ্বনি সে কানে শুনছিল—তাতে হতাশা তার খুব একটা ছিল না। রোগে দীর্ঘদিন ভুগলে মানুষ অনেকটা প্রস্তুত হয়ে যায়; তার উপর এই মানসিক আঘাতটা তার বড় লাগল। জীবনের সব কথা মেয়েকে খুলে বলবার পর এই ধরণের নিষ্ঠুর ঘৃণাত্মক আক্রমণ সে মেয়ের কাছে প্রত্যাশা করে নি। মেয়ে সে কামনা করে নি। কামনা সে তাঁকে করেছিল। তাঁকে পেয়েছিল—তার ফল সে। দেহব্যবসায়িনী কাঞ্চনের কোলে যদি তুই আসতিস মুক্তো তবে তোকে আজ—। না—সে কথা আর কাঞ্চন মুখে আনবে না। তবে মুক্তো যেন তার মুখে থুথু ছুঁড়ে থুৎকার দিল। আর তার মরা বাপের উদ্দেশে আকাশে ছুঁড়ল—তা এসে তারই মুখে পড়ল। জন্মের দায় যে কত বড় দায় তার কতটুকু তুই বুঝিস ?

তোর জন্ম-কথা তুই জানিস নে, কাঞ্চন জানে।

রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা লজ্জা ভয় সব কোথায় মিলিয়ে যায়। মাটি আকাশ চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সব মুছে যায়। কেউ থাকে না, কিছু থাকে না—ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য কিছু থাকে না। সন্তান আসে—আসে তোরই মত। কিন্তু তারও কোন বাসনা থাকে না। থাকে শুধু দু'জন। দু'জন মিশে একজন হয়ে যায়।

তিনি বলতেন—। থাক তাঁর কথা, তুই তাঁকে ঘেন্না করলি—অপমান করলি, আমাকেও করলি। যাক।

তার চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে হল মেয়েকে ডেকে—। না; সে কথা কুৎসিত। বাল্য-কালে সে তাদের পাড়ায় শুনেছিল—যুবতী মেয়েকে বলেছিল বুড়ী মা!

ওই বুড়ী মা বৈশাখ মাসে কি যেন ব্রত করেছিল। যুবতী মেয়ে প্রমত্ত অবস্থায় মাকে তার যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, সেইগুলো মনে পড়ে না ? তোর পড়ছে না—কিন্তু ধর্ম তোর ভোলে নি—সে যে লজ্জায় মরে গেল। ধর্ম ? ধর্ম আবার কিসের লা বুড়ী কসবী ? মুহূর্তে মায়ের পুরনো দিনের ভাষা বেরিয়ে এল। শেষ বলেছিল—একদিন তোরও এমনি হবে দেখবি। ধর্ম আজ তোর কাছে লজ্জায় মরছে। বয়স যখন পড়বে—তখন দেখবি সে মুখ খুলে এসে বলবে—নে আমার পায়ে ধর।

থিয়েটারে চাকরির সময় সে দেখেছে। গল্প শুনেছে। এ পাপ মানুষ জন্মের দায়েও করে —তাদের সমাজে করে, আবার অন্য সমাজের—যাদের এ জন্মের দায় নেই, তারাও করে—কর্মের দায় তাদের। পাপ থেকে আবার মুক্তির টানও সবারই আছে। তুই যা বললি মুক্তো, বললি, গোবিন্দ তোকে মার্জনা করুন।

বিনোদিনী এ্যাক্ট্রেস—তোরা এখন বলবি অভিনেত্রী—তার কথা জানিস ? এত বড় এ্যাক্ট্রেস যে আজও লোকে নাম করে। বিনোদিনী তাদের জাতের। এ্যাক্ট্রেস হয়ে গিরিশ ঘোষের স্নেহ পেয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষ পরমহংস দেবের কৃপা পেয়েছিলেন। ভেলায় চড়ে মহা সমুদ্র পার। জন্ম কর্ম সব জড়িয়ে পাপের সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে গিয়েছিলেন বিনোদিনী।

তারাসুন্দরীকে সে নিজে দেখেছে। তাঁর ছেলেদের দেখেছে। বড় ছেলে থিয়েটারে কাজ

করত। আজও হয় তো করে কিম্বা অন্য কিছু করে। ছোট ছেলে খোকাকে দেখেছে। তার সমাদর দেখেছে, ছেলেটির তরিবৎ দেখেছে, তার মর্যাদা বোধ দেখেছে। খোকার মৃত্যুর পর তারাসুন্দরী ভুবনেশ্বরে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়েছেন।

কই তারা কি এমন অপমান করেছে তাদের মায়েদের ?

পাছে তার জীবনের পাপ তাকে স্পর্শ করে তাই সে তাকে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার বাপ—সেই অপরূপ মানুষ—তাকে সে আজ অপমান করলে ?

মিশনারী ইস্কুলে ওকে পড়তে দেওয়া তার ভুল হয়েছিল। ভুল তার নয়—ভুল তাঁর।

সে জানে সংসারে কেউ কারুর ভার নেয় না। সবার ভার যাঁর উপর—ভার তাঁর। কিন্তু তবু—তবু মন মানে না। চাঁপা—তার সহোদরা। শুধু তাই নয়, চাঁপাও আজ দেহব্যবসায়িনী নয়, সে গৃহস্থ, সে সংসারী। তাকে সে আসতে লিখেছে। কিন্তু এই মুক্তো কি সেখানে মানিয়ে চলতে পারবে ? পাপ জন্মে নয় কর্মে ; পাপ কারুর জীবনে অক্ষয় বট নয়, পাপ জীবনের আগাছা। নিড়েন দিয়ে ফসলের ক্ষেতের মত পরিষ্কার করলেই পুণ্যের ফসল ফলবে।

চাঁপার জীবনেও তাই ফলেছে। তার আজ স্বামী হয়েছে—ছেলেমেয়ে হয়েছে, সংসার হয়েছে। সেও ওই ভালবাসার জন্যে হয়েছে।

সুরেনদা চাঁপার স্বামী—থিয়েটারে ড্যান্সিং মাস্টার। সুরো মাস্টার। সুরো মিত্তির নেপা বোসের ছাত্র। সুরো মাস্টার মিত্তির কায়স্থবাড়ীর ছেলে। বখা ছেলে। আলিবাবার আবদালার পার্টে নেপা বোসের পরেই ছিল সুরো মাস্টারের নাম। যে দিন কুমারসাহেব তাকে থিয়েটারে মর্জিনার পার্টে দেখে তার উপর ঝুঁকেছিল, সে দিন সুরো মাস্টারই ছিল আবদালা। সেই সুরেন এখন চাঁপার স্বামী। মানুষ পাপী নয় রে মুক্তো ; পাপ তার সয় না। যৌবনের নেশার ঝোঁকে করে—ওসময় জীবন থাকে জোরালো—জীবনের ঘরে যে পরমাত্মাই বল আর আসল মানুষই বল তাকে সে কায়দা করে রাখে রে! তখন ছোটে সে পাগ্‌লা ঘোড়ার মত। মানুষের মত মানুষও তাকে বাগ মানাতে পারে না কোন রকমে, ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে বসে থাকে।

ওঃ কি মানুষই ছিল সুরেন মিত্তির। সুরো মাস্টার। কি মানুষ কি হল! মেয়েরা বলত —ঠগ সুরেন।

ঠকাত মেয়েদের। না, ঠকাতো না। নাচের দলের মেয়েদের ঘরে পালা করে রাত্রিবাস ছিল তার বাঁধা নিয়ম। যেদিন যার পালা সেখানে ঠিক গিয়ে উঠত এগারোটার পর। ওটা তার ঠকানো ব্যবসা ছিল না—ওটা ছিল তার দক্ষিণে। সে বলত—এই! আজ দক্ষিণে আদায়ে যাব।

তবে সে খাবার কিনে নিয়ে যেত। খাবারের প্রথম দফায় নুন নয় শাক নয়—মদ।

সে সব মনে করতেও তার মন কেমন ছি ছি করে। গোবিন্দ স্মরণ করে সে মনে মনে। হয়তো সুরেনও আজ করে। বলে ওঠে হরি-হরি-হরি। কিম্বা তারা-তারিণী!

কলকাতার কাছেই সুরো মিত্তিরের বাড়ি। চেহারা ভাল ছিল—গানের গলা ছিল—তালে হুঁশ ছিল। ইস্কুলে ক্লাস্ নাইন পর্যন্ত উঠেই পেয়েছিল থিয়েটার বাতিকে। ফিমেল পার্টের জন্য মেয়েলী চেহারা, গলা—যা দরকার তার ছিল, সুতরাং ইস্কুল থেকে খসে পড়ে এ্যামেচার ক্লাবে ভিড়ে গেল। এ্যামেচার থিয়েটার থেকে যা রোজগার হ'ত তাতে

তখনকার পাঁচসিকেয় পাঞ্জাবি—ন-সিকে আড়াই টাকার পেটা ধুতি—তিন-চার টাকার লপেটা—দু-আনা বাক্স কাঁইচি সিগারেটে দিন চলে যেত তার। ভাতটা ঘরে থাকতো বাড়িতে—সুরেন বলতো ফাদার'স হোটেলে মিলত। বাপ মারা যেতে ভাইরা ঝেড়ে ফেলে দিলে। বিয়েটা বাপ দেয় নি, সেও করে নি, কারণ তখনই সে ভ্রমরা হয়ে উঠেছে। এর পর মথুর শার যাত্রার দলে। প্রথম হিরোয়িন, তারপর ড্যান্সিং মাস্টার। ওই যাত্রার দলে থাকতেই নেপা বোসের সঙ্গে আলাপ। কলকাতার বড়লোক বাড়িতে যাত্রা হচ্ছিল। সেই আসরে নেপা বোস ওর নাচ দেখে ওকে ডেকে বলেছিলেন—পা তো তোমার মন্দ নয়, চেহারাখানাও আছে—গলাটা একটু মেয়েলী—সে অভ্যাস করে করেছ। তা—কি পাও? থিয়েটারে এস না। পার্টও করতে পার!

সে ঝট ক'রে ঝুঁকে পড়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

নেপা বোস পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—মারব থাপ্পড়। বলা নেই কওয়া নেই পায়ে হাত! জাত কি? বামুন নয় তো রে বাবা।

—আজ্ঞে না, কায়স্থ।

—বহুৎ আচ্ছা—নে বাবা এবার দুবার নে—ঝেড়ে-মুছে চেঁচে-ছুলে নে। কিন্তু চামড়ার জুতোর ঘামে দুর্গন্ধ বড্ড।

সে হেসেছিল।

তিনি বলেছিলেন—কাল যাস। তারপরই জিজ্ঞেস করেছিলেন—বিয়ে করেছিস?

—আজ্ঞে না।

—জিতা রহো বেটা, ঠিক লাইনে এসেছিস—। বিয়ে করিস নে।

থিয়েটারে ঢুকে সে সহজেই পথ করে নিয়েছিল। ঝোলে ঝালে অম্বলে সবেতেই সে কাজে লাগত এবং কাজে লাগবার নেশা ছিল তার। তবলা বাঁয়ায় ভাল হাত ছিল, এ্যামেচারে যাত্রায় সে মেক-আপ-ম্যানের বিদ্যে শিখেছিল—তাতেও হাত লাগাত। বড়বাবুর হুকুম শুনত, পাশে পাশে ঘুরত, ম্যানেজারকে সব খবরাখবর যোগাত, যিনি সব থেকে বড় এ্যাক্টর—তাঁর পরিচর্যা করত।

আস্তানা একটা ছিল, সেটা কালীঘাটে। হাজরা পার্কের পাশে ছিল মেথর পাড়া—তার গা ঘেঁষে ছিল একটা বেশ্যাপল্লী পোটোপাড়া—তারই কাছাকাছি একটা আড্ডা তার ছিল। সেখান থেকে উঠে এসে আড্ডা নিয়েছিল—গ্রে স্ট্রীটের কাছাকাছি শ্যামবাজারের বাজারের উপরতলায় দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। সেও শুধু নামে। সকাল বেলাতেই সে পাশবোতাম পাঞ্জাবি চড়িয়ে এসে বসত থিয়েটারের টিকিট ঘরের পাশে। পাশেই চায়ের দোকান—পান সিগারেটের দোকান। বেগুনী ফুলুরি তেলেভাজারও একটা ফুটপাথি দোকান ছিল। তেলেভাজার সঙ্গে চা, তারপর কখনও বিড়ি কখনও সিগারেট। কোন কোন দিন মালিক বড় কর্তার কেস থেকে সরানো দামী চুরোট ধরিয়ে ব'সে থাকত, তারই মত আর দু-চারজন যারা আসত তাদের সঙ্গে গল্প করত। গল্প অন্য কিছু নয়—অন্য থিয়েটারে চলতি বইগুলির সমালোচনার নামে শ্রাদ্ধ। এরই মধ্যে উপযাচক হয়ে থিয়েটারের ভিতরে যারা স্টেজে কাজ করে—তাদের সাহায্য করত। নতুন বইয়ের সময় প্রথম দশ পনের দিন সকালবেলায় গানের মেয়েরা আসত, রিহারস্যাল দিত; সুরো ড্যান্সিং মাস্টার—গানও সে জানত সুতরাং রিহারস্যাল দেওয়াতো সে-ই।

বেলা এগারোটা-বারোটায় বাসায় ফিরত, স্টোভে রান্না করত; রান্নার মধ্যে ভাতটা ফুটিয়ে নিত, আর একটা ভাজা কি তরকারী; তার সঙ্গে রেস্টুরেন্ট থেকে খানিকটা মাংস আনিয়ে নিত। তারপর নিদ্রা। আবার বিকেলে উঠে থিয়েটার। সেই বেশবাস! তবে, ওবেলাই হোক আর এবেলাই হোক—প্রত্যেক বেলাতেই মনে হ'ত পাটভাঙা জামা কাপড়। তার আর্থিক সাচ্ছল্য তার হেতু নয়, ওটি তার নিজের কৃতিত্ব। সে নিজেই কাপড় কুঁচিয়ে নিত—চমৎকার হাত ছিল ওই কোঁচানো বিদ্যাটিতে। ওই কাপড় কোঁচানো বিদ্যের জন্যই সে মালিকের প্রসাদ পেয়েছিল। মালিকের চাকরের কোঁচানো বিদ্যের হাতের চেয়েও তার হাত সরেস ছিল। মাসের প্রথমেই খান-কয়েক কাপড় তার কাছে আসত—সে সেগুলি কুঁচিয়ে ব্যাগে পুরে থিয়েটারে কর্তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রণাম ক'রে চলে যেত। এ ছাড়াও তার আর একটা কৌশল ভালভাবে জানা ছিল। সেই বাটিইস্ত্রি বিদ্যে। তখন ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ছিল না, লোহার ইস্ত্রি, তারও উনোন টুনোন নিয়ে অনেক হাঙ্গামা। বাটি-ইস্ত্রি মানে ভারি একটা কাঁসার বাটি গরম ক'রে তাই দিয়ে ইস্ত্রি ক'রে নেওয়া। ব্যাপারটায় সরঞ্জামের হাঙ্গামা কম কিন্তু ইস্ত্রিকারীর কৌশল বেশী। প্রতিবার জামাটি খুলে সঙ্গে সঙ্গে পাট এবং ইস্ত্রি করে রাখত সুরেন। কাপড় ছেড়ে পরত লুঙ্গি অথবা গামছা। এবং ছাড়া কোঁচানো কাপড়খানিকে নিয়ে আবার তার কোঁচগুলির সংস্কার করে সদ্য কোঁচানো কাপড়ের মত গুটিয়ে বেঁধে রাখত।

এই সুরো মিত্তির—বাইরে সুরো মাস্টার—নাচের মেয়েদের মহলে গোপনে সুরো নচ্ছার—প্রকাশ্যে সুরোদা। এই সুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবাক ক'রে ভালবেসে বিয়ে করেছে চাঁপাকে।

সুরোর এই বিয়ে নিয়ে থিয়েটার মহলে কম হাসি ঠাট্টা হয় নি। কিন্তু সুরো বলত—পরশমণি জান মানিক? ভালবাসা পরশমণি, ওর ছোঁয়া লাগলে লোহা সোনা হয়।

* * * *

অন্যে সে কথা বিশ্বাস করুক-না-করুক, কাঞ্চন বিশ্বাস করে। তার জীবন সোনা হয়েছে। সে সোনায় সে জীবনকে গড়েছে রাধাশ্যামের মন্দির করে; সুরো মিত্তির আর চাঁপা—তারা মন্দির গড়ে নি—এই সোনার মূলধনে গড়েছে ঘর সংসার। তারা এখন গেরস্তের মত বাস করছে।

কাঞ্চন চলে এল লালপাহাড়ী থেকে; কুমারসাহেবের বাগানে এল রূপসী হামিদন বেগম। সেখানে নতুনের ছটায় মহ্ফিলের জলুস ঝলমলিয়ে উঠল। নাচ-গান খানা-পিনা সে প্রায় বার মাসে তের পার্বণের ব্যাপার। রাজাসাহেব একটু চঞ্চল হলেন। এ পথের পথিকদের নেশা রূপেরও নয়, দেহেরও নয়, গুণেরও নয়। এ নেশা নিত্য নতুনের নেশা। রাজাসাহেব হিসেবী লোক বলেই তাঁর নতুনের নেশাটা একটু দ'মে থাকে। সংসারে যে মাতাল দাম হিসেব ক'রে মদ খায়, তার কেনা বোতলটা না শেষ হওয়া পর্যন্ত নতুন কেনে না। হোক না কেন নতুন বোতলের গড়ন সুন্দর এবং মদের রঙ ও গন্ধ নতুন রকম। অনেক ধন এবং অনেক জনের মাথায় যারা দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসে, তাদের মধ্যে এই ধরণের হিসেবী লোক কম। সেই কম লোকেদের একজন এই রাজাসাহেব। কিন্তু মন তো চঞ্চল হয়। ভিজে ঘাসে আগুনের ফুল্‌কি এসে পড়ার মত পড়ে, খানিকটা ঘাস হয়ত ঝলসে দেয়, তারপর নিভে যায়। কিন্তু বাতাস যদি অনুকূল হয় আর আকাশে যদি প্রখর রৌদ্র থাকে তবে ভিজে ঘাসকেও

শুকিয়ে নিয়ে আগুন জলে।

রাজা সাহেবের আশেপাশে পারিষদের দল ছিল সেই অনুকূল বাতাস আর জীবনের আকাশে খট্‌খটে চড়া রোদের মত। অনেক টাকার সমাগম হয়েছিল তাঁর জমিদারীর আকাশ থেকেই। বড় সাহেব-কোম্পানী কয়লা তুলে আকাশপথে তার খাটিয়ে, তারে গেঁথে টব নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল। তারা রাজার এলাকায় তার নিয়ে যাবার জন্ম সেলামী দিয়েছিল মোটা টাকা।

মোসাহেবরা রাজাসাহেবকে জপাচ্ছিল—"দেশে আর মান থাকছেক নাই, নানান জনে নানান কথা বলছেক। কুমারসাহেবের পিঁজরাতে এল নতুন পাখী, রাজা সাহেবের পিঁজরা সোনার হলে হবেক কি?—পাখীটা সেই বুড়ীধাড়ী।"

রাজা সাহেব বলেছিলেন—বলুক হে, উয়ারা জানে নাই, পুরানো চাল ভাতে বাড়েক, সহজে হজমি হয়।

পরের দিন সব থেকে পেয়ারের যে মোসাহেব—সে এল। তার পরনের কাপড়খানা জামাটা ময়লা এবং ঘামের বিশ্রী গন্ধে প্রায় অসহ্য। রাজাসাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—এই—শালার বেটা শালা!

সে বলেছিল—আজ্ঞা রাজাসাহেব!

—ই কি ক'রে এসেছিস তু? অঁ? ই কি কাপড় চোপড়?

—আজ্ঞা হুজুর—ই কাপড়খানা আজ্ঞা খুব দামী, খাস ঢাকাই, আর জামার ছিট্টা দেখেন খাস মুরশিদাবাদি। হুজুর কিনে দিয়েছেন সিবারে, আমার পরে খুশী হয়েছিলেন—সেই থিয়েটারে যিবার কাঞ্চন আর চাঁপাকে পছন্দ ক'রে আনা হল। সেই আপনি শুধালেন কোন মেয়েটা সব থেক্যা ভাল—তা আমি বললাম ওই ওইটি—চাঁপা বল্যা মেয়েটি। আপনকার মনের সঙ্গে মিলে গেল। পরের দিনে সব গেলাম উদের বাড়ি, আপনি কিনে দিলেন এই জামা কাপড়।

রাজা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—হুঁ হুঁ মনে রইছে হে, বেবাক মনে রইছে। না সে বহু-দিনকার কথা! পুরানো হইছে।

সে বলেছিল—আজ্ঞা হুজুর, পুরানোর কদর আপনি কইলেন কাল, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে, সহজে হজমি হয়।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—হঁ রে শালা, এখনও বলছি। তা কাপড়-জামা কাচাকুচি কর নাই ক্যানে হে? কি বদ গন্ধ উঠছে—শালার নাকের ফুটা ছুটো বুঁজে গেইছে নাকি হে?

—আজ্ঞা না। নাক ঠিক আছে। তা পুরানো জিনিসে গন্ধ হয়। কাচতে গেলে যি ছিঁড়ে যাবেক। পাটে পাটে এলায়ে যাবেক। চাঁপা যি চাঁপা—তাকে কাচাকুচা কর্য্যা দেখেন কি হয়। তার বদবাস আপনি পান না, আমিও পাই না এই জামা কাপড়ের।

—ওরে শালা! শূয়ারের বাচ্চা! বলে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন।—বড়া বুলেছিস রে শালার বেটা, খুব বুলেছিস!

এরপর কাঁচা ঘাস শুকিয়ে এই বাতাসে জলল মনের আগুন। ঠিক কথা। এবং যে কথা সেই কাজ—একেবারে সঙ্গে সঙ্গে। আগুন জললে তো আর ঢাকা পড়ে না! চাঁপা বাতিল হল। কিন্তু তাঁর কাজের ধারা আর কুমারসাহেবের কাজের ধারা একরকম নয়। কুমারের মেয়েমানুষ পোষার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে শুধু হৈ চৈ, দেওয়া-থোওয়ার মধ্যেই শুধু একটা আতিশয্য নেই, তাকে ছাড়বার সময় একটা ঝগড়া ক'রে তাকে চাবুক মেরে একটা

কাণ্ড না করে সোজা কথায় তাকে 'তুই চলে যা, এই নে তোর পাওনা' বলে কারবার শেষ করতে পারেন না। কিন্তু রাজাসাহেবের ধারা-ধরণ সোজাসুজি। কোন কারণে চটলে বিচিত্র সাজা দেন। চুল কামিয়ে ন্যাড়া ক'রে ভাগিয়ে দেন, টাকাকড়ি দেন না। কিন্তু জবরদস্তি টাকা প্রাপ্তির রসিদ লিখিয়ে নেন। গভীরতর অপরাধে কঠিনতর শাস্তি হয়—মেয়েটা অক্ষত দেহে যায় অনেক সাক্ষীর সম্মুখে কিন্তু তারপর আর কোথাও গিয়ে পৌছয় না। কিন্তু এই এমনই ধারার জবাবের সময় সোজা ডেকে বলেন—ইবার ফারকৎ। এবং তাকে খুশী ক'রে বিদায় করেন।

চাঁপাকে তিনি সোজাসুজি ডেকে বলেছিলেন—চাঁপা! তুর ইবার ছুটি! একটু হেসে বলেছিলেন—ই শালারা আর দেশের শালারা বদনামি করছেক। বলছেক কুমারসাহেবের এমন খুবসুরত নতুন বিবি এল আর রাজাসাহেবের সেই পুরানো বিবি—দশবছুরে বালাপোশের মতুন। তা—। তা' তুকে ছুটি দিচ্ছি। এখন বল কি লিবি তু? তু আমাকে খুশী করেছিস। হঁ—তা করেছিস! বল।

চাঁপার কাছেও কথাটা চাপা ছিল না—সে শুনতে পাচ্ছিল—সে মনে মনে তৈরি ছিল; এদিকে কাঞ্চনের সঙ্গে মায়ের যা হয়ে গেছে তা থেকে সে সাবধান হয়ে নিজের অর্জন নিজে সঞ্চয় করে শক্ত ভিতের উপরই দাঁড়িয়ে ছিল এবং হিসেবীও ছিল। সে আপত্তি না করে রাজাসাহেবের কথায় হাসি-মুখেই বলেছিল—বেশ। রাজাসাহেব যা হুকুম করবেন তাই। আমি না বলবার কে? আর সাজবেই বা কেন? তবে কাঞ্চনের মত একটা মাসোহারা করে দেন। একটা বাড়িটাড়ি করে দেন। নইলে লোকে কি বলবে?

রাজাসাহেব বাড়ি একটা কিনে দিয়েছিলেন; ভবানীপুর কালীঘাটের দক্ষিণে টালিগঞ্জ পর্যন্ত তখন কলকাতার সীমানা এগিয়ে গেছে; বজবজ রেললাইনের দক্ষিণে রসা রোডের দুই পাশে কলোনী হচ্ছে। অনেক ব্যবসাদার সস্তায় মালমসলা কিনে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছে। চাঁপাকে সেইখানে একখানা বাড়ি তিনি কিনে দিয়েছিলেন। পল্লী ভদ্রলোকের। তবে মাসোহারা সম্পর্কে বলেছিলেন—উটি হবেক নাই। উ কাকা সাহেব করে—উয়ার সাজে। আমি রাজা, আমার সাজে না। আর উ আমি ভালবাসি না হে।

চাঁপা আপত্তি করে নি। বাড়িই যথেষ্ট। বাড়ি ভাড়া দেবে—নিজে নিজের সমাজের অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া করে থাকবে এবং থিয়েটারে কাজকর্ম নেবে। এই ঠিক করেই কলকাতায় এসেছিল। মায়ের কাছে সে যায় নি। তার মায়ের তখন চরম দুর্দশা। এক অল্পবয়সী হিন্দুস্থানী পানওয়ালা তার কাছে বাড়িঘর সব দলিল করে লিখিয়ে নিয়েছে—কোকেন মরফিয়ায় অভ্যস্ত করেছে, নানান রোগে ধরেছে। দিদির অবস্থা মায়ের অবস্থা দেখে সে হিসেব করেই বোধ হয় মধ্যপন্থা নিয়েছিল। দিদি ভালবেসে হল সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী না হোক একরকম বৈরাগিনী বষ্টুমী। কেত্তন ছাড়া গান করে না। নিরিমিষ্যি খায়—। বিধবার মত বেশভূষা। ভাগ্যে মেয়েটা কোলে এসেছিল তাই, না হলে হয়তো বৃন্দাবনে গিয়ে ভিক্ষে মেগে খেত। আর ওদিকে মা হয়েছে—নেশাখোর, কোকেন—কোকেন থেকে এখন মরফিয়া ধরেছে। ওই একটা পাষণ্ডকে ধরেছিল এখন তাকে ছেড়ে, বলতে লজ্জা, ধরেছে হিন্দুস্থানী পানওয়ালা গুণ্ডাকে। ঐ দুই পথ এড়িয়ে সে পথ বেছে নিয়েছিল। ওই; চাকরি করবে থিয়েটারে, রাজার দেওয়া বাড়িটা খাটাবে ভাড়ায়। দেহ নিয়ে ব্যবসায় রুচি খুব ছিল না। রাজার আশ্রয়ে থেকে এইটুকু অন্তত হয়েছে, বহুজনায় একটা অরুচি। রাজার কাছে বাঁদীর মত থেকেও একজনকে ভজে থাকার একটা স্বাদ পেয়েছে। থিয়েটারে

চাকরিও মিলেছিল, তার বয়স তখন যায় নি। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয়। তখন থিয়েটারে শিশিরবাবুর যুগ পড়েছে—তবুও মধ্যে মধ্যে পুরনো আমল ফিরে আসে। পুরনো আমলের লোকেরা মিনার্ভা থিয়েটারে ভিড় করেছে। আত্মদর্শন নাটক খুব জমেছে। চাঁপা একদিন সন্ধ্যেবেলা একখানা রিক্‌শায় করে সেখানে গেল; মালিকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সোজাসুজি বললে—বাবা, ফিরে এসেছি, একটা চাকরি দিয়ে রাখুন। যা দেবেন। সখীর দলে নাচতে বললে তাই নাচব।

মালিক হেসে বললেন—ফিরে এলে!

—হ্যাঁ বাবা।

—আর পারবে? রাজা-রাজড়ার বাগানে এতদিন রানীগিরি করে—

—রানীগিরি নয় বাবা, বাঁদীগিরি।

—হ্যাঁ—তা বটে। তা দেহ তোমার মজবুত আছে; সখীর দলে ভালই মানাবে। পা-টাগুলো ঠিক আছে তো? অভ্যেস আছে?

—দেখুন। সে-সব ঠিক আছে। এখনও একটানা আধঘণ্টা তো সমানে নাচব।

—আচ্ছা, দেখি। ওরে দেখ তো সুরো কোথায়?

সুরো মাস্টার কাছেই ছিল। সে শুনেছিল কোথা থেকে একটি নতুন মেয়ে এসেছে। শুনে অবধি দেখবার জন্যে সে ছুঁকছুঁক করেই ফিরছিল। মালিক ডাকবামাত্র—আমাকে ডাকছেন—বলে ঘরে ঢুকে আর 'স্যার'টা বলতে অবকাশই পায় নি।

চাঁপাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—চাঁপা!

হ্যাঁ, চাঁপাই। চাঁপা যখন এখান থেকে লালপাহাড়ী যায় তখন তার আপসোসের সীমা ছিল না। সবে তখন সে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তখনও দেহ তার পরিপুষ্ট লাবণ্যে যৌবনমাধুর্যের পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠতে পারে নি। কাঞ্চনের খ্যাতি তখন বেশী, সে সখীদলের এলাকা পার হয়ে অ্যাক্‌ট্রেস হচ্ছে, চাঁপা সখীর দলে নাচত কিন্তু কি ছিল তার লাস্য, কি উজ্জ্বলতা! কি নাচের পা! চাঁপার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য ওর বিশ বছরের কম নয় কিন্তু তখন থেকেই তার রূপে লাস্যে উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই চাঁপা! লাল-পাহাড়ীর বনদেশে থেকে চাঁপার রঙে কালচে আমেজ ধরেছে কিন্তু দেহ যৌবনে কি ভরাই ভরে উঠেছে যে!

চাঁপাই বলেছিল—চিনতে পারছেন না আমাকে মাস্টারদা?

—তা পারছি। কিন্তু—কি ব্যাপার? তুমি তো লালপাহাড়ীতে থাক।

—না, আর থাকি না। চলে এসেছি।

—চলে এসেছ?

—হ্যাঁ। এখন চাকরির জন্যে এসেছি—বাবার কাছে। বাবা বলেছেন আপনার হাত।

কর্তা বলেছিলেন—হ্যাঁ। চাকরি চাচ্ছে। পুরনো মেয়ে, এতদিন থাকলে এ্যাকট্রেস হয়ে যেত। তা আর কি করবে? নিয়ে নাও। এখন নাচের দলে কাজ করুক।

সুরো বলেছিল—তা বেশ। আমাদের বাঁয়ের মুখপাতটা একটু নরমও বটে। তা ভালই হবে।

চাকরি হয়ে গিয়েছিল। চাকরি নিয়ে ফেরবার পথে রিক্‌শায় উঠে একটু পথ এসেছে একটা গলির মোড়ে, পিছনে থেকে সুরোদা এসে রিক্‌শা থামিয়ে তার পাশে বসে বলেছিল —চল!

চাঁপা প্রথমটা খুশী হয় নি। সে বলেছিল—আপনি কোথায় যাবেন?

—তোমার বাড়ি। আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকলেও করা যায় না এক্ষেত্রে; বিশেষ করে সে আমলে যেত না। থিয়েটারের ড্যান্সিং ব্যাচে কাজ করে ড্যান্সিং মাস্টারকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব ছিল। চাঁপা চুপ করেই গিয়েছিল অগত্যা। সুরো মাস্টার বলেছিল—গল্প শুনব। একটু মদ খাব। তুমি খাওয়াবে। চাকরি পেলে। কি বল?

—বলব আর কি? চলুন।

—রাগ করছ না তো?

—তা করলেই বা কি হবে? মনের রাগ মনেই রাখতে হবে।

—এই রিক্‌শা রোখ, রোখ রে বাবা। রোখ্!

চমকে গিয়ে রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। লাফ দিয়ে নেমে সুরো মাস্টার বলেছিল—আচ্ছা চললাম। কিছু মনে কোর না।

মাস তিনেক পর, নতুন একখানা বই পড়ল রিহারস্যালে। তাতে ছিল সাঁওতালি নাচ। থিয়েটারের সে আমলে এক ধরণের বিকৃত হিন্দী চলত সাঁওতালি কথা হিসাবে, আর নাচও ছিল সেই রকম একটা বিকৃত ব্যাপার। চার বছর লালপাহাড়ীতে থেকে চাঁপা সাঁওতালি কথা-নাচ সবটাই ভাল করে শিখেছিল। সে শঙ্কা এবং সংকোচের সঙ্গে সুরো মাস্টারকে বলেছিল—একটা কথা বলব সুরোদা?

—বল।

—রাগ করবেন না তো?

হেসে সুরোদা বলেছিল—করলেই বা কি বল। মনের রাগ মনেই চাপতে হবে।

এবার চাঁপাও না হেসে পারে নি, হেসে বলেছিল—বাবা বাবা!—সুরোদা কথা ভোলে না!

—না, ভুলি না। তবে কি জান—তোমার উপর রাগই করতে পারি না।

—কেন?

—সে জানি না। তোমাকে দেখলে আমার মনটাই কেমন হয়ে যায়। রাগ থাকে না। বুঝেছ! কিন্তু কি বলছ?

—বলব। এখানে নয়; আজ রিহারস্যালের পর আমার ওখানে যাবেন। নেমন্তন্ন করছি।

—জয় জয় কালী, কলকাত্তাওয়ালী।

ওই প্রথম রাত্রেই তারা বাঁধা পড়ল দুজনে দুজনের কাছে। প্রথম চাঁপা তাকে দেখালে আসল সাঁওতালি নাচ; শুধু নাচ নয়—লালপাহাড়ীতে সংগ্রহ করা সাঁওতালি শাড়ী; দেখাল সাঁওতালি চুল বাঁধার ঢঙ। সেখানে শেখা সাঁওতালি গান গেয়ে সুর শোনালে। সুরো চাঁপার রূপে মজেছিল এবার গুণে মজল। তারপর কখন দুজনে দুজনের কাছে বললে মনের কথা। আশ্চর্য, দুজনের মনের কথা এক। একটি ঘর। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে সংসার। শেষরাত্রে দুজনেই কাঁদলে। অকারণে। তারপর সকালবেলা চাঁপা বললে—আবার কবে আসবে?

সুরো বলেছিল—আজ তো নড়ছিনে। এখানেই থাকব। যাচ্ছি, বাজারটা করে আনি।

চাঁপা বলেছিল—মাছ মাংস এনো না। সুক্তো করব। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগবে। নিরিমিষ্যে।

সুরো বলেছিল—মদ ?
—এনো। তুমি খাবে, আমি না।
—তবে আমিও না !

এসব কথা চাঁপা পুরোই বলেছিল কাঞ্চনকে। কয়েকবারই তারা এর আগে এসেছে। প্রথমে বার-দুই ঘন ঘন এসেছিল। এখন সংসারী তারা। ঘোর সংসারী। তার শুরু ওই দিন। অর্থাৎ যেদিন চাঁপা সুরেনকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডাকলে।

তারপর আর সুরেন মাস্টার জীবনে চাঁপার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যায় নি। শুধু তাই নয়, মাস ছয়েক পর সুরেন মাস্টার ধুমধাম করে শাস্ত্রমতে এবং আইনমতে চাঁপাকে বিয়ে করেছিল ; থিয়েটারের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল। তারপরও বছরখানেক থিয়েটারে কাজ করেছিল দুজনে। একসঙ্গে আসত একসঙ্গে যেত—সব থেকে আশ্চর্যের কথা, সুরেন মাস্টার মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর রূপী এল চাঁপার কোলে। এরপরই চাঁপা এবং সুরেন দুজনেরই কি হ'ল সে তারাই জানে—আর জানেন গোবিন্দ—হঠাৎ তারা পিছনের জীবনের সঙ্গে সব সংস্রব কাটিয়ে হয়ে গেল পুরোদস্তুর সংসারী-সমাজের মানুষ। চাঁপাকে কাজ ছাড়িয়ে সুরেন মাস্টার উত্তরপাড়ার অভিনেত্রীদের সমাজ ছেড়ে উঠে গেল দক্ষিণে চাঁপার নিজের বাড়িতে। সকলে ভেবেছিল—সন্তান প্রসবের পর আবার চাঁপা স্টেজে আসবে কিন্তু তা চাঁপা আসে নি। শুধু তাই নয়—বছর দুয়েক পর সুরেন মাস্টারও থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল এবং ব্যবসা শুরু করেছিল। করেছিল কয়লার ডিপো। সেও চাঁপার জোরে। চাঁপা সুরেনকে পাঠিয়েছিল লালপাহাড়ী—রাজাসাহেবের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিল। রাজাসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন—সেই হুকুমে রাজার দপ্তর থেকে কয়লাকুঠির মালিকদের কাছে চিঠি গিয়েছিল ; তারা যথাসম্ভব কম দরে এবং ধারে কয়লা দিয়েছিল। সুতরাং সুরেন মাস্টারের মত মানুষও তা থেকে লোকসান খায় নি, লাভ করেছিল। কিছু-দিনের মধ্যে ওতেই সে পোক্ত হয়ে ডিপো করেছিল বড় করে এবং মানুষটাও পালটে গিয়েছিল। থিয়েটারে নিত্যরাত্রে মাখত রঙ—পরত পুরনো রঙচঙে পোশাক—তার একেবারে উল্টো—সকাল থেকে রাত্রি সাতটা পর্যন্ত কয়লার কালো ধুলো মেখে এমনই পালটাল যে মাস্টার খেতাব তার উঠে গিয়ে সেটা হয়ে গেল—কয়লাওলা। বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গা ছিল —সেইখানে ডিপো আরম্ভ করেছিল, ক্রমে কালীঘাট রেলস্টেশনের পাশে রেলের জায়গা বন্দোবস্ত নিয়ে বড় ডিপো করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ছিল—এস. মিটার এ্যাণ্ড সন্স—কোল মারচেণ্ট। থিয়েটারের ড্যান্সিং মাস্টার কোল মারচেণ্ট হয়েছিল—থিয়েটারের সখীর দলের সখী—এক দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—রাজাসাহেবের রক্ষিতা পতিতা চাঁপা—সেও হয়েছিল গৃহস্থ-ঘরের গৃহিণী এবং পুত্রকন্যার মা।

ইদানীং তারা কম আসছে। অবসর নেই। ঘরসংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদের সংসার সুখের সংসার।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝ'রে পড়ল কাঞ্চনমালার বুক থেকে। সেটা পড়ল—তার নিজের কথা ভেবে। চাঁপা এবং সুরেন গৃহস্থ হয়েছে এ কথা সত্য কিন্তু তারা ঘোর বিষয়ী। বছরখানেক আগে যখন কাঞ্চন কলকাতায় গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে তখন ওদের ওখানেই উঠেছিল। মুক্তোকে নিয়ে যায় নি। মুক্তোকে তখনও রেখেছিল মিশনারী বোর্ডিংয়ে। সঙ্গে নিয়ে যায়

নি বলে মনে মনে সে গোবিন্দকে প্রণাম জানিয়েছিল। কারণ সেখানে গিয়ে সে যা দেখেছিল তাতে তার তৃপ্তি হয় নি। চাঁপা সুরেনের গৃহস্থালীতে পুরনো কালের পুরনো জীবনের ছাপ মুছে যায় নি। যেন ইচ্ছে করেই তারা মোছে নি।

দেওয়ালে সেকালের থিয়েটারের সাজে এবং ভঙ্গিতে তোলা চাঁপার এবং সুরেনের ফটো টাঙানো ছিল। চাঁপার ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই ইস্কুলে পড়ে, তারা থিয়েটারের গল্পে মশগুল এবং পঞ্চমুখ। শুরু করে একালের ছবির অভিনয় নিয়ে, তার সঙ্গে চলে আসে সেকালের গল্প। গিরিশবাবু, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত বোস, অমৃত মিত্তির, দানীবাবু—এমন কি কাশীবাবু, নেপা বোস, অহীন বোস ভাল অভিনেতা, না একালের শিশিরবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্তির, ছবি বিশ্বাস ভাল অভিনেতা এই নিয়ে তর্ক প্রায় দৈনন্দিন। অভিনেত্রীদেরও নাম মুখস্থ। বিনোদিনী তারাসুন্দরী তিনকড়ি থেকে একালের কাননবালা চন্দ্রাবতী পদ্মাবতী ছায়াদেবী কার নাম না জানে ওরা! এমন কি হালে এসেছে কে সুনন্দা দেবী তার নকলও করে দীপা। চাঁপার মেয়ে দীপা। তাদের ঝগড়া হলে সুরেন মীমাংসা করে দেয়। চাঁপা মীমাংসা করতে যায় না, সে মুখ বাঁকায়। বলে—হুঁঃ—ওই সব আবার এ্যাক্টিং! কি যে সব হচ্ছে কালে কালে।

দেখেশুনে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে কাঞ্চন বলেছিল—ঘর পাতিয়ে গেরস্ত হয়েছিস চাঁপা, নিজেরা ওসব পথ ছেড়ে এসেছিস—ছেলে-মেয়েকে ওসব কথা নিয়ে মাততে দিস কেন?

চাঁপা বলেছিল—দিদি, এখন এ কথা যে ঘরে ঘরে গো। বামুন যারা গুরু পুরুতের কাজ করে তাদের ঘরেও। লক্ষপতিদের বাড়িতেও। আমরা তো আমরা।

কাঞ্চন বলেছিল—ঘরে তোর এ্যাক্টিং-এর ফটো রেখেছিস। ছেলে-মেয়ে জিজ্ঞাসা করে না?

—করে।

—কি বলিস?

—সে-সব গল্প ওরা জানে।

—জানে?

—ওরে বাপরে, শুনছ না ওদের থিয়েটার সিনেমার গালগল্প!

—কি ক'রে বলিস? মানে—গেরস্ত সেজে রয়েছিস তো!

একটু থমকে গিয়েছিল চাঁপা, তারপর বলেছিল—ও কি চাপা থাকে দিদি। জানতে পারেই। তবে এত ভাবি নি কখনও। তা ছাড়া ওদের বাপকে তো জান, সে তো ঢাকা-ঢাকির ধার ধারে না। সে-ই নিজে সব গল্প ক'রে বলে। বলে কি কাজ বাবা ঢেকেঢুকে। এদিকটা না হয় ঢাকলাম, কিন্তু আমার রক্ত—সে তো ঢাকনি মানবে না।

সুরেনের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা হয়েছিল। সে বলেছিল—আমেরও অম্বল হয় আমড়ারও অম্বল হয় কিন্তু তা বলে আম-আমড়া এক নয়। আমি ওদের বলে দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি—এই যে টকো টকো স্বাদ তোদের—এ হল আমড়ার, আমের নয়। চিনি আমাদা মিশিয়ে আমড়াকে আমের অম্বল করা যায় তা সে সুরো মিত্তিরের পোষাবে না। শালা—ঝঞ্ঝাট কত? বড় হলে—কা—কা—কা—বলেই যখন চেঁচাবে—ডাকবে, তখন বাচ্চা বয়সে কুহু—কুহু—কুহু—ডাক শেখানো ভস্মে ঘি ঢালা। মারো ঝাড়ু শালা কুহুর মুখে। কা—কা—ই ভাল: বলে একচোট খুব হেসে নিয়েছিল।

সেদিন কাঞ্চন মনে মনে আঘাত পেয়েছিল। মনে হয়েছিল কথাগুলো সুরেন বোধ হয়

তাকেই বলছে। সে আঘাতের খানিকটা ক্রিয়াও হয়েছিল। রাগ হয়েছিল। সে তা সম্বরণ করেছিল গোবিন্দ স্মরণ ক'রে। একটু চু'প ক'রে থেকে হেসে বলেছিল—তা কি হয় সুরেনদা। তা হয় না। সৎ কথা—ভগবৎ কথা—ও হ'ল অমৃত। অমৃত কি নিষ্ফল হয়? উনি বলতেন—কাঞ্চন, সৎ কথা হল—অমৃত আর অসৎ কথা হল বিষ। বিষ খেলে যম, মরণ,—অমৃত খেলে আসেন ভগবান। ভগবান দয়া করলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ছেলেবয়সে সৎশিক্ষা তো অনেক আশার কথা গো—ছেলে-বয়সে অসৎ শিক্ষা যারা পায় আমাদের মত—তারাও তো কতজনে গুরুর কৃপায় সৎশিক্ষা পেয়ে পার হয়ে যায়।

হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল—থিয়েটারে সমস্ত জীবনটাই তো কাটল, তা পরমহংস দেবের কৃপায় শিক্ষায়—

হাঁ-হাঁ করে উঠে বাধা দিয়ে উঠেছিল সুরেন—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ! কার কথা যে বল কাঞ্চন—কিসের কথায় কি! সে কি আর কেউ না বলতে পারে। তা আমি বলি নি। আমি বলছি সাধারণ কথা। এই আমাদের কথা, আমার চাঁপার কথা। তোমার কথাও আমাদের কথা নয়। বোসবাবুকে আমি ভাল ক'রে না-জানি, চাঁপার কাছে তাঁর কথা শুনেছি; তোমার জীবনটা তো নিজের চোখে দেখছি। খাঁটি লোক, পরশপাথরের গুণ ছিল। নইলে এমনটা হয়! তোমার মেয়ে—ওর জাত আলাদা হবে—দেখো তুমি।

চাঁপা বলেছিল—তা বলে ক্রীশ্চানদের ইস্কুলে দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি দিদি। না-না-না। কি যে ওর বাপ বুঝেছিল আর তুমি যে কি বুঝে সায় দিয়েছিলে। না-না-না।

চুপ ক'রে থেকেছিল কাঞ্চন। এ নিয়ে আর আলোচনা করে নি। নিজের মনেই এ নিয়ে একটি সংশয় তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কাঁটার মত বলতে গেলে নিরন্তর তাকে বিদ্ধ করত।

আজও রোগশয্যায় শুয়ে সেই কাঁটার খোঁচা সে অনুভব করলে। সেই কাঁটাটা যেন নতুন ক'রে মুখ নিয়ে উঠেছে। সুরেনের কথাই তা হ'লে ঠিক! মুক্তোকে ক্রীশ্চান ইস্কুলে দেওয়া ঠিক হয় নি। মুক্তো বললে—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম ক'রে তোমরা অন্যায় করেছ।

ওঃ, তার শেষ কথাগুলো কি কঠিন, কি নিষ্ঠুর, তাতে কি ঘেন্না! ওঃ!

ক'ফোঁটা জল শীর্ণ মুখখানি বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। ভাবনা তো তার নিজের জন্যে নয়—ওই মেয়ের জন্যে। পাপ-পুণ্যের বিচার করতে গিয়ে যারা বাপ-মাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, তারা দুনিয়ার কাছে আর যা পাবে পাক, ভালবাসা তো পায় না। তা ছাড়া সে সেখানে গিয়ে তাঁকে বলবে কি? তিনি তো দাঁড়িয়ে আছেন প্রতীক্ষা করে। নিশ্চয় আছেন। তিনি যখন বলবেন—কাঞ্চন, মুক্তোর নিশ্বাসগুলি এত তপ্ত কেন বলতে পার? সেগুলি আমার বুকে এসে লাগে আর ঝলসে দেয়!

কি বলবে সে?

* * *

পরের দিন সকালে কাঞ্চন বসেছিল উঠে। নিজেই কোনমতে কষ্ট ক'রে উঠে পিঠের দিকে বালিশগুলি গাদা ক'রে তাতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছিল। সকালে অনেককালের বাউরী ঝি-টি আসে, তার মমতা আছে সে কাজ ছাড়ে নি, সে-ই সব পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায়। চাদর কাপড় সে-ই কাচে। মুক্তোকে করতে হয় না। কাঞ্চনও চায় না, ওই ঝিটিও দেয় না। মুক্তো এসে মুখ ধোওয়ার জল, মাজন, জিভছোলা দিয়ে সামনে ব'সে খলনুড়ি নিয়ে কবিরাজী ওষুধ মাড়তে বসে। ওষুধ খাইয়ে একটু ছানা, কয়েক টুকরো কলা কেটে মাকে খাইয়ে তবে যায়।

নিচে গিয়ে রান্নাবান্না করে। নইলে কে করবে? মুক্তোর রান্না মুক্তোর নিজের জন্যে। সাহায্য ওই ঝিটিই করে। আগে একটি বৈষ্ণবের মেয়ে ছিল, তাকে জবাব দিতে হয়েছে কিছু-দিন হ'ল। জবাব মুক্তোই দিয়েছে। বলেছে এত জাত কেন? ইস্কুলে তো জাত-বিচার নেই! সেখানে তো জল খাই। বাড়িতে এত ভড়ং কেন?

মেনে নিতে হয়েছে কাঞ্চনকে। বোসবাবু কাঞ্চনের প্রভু, স্বামী, তিনিও জাত মানতেন না। বলতেন বৈষ্ণবের কাছে জাতিবিচার নেই। শুধু মানুষের দুটি জাত কাঞ্চন। সৎ মানে ভাল মানুষ, অসৎ মানে মন্দ মানুষ। এই হল আসল সদ্ জাতি আর অসদ্ জাতি। তবু কাঞ্চন তার সবটা মানতে পারে নি। সে হিন্দু অহিন্দু মানত এবং মানে। সে নিরামিষ খায় তার দীক্ষার পর থেকে, মেয়ে মাছ খায়। যে বৈষ্ণব মেয়েটি রান্না করত, মুক্তো ছুটিতে বাড়ি এলে, সে তার জন্যে আলাদা মাছ রান্না ক'রে দিত। স্নান ক'রে রান্না করত। জাত বিচার ধর্মের নিয়মে না মানলেও, সদাচার কদাচারের জাত মানত। এবং এ মানাটা তার তো আজকের নয়, অনেকদিনের। কলকাতায় যারা দেহ নিয়ে ব্যবসা করে তারা এটাকে বিচিত্র ভাবে মানে। বর্ধমানে তো আজও রয়েছে সে মানা। রাত্রে ব্যবসার জন্য তারা যা করুক, সকালে স্নান সেরে তারা শুদ্ধ হয়ে যেত। তাদেরও ঠাকুরঘর ছিল—আজও আছে—সে ঘরে কখনও কোন অনাচার ঢুকতে পায় নি। মনের মধ্যেও তেমনি একটা ঘর আছে তাদের। হয় বয়সের সঙ্গে নয় অন্য কোনও সুযোগে সে ঘরের ধূপের গন্ধ বেরিয়ে বাইরের অপর সকল ঘরের সকল গন্ধ—সেণ্ট ল্যাভেণ্ডার পাউডার গন্ধতেল হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি ধেনো মদের গন্ধ আচ্ছন্ন করে দেয়।

কাঞ্চনের সারা জগৎটা ধূপের গন্ধে ছেয়ে গেছে। তার কি একার? কতজনের, কতজনের কে হিসেব রাখে তার? কতজন সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে। এই তো গতবারে চাঁপা সুরেন এসে বলে—দিদি আশ্চর্য শুনেছ, শিশিরকণাদি' হরিদ্বারে এক আশ্রমে গিয়েছে, সেখানে এঁটো বাসন মাজার কাজ নিয়েছে!

শিশিরকণা বাংলা থিয়েটারের দমকা হাওয়া। নাচে গানে হাস্যে লাস্যে সে ছিল পাগলাঝোরা। শেষ পর্যন্ত মস্ত এ্যাক্‌ট্রেস হয়েছিল। শুধু তাই নয়—গোটা একটা থিয়েটারের প্রায় মালিক—; মালিকের গৃহিণী। কত ধনী, কত বাবু, কত এ্যাক্টর যে শিশির-কণার জন্যে পাগল হয়েছিল তার হিসেব নেই। মদ—মজলিস—হাসি—রঙ্গ—এই ছিল তার জীবন! সে—; সে বাসন মাজতে গেল হরিদ্বারে এক আশ্রমে! হরি! হরি! হরি!

কথাটা শুনে কাঞ্চন মনে মনে হরিকে ডেকেছিল। আর কাকে ডাকবে! এ আর সে ছাড়া কার খেলা!

মুক্তো এসব মানে না। অবশ্য এসব কথা মুক্তোর কাছে সযত্নে সে ঢেকেই রেখেছিল। জানতে দেয় নি, আজ জানালে। জেনে সে তাকে ঘেন্না ক'রে বেরিয়ে গেল। তাকে ঘেন্না করুক ক্ষতি নেই। সে তো সত্যই কলঙ্কিনী। কলঙ্ক তো কোন জনকে ভালবাসায় নয়! কলঙ্ক ব্যভিচারে। ব্যভিচার তার তো একদিনের পেশা ছিল, নেশাও ছিল; ঘেন্না তার প্রাপ্য। কিন্তু মুক্তো তার বাপকে, তাঁর মত মানুষকে ঘেন্না করলে!

চোখ দুটি তার আবার জলে ভ'রে গেল। চোখ মুছলে। না মুছে উপায় কি! ওঃ, সকাল থেকে এল না মুক্তো! জল মাজন জিভছোলা দিলে না! না দিক, সে দেওয়াল ধরে উঠল। আস্তে আস্তে গিয়ে সেগুলি নামিয়ে জলের ঘটিটা টেনে নিয়ে মুখ ধুতে বসল।

মুখ ধোয়ার শব্দে মুক্তো এসে দাঁড়াল।

—তুমি নিজেই নিয়েছো? আমাকে ডাকতে হ'ত। এমন ক'রে—

—তা হোক। পেরেছি তো!

—পারবে না কেন? কিন্তু আমি রয়েছি।

—কত আর করবি বাছা? তা ছাড়া সুখ দুঃখ তো সবারই আছে। তোর সেই কাল থেকে—। কে এল দেখ তো? সাইকেল-রিক্সার ঘণ্টা বাজছে দোরে। হয়তো চাঁপা এল! দেখ।

হ্যাঁ, চাঁপাই বটে। সুরেনের গলা শোনা যাচ্ছে। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তকরার জুড়েছে।

—তার চেয়ে তুমি রিক্সায় চড় বাওয়া—আমি চালিয়ে তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমাকে—তুমি বারো আনা চাচ্ছ—ছ আনা দিয়ো। এই পথটুকুর জন্যে বারো আনা! এর চেয়ে যে আলিবাবার চিচিং ফাঁকের গুহার ধন সস্তা মানিক! নাও—নাও। ওই অষ্টগণ্ডাতেই রফা কর।

চাঁপা ঘরে ঢুকে কাঞ্চনের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেই দিদি—এমন হয়ে গেছে। এ যে যাবার জন্যে সেজেছে বললেই হয়! তার মুখ থেকে শুধু একটি কথা বের হয়েছিল, ভয়ে—বিস্ময়ে—আনন্দে সব কিছুর মধ্যেই কথা হারিয়ে সর্বপ্রথম যে কথাটি ফিরে পায়? ও—মা!

তারপরই সে কেঁদে ফেলেছিল।

কাঞ্চন হেসে বলেছিল—কাঁদছিস? কেঁদে কি করবি? কাঁদিসনে।

তবু চাঁপা কেঁদেছিল।

কাঞ্চন আবার বলেছিল—আমি কাঁদি নি। তুই কাঁদবি কেন? তোরা শুধু আমাকে একজনকে হারাবি। আমি তো তোদের সকলকে হারাব। কাঁদিস নে রে। বড় কষ্ট পাচ্ছি। এ থেকে খালাস পাব এবার।

ঠিক এই সময়টিতেই সুরেন ভাড়ার কোন্দল মিটিয়ে উত্তপ্ত পদক্ষেপের শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। সে যে সে—সেও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কাঞ্চনই বলেছিল—এস বস। তারপর হেসে বলেছিল—ভয় পাচ্ছ দেখে?

সুরেন বিহ্বলতার প্রভাবে মৃদুস্বরে বলেছিল—এমন হয়ে গেছ?

—যাবার একটা সাজ আছে সুরেনদা! মনে কর থিয়েটারে যাবার সাজ। তা সেখানে যাব, সেখানকার সাজ যে এমনি। এস বস!

মুক্তোও এসে দাঁড়িয়েছিল—মেসোর পেছনে। কথা বলে নি। মাসী ও মেসো এসেছে সে তা উঠোনের দিক থেকে দেখেছে। কাল রাত্রে মায়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের পশ্চাদপট যেন একটা আকস্মিক ঝড়ের আঘাতে ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করে দিয়ে চলে গেল এবং সে দেখলে তার জীবনের আসল পটভূমি—যে পটভূমিকে সে মিশনারী ইস্কুলে পড়ে ঘৃণা করে এসেছে—যেখানে ছড়ানো আছে মদের বোতল—যেখানে পড়ে আছে পানোন্মত্ত নারীদেহ, অসাড় মাংসপিণ্ডের মত; যেখানকার শব্দজগতে বেজে বেজে উঠছে—স্খলিত চরণের ঘুঙুরের শব্দ, মধ্যে মধ্যে কুৎসিত অশ্লীল কথা—গালিগালাজ, যাতে সুর সঙ্গীত এমন কি তার মায়ের চোখের-জল-ফেলে-গাওয়া কীর্তন গান পর্যন্ত কুৎসিত ও কলুষিত মনে হয়। তার কিশোর মনে এ আঘাত নিষ্ঠুর, অতি নিষ্ঠুর হয়েছিল; মায়ের উপর রাগ হয়েছিল—নিজের উপর ঘৃণা হয়েছিল—বাইরের সকল কিছুর মধ্যে একটা আতঙ্ক

যেন রূঢ় কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে শাসন করেছিল। সকাল থেকে উঠে তাই সে রান্নাশালের দিকে চুপ ক'রে বসেছিল। যে ঝি'টা কাজ করতে আসে সে কাজ করে যাচ্ছিল এবং তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করছিল—কি হ'ল গো মুক্তো মা? এমন ক'রে কেন গা?

উত্তর দেয় নি মুক্তো। ঝি আবার প্রশ্ন করেছিল—মায়ের জন্ম এত ভেব না। ও ডাক্তার-বদ্যিরা যা বলে বলুক। আমি বলি কি জান? মা কালী—ওই যে—সব্বানপুরের মা কালী—ওই থানে চল আমার সঙ্গে। চান ক'রে সোঁ-চুলে সোঁ-কাপড়ে পেনাম করে মানত করে চরণামেরতো আর মিত্তিকে নিয়ে এস—মাকে দাও—ভাল হয়ে যাবে। এই দেখ আমার—আমার একবার সুতিকা ব্যামো হয়ে এমনি দশায় মরতে বসেছিনু, তা ওই—মায়ের থানে গিয়ে পড়নু, বনমু মা—যা হয় কর। যদি ভাল না কর মা—তোমার মহিমে যাবে। অপযশ হবে। ভাল কর, পাঁঠা বলি দেব—পুজো দেব। তা দেখ—বেঁচে গেনু। জলজ্যান্ত কাজ করছি।

ঠিক এই সময়েই মাসীরা এসে পৌছল। ঝি বেরিয়ে গিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিলে, এবং এক ফাঁকে এদিকে এসে তাকে সজাগ করে দিলে।—তোমার মাসী মেসো এসেচে মুক্তো। ওঠ—এমন ক'রে ব'সে থাকে না।

তারপর সে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিল—এই তোমার সেই চাঁপা মাসী, না মুক্তো? আর ওই তো সুরো মাস্টার?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল মুক্তো—হ্যাঁ।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুক্তো। উঠতেই হবে। ঘরের দোরে—সুরেন মেসোর পিছনে এসে দাঁড়াতেই চাঁপা মাসী তাকে দেখেছিল। দেখে বলেছিল, আয় মুক্তো আয়। ওগো সর না একটু। মুক্তো তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে। আসতে দাও ওকে।

সুরেন মেসো পিছনে ফিরে মুক্তোকে বলেছিল, এই মুক্তো? মিস্ পার্ল? বাঃ। দিব্বি মেয়ে। সঙ্কুচিত এবং বিরক্ত হয়েছিল মুক্তো। কিন্তু পরক্ষণেই সুরেন বলেছিল—এ তো বড় ঘরের মেয়ের মত বেশ সম্ভ্রমের মেয়ে হয়েছে, কাঞ্চন! বা বা বা! গতবার যখন দেখেছিলাম তখন ছোট ছিল। অনেক ছোট। এ তো একটু মাজলে ঘষলে—সিনেমায়—

চাঁপা ধমক দিয়ে বলেছিল—কি যা তা বলছ। কোন কাণ্ডজ্ঞান কি কোন কালে হবে না! আয় রে মুক্তো—আয়। মায়ের কাছে বস।

কাঞ্চন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—না। ওর এখন অনেক কাজ। তোদের চা দেবে, সুরেনদাকে কিছু খেতে দিতে হবে। আমি তো জানি ওর ভোরবেলা ক্ষিদে পায়।

সুরেন মেসো হেসে উঠেছিল।—মনে আছে তোমার?

—তা নেই!

—কিন্তু সে অভ্যেস আর নেই। গতবার সব মন্তর নিয়েছি তো। তা গুরু বলেছিল, অনুমতি রইল তুমি খেয়ো। খেয়েদেয়েই যখন হোক একবার তাঁকে ডেকো। তা বুঝেছ কাঞ্চন—ক্রমে ক্রমে না সাপ যেমন করে ব্যাঙ ধ'রে একটু একটু ক'রে কায়দা করে না—ঠিক তেমনি ভাবেই কায়দা করে ফেলেছে ইষ্টমন্ত্র। তবে চা-টা খাই। দে বাবা মুক্তো, চা-টা দে।

চলে আসছিল মুক্তো। সুরেন মেসোর কথা তার ভাল লাগে নি। আগেও লাগে নি যখন বছরখানেক আগে এদের দেখেছিল—কিন্তু তখন এদের জীবনের নগ্ন সত্যটা, আসল রূপটা জানতে পারে নি। তখন যেসব কথাবার্তাকে ভাবভঙ্গিকে—অজ্ঞতা বা গ্রাম্যতা বলে ক্ষমা করে গ্রহণ করেছিল আজ সে সবই তার কাছে অশ্লীল, অশুদ্ধ, অপবিত্র বলে মনে হচ্ছে। চলে আসতে আসতে সে সিঁড়িতে দাঁড়াল। সুরেন মেসো তার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলছে—কেন—কি—বললাম কি ? ভাগবত অশুদ্ধ হ'ল কিসে ? যত সব—

চাঁপা মাসী বললে—চেঁচিও না।

—নে বাবাঃ, এও চেঁচানি হল ?

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—না—না। মানে—ওকে সিনেমা-টিনেমার কথা বলো না। মিশনারী ইস্কুলে পড়ে তো। এ সবকে—বুঝেছ।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে কাঞ্চন—কাল আমি ওকে সব বলেছি। আমি কি, ওর বাপ—মানে সব কথা। কোন কথাই লুকুই নি।

—ভাল করেছ। খু—ব ভাল করেছ—

—কিন্তু—

—এতে আবার কিন্তু কি আছে ? কাল বদ্‌লেছে—তার ওপর ভগবান দয়া করেছিলেন তোমাকে—বোসবাবুর মত ভক্ত লোক ভাল লোকের ভালবাসা পেয়েছিলে—তিনি টাকা দিয়ে গিয়েছেন—তাই আজ মিশনারী ইস্কুলে পড়ছে। নইলে তো এতদিন থিয়েটারের গাড়ি আসত—ছুটতে হ'ত। কোমর বেঁধে এক দুই তিন—এক দুই তিন—গুনে ধিন তাক তাক করতে হ'ত। হয়তো ঠেলে জানলার ধারে খোঁপায় মালা জড়িয়ে দাঁড়াতে হত।

কাঞ্চন বললে—হয়তো হ'ত সুরেনদা। কিন্তু মুক্তো আর তা' হবে না। কিন্তু বলে তাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের।

সে বলতে লাগল মুক্তোর কথাগুলি, বললে—বললে কি জান—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম ক'রে তোমরা অন্যায় করেছ। ভগবানও তোমাদের ক্ষমা করবেন না। ছি—ছি! আমার পরিচয়টা কি বলতে পার মা ? তারপর—। কণ্ঠ বোধ করি রুদ্ধ হয়ে গেল কাঞ্চনের।

মুক্তোর মনে পড়ল নিজের বলা কথাগুলি।

—সে পরিচয় আমি আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই—কোন ভণ্ড প্রভুর মেয়ে নই। আমি কারুর দাসী হব না। আমি মানুষ। আমি মেয়ে। তাই আমার সব।

দুড়দুড় করে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

ঘরের দরজা খুলে চাঁপা মাসী বেরিয়ে এসে ডাকলে—মুক্তো! মুক্তো!

মুক্তো তখন উনোনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। কেৎলিটা খুঁজছিল—চড়িয়ে দেবে চায়ের জল। উত্তর দিয়েছিল—জল চড়িয়েছি চায়ের।

কাঞ্চন সেইদিনই একসময় হঠাৎ ঘাড় লুটিয়ে বালিশের উপর কাত হয়ে পড়ে গিয়ে আর ওঠে নি। মুক্তো তখনও কাছে ছিল না। সে পাশের ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বালিকা বয়স তখন কাটছে বা কেটেছে, কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের অনেক কিছু শুনে শুধু পাখীর মতই শেখে নি—অনুভবে আন্দাজে মনে মনেও বুঝছে। বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে সেদিন আশ্চর্য লজ্জা এবং দীনতা অনুভব করেছিল। তার

কান্না পাচ্ছিল।

ঠিক এই সময়েই চাঁপা মাসী আর্তস্বরে ডেকে উঠেছিল—দিদি! দিদি!

সেও চমকে উঠেছিল। এবং শুনতে চেষ্টা করেছিল—মা কি বলছে। মায়ের কোন কথা শুনতে পায় নি। তার বদলে মাসীই আবার চীৎকার করেছিল—ওগো, শুনছ—ওগো! দেখ কি হল?

মেসো ডেকেছিল—মুক্তো! মুক্তো! মুক্তো কই!

মুক্তোর পা বুক কেঁপে উঠেছিল থর থর ক'রে। সে কোন রকমে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ঘরের দরজায়। মা চেয়ে রয়েছে—কিন্তু কথা বলতে পারছে না। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন! তবু তার মধ্যে চেনার চিহ্ন ছিল।

চাঁপা মাসী বলেছিল—আয় আয়, পাশে বোস। দে দে—মুখে দুধ গঙ্গাজল দে। দুধ কই—গঙ্গাজল কই!

সে পাশে চুপ করে বসেই ছিল। দুধ গঙ্গাজল আনতে আনতে মায়ের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল।

সে পাথরের মত বসেছিল। মা বলে একবারও ফুকরে ডেকে ওঠে নি; ওঠে নি নয়, উঠতে পারে নি চেষ্টা করেও।

দ্বিতীয় পর্ব

(মুক্তামালার কথা)

এক

বারো বৎসর পর। মুক্তামালা এখন ছাব্বিশ বছরের পূর্ণযুবতী। সে দুঃখে নেই—তার জীবনের চারিপাশে এরই মধ্যে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য। মুক্তামালা নৃত্যকলায় খ্যাতি পেয়েছে অনেক—শুধু বাংলাদেশেই নয়—ভারতবর্ষেই নয়—এই বয়সে সে বাইরের দেশে ঘুরে এসেছে। গানেও তার যথেষ্ট খ্যাতি। তার নাম এখন মুক্তামালা নয়, মুক্তি; এবং বাপের বোস উপাধি সে নেয় নি—মায়ের মাতৃ-উপাধি সেকালের দাসীকে সে দাস করে নিয়েছে। দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, টানা দুটি চোখ—শ্রীময়ী মেয়ে—নৃত্যকলার উপযুক্ত করেই যেন তার দেহখানিকে কেউ গড়েছিল—কিন্তু সব থেকে আকর্ষণ করে তার দৃষ্টির একটি বিষণ্ণতা। অন্যমনস্কতার সঙ্গে একটি উদাসীনতা যেন বর্ষার রাত্রের মধ্য-আকাশের চাঁদের পরিপূর্ণ আলোর উপর দিগন্তের কালোমেঘের মত একটি ছায়া ফেলেছে। জীবনে সে একাই একরকম। থাকবার মধ্যে চাঁপা মাসীর ছেলে রূপেন, ডাকনাম রূপী—সে থাকে। মুক্তিই তার ভরণপোষণ করে; রূপেন বয়সে ওরই বয়সী প্রায়; লেখাপড়া তেমন শেখে নি; বারদুয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে বসেই আছে। বাড়িটা ওরই, অর্থাৎ চাঁপা মাসীরই বাড়ি। নিচের তলায় ভাড়াটে আছে একঘর, মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পায়। মুক্তার কাছে ভাড়া চায় না—নেয় না, মুক্তার টাকাতেই তার বাকী খরচ চলে যায়। হিসেবে সেটা ভাড়ার চেয়ে বেশীই পড়ে। রূপী ঠিক হিসেব করে হাত ছেড়ে দেয় তা নয়, অন্তর থেকেই সে নেয় না, নিজের বোনের থেকে বেশী মনে করে মুক্তাকে।

সংসারে রূপেনের কাছেই সে মধুর এবং কোমল—বাকী দুনিয়ার কাছে সে তিক্ত, রূঢ় এবং নিষ্ঠুর। দৃষ্টিতে তার এমন যে একটি বিষণ্ণতা, যা দেখে মানুষ আকৃষ্ট হয়, কাছে এগিয়ে আসে; যখন সে দৃষ্টি তার ঘৃণায় রূঢ়তায় এমন তীব্র হয়ে ওঠে যাতে কাছে-আসা মানুষের অন্তর আগুনের জ্বালার মত একটা জ্বালা অনুভব করে। তারা বাধ্য হয়ে দূরে সরে যায়। আশ্চর্য! একটা আশ্চর্য—তার জীবনে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবনে সে নাচ-গানকে দূরেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হল না শেষ পর্যন্ত! আশ্চর্যভাবে সে এসে পড়ল এই নাচ-গানের কাছেই। নাচ-গানে খ্যাতি তার হয়েছে কিন্তু মনে মনে নিজের উপরেই সে বিরক্ত। এ যেন তার ভাগ্যের কাছে না হোক জন্মের কাছে হার মানা হয়েছে। মায়ের সকল সম্পর্ক থেকেই দূরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু হ'ল না।

এতকাল পরে ঘরে বসে বিষণ্ণ অবসরে বসে এই আশ্চর্য সংঘটনের কথাই ভাবছিল সে। মনে পড়েছে তার সব।

এর জন্যে আজও সে ভাবে, মনে করে—দায়ী তার বাপ, তার মা। শুধু কি তারাই? সংসারে ওই অপরাধে অপরাধী ক'রে মানুষ ঠেলে তাকে এই কাজেই এনে দিলে।

ওঃ, মায়ের মৃত্যুর পরই—সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—শ্মশানে—!

শ্মশানে মৃতের নাম লেখাতে হয়। সেইখানে খাতায় লিখবার সময় প্রকাশ হয়ে গেল—কাঞ্চনমালা—ভক্তিমতী কীর্তনগায়িকার পিতৃপরিচয় নেই, সে দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—দেহব্যবসায়িনী—উকীল বোসবাবুর রক্ষিতা। এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ হল মুক্তামালার পরিচয়।

সারাটাক্ষণ মুক্তা মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল। মনে হচ্ছে শ্মশানের লোকগুলি তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।

তখনও বুঝবার ঠিক সময় হয় নি। তখন বুঝতে পারে নি কিন্তু আজ বোঝে। তার বাপ মা তার প্রতি স্নেহবশে—? না- শুধু স্নেহবশে কখনও নয়—তাঁদের এই ভালবাসাকে তাঁরা দুজনেই পুণ্যের মূল্য দিতে পারেন নি তাই তার পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের সেই ভালবাসার কথাও গোপন করেছিলেন। অত্যন্ত সযত্নে। উকীলী চাতুর্যের সঙ্গে চারিদিকে এমন করে ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন যে কোন দিক থেকে যেন এক বিন্দু আলো না পড়ে তার ওপর।

তার মা সেদিন শেষ কথাটা খাঁটি সত্য বলেছিল—আমি তাঁর দাসী। তিনি আমার প্রভু। ভালবেসে তাঁর চরণে বিকিয়েছিলাম।

খাঁটি সত্য। এবং তার বাবা প্রভুদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী তাকে দাসীর অধিকার ছাড়া আর কিছু দেন নি। মধ্যযুগে রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা, দস্যুসর্দার, গুরু, সমাজপতিরা এই প্রভুনীতি—না, নীতি নয়, প্রভুধর্মকে জীবনধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে আবিষ্কার করে ছিল; তাদের চারিপাশে থাকত নারীর দল—দাসী—সবাই ছিল দাসী। যাদের পিছনে বাপের জোর থাকত তারা ছিল পত্নী, বাকীরা ছিল উপপত্নী। কেউ হাটে কেনা—কেউ ধরে আনা—কেউ বা নিজেই বিকোত। ওই তার মায়ের মত বিকোত নিজেকে। এদের সন্তান-সন্ততিরা এ দুনিয়ায় জন্ম নিত কুক্কুরীর শাবকের মত; বড় বাড়িটার কোন এক প্রকাণ্ড উনোনের ছাই অথবা খড়কুটোর গাদায় জন্মাত, মায়ের যত্নে, তার দুধে মানুষ হত; শৈশবে লাবণ্যের জোরে করুণা পেয়ে উচ্ছিষ্ট পেত। বড় হত। তারপর ঘর হতে বিতাড়িত হত।

পথে ঘুরত। না খেয়ে মরত। কেউ মারা পড়ত মাথায় ডাণ্ডা খেয়ে। কেউ মরত জলাতঙ্কে পাগল হয়ে। জন্তুর রাজ্যে যে নিয়ম, মানুষের রাজ্যেও সেই নিয়ম—এক—এক, কোন প্রভেদ নেই। মানুষ বুদ্ধিমান জন্তু, সে কাপড় পরে জামা পরে—অর্থাৎ সে আবরণের কৌশল জানে, তাই নারী-পুরুষের সেই আদিম সম্পর্কের উপর সে একটা আবরণ দিয়েছে। চেলি মালা টোপরের আবরণ।

তার জন্মদাতা—তার মায়ের প্রভু—তাকে তাঁর প্রভুধর্মের ছলনা করে গিয়েছিলেন। দাসী—তার মা—সেই ছলনাকেই ভালবাসা বলে মনে করেছিল। হায় দাসীর দল!

তার জন্মদাতা একখানা দলিল করে তার জন্যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে সব লিখে-পড়ে ব্যবস্থা করেছিলেন। সে দলিল তার কাছেই আছে। তাতে দাতা তিনি—গৃহীতা মা। "তুমি এবং আমি উভয়ে প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলাম—আমি দুরন্ত ক্যান্সার ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তুমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত আমার সেবা পরিচর্যা করিয়াছ; এবং আমাদের উভয়ের সাহচর্যের ফলে আমাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তোমাদের উভয়ের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্ব। আমার যে ব্যাধি হইয়াছে তাহাতে আমার যে কোন দিন মৃত্যু হইতে পারে এই উপলব্ধি করিয়া অতি বিচক্ষণ বিবেচনা ও বিচার করিয়া তোমাদের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি!"

এরপর ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক ধর্মকথা বলে বলেছেন—তোমাদের মা এবং মেয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রইল। এই টাকার অর্ধেক—যা মুক্তামালার জন্য—সেটার প্রথম পাঁচ বছর খরচ হবে না—তারপর অর্থাৎ মুক্তামালার সাত বছর বয়স থেকে তার পড়ার জন্য খরচ হবে। তাকে কোন মিশনারী ইস্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখতে হবে। কারণ এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধারণ ইস্কুলে মুক্তামালার মত পরিচয় যাদের তাদের অনেক অসুবিধা। পড়ার খরচ সংকুলান হয়ে যদি কোন টাকা থাকে সেটা মুক্তামালা পাবে।

মুক্তামালা সাত বছর বয়স থেকেই মিশনারী বোর্ডিংয়ে থেকেছে। সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত থেকেছে। তারপর মুক্তামালার মুক্তি, তার সৌভাগ্য ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ে টাকাটা গেল। মায়ের তখন অসুখেরও শুরু। ওখানেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। সেখান থেকেই সে এর আঁচ পেতে লাগল। তারপর একদিন স্বয়ং তার মা—তার মুখের সামনে পরিচয়ের বারুদের আগুন ধরিয়ে দিনের আলোর মত আলো জ্বেলে—সামনে ধরলে আয়না। ভাবলে রোশনাইয়ে তার মুখখানা অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আসলে ওই বারুদের আলোতে তার মুখখানা পুড়ে ঝলসে গেল।

যাক পোড়ামুখের উপর মুখোশ বা রঙ সে লাগাবে না। সে ঢাকবে না। কিছুই ঢাকবে না। তার জন্মদাতা—তার মায়ের থেকে চাঁপা মাসী ভাল। অনেক ভাল সহজ ওরা। চাঁপা মাসীর হরিভক্তি নেই—কিংবা চাঁপা মাসী যে সুরেন মেসোকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে তারও ওসব হরিভক্তি বা কালীভক্তি বা কোন ধর্ম-বাইই নেই।

* * * *

শ্মশান থেকে ফিরতে হয়েছিল প্রায় রাত্রি নটা।

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সারারাত্রি। মাসী অনেকক্ষণ জেগেছিল কিন্তু মেসো ঘুমিয়েছিল। সুরেন মেসো আশ্চর্য সহজ মানুষ। মায়ের অসুখের শেষ দিন এসে পৌঁছেছিল। সারাটা দিন আশ্চর্য সেবা সে করেছিল। মল মূত্র থেকে সব দু'হাতে পরিষ্কার করেছে—কারও মানা শোনে

নি। শ্মশানেও সে-ই সব করেছে। তারপর এসে শুয়েছে এবং অঘোরে ঘুমিয়েছে। মুক্তা জেগে ছিল। একা জানলার ধারে বসে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। ঘুমন্ত শহর—উপরে নক্ষত্রভরা আকাশ—তার নিচে অন্ধকার, শহরের এখানে ওখানে আলোর ছটা, নিস্তব্ধ ইঁট-কাঠের স্তূপ। মাথার মধ্যে সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ছিল একটা অবসন্নতা। কিন্তু তবু ঘুম আসে নি। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উঠছিল—এর পর ?

এর পর সে চলে যাবে সেই ক্রীশ্চান মিশনের ইস্কুলে। সেখানে গিয়ে সব বলবে। তার জীবনের সব কথা। তার পর ক্রীশ্চান হবে। ওখানেই পড়বে। তারপর নিজের একটা পথ সে করে নেবে। এ পথ নয়; নাচগানের পথ নয়। কিন্তু এতেই তার একটা জন্মগত অধিকার আছে। গান সে শুনবামাত্র শিখতে পারে। তা হোক—এ পথে সে হাঁটবে না। না।

স্থির তাই করেছিল কিন্তু কাজে পরিণত করা তো সহজ নয়! সংসারে আসবাবপত্র বাড়িটা আর শতখানেক টাকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। চৌদ্দ-পনের বছরের কুমারী মেয়ে—সংসারে একা। ক্রীশ্চান মিশনে যেতে চেয়েও তার যাওয়া হয় নি। চাঁপা মাসী, সুরেন মেসো দেয় নি। আসবাবপত্র সামান্য, বেচে আশি টাকা পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ির ব্যবস্থা পরে হবে, ভেবেচিন্তে করা ভাল—এই স্থির করে চাঁপা মাসী আর সুরেন মেসো তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করলে সে বলেছিল—আমার টাকাটা আমাকে দাও মাসী। আমি আসানসোলে গিয়ে মিশন ইস্কুলে ভরতি হব।

—মিশন ইস্কুলে ভরতি হবি কি ? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল চাঁপা মাসী।

—হ্যাঁ। মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি।

—কই দিদি তো তা বলে নি কিছু।

—না। মা বলে নি। আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তুই ঠিক করে রেখেছিস কি ? তোর ঠিক করার মানে কি ? তোর কি ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে যে তুই ক্রীশ্চান ইস্কুলে পড়বি! খরচ যোগাবে কে ?

—ক্রীশ্চান হয়ে গেলে—বাপ-মা না থাকলে ওরা খরচ নেয় না।

—পড়বার খরচের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে, তারা পড়ছে তুইও পড়বি। এই বাড়ি বিক্রী হলে কিছু টাকা তোর আসবে। পড়বার জন্যে জাত দিবি কি ? এমন কথাও তো কোথাও শুনি নি।

সে চুপ করে গিয়েছিল—তার মাকে মুখের উপর যা বলতে পেরেছিল তা মাসীকে বলতে পারে নি। একবার ভেবেছিল সে পালিয়ে যাবে আসানসোল এবং ক্রীশ্চান মিশনে গিয়ে উঠবে। কিন্তু তাও সে পারে নি। অসহায় বোধ হয়েছিল নিজেকে।

কলকাতাতেই আসতে হয়েছিল তাকে মাসীর সঙ্গে। এসেছিল অনিচ্ছার সঙ্গে কিন্তু এখানে এসে তার ভাল লেগেছিল রূপীকে। রূপীর বয়স তখন বারো-তেরো। ওর স্বভাবে একটি আশ্চর্য মিষ্টতা আছে, সেটি বোধ হয় জন্মগত।

সে প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করেছিল—তুমিই তো দিদি ? আমার থেকে বয়সে তো বড় তুমি ?

সে জবাব দেয় নি। কি জবাব দেবে ? এবং জবাব দেবার মত মনও ছিল না। উত্তর দিয়েছিল চাঁপা মাসী। কথাটা তার কানে গিয়েছিল—হ্যাঁ, পেনাম কর।

রূপী বলেছিল—এস না তার থেকে হ্যাণ্ডশেক করি। পায়ে হাত দিয়ে পেনাম—এই তো

এতটুকু বড় তুমি! বলেই হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিল—গুড মরনিং!

একটু ম্লান হেসেছিল সে।

চাঁপা মাসী ঘুরে এসে ঘরে ঢুকে বলেছিল—ওকে মেলা বকাসনে। ওকে জিরুতে দে। কই দীপা কই? বলেই ডেকেছিল গলা তুলে—দীপা—।

ও ঘর বা কোনখান থেকে দীপা উত্তর দিলে—আমি চুল আঁচড়াচ্ছি।

মা অর্থাৎ চাঁপা মাসী বলেছিল—মরণ হারামজাদীর। জাত-স্বভাব যাবে কোথা? চুল আঁচড়াচ্ছি! দিদি এসেছে—আয়।

—বাঃ, এই ছিরি করে যায় নাকি!

চাঁপা মাসী অবশ্য দাঁড়ায় নি, সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—ক'দিন বাড়ি ছিল না, ঘরদোর গুছিয়ে ঘুরছে এ ঘর থেকে ও ঘর। সে দীপার উত্তরের আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

রূপী হেসে বলেছিল—এইবার মা গাল দেবে। খানকীর বেটি কসবী। দীপাটা দিনরাত সাজছে আর নাচছে। এই নাচছে—এই নাচছে। পাড়ায় নটীর পূজা দেখেছে তাই নকল করছে।

দীপা ঘরে ঢুকেছিল সেই মুহূর্তটিতেই। রূপীর কথাগুলি শুনেছিল, বলেছিল—আর তুই? তুইও তো দিনরাত গান গাইছিস—সুরিয়া অস্ত হো গেয়া—সুরিয়া মস্ত হো গেয়া—গগন মস্ত হো গেয়া! আল্লা পানি দে—ম্যাঘ দে আল্লা—। থিয়েটার করছিস! এ্যাঁঃ—ওরে বাবা! মদ খাব না—সিগারেট খাব না—তাহলে কি খেয়ে বাঁচব হুটুদা! জান—একটা প্লে হচ্ছে—দুই পুরুষ—তাই দেখে এসে দিনরাত সুশোভনের আর গোপী মিস্ত্রিরের পার্ট করছে। চা যেমন ডাল ভাত নয় তেমনি বিবেচনা করুন বিষও না; আপনি মুনিব, বলছেন খেতে—তা দাও হে এক কাপ চা দাও! দিনরাত ফাঁক পেলেই করছে। আবার আমাকে বলছে।

মুক্তো শোকাচ্ছন্নতার থেকেও অসহায় অবস্থার উদ্বেগে বেশী অভিভূত হয়েছিল। দীর্ঘ রোগভোগে মা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাতে তাকে প্রস্তুতই শুধু করে নি, ক্লান্তও করেছিল—তার উপর এই পরিচয়ের আঘাত। এতেই তাকে অভিভূত করেছিল বেশী। এদের মত সত্য পরিচয়ের মধ্যে মানুষ হলে এমন হত না! এই সব কথাবার্তা শুনে তার মন চীৎকার করে উঠতে চেয়েছিল—আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চলে যাব।

তাও তো কিন্তু পারে না মানুষ। বিশেষ করে সে তখন চৌদ্দ বছরের কিশোরী। ছেলে হলে সে হয়তো পারত। কিন্তু সে যে মেয়ে। এ দেশের মেয়ে। যেখানে মেয়েদের বিশেষণ অবলা। বলহীনা। যারা বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের দ্বারা রক্ষণীয়া।

দুই

চাঁপা মাসী সুরেন মেসো কিন্তু জীবনের ঘরে কোন জানলাতে ঘষা কাচ বা রঙীন কাচ লাগায় নি। পরিষ্কার সাদা কাচের কারবার। জীবনের বর্তমানেও বাইরের সাদা আলো রঙীন হয়ে পড়েনি—এবং ভিতর থেকে বাইরেটা অর্থাৎ ভবিষ্যৎটাও রঙীন হয়ে দেখা যেত

না। সবটাই খোলাখুলি স্পষ্ট। কয়লার ডিপো থেকে চলত ওদের মন্দ নয়, ভালোই। যুদ্ধের বাজারে তো কয়লা থেকে বেশ কামিয়েছে। ছেলে পড়ে মেয়েও পড়ে। তা বলে ছেলে পড়ে একটা কেষ্টবিষ্টু হবে তা তাদের কল্পনা ছিল না, যা হয় হবে, কয়লার ডিপো তো আছেই, তবে মেয়ের সম্পর্কে উচ্চাশা কালের সঙ্গে ফুলে ফলে ভরে উঠেছিল।

সিনেমা আর্টিস্ট হবে দীপা।

১৯৪২।৪৩ সাল।

বাংলা দেশে কলকাতার ভাল ভাল ঘরের মেয়েরা ছবিতে নামছে; সিনেমায় নেমে চাঁপা মাসীর জানাশোনা ও চেনা মেয়েরা যখন আর্টিস্ট হয়ে খ্যাতি ও অর্থই শুধু নয় কত সদ্বংশের বউ হয়ে যাচ্ছে তখন এর চেয়ে ভাল ভবিষ্যৎ মেয়ের জন্যে আর কি হতে পারে?

সুরেন মেসো খবরের কাগজ নিত, পড়ত, তার মধ্যে শুক্রবারের কাগজের দাম বেশী। ওই দিন কাগজে থাকে সিনেমার খবর, থিয়েটারের খবর। চাঁপা মাসী ছেলেকে পাঠায় মাসে মাসে সিনেমার কাগজ কিনবার জন্য। ছেলে মেয়ে চাঁপা মাসী সুরেন মেসো সেগুলি কণ্ঠস্থ করে নিত। যুদ্ধের কাল, দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল—দেশে অভাব ঝড়ক—এসব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না, তবে কথাবার্তা তাদের হোত; কিন্তু জীবনের সব আগ্রহ ছিল সিনেমা নিয়ে। এরই মধ্যে তার জীবন শুরু হল নতুন করে।

তার জীবনের মূলে রয়েছে একটা গোপন করে রাখা ছি-ছিক্কার। এটা যদি তার মা তার কাছে জন্ম অবধি গোপন না করত, একটা ভগবানকে বিশ্বাস আর ভক্তির ভানের নামাবলী পরিয়ে হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগালের শৃগালত্বের উপর একটা অবজ্ঞা ঘৃণা না জন্মিয়ে দিত—তা হলে এই ছি-ছিক্কার বোধ থেকে পীড়া সে অনুভব করত না।

মাসখানেক পর দীপাদের স্কুলেই তাকে ভরতি করে দিয়েছিল সুরেন মেসো। তখনও সে মুক্তামালা বোস। বাবার নাম ভূদেব বোস। কিন্তু দীপা তার মায়ের নাম আর সংগীতখ্যাতির গৌরব প্রকাশ করে দিয়েছিল সগৌরবে। তার মায়ের গানের রেকর্ডের কথাটা অহংকার করেই সে বলে বেড়িয়েছিল।

—জান, মুক্তোদি'র মা, আমার মাসী খুব ভাল গান গাইত। রেকর্ড আছে। খুব ভাল রেকর্ড। কেত্তনগান। সজনী কি হেরিনু যমুনার কূলে। ব্রজকুলনন্দন, হরিল আমার মন—ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে। আর এক পিঠে আছে গজল—রুয়েঙ্গে হম হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।

মুক্তামালার শরীর যেন ঝিমঝিম করে উঠত। তার মনে হত—এখনি, যাদের কাছে গৌরব করে দীপা এই সংবাদটি দিচ্ছে তাদের মুখে সেই বিচিত্র হাসি ফুটে উঠবে—যা ফুটে উঠেছিল বর্ধমানের শ্মশানে—সেখানকার লোকেদের মুখে।

তার জন্মের বছরেই—মাস আষ্টেক পর—তার জন্মদাতা রুগ্নদেহেই তদ্বির করে গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তাদের ধরে পেড়ে মায়ের এই গান দুখানা রেকর্ড করিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন—যদি গান দুখানা বাজারে জনপ্রিয় হয় তবে এই দিক থেকে কাঞ্চনমালার জীবনের উপার্জনের পথ খুলবে। নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সে আশা পূর্ণ হয় নি, শুধু এই রেকর্ডখানায় প্রমাণ থেকে গেছে—কাঞ্চনমালা দাসী ছিল পেশাদার কীর্তনওয়ালী। ঢপ কীর্তনওয়ালী।

দীপাকে সে বারণ করত—ওসব কথা কেন বল দীপা?

দীপা বলত—কেন, বলব না কেন? হিংসুটিরা সব শুনুক না। আমার মা থিয়েটার

করত, আমি তো সবাইকে বলি!

চুপ করতে হত তাকে।

যাদের কাছে দীপা এ গল্প করত তারা অনেকে প্রশ্ন করত—তুমি গান গাইতে পার?

সে বলত—না।

দীপা বলত—না—না। খুব ভাল পারে। গায় না। আমি শুনেছি—একা যখন থাকে, তখন গুনগুন করে গায়। রেডিওতে গান হয়—যে গান ভাল লাগে—সেটা, একা থাকলে নিজে গায়। রবীন্দ্রসংগীতে ভারী ঝোঁক!

সে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কাঠের পুতুলের মত চলে যেত সেখান থেকে। কিন্তু চলে গিয়ে এমন ক্ষেত্রে রেহাই পাওয়া যায় না। হয়তো সব দেশে সব সমাজে এর কিছু কিছু আছে—কিন্তু এ দেশে এ সমাজে এর আর ক্ষমা নেই। এ দেশে মানুষকে ছুঁলে মানুষ স্নান করে, নিজের বিছানাও এখানে পবিত্র নয়, অন্ন জল এ দেশে মানুষের স্পর্শে অপবিত্র হয়। সেই দেশে কি কাঠের পুতুল হয়েও রেহাই পায় কেউ? সেও পায় নি। একদিন কাঠের পুতুলত্বের ভিতর থেকে তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল।

অহল্যা অসতীত্বের অপরাধে পাথর হয়ে গিয়েছিল। সে গল্প সে শুনেছে। পড়েছে। আজ এই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মন তার নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে। মানুষের দেহ সত্যি পাথর হয় না; মন পাথর হয়। সে যেমন ইস্কুলে কাঠের পুতুল হয়েছিল—তেমনি গৌতম ঋষির পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্তরে পাথর হয়ে ঘুরে বেড়াত, গ্রাহ্য করেনি মানুষের ব্যঙ্গ, গ্রাহ্য করেনি সমাজের শাস্তি; সে অরণ্যে অরণ্যে বনবাসিনী হয়ে ফিরত, শুদ্ধ বোবা হয়ে থাকত। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি। তারপর রাম এসে তাকে যেদিন পদাঘাত করলেন—সেই দিন পাথরের মন ফেটে গেল মর্মান্তিক বেদনায়। ভেঙে পড়ল। কাঁদল রামের পায়ে ধরে। রাজার ছেলে রাম, লোকে তাঁকে বলত ভগবানের অবতার, তাঁর আদেশে দেশের সমাজের একপ্রান্তে সে স্থান পেয়েছিল। সে অহল্যার মত নয়, তবু তার সঙ্গে নিজের একটা মিল খুঁজে বের করে। অহল্যার দোষ—অহল্যার; সে দোষ কতটুকু তার বিচার থাক, হয়তো ষোল আনা অপরাধের এক আনা। তার ক্ষেত্রে অপরাধ তার নিজের এক পাইও নয়। অপরাধ জন্মদাতার, অপরাধ গর্ভধারিণীর। যার জন্যে সে কাঠের পুতুল হয়ে ছিল। তারপর একদিন সে কাঠের পুতুল ক্ষোভে অপমানে অন্তরের আগুনে জ্বলে উঠল। তার ভাগ্যে রাজার ছেলে রাম নয়, বর্ধমানেরই এক উকিলের নাতনী তাকে লাথি মারার মতই আঘাত করলে।

মাস আষ্টেক পর।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস।

সেবার সে ক্লাস-প্রমোশন পায় নি, ফেল করেছিল। দীপাও পায়নি। রূপী কেঁদেকেটে উঠেছিল। চাঁপা মাসীর বাড়িতে তা নিয়ে কোন ক্ষোভ হয় নি। চাঁপা মাসী একটু ক্ষুব্ধ যদিবা হয়েছিল কিন্তু সুরেন মেসোর পরিহাসে তা জোরালো ফুৎকারে আগুনের ফিনকির মত নিভে গিয়েছিল।

চাঁপা মাসী বলেছিল—একটা কেউ বাড়ির প্রমোশন পেলে না গা! (তখনও কাঁদাকাটা করে রূপীর প্রমোশন হয় নি!) তা হলে—অপব্যয়গুলো করে হবে কি?

সুরেন মেসো বলেছিল—যেঁত্ দাও (যেতে দাও) মহিন্দর—যেত্ দাও। বেশী বকো না! (বোধ হয় কোন পুরানো নাটকের কথা)।

চাঁপা মাসী বলেছিল—যেত্ দোবো! বকবো না?

সুরেন মেসো গড়গড়ায় কাঠের নল লাগিয়ে তামাক খেতো, আর খেতো এক ডেলা আফিং। চোখ প্রায় বুঁজেই থাকত। সেই অবস্থায় তামাক খেতে খেতেই বলেছিল—হ্যাঁ। যেত্ দেবে। বকবে না।

—কেন?

—আরে! গড়গড়ার নল থেকে এবার মুখ তুলে—চোখের পাতা দুটোকে চেষ্টা করে চাড় দিয়ে খুলে আরক্ত দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—আরে আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয়? ইস্কুলে কিফ্‌থ ক্লাস থেকে ভেগেছিলাম। এক ক্লাসে তিন বছর ছিলাম। ভেবেছিলাম কেঁদেকেটে প্রমোশন পাব, তা হেডমাস্টার বললেন—তোকে প্রমোশন দিতে হলে গরুকে দিতে হবে। ও কেষ্ট, কেরানীবাবুকে বল তো সুরেনের বাংলা খাতাটা দিতে। খাতা এল—মাস্টার দেখালেন—গরু বানান লিখেছি গ-রয়ে উ। তারপর বললেন—তোর পকেট থেকে হেডপণ্ডিত পরীক্ষার হলে সিগারেট বের করেছিলেন, তাতে কি ছিল? সিগারেট? তাঁর মাথা ঘুরেছে! ছিল চরস। মিকচার টোবাকোর সঙ্গে চরস মিশিয়ে খেতাম। বুয়েচ! এরপর পড়া ছাড়লাম। তারপর অ্যামেচার থিয়েটার। শেষ পর্যন্ত পাবলিক থিয়েটারে ড্যান্সিং মাস্টার। একবার এস্টারের বড়বাবু নাটক কপি করতে দিয়েছিলেন—এমন কপি হল যে সে পড়ে কোন্‌ বেটা। তা আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া কি করে হবে বলো? আক্ষেপ করো না চম্পকরানী, বৃথা এ আক্ষেপ তব, অরণ্যে রোদন।

চাঁপা মাসী বুঝেছিল। কিন্তু পড়া ছাড়ায় নি ছেলেমেয়ের। সিনেমাতে ঢুকতে হলে লেখাপড়া চাই। অন্ততঃ ম্যাট্রিক ফেল এটা বলতে পারা চাই। তার সম্বন্ধে কথা ওঠেনি। মায়ের মৃত্যুর পর মাত্র কয়েক মাস সে ভরতি হয়েছিল। আর টাকা যেটা তার পিছনে খরচ হচ্ছিল সেটা তার বাড়ি বিক্রির টাকা। বিশ বছর আগে আড়াই হাজারে কেনা বাড়ি সাত হাজারে বিক্রি হয়েছে। সে নিজে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দুঃখ পেয়েছিল কিন্তু পরিশ্রম সে কম করে নি, তাই অনুশোচনা বা নিজেকে তিরস্কার করতে পারে নি—শুধু দুঃখ পেয়েছিল, কেঁদেছিল।

ক্লাসে নিচের ক্লাসের মেয়েরা উঠে এল। সঙ্গে এল এই মেয়েটি—নাম গায়ত্রী মুখার্জী। বর্ধমানের কোন উকিলের পৌত্রী—বাপ কোন্ তেল কোম্পানীতে কাজ করে, আগে থাকত ভবানীপুরে, এখন নতুন কলোনীতে বাড়ি করে এখানে থাকে। মেয়েটি এ স্কুলে এসেছে অল্প কিছুদিন। প্রমোশনের দিন সে তাদের ক্লাসের মেয়েদের নাম ডাকা শেষ হলেই চলে এসেছিল, তার নাম তাদের মধ্যে ছিল না। তারপর দু'তিন দিন কেঁদেছিল। তারপর কয়েকদিন ইস্কুলে আসে নি। তারপর এল ইস্কুলে। যেদিন এল সেই দিনই একটি ঘটনা ঘটল। সে ক্লাসে ঢুকে ভাবছিল কোথায় বসবে। একটা বেঞ্চে আরও দুজন ফেল-করা মেয়ে বসেছিল। তারাই তাকে ডেকেছিল—মুক্তো এখানে আয়। এই বেঞ্চে।

মুক্তো সেই বেঞ্চেই গিয়ে বসেছিল। গায়ত্রী উঠে গিয়েছিল বেঞ্চখানা থেকে। কারণটা সেদিন বুঝতে পারে নি মুক্তো।

কয়েকদিন পর গায়ত্রী এসে হঠাৎ তাকে বললে—আমাদেরও বাড়ি বর্ধমান।

মুক্তোর বুকখানা ধড়াস করে উঠল। সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গায়ত্রী হেসে বললে—আমার মা তোমার মাকে দেখেছে। বলছিল—তোমার মা খুব ভাল গান গাইত।

সে হাসির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল। মুক্তোর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, হাত পা ঘামতে শুরু করেছিল। চুপচাপই সে থাকত। অভ্যাসে অভ্যাসে যেন স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বুকের ভিতর বিদ্রোহ জেগেছিল কিন্তু বলতে কিছু চায় নি—পারে নি। এর উত্তর যে সে আজও খুঁজে পায় নি। এর উত্তরে সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মা উত্তর একটা দিয়েছিল—সে উত্তর উত্তর নয়—সে তার মায়ের কৈফিয়ৎ। যে কৈফিয়তে সে নিজেই সন্তুষ্ট হয় নি—দুনিয়া তাতে খুশী হবে কেন? মায়ের মত সে যদি বলতে পারত তবে ভাল হত। কিন্তু সে তা আজও পারলে না। সেদিন পারার কথাই ছিল না। সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে সেই তাকিয়েই ছিল।

গায়ত্রীর বয়স হয়েছিল। ওর থেকে তার বেশী বয়স। তা ছাড়া সে সেই ধরনের মেয়ে যারা বয়সের চেয়ে অনেক বেশী-বয়সের মেয়ে হয়ে ওঠে। যাদের বাড়িতে পুরনো আমলের সেই রেওয়াজ আজও আছে যাতে মেয়েরা যুবতী হতে না হতে বুড়ির মত কথা বলতে পারে। সে মুখ মচকে বলছিল—তুমি বোবা নাকি?

সে এবার বলেছিল—না। বোবা কেন হব?

—তবে? কথা বল না যে?

—এই তো বলছি।

—কিন্তু সবাই বলে, তুমি কথা বল না।

এ কথারও সে জবাব দেয় নি। আবার সে চুপ করে গিয়েছিল।

—আচ্ছা, চলি।

বলে গায়ত্রী চলে গিয়েছিল। ক্লাসে মাস্টার তখনও আসে নি। শুরু হয় নি স্কুল। যাবার সময় গায়ত্রী গান গেয়েছিল গুনগুন করে।

—গোকুল নগর মাঝে আরও কত নারী আছে

তাহে কেন না পড়ল বাধা!—কীর্তন গেয়েছেন কাঞ্চনমালা দাসী।

সারাটা দিন সে কাঠ হয়ে বসেছিল। না কাঠ নয়—ছিল কাঠ, সেদিন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কাঠ মাটির তলায় চাপা পড়ে পাথর হয়। সেদিন এ কথা সে জানত না—আজ সে লেখাপড়া না শিখেও অর্থাৎ ইস্কুল কলেজে না পড়েও অনেক শিখেছে, অনেক জেনেছে, আজ সে জেনেছে শুধু পাথর কেন কয়লাও হয়—আগুন লাগে কয়লায়।

ইস্কুলে যে পড়া তার হয় নি, পড়েও যে সে ভাল করে কিছুই বুঝতে পারত না তার কারণও এই। একটা আশঙ্কায়, নিজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় তার মন প্রথমে কাঠ, পরে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

চাপা হাসির একটা তরঙ্গ ক্লাসের অন্য প্রান্তে বয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার আভাস এই প্রান্তে তার কাছে অগোচর থাকে নি। শুধু চাপা হাসিই নয়—মধ্যে মধ্যে সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টি গায়ত্রীর মুখের দিকে প্রথম নিবদ্ধ হয়ে মুহূর্ত পরে তার দিকে ফিরছিল।

টিফিনের সময় স্রোতটা এসে সরাসরি তার উপর আছড়ে পড়েছিল। ওপাশের একটি মেয়ে এসে তাকে প্রশ্ন করেছিল—তোমার মা নাকি চপ-কেত্তনওয়ালী ছিল? সে কি উত্তর দেবে? বিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে তার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিল। গায়ত্রী পিছন থেকে এসে বলেছিল—উত্তর দাও না কেন?

তার কণ্ঠ থেকে এবার স্বর বের হয়েছিল। তাতে অসহনীয় উত্তাপ। সে উদ্ধতভাবে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলেছিল—হ্যাঁ ছিল।

—তোমার মা বেশ্যা ছিল?

এবার বিস্ফোরণ হয়েছিল। তার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। সে বাঘিনীর মত লাফ দিয়ে পড়েছিল গায়ত্রীর উপর। এবং চিৎকার করেছিল—না—না—না। অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন হেডমিস্ট্রেস!—কি হল? কি হয়েছে? ছাড়! ছাড়!

ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তো এখানেই শেষ হবার নয়। অফিসরুমে ডাক পড়েছিল। দুজনেরই ডাক পড়েছিল। হেডমিস্ট্রেস দুজনকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছিল বল!

ঠিক এই সময়ে অন্য একজন দিদিমণি হেডমিস্ট্রেসের কানে কানে কিছু—কি আর কিছু,—এই ঘটনার কথাই সংক্ষেপে তাঁকে বলেছিলেন,—নইলে হেডমিস্ট্রেস বলবেন কেন—তুমি একটু বাইরে যাও—ওই টিচারদের রুমে গিয়ে বস। পরে ডাকব তোমাকে।

টিচারদের ঘরে গিয়ে এক পাশে সে চুপ করে বসেছিল। অন্তরে কিন্তু আগুন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল উদ্ধত চীৎকারে সে বলে—হ্যাঁ—আমার মা—। আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে—এইখানেই তার মনের কণ্ঠও যেন আপনাআপনি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল—নিজের ভিতরেই কেউ যেন মনের কণ্ঠকে সজোরে টিপে ধরে বলছিল—না—। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতর থেকে অসহনীয় বেদনার ক্ষোভের সমুদ্র কলকল্লোলে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল বাইরে এসে। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সেই হাতখানাই এবার তার মনের মুখের উপর চাপা দিয়ে সেই ভিতরের জন বলছিল—ছি! মেঝের দিকে চেয়ে সে বসেছিল কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করছিল—টিচারদের বক্রকটাক্ষ একবার তার দিকে একবার নিজেদের মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে বিনিময় হচ্ছিল—ইঙ্গিত চলছিল। অনেকজনের ঠোঁট দুটি ওই গায়ত্রীর মতই উল্টে উল্টে যাচ্ছিল।

অসহনীয় শীতে যেমন কষ্ট হয়, ঠিক তাই যেন হচ্ছিল তার। সূচীতীক্ষ্ণ কিছু যেন তাকে বিঁধছিল. দেহ হয়ে আসছিল অসাড়।

এ অনুভূতি স্পষ্ট মনে আছে আজও। মনই অসাড় হয়ে আসছিল আসলে। কিছুক্ষণ পর যখন তার ডাক পড়েছিল তখন প্রথমটায় সে ঠিক খেয়াল করতে পারে নি। তাকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে হয়েছিল, চমকে উঠেছিল সে; যে দিদিমণি কাছে বসেছিলেন তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন,—তোমাকে ডাকছেন! শুনতে পাচ্ছ না?

সে আস্তে আস্তে উঠে এসে আপিস-ঘরে টেবিল ধরে দাঁড়িয়েছিল। হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন—কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। সত্যি জবাব দেবে। কেমন?

সে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ।

—তোমার—। কথা বলতে তাঁরও বাধছিল। একবার থেমে দ্বিতীয়বারে শেষ করে বলেছিলেন—তোমার মা কীর্তন গাইতেন?

—হ্যাঁ।

—কাঞ্চনমালা—কীর্তনগায়িকা?

—হ্যাঁ।

—বর্ধমানে থাকতেন?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি তো বর্ধমান ইস্কুলের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ভরতি হয়েছ। মিশনারী ইস্কুল!

এর উত্তর আর সে দেয়নি। গলা তার শুকিয়ে আসছিল।

হেডমিস্ট্রেসও কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। এর পর আর যেন প্রশ্ন পাচ্ছিলেন না তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—বোধ হয়ে খুঁজে পেলেন—কাঞ্চনমালা দাসী? না?

সে ঘাড় নাড়লে—হ্যাঁ।

—জাতে কি তোমরা?

—বোষ্টম।

—কিন্তু—তোমার নাম রয়েছে মুক্তামালা বোস! বাবার নাম রয়েছে ভূদেব বোস। কেন বল তো? মা দাসী! বাবা বোস!

অকস্মাৎ সব কালো হয়ে গিয়েছিল—অথবা কালো একটা সমুদ্রের মত কিছু এসে দিনের আলো, বাইরের সব—অফিস রুম—সব সব ঢেকে ফেলেছিল বা ডুবিয়ে দিয়েছিল।

আর তারপর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ পর সে জানে না, আবার দিনের আলোর মধ্যে ফিরে এসেছিল। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। সে শুয়েছিল একখানা বেঞ্চের উপর। একজন দিদিমণি মুখে জল দিচ্ছিলেন, স্কুলের ঝি মাথায় হাওয়া করছিল।

কথা আর কিছু হয় নি। কিছুক্ষণ পরে একখানা রিক্শা ডেকে একজন দিদিমণি তাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং দিয়ে গিয়েছিলেন স্কুলের একখানা পত্র। তার গার্জেন মেসোমশায়কে যেতে লিখেছিলেন হেডমিস্ট্রেস।

অকস্মাৎ চাঁপা মাসীর গৃহস্থঘরের সব আবরণ নিতান্তই একটা খোলসের মত খসে পড়েছিল। কুৎসিত ভাষায় উলঙ্গ অশ্লীল গালিগালাজ শুরু করেছিল মাসী ওই গায়ত্রীকে এবং ইস্কুলের দিদিমণিদের। সে শুয়েছিল—শুয়ে শুয়ে শুনছিল, তারপর সে এখানেও যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। তার মাও কি এমনই আঘাতে এমনি উলঙ্গ গালিগালাজ করতে পারত? সেও কি পারে? আজ না পারলেও কাল পারবে?

ব্যাপারটা আরও খানিকটা গড়িয়েছিল। সুরেন মেসোকে ডেকে হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন, ভাল করেই বলেছিলেন—দেখুন এ নিয়ে যখন আন্দোলন হয়েছে তখন তো মুক্তোকে বা দীপাকে আর নিতে পারব না। ইস্কুলের ক্ষতি হবে।

সুরেন মেসো আহত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—ওদের মা বাপের যাই দোষ থাক, ওদের দোষ কি বলুন?

—সে বিচার আমি করব না সুরেনবাবু, আমাকে ইস্কুল রাখতে হবে। ইস্কুলের জন্যে ওদের আমি রাখতে পারব না। আপনি অন্য ইস্কুলে দিন না।

—না। সেখানেও যদি এই বলে?

—কি করব? আমি নিরুপায়। আমাকে নোটিশ দিয়ে নাম কেটে দিতে হবে।

সুরেন মেসো একটু অনুনয় করেছিলেন, বলেছিলেন—আপনি জানেন না, মুক্তোর মা বলতে গেলে মুক্তোর জন্মের আগে থেকে গৃহস্থঘরের মেয়েদের থেকেও ভাল ছিলেন। একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে না নিলে—

—উপায় নেই। কি করব আমি। ইস্কুল আমার ভেঙে যাবে।

এবার চটেছিলেন সুরেন মেসো। বলেছিলেন—ভাল, মুক্তোকে বলছেন—সে আসবে না। কিন্তু দীপা আসবে। তাকে আপনি তাড়ান কি করে তা আমি দেখব।

চলে এসেছিলেন সুরেন মেসো। তারপর ইস্কুল থেকে নোটিশ এসেছিল—পরিচয় গোপন

করে মুক্তো ও দীপাকে ভরতি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে পড়তে ইস্কুলের মেয়েদের সামাজিক কারণে আপত্তি আছে। সুতরাং তাদের নাম কেটে দেওয়া হল।

সুরেন মেসো দিয়েছিলেন উকিলের নোটিশ। তার ব্যাপার নিয়ে নয়, দীপার ব্যাপার নিয়ে।

সুরেন মেসো চাঁপা মাসীকে থিয়েটারের লোকদের সাক্ষী রেখে—চাঁপা মাসীদের সমাজের পুরোহিত ডেকে অনুষ্ঠান করেই বিয়ে শেষ করেন নি; রেজেস্ট্রি করেও বিয়ে করেছিলেন।

ওই সমারোহের কিছুদিন পর। লোকের ব্যঙ্গ-ঠাট্টায় ক্রুদ্ধ হয়ে করেছিলেন রেজেস্ট্রি বিয়ে। থিয়েটারের লোকে বলেছিল—মিত্তিরের মরণ, চাঁপারও আদিখ্যেতা। বিয়ে! দূর! দুদিন পরে মিত্তির ছুটবে চাঁপাকে ছেড়ে পারুলের বাড়ি—চাঁপা ধরবে নতুন কাপ্তেন। সঙ করবি তার এত ঢঙ কেন?

শুধু পুরুষরাই নয়। মেয়েরাও। মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়ে হাসত। একজন সেই বৈশাখে চাঁপাকে ঠাট্টা করে বলেছিল—তোকে ভাই এবার এয়ো করব আমি। চাঁপা মাসী তাকে কি জবাব দিয়েছিল সেটার কাহিনী আজ স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, সুরেন মেসোরও গেছে, চাঁপা মাসীরও গেছে—তবে তাদের সে মর্মবেদনার কথা মনে আছে; বেদনা তারা দুজনেই পেয়েছিল, এই ক্ষেত্রটিতে তাদের দুজনেরই মনের চামড়ার অবস্থা গণ্ডারের চামড়ার মত পুরুই ছিল কিন্তু তা তখন বিচিত্রভাবে কোমল মানুষের চামড়া হয়ে উঠেছিল—তারা এতে আঘাত পেয়েছিল। এবং দুজনেই পরামর্শ করে রেজেস্ট্রি করে এসেছিল।

সার্টিফিকেটখানা ছিল। কোন দিন কাজে লাগবে বলে ছিল না, পরম প্রিয় বস্তু বলে ছিল। তারই নকল সমেত গিয়েছিল উকীলের চিঠি এবং মানহানির জন্য নালিশের কথাও তাতে লেখা ছিল। এর পর হেডমিস্ট্রেস সেক্রেটারী ছুটে এসেছিলেন চাঁপা মাসীর বাড়ি। ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—যা হয়ে গেছে গেছে, দীপাকে পাঠিয়ে দেবেন। মুক্তোকেও দেবেন। তবে—গোলমাল তো ওকে নিয়েই কিনা। একটু ভেবে দেখুন—ইস্কুলটা হয় তো ভেঙে যাবে।

সুরেন মেসো টেবিলে চাপড় মেরে বলেছিলেন—স্যার, আমি দু-কান-কাটা। এককান-কাটারা গাঁয়ের বাইরে বাইরে যায়, দু-কান-কাটারা শহরের পথের উপর বুক ফুলিয়ে হাঁটে। ওই গায়ত্রী না কি, ওর বাবাটার খোঁজ আমি নিয়েছি স্যর। ওটার আবার নাক কান দুইই কাটা। মুক্তোর মা কাঞ্চন এই পাপ জীবন থেকে পালাতে গিয়ে আসানসোলে কয়েকটা ডাকাত লোচ্চার হাতে পড়েছিল—তারা ওর লাঞ্ছনার বাকি রাখে নি। খবরের কাগজে শোরগোল উঠেছিল—লিখেছিল—ভদ্রলোকে পুণ্য করে না পতিতে পুণ্য করে। সব ভদ্দর-লোকের ছেলে—গুণ্ডা লোচ্চা তারা। মস্ত কেস। সেই কেসে ওই গুণ্ডাদের উকীল ছিল গায়ত্রীর ঠাকুরদা। ওর বাবাও গুণ্ডা। সেটা ছিল গুণ্ডাদের টাউট। মহাজন-টুলিতে নামী লোক। তবে উকীলের বেটা—চাকরি পেয়ে গেছে। এখন জেণ্টেলম্যান। আমি ফাঁস করে দিচ্ছি। যেতে দিন বললে শুনছি না।

তাই বলতে তাঁদের হয়েছিল। কিন্তু সেটা এ পক্ষের জন্যেই তাঁরা বলেছিলেন। অর্থাৎ দীপা এবং মুক্তোর জন্যে।

পরের দিন সুরেন মেসো নিজে পরমোৎসাহে সেজেগুজে ডাক দিয়েছিলেন—দীপা মুক্তো—হল তোদের, চল আমি নিয়ে যাব তোদের ইস্কুলে।

দীপার হয়েছিল—সে তৈরি হয়ে বলেছিল—যাচ্ছি বাবা! মুক্তোদির হয় নি।

—মু—ক্তো! ডাক দিয়েছিলেন সুরেন মেসো।

মুক্তো চুপ করে বসেছিল তার বিছানার তক্তাপোশটার একটা কোণে। একটা দুরন্ত ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল; পাশে বই দপ্তর পড়েছিল কিন্তু কোনমতেই উঠে দাঁড়াতে পারছিল না সে।

তার মনের চোখের সামনে অসংখ্য মেয়ের ব্যঙ্গ-হাস্যে মেলা দাঁতগুলো যেন লম্বা ধারালো ছুরির মত সারি বেধে উঁচিয়ে ছিল—ঝিকঝিক করছিল—তাকে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

দীপা এসে দাঁড়িয়েছিল—এসো ওঠো। দীপার উৎসাহ সুরেন মেসোর মত। অথবা তার থেকেও বেশী। কিন্তু মুক্তো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। দীপা তার বইয়ের ব্যাগটা তুলতেই সে চেপে ধরেছিল।

—না।

তারপর এসেছিল চাঁপা মাসী—মুক্তো!

সে বলেছিল—না।

চাঁপা মাসী তার হাত ধরে বলেছিল—না নয়, ওঠ! যেতে হবে তোকে।

সে কেঁদে ফেলেছিল—না—না। অন্য হাতটা দিয়ে বিছানার চৌকির বাজুটা চেপে ধরেছিল।

—কেন?

—না—না। আমি যাব না।

—মুক্তো, তোর হল কি? এবার এসেছিলেন সুরেন মেসো। সঙ্গে রূপী।

সে এবার সবেগে ঘাড় নেড়ে নিদারুণ আতঙ্কে কেঁদে উঠে বলেছিল—আমি যাব না। আমি মরে যাব। না—না—না। রাগ করে চাঁপা মাসী টেনেছিল তাকে সজোরে। সে-টানে তার হাত ছেড়ে গিয়ে সে আছড়ে পড়েছিল মেঝের উপর। পড়বার সময় চৌকির কোণে লেগে তার কপালটা কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে কথা সে জানতে পারে নি, সে অধিকতর আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল—তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের পায়ে পড়ি। আমি যাব না। আমি পড়ব না। চাঁপা মাসী ছেড়ে দিয়েছিল তাকে।

সুরেন মেসো বলেছিল—থাক তবে, আজ থাক ও। চল দীপা তুই চল।

তিন

এরপর আর সে ইস্কুলে যায় নি। চেষ্টা সুরেন মেসো করছিল—প্রায় এক মাস ধরে চেষ্টা করছিল—প্রতিদিন সে এসে ডাকত—চল, কোন ভয় নেই চল।

সে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। চুপ করে। সেই কাঠের বা পাথরের মূর্তির মত।

শেষ পর্যন্ত চাঁপা মাসী একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে তার চুলের মুঠো ধরে টেনেছিল।—যেতেই হবে তোকে।

সে চিৎকার করে কেঁদেছিল—না—না।

বাঁচিয়েছিল সুরেন মেসো এসে।—ছেড়ে দাও। করছ কি ?

চাঁপা মাসী বলেছিল—না। আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন!

—না—না। যেতে দাও।

—যেতে দেবো!

—হ্যাঁ। যেতে দাও। না যায় যাবে না।

—যাবে না তো করবে কি ? আমরা গেরস্ত এখন। সোনাগাছির ব্যবসা তো নয়!

—কি বিপদ! চেঁচিও না।

—চ্যাঁচাব না! আর তো সব ঢাকা আছে তাই চ্যাঁচাব না ওই ওর জন্যে।

সুরেন মেসো বলেছিল—রূপীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব। রূপীর তো বিয়ে দিতে হবে।

—রূপীর সঙ্গে বিয়ে ? মাসতুত ভাই বোন! ও বয়সে এক বছরের বড়।

—হলেই বা! আমাদের শাস্তরে তো পিণ্ডিদোষ নেই। আর এক বছরের ছোটতে যাবে আসবে না কিছু। বেটাছেলে—হু হু করে বেড়ে যাবে।

হঠাৎ রূপী ঘরে ঢুকে বলেছিল—এক থাবড়া মারব তোমার মুখে। খবরদার তুমি ও কথা বলবে না আর। ও কথা শুনলে পাপ হয়।

সে শুধু কাঠের মূর্তির মত এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার তার চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করেছিল। গায়ত্রীর কথায় তার বুকে আগুন জ্বলেছিল, রূপীর কথায় এসেছিল চোখে জল।

সুরেন মেসো বলেছিল—ওরে আমার মুনি-ঋষির ব্যাটা! মুখে আমার থাবড়া মারবি! ও কথা শুনলে পাপ হয়! যে কাল পড়েছে তাতে বামন-বদ্যি ভদ্দর-লোকের ঘরে রেজেস্ট্রি করে এই বিয়ে কত হচ্ছে—আর তুই বেটা আমার গঙ্গাজলখেগো কুলীনের পুত্তুর মহা-কুলীন! বলে কিনা পাপ হয়। তোর মাকে বিয়ে করে আমার পাপ হয়েছে ? পাপ ?

চাঁপা মাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল—তুমি হলে পরমহংস মহাপুরুষ। তোমার আবার পাপ হয় ?

রূপী বলেছিল—পাপ হয়ে থাকে তোমার হয়েছে। সে তুমি জান। তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি করবে। তা বলে আমরা কেন পাপ করব ? না। এসব কথা বলবে না তুমি।

দীপা মুখে কাপড় দিয়ে হেসেছিল তার মায়ের মতই।

•

বিচিত্র মানুষ সুরেন মেসো। ও-কথা আর কোন দিন বলে নি। এবং এ নিয়ে কোন ক্ষোভই তার ছিল না।

কয়েক দিন পর রূপীকে বলেছিল—ওরে, বেটা আমার কথাটাই তুই বুঝলি নে। তোর মাকে বিয়ে করে আমার পাপ তো হয়ই নি, পুণ্যি হয়েছে। বুঝলি! পাপ করেছিলাম আগে—সেটা খণ্ডেছে।

রূপী কথা বলে নি। বলেছিল—চাঁপা মাসী। বলেছিল—কিন্তু তুমি কি করে বললে মুক্তোর সঙ্গে রূপীর বিয়ের কথা ?

—কি করে বললাম ?

—হ্যাঁ ? কি করে ? কোন্ শাস্তরে লেখে!

—কোন শাস্তরে লেখে না ?

—যে শাস্তরে লেখে সে শাস্তর আমরা ছেড়েছি—গেরস্ত হয়েছি।

—মুসলমান ক্রীশ্চানরা গেরস্ত নয় ?

—মরণ মরণ! মুখে আগুন! আমরা তাই ?

—বেশ, হয়ে যেত ওরা। আমাদের ঘাটও নেই ঘরও নেই। একটা গাছতলা হলেই হল।

—তুমি আর ওসব কথা বলবে না।

—বেশ বলব না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই স্থরেন মেসো বলেছিল—দেখ—একটা কথা বলছিলাম। মুক্তোর জন্তে একটা ভাল পথ পেয়েছি।

—যাক, মুক্তোর জন্তে ভেবো না তুমি।

—আরে শোনই না ছাই। এটা ভাল কথা।

—তোমার ভাল কথারও মুখে ছাই।

—আরে বাপু, দয়া করে শোন। হাত জোড় করছি। মাইরি বলছি—ভাল আইডিয়া।

—বল।

স্থরেন মেসো তার আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে তামাক টানতে টানতেই কথা বলছিল। —এই কাল হঠাৎ মনে হয়ে গেল। দেখা হয়ে গেল স্থবাসিনী—মানে মুন্ স্থবাসিনীর প্রভাত চাটুজ্যের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম খবর। ভালই। ছেলেমেয়ের কথা শুনলাম। ছেলেটি খাসা—বুয়েচ, বি এস-সি পর্যন্ত পড়েছে, ফেল করে জামসেদপুরের ওখানে একটা চাকরি পেয়েছে, সেখানেই থাকে। দিব্যি বিয়েও করেছে। অবিশ্যি এখানে আসে না। মেয়ে দুটি তো ছোট—একজন আঠারো, একজন ষোল—তা দুজনকেই নার্সিং শেখাচ্ছে। বললে—বুঝছ তো, বিপদ তো ওদের নিয়েই। বিয়েতে টাকা ঢালতে পারলে ভাবনা ছিল না। গরীব ঘরের ভাল ছেলে পাওয়া যেত। তা যখন নেই তখন অনেক ভেবে-চিন্তে এই লাইনেই দিলাম। লাইনটা ভাল। ভাল কাজ সৎ কাজ। তা আমারও মনে হল তাই তো, এ লাইনে তো অনেক মেয়ে যায়। ওখানে তো কুলুজী বিচার নেই। কি বল ? ওর মায়ের যে ধারা ইচ্ছে ছিল তাতে ওটা আমার ভাল মনে হচ্ছে। সিনেমা লাইনে ও পারবে না। মানে, দেখছি তো—ভারী আড়ষ্ট—চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবছে—মুখে হাসি নেই—গলা ভাল—শুনবামাত্র গান শিখে নেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু নেশা নেই। ও ওর হবে না। তা নার্সিং শিখে নার্স হোক না। কি বল ?

চাঁপা মাসী বলেছিল—এ তো খুব ভাল। খুব ভাল বলেছ তো!

পুলকের আতিশয্যে চোখদুটো চাড় দিয়ে খুলে স্থরেন মেসো বলেছিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখ তা হলে আমার মাথা আছে কিনা। তা হলে প্রভাত চাটুজ্যের কাছে গিয়ে হদিসগুলো নিয়ে আসব, কি বল ?

মাসী বলেছিল—দাঁড়াও, সেই মন্সাঠাকরুণকে একবার জিজ্ঞেস করি। মায়ের আমার ধূপের ধুনোয় চোখ দিয়ে জল যে ঝরছেই—ঝরছেই!

পাশের ঘর থেকেই সব শুনেছিল মুক্তো। কান্নার বদলে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

চাঁপা মাসী চোখ থেকে জল ঝরার কথাটা অতিরঞ্জন করে নি। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে তার মা-বাপের উপর ক্ষোভে ও অশুচি-বোধে বেদনায় কাঠ হয়ে গিয়েছিল কাঠের পুতুলের মত। তার ওপর মানুষের ঘৃণায় সে কাঠ থেকে হল পাথর। তারপর পাথর ফেটে কোথা

থেকে এল জলের ধারা। চোখের জলের উৎস যেন বাকি জীবনটার জন্যই সে-সময় বিমুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

দোষ কার? আজও সে ভাবে। দোষ কার? তার? অর্থাৎ তার জন্মের? না—সে তা মানতে পারে না।

পূর্বজন্ম? মিথ্যা। জন্ম-জন্মান্তর—পূর্বজন্ম—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। অলীক কল্পনা।

কোন দূর সুদূর অতীতকালে মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে সদ্য জ্ঞানবুদ্ধির একটি আলো—হয়তো তার উপমা প্রদীপের মত—জ্বেলে পিছনের দিকে অন্ধকারের মধ্যে যখন ভ্রূণের আকারেও মানুষ থাকে তখন, তারও পিছনে আছে হয়তো আর একটি জন্মান্তর; এবং এ জন্মে—বর্তমানের মধ্যে পথ চলেছে যখন ভবিষ্যতে অন্ধকারের মধ্যে, তখন আরও একটি জন্মান্তর প্রতীক্ষা করছে তার জন্য। হয়তো অনুমানের পিছনে শুধু জ্ঞানের আলোকের স্বল্পতাটুকুই সব নয়—তার সঙ্গে মিশে আছে জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তে নাস্তির শূন্যলোকের ভয়াবহতা। সেই ভয়ে এই কল্পনার চেয়ে বড় সান্ত্বনা কি হতে পারে? জন্মের জন্য কোন দোষ কোন অপরাধ তার নেই! নেই! নেই!

তবে কার? মার বাবার?

তাই বা কি করে বলবে? না, বলতে পারবে না। তার মা বাবার ভালবাসাকে সে অস্বীকার করতে পারবে না! মায়ের ভালবাসাকে তো নয়ই। বাবার—? একটু থমকে দাঁড়াতে হয় এখানে। কে—? রোগ-শয্যায় মৃত্যুকে সম্মুখে রেখেও দেহের আবেদন মঞ্জুর করলে কেন? উত্তর তারও আছে। যে দেহের আবেদন মৃত্যু-ভয় রোগযন্ত্রণাকে বিস্মৃত করিয়ে দিতে পারে তার আবেদন কি অমঞ্জুর করবার হাত কারুর আছে? মঞ্জুরী অমঞ্জুরীর ঊর্ধ্বে সে। যখন সে আসে তখন দিনকে আচ্ছন্ন নিষ্প্রভ করে অন্ধকারের আসার মত অনিবার্য শক্তিতে সে আসে বা জাগে।

শুধু একটি প্রশ্ন। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা তপস্যা করেছ—তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রেখেছিলে কেন? তার পরিচয় তারই কাছে বা কেন ঢেকে রেখেছিলে? মানুষ তার এই জন্ম-পরিচয়কে অশুচি ভাবে—সেটা সমাজের সংস্কার; তোমরা সত্য পরিচয় গোপন করে তার মধ্যেও সেই সংস্কার জন্মাতে দিলে কেন?

মা হয়তো এ পরিচয় গোপন করত না। প্রথম বাল্যেই সে নিশ্চয় জানতে পারত, এবং সেই সত্যকে স্বীকার করলে সে তো নিজেকে নিজে ঘৃণা করত না।

চাঁপা মাসীর ছেলে মেয়ে, তারা তো নিজেদের নিজেরা ঘৃণা করে না।

গোপন করে গেছেন তার জন্মদাতা। দায়ী তিনি।

থাক। ও কথা থাক।

চাঁপা মাসীকে এসে কথাগুলি সব বলতেও হয় নি। সে কাঁদে নি। পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে উজ্জ্বল হাসি হেসে বলেছিল—তাই বল মাসী মেসোমশায়কে—নার্সিং শিখতে ভরতি করে দিন আমাকে। আমি শিখব।

চার

দু বছর জুনিয়ার নার্স কোর্স ট্রেনিং। তারপর দু বছর সিনিয়র কোর্স। চার বছর। অনেক আগ্রহ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সে এখানে এসেছিল। আশঙ্কাও ছিল, না ছিল তা নয়। কেউই কি কোন প্রশ্ন করবে না এখানে? নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল—মুন সুবাসিনীর দুই মেয়েও তো পড়ে সেখানে। প্রশ্ন তো ওঠে নি। আরও জেনেছিল—সুবাসিনী এবং প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বাস করে তার মা-বাপের মতই। চাঁপা মাসী সুরেন মেসোর মত বিয়ের রেজেস্টি করার সার্টিফিকেট তারা নেয় নি। তাদের মেয়েরা যখন পড়ছে সেখানে তখন তার সম্পর্কেই বা কথা উঠবে কেন? সুরেন মেসো বলেছিল—শুধু সুবাসিনীর মেয়ে দুটিই নয়—সুবাসিনী, চাঁপা মাসী ও তার মায়ের মত অনেকের মেয়েই ওখানে পড়ে পাস করে গেছে এবং আরও আট-দশজন পড়ে। একবার মনে হয়েছিল—তারা যদি দীপার মত হয়! যাদের জন্ম-সত্য জানার জন্য এরকম কোন সংকোচ নেই। নিজের প্রতি নিজের ঘৃণাই যে সে সংকোচের মূল! তবুও ভরসা করে সে গিয়েছিল। ভরতিও হয়েছিল। ১৯৪৩ সাল। যুদ্ধের জন্য নার্সের অনেক চাহিদা।

সে এক নতুন জগৎ—বিচিত্র পরিবেশ।

বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে হাসপাতাল—নানান বিভাগ; জেনারেল ওয়ার্ড, এমার্জেন্সী ওয়ার্ড, সার্জিকেল ওয়ার্ড, কলেরা বসন্তের ওয়ার্ড। ইয়ার-নোজ-থ্রোট। মেটারনিটি।

এতদিন সে হাসপাতাল দেখেছে বাইরে থেকে। ভিতরে এসে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। আবার অজ্ঞাত অকল্পিত এক আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েও চমকে উঠেছিল প্রথমটা। এ যে সবই পুরুষ—। ডাক্তার ছাত্র লোকজন সব—সবই যে পুরুষের মেলা।

হাসপাতালের বাইরে নিজেদের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে উল্লাস—উচ্চহাসি, ইঙ্গিত, রসিকতা, —তরুণ ডাক্তারদেরও তাই। তবে অপেক্ষাকৃত সংযত তারা। মেয়েদের অর্থাৎ নার্সরাও ঠিক তাই নিজেদের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য—হাসপাতালের ভিতর ঢুকলে সব পাল্টে যায়। রোগ মৃত্যু—ওষুধের গন্ধ—অ্যাপ্রনের খসখসানি—নিস্তব্ধতার মধ্যে দু-চারজন রোগীর কাতরানি, অন্যদের বিষণ্ন শঙ্কাতুর দৃষ্টি—এইসবের এক প্রবল প্রভাব পড়ে সকলের উপর। সব চঞ্চলতা সব উল্লাস—সব যেন স্তম্ভিত হয়। মনে হয় অদৃশ্য কোন একজন যেন ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে—চুপ কর।

আবার বেরিয়ে এসে খোলা হাতায় লালসুরকির পথ বেয়ে চলবার সময় সব যেন পাল্টায়, মানুষ সহজ হয়ে আসে। প্রথম দিনের হোস্টেলের অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে।

সুষমা বলেছিল—কি অসভ্য ভাই ওই বোস ডাক্তারটা আর সিক্সথ ইয়ারের সেনটা। কোন জিনিস দিতে নিতে গেলেই হাত বা আঙুল টিপে দেবে নয় চিমটি কাটবে।

রেবা তার মাথায় রুমালখানা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিয়েছিল—তুমি ওদের বঁড়শীগাঁথা মাছের মত খেলাচ্ছ ভাই, আর ওরা সুযোগ পেলে টান দেবে না এ কি কথা? আঙুল টিপে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে ভাগ্যি তোমার। তোমার কামড়ে দিতেও তো পারত! মাছ না হয়ে যদি কুমীর হত!

সুষমা মফঃস্বলের মেয়ে—কলকাতার কাছাকাছি আধাশহর ডায়মণ্ড-হারবারে বাপের বাড়ি।

অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিল। সেখানে এমন কি ঘটেছিল যাতে সুষমাকে এ দেশের সাধারণ বিধবা মেয়েদের মতো রাখার কল্পনা তার বাপ করতে পারেন নি। অনেক ভেবে-চিন্তে নার্সিং কোর্সে ভরতি করে দিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। একটা সরকারী বৃত্তিও পাইয়ে দিয়েছিলেন। এখানকার নার্সরা বলে—সুষমা সেখানেও বঁড়শী দিয়ে গেঁথেছিল—ওই অফিসারের সদ্যযুবক পুত্রটিকে। নার্সিং শেখার সুযোগ এবং বৃত্তি তারই মূল্য। চঞ্চলা সুষমা সেবাব্রত নিয়েও বদলায় নি।

সেদিন সুষমা সঙ্গে সঙ্গে রেবাকে উত্তর দিয়েছিল—মণি আমি গাঙের ধারের মেয়ে, আমরা কি শুধু মাছ নিয়েই খেলি—কুমীর নিয়েও খেলতে পারি। গায়ে আমরা হলুদ মেখে তবে জলে নামি। ওটা কুমীরের ক্লোরোফর্ম। কুমীর কাত হয়ে যায়। আর সত্যি বলতে কি, এরাও রুই মাছ নয়, কুমীর—তবে মেছো কুমীর—ওদের জন্যে হলুদ লাগে না—কাতুকুতু দিয়েই সারি। কুমীরের কাতুকুতু বড্ড বেশী জান তো! কথাটা শেষ করে সে হেসে প্রায় ভেঙে পড়েছিল।

রেবা শহরের মেয়ে এবং কুমারী। রঙ কালো। বাপ গরীব। বিয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করে তার বাপ তাকে পড়াতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনবারেও ম্যাট্রিক পাস করতে পারলে না যখন তখন তার বাপ এখানে ভরতি করে দিয়েছেন। রেবা প্রথম প্রথম বড় গম্ভীর আর আড়ষ্ট ছিল—কিন্তু বিচিত্র চরিত্র—সাজতে ভালবাসত। আজও বাসে এবং সাজতেও সে জানে। এখন তো তার চর্চায় প্রায় সে সিদ্ধিলাভ করেছে! এই কালো মেয়ে যার বিয়ে হয় নি কালো বলে, তার দিকে চোখ পড়লে চোখ জুড়িয়ে যায়। নাকি—সকলে না-হলেও একদল রসিক ওর নাম দিয়েছে কালো রাধিকা। রেবা তা জানে, যখন সে ওয়ার্ড থেকে ফেরে বা ওয়ার্ডে যায়—কিংবা ডিউটির সময়েই—একটু দূর বা কোন একটি আড়াল থেকে শুনতে পায় ওই শব্দটি। প্রথম প্রথম ওর অন্তর একটু ছলকে উঠত—হুঁচোট-খাওয়া পথিকের হাতের জলভরা ঘটের ভিতরের জলের মত। কিন্তু এখন আর ওঠে না। কারণ হুঁচোটই খায় না ও কথা শুনে। তারের উপর জলভরা ঘট মাথায় নিয়ে চলার অভ্যাস তার হয়ে গেছে। শুধু একটু মুচকে হাসে। বান্ধবীরা পরিহাস করে বলে—তুই ভাই নিষ্ঠুর। এমন মিষ্টি নাম—কালো রাধিকা বলে ডাকে—তবু সাড়া দিস নে!

রেবা বলে—জানিস নে বুঝি, গৌরী রাধা সাগরে কামনা করে স্নান করেছিল যার জন্যে বাংলাদেশে কালো হয়ে জন্মেছে—শুধু কালো নয়, কালাও বটে। কামনা ছিল কালো কানাই ফরসা রঙ নিয়ে জন্মে বাঁশি বাজালেও যেন তা কানে না যায়। পাগল হব না আর বাঁশির সুরে! বুঝেছ!

এমন আরও অনেক মেয়ে। রেবা সুষমা তখন সিনিয়র ট্রেনিং শেষ করেছে, পাস করেছে, হাসপাতালেই কাজ করছে। ওরা তখন সব বড়র দল। সে দলের সকলেই একটা ছাঁচ পেয়েছে—শুধু ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্য অনুযায়ী পরস্পর থেকে কিছু কিছু পৃথক। সকলেরই জীবনে যেন দুটো কুঠরী হয়ে যায়, এক কুঠরী কর্মের কর্তব্যের অন্য কুঠরীটা জীবনের। এক কুঠরীতে তারা সেবিকা—মায়ের মত বোনের মত মেয়ের মত; অন্যটায় ঢুকলেই চেহারা পাল্টায়—তখন তারা জীবনে গৃহসুখ-বঞ্চিতা—স্নেহ সম্পর্কে বঞ্চিতা—একান্তভাবে একাকিনী—জীবনের গৃহসমারোহের আনন্দক্ষেত্র থেকে নির্বাসিতার মত। তাই এই জীবনে একাকিনীরা এই নির্বাসন দ্বীপে দলবদ্ধ হলেই খানিকটা হেসে নেয়—বাঁকাপথে জীবন-বাসনার খানিকটা প্রকাশে হাল্কা হয়। দু'একজন কাঁদেও।

বাসনাদি একটু বয়স্কা—পঁচিশের উপর বয়স—সে ধনুষ্টঙ্কারে বালকের মৃত্যু হলেই কাঁদত। এ কেস প্রায় আসত হাসপাতালে—এবং এলেই সে সেখানে ছুটে যেত দেখতে। বার বার খবর নিত। মৃত্যু হলে হোস্টেলে এসে শুয়ে শুয়ে কাঁদত। বাসনাদি বিধবা হয়েছিল একটি ছেলে নিয়ে—সে ছেলে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেছে। বাসনাদি বড় ভাল মেয়ে।

মুন সুবাসিনীর মেয়েরা জুনিয়র কোর্স শেষ করেছে তখন। নীলিমা আর অনিমা। তারা খানিকটা দীপার মত। দীপার মত এতটা নয়, তবু আদল যেন আসে। গান তাদের মুখে লেগেই থাকত। চাপল্য লাস্য—তাও বেরিয়ে পড়ত বেলোয়ারী কাঁচের ছটার মত। বেলোয়ারী কাঁচ তো অহরহই ছটা ছিটকে দেয় না—ছিটকে দেয় তখনই, যখন তাতে রোদের ঝলক এসে পড়ে।

ক্রীশ্চান মেয়ে ছিল সংখ্যায় বেশী। তাদের ছন্দ স্বতন্ত্র। কর্মের সময় সংযম তাদের বড় সহজ; হিন্দু মেয়েদের মত টানটা কড়া নয়। আবার কর্মের বাইরে উল্লাস—তাদের জীবনের ঝলকও একটু বেশী চড়া।

এরই মধ্যে আশ্বাস সত্ত্বেও সে আড়ষ্ট ভাবেই ঢুকেছিল এবং জীবনের এই বৈচিত্র্যে ওই আশ্বাসের মধ্যেও একটুখানি ভয় পেয়েছিল।

আশ্বাসের পরিমাণই বেশী। কারণ এখানে জীবনের কলঙ্ক নিয়ে জটলা নেই এমন নয় —তবে তা নিয়ে জট কেউ পাকায় না। এবং সে জট ধরে টানাটানিরও প্রবৃত্তি নেই কারও। ওগুলি যেন দেহরূপের অন্তরালবর্তী রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার অস্তিত্বের মত শুধু যুক্তিতেই স্বীকৃত নয়—বোধে স্বীকৃত। এগুলির স্পর্শে ছোঁয়াচ-পড়া নেই। হাতই ধুতে হয়—গঙ্গাস্নান করতে হয় না।

তবু ভয় হয়েছিল।

ভয় হয়েছিল বঞ্চিত জীবনের নির্জনে কল্পনার উল্লাস দেখে। আরও ভয় হত বাইরে বেরিয়ে। অনুভব করত কত তীক্ষ্ণ বাঁকা চোখের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তরুণ ছাত্রদের হাসি শুনে সে চমকে উঠত।—তাকে দেখে হাসছে!

তাদের নিম্নস্বরে কথা বলতে দেখলে মনে হত—তার সম্পর্কে কথা বলছে।

সে পথ চলত মাটির দিকেই মাথাটি ঈষৎ নত করে, চোখ মাটির উপরেই থাকত কিন্তু চকিতে সে দৃষ্টি তির্যক হয়ে দুই পাশে ছুটে যেত। কখনও কখনও অকস্মাৎ মনে হত পাশে কেউ দাঁড়িয়ে। চকিত তির্যক দৃষ্টিতে দেখত—হ্যাঁ ভুল দেখে নি সে। আবারও কখনও দেখত—ভুলই তার সেটা। যেটার ছায়া তার উপর পড়েছে অথবা তার অস্তিত্ব সে অনুভব করেছে সেটা মানুষ নয়—গাছ খুঁটি অথবা এমনি একটা কিছু।

ডাক্তার বা মেডিকেল স্টুডেন্টদের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলা তার সারা পাঠ্যজীবনে সম্ভবপর হয় নি। চিকিৎসার জিনিস যোগাতে গিয়ে হাত কাঁপা তার বন্ধ হয় নি। মনে পড়ে—প্রথম যেদিন ডাক্তারকে সাহায্য করবার জন্য তার ডাক পড়েছিল সেদিন তার এই কম্পনের আর সীমা ছিল না—তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে কাজ করেও শেষরক্ষা করতে পারে নি। শেষকালে একটা কাচের গ্লাস দিতে গিয়ে ডাক্তার ধরবার আগেই সে সেটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল—হাতে হাত ঠেকল বুঝি। গ্লাসটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। গ্লাসে শুধু জল ছিল তাই রক্ষা। তবু ডাক্তার বলেছিল—বলেছিল নয়, বিরক্তিতে বলে ফেলেছিল—ননসেন্স। ডাক্তারটি এখানকারই ছাত্র ছিল—পাস করে হাউস ফিজিসিয়ান হয়েছিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী। বয়সে নবীনই শুধু নয়, কলেজে তার খাতির আছে।

লজ্জায় সে প্রায় মরে গিয়েছিল।

শুধু নিজের অক্ষমতা বা দুর্বলতার জন্য নয়। সে জানে—নিশ্চিতরূপে জানে—ডাক্তারের সঙ্গে তার হাত ঠেকতই এবং ডাক্তার লোহার টুকরোর মত তার হাতের চুম্বকে আকৃষ্ট এবং নিবিদ্ধ হয়ে যেত। যেতই।

সে দেখেছে—চুম্বকের মত এই আকর্ষণী মুন সুবাসিনীর মেয়ে নীলিমা অণিমার আছে। তার আছে। কিন্তু সুষমা, যাকে দেখে এবং যার কথা শুনে সে প্রথম দিনই চমকে গিয়েছিল—তার ছিল না। তার বাক্যের তার ভঙ্গিমার লাস্য সত্ত্বেও না। রেবা, যাকে বলত কালো রাধিকা—তারও না।

সুষমা এখানে এখনও আছে। সে এখন এখানে চাকরি করছে। সেই হাসি—সেই কথা—সেই সব—বরং সে সব দিনে দিনে বাড়ছে—প্রখরতার সূক্ষ্মতায় এবং শক্তিতেও। জীবনে এখন সে এখানে জলের মধ্যে মাছের মত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। রেবা, সেই কালো রাধিকা এখন আর এখানে নেই—আশ্চর্য কথা—সে পাস করেই যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সুষমাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি দিত। শেষ চিঠি পেয়েছিল রেঙ্গুন থেকে। জাপানীদের পরাজয়ের পর সেটা। একটা কথা মনে আছে—সে লিখেছিল—Life is so easy here dear Susama, ইংরাজীতে চিঠি লিখেছিল। সুষমা বলেছিল—মরণ তোর! কিন্তু ডাক্তার যারা একটু অনুগ্রহ করত তাকে, তাদের দেখিয়ে বলেছিল—দেখুন! ভাবছি আমিও চলে যাব চাকরি নিয়ে। ইজি লাইফটা দেখে আসি, চেখে আসি একটু। টাকাও নিশ্চয় অনেক পাব।

মুখে বললেও কিন্তু তা যায় নি সুষমা। নিজেরা কথা উল্টে দিয়ে বলছিল—দূর্ এ বেশ আছি। এখানে কেমন মায়া পড়ে গেছে।

এই সুষমাই এই গ্লাস ভাঙার ঘটনার পর বিকেলে ডেকে বলেছিল—এই মুক্তি—শোন।

হ্যাঁ—মুক্তো ওই নার্সিং পড়বার সময় মুক্তি হয়েছিল—আর বোসের বদলে হয়েছিল দাস। জাতি লিখেছিল বৈষ্ণব।

বাপের উপাধি নেবার অধিকার তার জন্মদাতা দেন নি। অর্থ দিয়েছিলেন—এটা সে স্বীকার করে। কিন্তু কোন অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ কি অর্থে হয়? ওটা নিতান্তই শোকে সান্ত্বনার মত। সান্ত্বনায় শোকের কারণ যেমন তেমনি থেকে যায়—কোন মতেই তা ফেরে না, এও তাই; যে ঘটনায় অন্যায় হয় সে ঘটনা ঘটে গেলে কি আর ঘটনা ঘটার আগের অবস্থায় ফেরা যায়? আর্থিক ক্ষতিপূরণে যার উপর অন্যায় হয় তার আত্মার অপমান বাড়ে।

অর্থ অবশ্য নিয়েছিল তার মা। ছেলেবেলা তার এ সব পরিচয় না জানার সময় সে অর্থে সে খেয়েছে পরেছে কিন্তু জানার পরও তো সে তা ফেলে দিতে পারে নি।

লালপাহাড়ীর কুমারের দেওয়া বাড়ির দরুন টাকাটা নিয়ে তার কোন অনুশোচনা নেই। সেখানে ছলনা নেই। কিন্তু যে জন্মদাতা তার ধার্মিক ঈশ্বরভক্ত—যিনি তার মাকে বলে গেলেন, টাকা দিয়ে গেলেন তাকে সৎ, সমাজমতে শুদ্ধা করে তৈরি করতে, অথচ জন্মের মধ্য দিয়ে তাকে অশুচি অশুদ্ধই রেখে গেলেন—স্বীকৃতির সত্য গঙ্গায় অবগাহনের অধিকার তাকে দিলেন না—তার টাকা তো সে নিয়েছিল! সেও তো ছলনা! আর উপাধি ত্যাগ? সেও তো তাই। মুক্তামালা মুক্তি নাম নিলেই কি আত্মার মুক্তি হয়? বোস দাস হলেই কি হয়? তার মধ্যে মুক্তি কামনাই বা কতটা সত্য ছিল? হিসেব করে দেখলে অতি সামান্য।

ওটাও ছিল ছলনা। ওর পিছনে ছিল স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সেই জেরার স্মৃতি।

"তোমার বাবা বোস কিন্তু তোমার মা দাসী কেন?"

তখন সে তার উত্তরই খুঁজে পায় নি। বললেই হত—মায়ের বাপেদের বাড়ি গোঁড়া ছিল—তাঁদের ঘরের মেয়েরা উপাধি ব্যবহার করতেন না। সে আমলে বামুনের মেয়েরা লিখত দেবী—কিন্তু বামুন ছাড়া সব জাতের মেয়েরা লিখত দাসী!

যাক—ওসব কথা ভেবে আজ লাভ নেই।

জীবন ভুলের বোঝা। হয়তো সবটাই ভুল। ভুল নয় মিথ্যা। সব মিথ্যা। যা সত্য ভেবে তাকে মানে মানুষ—তাই তোমাকে পিষে মারে। সেই হয় তখন শাসনকর্তা—তখন সে সত্য যদি মিথ্যাই প্রমাণিত হয় তবুও তখন তাকে অস্বীকারের উপায় নেই। তোমার নিজের মনই তখন বলে—না—না—ওই সত্য। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? বাঁচতে আমি পারি না।

মানুষের একটি জাত—জাতিতে সে মানুষ।

কিন্তু তা আজও সে কোনমতেই মানতে পারছে না। তার কাছে সত্য—'হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান—ইংরেজ-ফরাসী-জার্মান-ভারতীয়—সাদা-কালো হলুদ'। এই মিথ্যাকে সে একদিন মেনেছিল সত্য বলে। আজ তা মিথ্যা হয়ে গেছে—বুদ্ধিতে যুক্তিতে সবেই। কিন্তু সে তো তাকে মানতে পারছে না। সে আজও সত্যের উপরেও সত্য হয়ে আছে।

মিথ্যা জেনেও তো ওই জন্মের কলঙ্ককে আজও অস্বীকার সে করতে পারছে না। প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করেছে—তার কলঙ্কের আকর্ষণে মানুষের মনের প্রবৃত্তি চুম্বকের টানে লোহার মত আকৃষ্ট হচ্ছে, সে অনুভব করছে—সেই অনুভূতির ফলে তার মুখের রক্তাভায় কলঙ্ক-ছোপ ফুটে উঠেছে।

সেদিনও তার তাই মনে হয়েছিল। যখন সে তরুণ হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার গাঙ্গুলীকে জিনিস যুগিয়ে দিচ্ছিল তখন সে মনে মনে অনুভব করছিল যে তার আকর্ষণ চুম্বকের লোহাকে টানার মত ডাক্তারকেও টানছে। কিন্তু যতক্ষণ রোগীটি মাঝখানে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে একটি বাধা ছিল। তারপর ডাক্তার চাইল জল। কাচের গ্লাসে জল দিতে গেল সে। ডাক্তার হাত বাড়াল—সে স্পষ্ট বুঝলে এবার ডাক্তারের আঙুল দুটো তার আঙুলের উপর পড়বে, চেপে ধরবে। সে ছেড়ে দিল গ্লাসটা। মুখখানা তখন তার কলঙ্কের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। এ কলঙ্কই যে তার রক্তে রক্তের কলঙ্ক।

সুষমাদি বিকেলে তাই ডেকে প্রশ্ন করেছিল—এই যুক্তি, শোন!

সে প্রথমটা বুঝতে পারে নি। সদ্য সে তখন ওই স্মৃতির অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এর আগে পর্যন্ত শুধুই তার মনটা ছি-ছি করেছিল। তখন সদ্য ভাবছে—হয়েছে হয়েছে—তার জন্য এত লজ্জা কিসের? ডাক্তার তাকে নির্বোধ বোকা ভেবেছে—এসব তো সে বুঝতে পারে নি। আর বুঝে থাকলেই বা কি? সেও তাহলে ঠিক আঙুল বাড়িয়েছিল তার আঙুলের উদ্দেশে। তাহলে সে সরিয়ে নিয়েছে ঠিকই করেছে। গ্লাসটা ভেঙেছে বেশ হয়েছে। গ্লাসের চেয়ে তার পবিত্রতার দাম নিশ্চয় বেশী। সে তাদের হোস্টেলের বারান্দার রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়টা ফাল্গুনের শেষ; বিকেলে কলকাতার সেই সমুদ্র-হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সামনে বাদাম গাছটায় পাতা ঝরছে। ভারী ভাল লাগছিল। মুহূর্তটা ছিল অস্বস্তির অবসানের স্বস্তির; তার উপর বসন্তদিনের অপরাহ্ণে সমুদ্রের হাওয়ার

স্পর্শে শরীরে যেন একটি আনন্দময় আরামের স্বাদ অনুভব করছিল ; মধ্যে মধ্যে কোন গাছের মুকুলজাতীয় ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

সুষমাদির আহ্বানে সে মুখ একটু ফিরিয়ে প্রসন্ন হেসে বলেছিল—কি ?

—শোন। নিচে আয়, আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না।

—যা মোটাচ্ছ দিন দিন! বলে হাসতে হাসতে নেমে গিয়েছিল সে।

—কি ?

—কি ? ভঙ্গি করে মিষ্টি ভাবেই ভেঙিয়েছিল সুষমাদি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ কি ? যেন কিসের একটা সন্দেহ জেগেছিল মুহূর্তে এবং ভুরুদুটি ঈষৎ কুঁচকে উঠেছিল।

—ননসেন্স! বলে হেসে ফেলেছিল সুষমাদি।

বলা এতেই সব হয়ে গিয়েছিল—মুখ তার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় শুকিয়ে গিয়েছিল। আয়না ছিল না, বলতে পারবে না সে। কিন্তু বুকের ভিতরটায় যেন কাঁসরে কে জোরে একটা ঘা মেরেছিল—ঘং। তারপর অতি দ্রুত ঘন—ঘন—ঘন—ঘন্ বেজেই চলেছিল। তবু সে বলেছিল—তার মানে ?

—মানে। ডোণ্ট মাইণ্ড ইট প্লিজ! অন্যায় হয়ে গেছে। ডাক্তার গাঙ্গুলী বলেছে রে, আমি না। মাঃ—সে কি কাকুতি! যাক এতকাল পরে যেন তুই খোলস ছাড়লি! ওঃ কি জড়ভরতই না ছিলি! বলেই সে হেসে ভেঙে পড়েছিল।

সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—না—তুমি এমন করে হেসো না। না।

তার হাসি বেড়ে গিয়েছিল—সে বলেছিল—ওমা! ঘায়েল—দু পক্ষই! তুইও মরেছিস!

—সুষমাদি!

আরও হেসে সুষমা বলেছিল—ভারী অসহ্য লাগছে, না ?

সে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল—হ্যাঁ লাগছে। কারণ এ মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা! আর আমার তোমার মত গণ্ডারের চামড়া নয়।

* * * *

বীজের মধ্যে থাকে অঙ্কুর। সে অঙ্কুর যখন উদ্গত হয় প্রথম, তখন তাকে প্রথম ক্ষণটিতে অন্ততঃ চোখেও দেখা যায় না ; শুধু বীজের দল দুটির মধ্যে দেখা যায় সুতোর মত একটি রেখা।

সেদিন সুষমার কথায় সে সজোরে প্রতিবাদ করেছিল—কিন্তু সুষমা জীবনের অভিজ্ঞতায় ওই সুতোর দাগের মত রেখার লক্ষণটি দেখে ঠিক ধরেছিল। অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে তখন। ডাক্তার গাঙ্গুলীর সঙ্গে এর আগে থেকেই আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছিল তার অজ্ঞাতসারে। তরুণ ডাক্তার অরুণেন্দ্র গাঙ্গুলী—এখানে সিনিয়র ; ছাত্রত্ব থেকেই গম্ভীর লোক। চলায় ফেরায় তখন থেকেই সে নিজের একটা মর্যাদা গড়ে এসেছে। যার ফলে সকলে তাকে সম্ভ্রম করত। তার উপর সে সুপুরুষ। ছাত্রদের মধ্যে একটি সহজ প্রাধান্য তার ছিল, কিন্তু সে তাদের নেতৃত্ব নিয়ে নেতা সাজে নি।

সংঘের কাল! পথেঘাটে ইনকিলাব অহরহ দীর্ঘজীবনের শুভকামনা লাভ করছে ; এমন অবস্থাতেও ক্ষমতা থাকতেও ওই ধ্বজা সে ধরতে যায় নি। এতেই ওর মর্যাদা ছিল বেশী। কলেজের অধ্যাপকেরাও তাকে যে স্নেহ করতেন তা নিছক স্নেহ ছিল না—তার সঙ্গে সম্ভ্রমের সংমিশ্রণ ছিল। নেতৃত্ব সে করত কেবল এক জায়গায় ; কলেজের ছাত্রদের অভিনয়ে। সেও সেক্রেটারী হিসেবে বা অন্য কোন পদাধিকারী হিসেবে নয়—স্টেজের উপর অভিনয়ের সময়

ওকেই দেখা যেত নায়ক হিসেবে। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিন বছরে ছখানা নাটকের পাঁচখানাতেই মুক্তো তাকে নায়ক হিসেবে দেখেছে। 'শেষরক্ষায়' গদাই-এর ভূমিকায়—সেই বুড়ী ঝিয়ের কাছে মোজা নিয়ে বুকে চেপে ধরে—ওরে মোজা বলে জানলার পানে চেয়ে কবিতা আবৃত্তি দেখে লোকে হেসে গড়াগড়ি গিয়েছিল—কিন্তু তার মুখ চোখ কান গরম হয়ে উঠেছিল লজ্জায়, কৌতুকেও সে হেসেছিল কিন্তু তার থেকেও একটা অস্বস্তিকর লজ্জাই যেন বেশী হয়েছিল তার। কর্ণার্জুনের কর্ণের ভূমিকায় তার সে অভিনয় দেখে কেঁদেছে। দুই পুরুষে 'নুটু', 'মাইকেল মধুসূদন' সবই সে-ই করত। শুধু কলেজেই নয়, মধ্যে মধ্যে বাইরেও অভিনয় করত সে। শনি রবিবার সপ্তাহে ফাঁক পেলেই থিয়েটারে সে যেতই। প্রথম ছাত্রজীবনে ছাত্র হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। কিন্তু শেষের দিকে এই বাতিকের জন্যই তার সুনাম গিয়েছিল। অধ্যাপকেরা অনুযোগ করতেন কিন্তু ফল হয় নি। শেষ পরীক্ষায় পাস একেবারেই করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে কৃতিত্বের দীপ্তি ছিল না। তবুও তার ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক আর অধ্যাপকদের স্নেহের জন্যই হোক—কলেজে জুনিয়ার হাউস ফিজিসিয়ান হয়ে ঢুকে অনায়াসেই সিনিয়র হয়েছিল। সেটা সদ্য সদ্য। এই ঘটনার মাত্র দিন চারেক আগে।

রূপে এবং গুণে, বিশেষ করে সাধারণ সময়ে তার গাম্ভীর্য এবং এই অভিনয়ের মধ্যে তার সর্বমুখী নায়কোচিত যোগ্যতায় সে কুমারী হৃদয়ের স্বপ্ন দেখার মানুষ ছিল এতে ভুল নেই। নইলে হয়তো সেদিন গ্লাসটা এমনি করে ভাঙত না। কল্পনার এতখানি আতিশয্য তার ঘটত না।

তরুণী নার্সদের সবাই স্বপ্ন তাকে দেখেছে। অন্তত: যাদের স্বপ্নদেখার মানুষ জীবনে দেখা দেয় নি তারা দেখেছে। সেও দেখেছে—এর আগে। হ্যাঁ—কতবার দেখেছে। অন্তত: কলেজের অভিনয়ের পর কয়েকদিন করে দেখেছে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সে হাসপাতালে বেরিয়ে ওয়ার্ডের দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। ডিউটিতে যাচ্ছিল সে। ওপাশ থেকে ডাক্তার গাঙ্গুলী আসছিল খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে—সেও ওয়ার্ডে যাচ্ছে। সঙ্গে দারোয়ান। ডাক্তার গাঙ্গুলীও থমকে দাঁড়াল—বললে, তোমার ডিউটি এখন ?

সে বলেছিল, হ্যাঁ।

—কোথায়—কত নম্বরে ?

—দোতলায় চার নম্বরে।

—তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি বদল করে দিলাম ডিউটি। বলে দিচ্ছি গিয়ে।

তারা চলেছিল তেতলায়। প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই ডাক্তার বলেছিল—আগে আগেই যাচ্ছিল ডাক্তার, বারেকের জন্য মুখ ফিরিয়ে বলেছিল—কালকে কথাটা আমার অভ্যাসবশে মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। I did not mean to offend you. তুমি offended হয়েছ, না ?

সে উত্তর খুঁজছিল, কিন্তু সে সময় তাকে ডাক্তার দেয় নি—বোধ হয় উত্তর চায়ও নি, বলেছিল—কুইক।. কেবিনে একটা ম্যানেনজাইটিস কেস—সিরিয়স টার্ন নিয়েছে।

আবার কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বলেছিল—নিভার পেশেন্স কম। টেম্পারটা কুইক। তোমার নেচার সফ্‌ট্‌। আর কাজ তোমার পরিষ্কার।

বলতে বলতে তারা কেবিনের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে জুনিয়র হাউস সার্জেন,

স্টাফ নার্স, কেবিনের মাইনে করা নার্স—এরা রোগীর দুই পাশে দাঁড়িয়েছিল—তাদের স্তব্ধতার মধ্যেই উৎকণ্ঠা যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। রোগী গোঙাচ্ছিল। ঘাড়টা বেঁকে গেছে।

ঘরে ঢুকেই বাস্তব জগৎ থেকে এক মুহূর্তে অন্য জগতে এসে গিয়েছিল তারা।

রোগীকে মাঝখানে রেখে একপাশে তারা, অন্যপাশে মৃত্যু। ঘরের বাতাসে রোগের গন্ধ ওষুধের গন্ধ। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। জুনিয়ার ডাক্তার বলে যাচ্ছিল অবস্থা।

ডাক্তার বলেছিল—এক মিনিট। তারপর স্টাফ নার্সের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—পেনি-সিলিন দেব—মুক্তিকে এখানে দরকার হবে। বলে দিন আপনি। দোতলায় চার নম্বরে ডিউটি ছিল ওর। হ্যাঁ—তারপর বলো।

জুনিয়র ফিজিসিয়ান—তিনমাস আগে পাস করেছে। সে আবার শুরু করেছিল—পাল্‌স—।

ডাক্তার গাঙ্গুলী চার্টটা হাতে নিয়ে পড়ে নিতে লাগল।

তারপর বলল—পেনিসিলিন দেব। নিয়ে এসো, যাও। আমি রইলাম। আমিই দেব ইনজেকশন। তার আগে লাম্বার পাংচার করব।

১৯৪৫ সাল।

পেনিসিলিন তখন রেফরিজারেটার ছাড়া থাকে না। দু'ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দু'ঘণ্টা।

মুক্তিকে হুকুম করলে—লাম্বার পাংচারের সব ঠিক করো। দেখো কেবিনের আলমারিতে আছে বোধ হয়।

মুক্তি সাজাতে লাগল—লাম্বার পাংচার নিড্‌ল, গ্লাভস, টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেনজিন। ট্রেতে সাজিয়ে এনে রাখল টেবিলের উপর।

হাত ধুয়ে গ্লাভস তুলে নিয়ে হাতে পরতে পরতে ডাক্তার বললে—এবার ওকে বেঁকিয়ে ধর। স্টেডি! গুড।

নিপুণ হাতে সুচটা ঢুকিয়ে দিলে ডাক্তার স্পাইনাল কলামের ভিতর—জল বেরিয়ে এল—টেস্ট টিউবে জলটা ধরে সেটা দিলে কেবিনের মাইনে করা নার্সের হাতে। তার নাম নিভা।

প্রথম ইনজেকশন দিয়ে গাঙ্গুলী বললে—ঠিক সময়ে আমি আসব। সাড়ে দশটায়। তুমি এখানে স্পেশাল ডিউটিতে থাকলে। একা এর কাজ নয়।

দু'ঘণ্টা অন্তর গাঙ্গুলী এসেছিল ঘড়ির কাঁটার মত।

শেষরাত্রে সাড়ে চারটেতে ইনজেকশন দিতে এসেছিল ডাক্তার। রোগী তখন শান্ত। মুক্তা নিভা দুজনেই চেয়ারে বসে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়েছে। মুক্তার কপালে একটি হাত রেখেছিল ডাক্তার। চমকে জেগে উঠেছিল সে।

স্মিত হেসে ডাক্তার বলেছিল—ইনজেক্‌শনের সময় হয়েছে।

লজ্জিত হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ডাক্তার বললেন—ব্যস্ত হয়ো না! খুব ভাল ডিউটি করেছ, রোগী শান্ত হয়েছে—রোগ কমেছে; ঘুম একটু আসবেই। চোখের দোরে দাঁড়িয়ে থাকে—উৎকণ্ঠা কমলেই সেও এসে চোখের পাতায় আসন পাতে। নাও আন সব।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে যেতে যেতে বলেছিল—তুমি একটু ঘুমুতে পার এবার।

তারপর আঙুল বাড়িয়ে নিভাকে দেখিয়ে বলেছিল—এ তো সেই আড়াইটে থেকেই দেখছি ঘুমুচ্ছে। রাবিশ। তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ। ঘুমুচ্ছিলে—এত মায়া হচ্ছিল ডাকতে!

একটু হেসে বলেছিল—you have got a very soft face—and so sad!

কিছু বলতে পারে নি সে।

সে নার্স—ডাক্তার সিনিয়র হাউস ফিজিসিয়ান। ভয় অবশ্যই ছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল। হ্যাঁ ছিল, ভাল-লাগাও ছিল। ভাল লেগেছিল তার।

অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছে বলে নেচেছিল।

জীবনে তার প্রথম পুরুষের সমাদরের স্বাদ। ভাল লেগেছিল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের চাকর এসেছিল ফ্লাস্ক নিয়ে। চা পাঠিয়েছিল ডাক্তার। একটা স্লিপ পাঠিয়েছিল—চা খেয়ো। আমি খেলাম—তোমার ক্লান্ত মুখ মনে পড়ল। ভাল লাগবে। ও. কে.।

খুব ভাল লেগেছিল। খুব। খুব।

একরাত্রে বীজের চারিপাশের সুতোর মত দাগটি ফেটে অঙ্কুর বেরিয়েছিল। বীজের দল দুটি তখনও পাণ্ডুর।

* * *

তা রঙ সবুজ হতে বেশী দিন লাগে নি। অল্প কয়েক দিন—বোধ হয় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবুজ হয়ে সে দুটিকে ছাড়িয়ে সবুজ দুটি পাতা দেখা দিয়েছিল। জীবনের সকল শিক্ষা সকল সংকল্প সব যেন কোনও অভিনব উল্লাসের আবেগে নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়েছিল—নাইট ডিউটিতে যেমন কর্তব্যবোধ সংকল্প সকলকে নিস্তেজ করে দিয়ে ঘুম আসে, তেমনি ভাবে। রোগী কাতরায়—কর্তব্য ডাক দেয় তবু ঘুম ভাঙলেও ছাড়ে না, তেমনি। ঠিক তেমনি।

মনে হয়—এমন কিছু নয়। আবার এখুনি ঘুমিয়ে যাবে রোগী। তেমনি ভাবেই মনে হত—মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি। হোক না পুরুষ! শুধু প্রীতি বই তো নয়। যে প্রীতি এমন মধুর, এত মধুর। যার স্পর্শে মনে আনন্দের স্রোত উৎসারিত হয়েছে—জীবনের শুকনো বালি ঢেকে স্রোত বইছে।

সাত দিন পর রূপী এসেছিল। দীপা থিয়েটারের টিকিট পাঠিয়েছে। দীপা থিয়েটারে নামছে। অ্যামেচার অবশ্য। কলকাতায় তখন অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়েদের নিয়ে অভিনয়ের রেওয়াজটা প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। দীপার মত অনেক মেয়ে এতে নামছে। সুরেন মেসো দীপাকে তৈরী করে দেয়। কলকাতার নাম-করা অ্যামেচার পার্টি।

রূপী বলেছিল—নিশ্চয় যেন যাবি দিদি। দীপা ভাল পার্ট করবে। সত্যিই ভাল। বাবা নাচটা খুব ভাল দিয়েছে। ঠিক শিশিরবাবুর থিয়েটারের মত।

জনা নাটক। এতে দীপা করবে মোহিনীর অভিনয়। গঙ্গার বরে অজেয় প্রবীর শুদ্ধাচারে ব্রহ্মচর্য পালন করে যুদ্ধ করেছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুন প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এরপর দেবলোক থেকে এল এক মোহিনী। বিজয়ী প্রবীর মাতৃদর্শনে চলেছিল—পথ থেকে এই মোহিনী তাকে নৃত্যগীতে হাস্যলাস্যে মোহিত করে নিয়ে গেল এক মায়াকাননে। সেখানে তাকে আসবপানে প্রমত্ত ক'রে তার রূপযৌবনের নৈবেদ্যে

তপস্যার উপবাস ভঙ্গ করে তার সকল শক্তি হরণ করে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। পরদিন প্রভাত যখন প্রবীরের নিদ্রাভঙ্গ হল তখন সে সবিস্ময়ে দেখলে—কোথায় নন্দন-কানন? সে শুয়ে আছে এক শ্মশানে। কই সে মোহিনী? তার পাশে রয়েছে একটি নরকঙ্কাল। হয়তো নারীকঙ্কাল।

এই মোহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করবে দীপা। দীপা এখন যোড়শী। মুক্তা অনেক দিন যায় নি অবশ্য। সম্পর্কটা সে ছিঁড়তেই চেয়েছিল। কিন্তু রূপী মধ্যে মধ্যে এসেছে—দেখা করেছে—সেই বলত দীপার কথা।

সে জিজ্ঞাসা করত—মাসী কেমন আছে?

—মা ভালই। তবে বাত হচ্ছে।

—মেসো?

—বাবার নেশা চেপেছে দীপাকে নিয়ে। তাকে খুব নাচ শেখাচ্ছে। ফিল্মস্টার তাকে করবেই। তা হবে, বুঝেছ না? দীপা দেখতে বড় ভাল হয়েছে। ওঃ, যদি ফিগারটা তোমার মত হত! আর মুখের নরম ভাবটা পেত! মুখটা একটু কাঠ-কাঠ, বড্ড স্নো-টো-গুলো মাখে যে! মাঝখানে নটীর পূজায় নটীর পার্ট করলে। নাচ ভাল হয়েছিল—গান ভাল না।

—আর তুই?

—আমি? আমি কয়লা ভাঙছি। ডিপো তো আমিই চালাচ্ছি।

—তুই থিয়েটার করছিস নে?

—নাঃ। তবে সেতার শিখছি।

—সেতার!

—হ্যাঁ। নাড়া বেঁধেছি। কালীঘাটের শিবেন মাস্টারের কাছে যাই। আর একটা বিদ্যে শিখছি। একদিন তোকে আশ্চর্য করে দেবো।

—কি বল তো!

—অ্যাস্ট্রোলজি, পামিস্ট্রি! জ্যোতিষ-বিদ্যা।

—এ সব আবার মাথায় ঢোকালে কে?

—যে ঢোকাবার সেই। গ্রহ! তোর যেমন গ্রহ—তুই এসেছিস নার্সিং শিখতে। রোগীর সেবা। পুঁজ-রক্ত মলমূত্র ঘেঁটে কি মাইনে? না দুটি অঙ্ক, পঞ্চাশ ষাট সোত্তর পঁচাত্তর—ম্যাক্সিমাম আশী! এমন গলা! তার গলা কেটে—কি হ'ল? না—তোর প্রায়শ্চিত্তির! তুই তো প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হতে পারতিস।

—না।

—বেশ। না তো না। যা খুশি কর। আমি অবিশ্যি খুব অ্যাডমায়ার করি। এ তোর তপস্যা।

সেদিন টিকিট দিতে এসেও এ কথাগুলি বলেছিল রূপী। শেষকালে শুধু বলেছিল—নিশ্চয় যেন যাবি। বুঝলি? আমাকে বললে—খুব তাক লেগে যাবে তোর একটা কি দেখে। অবাক হয়ে যাবি তুই। তবে বলে নি আমাকে—কি ব্যাপার! তুই চলে যাস—কেমন? এই তো—রঙমহল! আমি বরং ফেরার সময় তোকে পৌঁছে দেব। দীপা বার বার করে বলেছে। বাবা বলেছে—এই নাচেই দীপা ফেমাস্ হয়ে যাবে।

—যাব। হেসে বলেছিল মুক্তা।

গিয়ে সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীপাকে দেখে নয়। প্রবীরকে দেখে। প্রবীরের ভূমিকায়—ও কে? এ যে ডাক্তার গাঙ্গুলী!

চমৎকার লাগছিল ডাক্তার গাঙ্গুলীকে! এবার এই সাতদিনের পরিচয়ে তাকে রাজকুমারের ভূমিকায় যে ভালটা লেগেছিল, সে ভাল লাগা এর আগে তার লাগে নি। অপরূপ মনে হয়েছিল।

দীপা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ভিতরে। রূপী ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

দীপা তখন সেজেছে। রঙে-চঙে সাজপোশাকে মানিয়েছিল ভালই। হ্যাঁ ভালই। তবে প্রবীরকে ভোলাবার মত নয়।

আজ এতকাল পর—যখন তার গাঙ্গুলীর উপর কোন মোহ নেই, নিজে সে এতবড় নৃত্যশিল্পী—নিজের রূপে সে নিজেই মুগ্ধ এবং বহুজন মুগ্ধ; তখনও—সে ঈর্ষা মোহ সব মুক্ত হয়েই বলছে—না—সেই প্রবীরকে ভোলাবার মত রূপ দীপার মধ্যে এত যত্নেও ফোটে নি। কাগজের ফুলের মত চড়া রং আর কোমলতার অভাব তাকে ম্লান করেছিল।

তবে সেদিন তার ঈর্ষা হয়েছিল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজের উপর নিজে বিরক্ত হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল—সেও যদি আজ দীপার সঙ্গে নামত। তার ইচ্ছে হয়েছিল—প্রবীরের প্রেয়সী মদনমঞ্জরীর ভূমিকায় নিজেকে দেখতে।

রূপীই তাকে নিয়ে ভিতরে গিয়েছিল। তখন প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়েছে। দীপা তখনও স্টেজে বের হয় নি। তার পার্ট আরও পরে। প্রবীরকে দেখেছে এবং বিস্ময়-বোধও করেছে। খানিকটা দুঃখও অনুভব করেছে। হাঁ দুঃখই। অভিমান নয়, কারণ দুঃখ অভিমান হয়ে ওঠার মত অবস্থা হয় নি তখনও। সেই রাত্রি থেকে এই অভিনয়ের দিন পর্যন্ত রোজই তার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয়েছে। রোজ। ডাক্তার যেন দাঁড়িয়ে থেকেছে তার জন্যে—হাসপাতালে ঢুকবার মুখে। একটু প্রসন্ন হাসি—দু'চারটে কুশল প্রশ্ন ছাড়া কথা বলে নি। তারই মধ্যে যেন মৃদু বর্ষণের জলসিঞ্চনে মন অভিষিক্ত হয়েছে—যার ফলে হৃদয়ের গোপন বীজটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে অঙ্কুর বিকাশের জন্য।

ভিতরে দীপা সেজে তাদের অর্থাৎ মেয়েদের সাজঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষা করে। তাকে দেখে অনেকখানি হেসে বলেছিল—চিনতে পারছ মুক্তোদি?

চমৎকার লাগছিল দীপাকে।

মুখের রঙ, চোখে কাজল আঁকা ভুরু, মাথায় ফুলের মুকুট, নীচে-হাতে, উপর-হাতে ফুলের মালা বাজুবন্ধ—গলায় মালা পরে দীপা রূপসী হয়েছে। তার উপর সজ্জাকৌশলে তাকে তার স্বভাবের চেয়ে অনেক বেশী লাস্যময়ী মনে হচ্ছিল। দীপার কথার জবাবে সে বলেছিল—ভালো লাগছে রে।

—খুব ভালো?

জবাবে একটু অতিরঞ্জনই করেছিল—খু—ব ভালো।

কানের কাছে মুখ এনে দীপা প্রশ্ন করেছিল—বেটা-ছেলে হলে তোর মাথা ঘুরে যেত?

সে ভুরু কুঁচকে বলেছিল—ছি!

দীপা বলেছিল—তুই ভারী বেরসিক।

ঠিক এই সময়েই ভিতরে ওদিক থেকে এদিকে এসেছিল প্রবীরবেশী ডাক্তার। তাকে দেখেই বলেছিল—এই যে, এসেছ। যেন প্রত্যাশা করাই ছিল।

দীপা বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল—আমার মেক্-আপ কেমন হয়েছে?

—ভাল। তবে একটু বেশী হয়েছে। জান রঙকে রঙ বলে ধরা গেলেই—মানে ওটা ধরা পড়লেই তো—মোহ ছুটে যায়। বলেই হেসে বললে—আমার আবার ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। দিদিকে চা-টা খাওয়াও।

চমকে উঠেছিল মুক্তো। দিদি? ডাক্তার চলে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই ওঁকে বলেছিস নাকি আমি তোর দিদি?

দীপা অসঙ্কোচে বললে—হ্যাঁ। উনিই তো এ ক্লাবের হিরো। ওঁর খুব নাম অ্যামেচারে। শুনলাম তোদের হাসপাতালের ডাক্তার। তাই বললাম—আমার এক দিদি থাকে আপনাদের হাসপাতালে—নার্স সেখানে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম বল তো? বললাম তো, বললেন—খুব চিনি। বড় ভাল মেয়ে। তোমার দিদি? কি রকম দিদি? বললাম—মাসতুত দিদি। সে প্রথম দিন।

তার শরীরটা যেন ঝিমঝিম করে উঠেছিল। অকারণে। কারণ জীবনের পরিচয় তো সে গোপন ঠিক করে নি বা করতে চায় নি। নার্সেস কোয়ার্টারে তার পরিচয় ঠিক গোপনও তো ছিল না। কতদিন সে তাদের বান্ধবীদের মধ্যে এ আলোচনা কানাকানি হতে শুনেছে। মুন সুবাসিনীর মেয়ে ছুটিই তো সেকথা প্রচার করে দিয়েছিল সে ওখানে ভরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তবুও শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছিল। সে দীপাকে বলেছিল—কি দরকার ছিল বলবার?

দীপা বিস্মিত হয়ে বলেছিল—বাঃ—তাতে দোষটা কি হল?

—আমার পরিচয়ে তো তোর আলাপের সুবিধে হবে না!

—মানে?

—নার্সের বোন, তার আর দাম কি? তার থেকে তুই আর্টিস্ট—তার খাতির তো বেশী। তার উপর উনি নিজে আর্টিস্ট!

—না—না। খুব প্রশংসা করেছিলেন তোর। বলেছিলেন—কাজ করে অন্তর দিয়ে, আর স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। A sweet girl—

তার দেহে ঝিমঝিমিনির বিপরীত চঞ্চলপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।

দীপা বলেই চলেছিল—উনিই তো বললেন—তুমি পার্ট করবে তো দিদিকে নেমন্তন্ন করবে না দেখতে? আমি বললাম—আপনিই তো এখানকার একজন কর্তা—তা কার্ড করে দিন। উনিই কার্ডের ব্যবস্থা করে দিলেন। নইলে আমরা টাকা নেব—তার উপর কার্ড দেবে কেন? তবে বললেন—আমি নামছি তা জানিয়ো না ওকে, তা হলে হয়তো আসবে না। মানে উপরওয়ালা তো আমরা! তা না হলে তো উনিই তোকে নিয়ে আসতেন।

ঠিক এই সময়েই ফিরেছিল ডাক্তার গাঙ্গুলী। পোশাক বদলে রণবেশে সেজে বেরুবে এবার। বুকে হাতে পায়ে বর্ম—পিঠে ঢাল—তূণীর—কাঁধে ধনুক,—এ যেন আরও ভাল লাগছে। কর্ণার্জুনের কর্ণের সাজেও এমন মানায় নি। বললে—ওঃ বোনের সঙ্গে বোনের আলাপন—আনন্দমগন! খুব জমে গেছ যে তোমরা।

তারপরই বলেছিল—যাও যাও—গিয়ে সিটে ব'স গে। খুব জমবে এবার বই। বলেই এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল—মুক্তা, তোমার আপত্তি না থাকলে ফেরবার সময় আমি গাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। দীপা ওকে চা-টা খাইয়ো।

ফেরার পথে ওর গাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে তার ছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল। খানিকটা

দীপা তার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য—খানিকটা তার পাশে বসে যেতে হবে তার জন্য। সেই অস্থিরতা! যার জন্য সে গ্লাসটা ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তার ধরবার আগেই। তার দুর্বলতা—সে তার রক্তে আছে। বোধ হয় মায়ের রক্তের উত্তরাধিকার। সে মনে করে—তার সান্নিধ্য—পাশের মানুষটি যদি পুরুষ হয় তবে তাকে অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট করে। চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণের মত। কিন্তু উপায় ছিল না। শেষের দিকে সুরেন মেসোর শরীরটা অসুস্থ হয়েছিল। সুরেন মেসো দীপার সঙ্গে সর্বত্রই যেতেন—টাকাটা বুঝে নিতেন। তিনি বাইরে বসতেন না। ভিতরে স্টেজের লোকেদের সঙ্গে জমিয়ে বসে গল্প করতেন সে-কালের থিয়েটারের। মধ্যে মধ্যে চা—একটু আফিং আর সিগারেট। এখানেও গল্প চোখ বুজে। বাইরে বসতেন না ওই কারণেই—দেখতে হলে চোখ খুলতে হয় যে। আর দেখবেনই বা কি এ কালের অ্যাকটিং! সেদিন তাঁর শরীর খারাপ হওয়াতেই রূপীকে তাদের সঙ্গে ফিরতে হয়েছিল। রূপী বলেছিল—তুই তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যাবি। আমি চলে যাই ওদের সঙ্গে।

সে 'না' বলতে উত্তর খুঁজে পায় নি।

রূপী থাকলেই বা কি হত? কি করে বলত—আমি রূপীর সঙ্গে যাব! অথবা রূপী সঙ্গে যাবে! না—তা বলতে পারত না! দুটোর একটাও না।

তার অস্বস্তি থাকলেও তার সে অস্বস্তির অন্তস্তলে তার সঙ্গে যাবারও গোপন কামনা উন্মুখ হয়ে ছিল। সে কামনা সেদিন প্রবীর রাজকুমারের মৃত্যুতে শোকে বেদনায় অনুরঞ্জিত হয়ে তাকে প্রায় বিহ্বল করে তুলেছিল। নাটক শেষ হবার আগেই তাকে একজন এসে ডেকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—ডাক্তারবাবু ভিতরে ডাকছেন।

প্রবীরের শোকে কাঁদতে কাঁদতেই সে গিয়েছিল। শেষের উজ্জ্বল দৃশ্য তার দেখা হয় নি। চুপচাপ সে বসেই ছিল। অভিনয়শেষে ডাক্তার এসে বলেছিল—পাঁচ মিনিট। রঙটা তুলে নি। কেমন?

গাড়িতে উঠে তাকে পাশেই বসিয়েছিল ডাক্তার। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলেছিল—কেমন লাগল? ডাক্তারের মুখ থেকে বিলাতী মদের গন্ধ বের হচ্ছিল।

সে বলেছিল—খুব ভাল। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—এসব পার্ট কেন করেন?

—কেন?

—মরলে ভারী খারাপ লাগে।

—হাসপাতালের এত মৃত্যু দেখেও?

—হ্যাঁ।

—সে আমি দেখেছি। তোমার মুখই সফ্‌ট্ নয়—ভিতরের ভিতরটাও; আমি জানতাম। এবং সেই জন্যেই দীপাকে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে বলেছিলাম। নেমন্তন্নটা প্রকৃতপক্ষে আমার।

চুপ করে গিয়েছিল সে।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করেছিল—তুমি জানতে না—না?

মৃদুস্বরে সে বলেছিল—দীপা বলেছে।

—দীপার পার্ট ভালো হয় নি। ভালগার হয়ে গেছে খানিকটা।

সে বলেছিল এবার—দীপার সঙ্গে থিয়েটার করবেন না। ও ভাল মেয়ে নয়। নিজেই ভালগার।

হেসে ডাক্তার বলেছিল—অভিনয়ে ও বাছলে চলে না।

সে হঠাৎ বলে ফেলেছিল—থিয়েটার আপনি না করলেই পারেন! কেন করেন?

এবার ডাক্তার হেসে উঠেছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল—থিয়েটার না করে আমি পারি না। তা পারলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম। অনেক কিছু। অন্ততঃ ডাক্তারিতে ফার্স্ট সেকেণ্ড হতে পারতাম। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—অথচ ইচ্ছে হয় এসব ছেড়ে দিয়ে বিলেত গিয়ে পড়ে আসি—রিসার্চ করি। কিছু আবিষ্কার করি। কিন্তু এর থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারি নে। কিছুতেই না।

কি উত্তর দেবে সে!

গাড়িটা হাসপাতালের রাস্তায় না-এসে সোজা বি. টি. রোড ধরেছিল। সেটা সে বুঝেও যেন ধরতে পারে নি। ভারী ভাল লাগছিল। ডাক্তারের কথায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

হঠাৎ ডাক্তার বলেছিল—কিন্তু তুমি নার্স হতে এলে কেন? কি হবে তোমার এতে? এ তো দুঃখের জীবন। এদের তো কেউ সম্মান করে না। তুমি অভিনয় করলে যে দীপার থেকে অনেক ভাল করতে।

অস্ফুট স্বরে আতঙ্কিত ভাবে সে বলেছিল—না। কিন্তু সে ডাক্তারের কানে যায় নি। সে বলেই চলেছিল—শুনেছি তোমার গান গাইবার গলা খুব মিষ্টি। আর শুনেই শিখতে পার। আমি জানি, শুনেছি সব সুরেন মিত্তিরের কাছে—তুমি—

সে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

ডাক্তার ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলেছিল—তুমি কাঁদছ কেন?

সে বলতে চেষ্টা করেছিল—আমি জন্মের জন্য ঘৃণিত কিন্তু আমি পবিত্র হতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বলতে পারে নি—শুধু বারকয়েক বলেছিল—আমি—আমি—আমি—।

—তুমি পবিত্র তুমি শুদ্ধ। কেন নিজেকে ছোট ভাব?

সে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিল—তুমি কারুর চেয়ে ছোট নও।

সে এবার প্রশ্ন করেছিল—আপনি আমাকে ঘৃণা না করে পারেন?

হেসে ডাক্তার বলেছিল—ভালোবাসি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

সেদিন তারা গঙ্গার ধার পর্যন্ত গিয়েছিল। বরানগরের নতুন ব্রিজ পর্যন্ত।

তাকে সেদিন গান গাইতে হয়েছিল ডাক্তারের অনুরোধে। ডাক্তার বলেছিল—ছি—ছি—ছি। এমন গলা, তুমি গান গেয়েও তো পবিত্র জীবন যাপন করতে পারতে। প্রতিষ্ঠা পেতে, অর্থ পেতে—সুখে থাকতে। নার্সিং শিখে তুমি কি করবে? তুমি যা চাও মুক্তো তা নার্স হয়ে পাবে না। পাবে শিল্পী হয়ে। ওই তোমার মূলধন।

সে চুপ করেই বসেছিল।

অনেকক্ষণ পর ডাক্তার বলেছিল—ওঠো। বারোটা বাজে।

সে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার—।

'না'—বলে চীৎকার করে উঠল বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মুক্তামালা। সে স্মৃতিটুকু থাক, বিস্মৃতির তলে থাক, অকথিত থাক।

পাঁচ

আপনার ঘরে বসে একখানা চিঠি পড়তে পড়তে মুক্তামালা স্মরণ করছিল তার অতীত জীবন। তাকে চিঠি লিখেছেন তার সর্বাপেক্ষা হিতার্থী—তার বন্ধু—তার কর্ম ও শিল্পী-জীবনের সঙ্গী শ্রীনারায়ণ। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ—বিখ্যাত যন্ত্রী। সন্ন্যাসীর মত মানুষ। বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।

না, তাঁর নিজের সঙ্গে নয়। তিনি ব্রহ্মচারী। তিনি প্রৌঢ়। কলকাতায় এক খ্যাতিমান ঘরের ছেলে—নিজে খ্যাতিমান যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ, মুক্তামালার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সে তাকে বিবাহ করতে প্রার্থনা জানিয়েছে। সেও ব্রহ্মচারী নারায়ণের শিষ্য। দীপেন রায়। বিখ্যাত সেতারী সে-ও। সে জানে মুক্তামালা তাঁর কথা ঠেলতে পারবে না। সে সব জানে—মুক্তামালার জন্মকথা। সব জেনেই সে মুক্তামালাকে গ্রহণ করতে চায়। সে মুক্তামালার নাচের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছে।

শ্রীনারায়ণ শিষ্যটিকে বড় ভালবাসেন। তিনি অনুরোধ করেছেন—তোমার দুস্তর তপস্যার শেষ হোক মা। আমার ইচ্ছা তুমি গৃহকে বরণ করে গৃহিণী হও।

না, না, তা হয় না। আপনি গুরু, আপনাকে আজ সব কথা জানাব। যে কথা সংসারে মাত্র কয়েকজন জানে, যা স্মরণ করতে গিয়েও আমার মুখ থেকে আমার অজ্ঞাতসারে না—না বলে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসে, সে কথা আজ বলব আপনাকে। তারপর আপনি বলবেন, আপনি গুরু, আপনি বিচার করে বলবেন—আমার কি কর্তব্য।

ওই চিঠি পাওয়ার একদিন পর।

সারাটা দিন-রাত্রি চিন্তা করে রূপীকে পাঠিয়েছিল শ্রীনারায়ণের কাছে। তাঁকে তার ঘরে আসতে বলেছিল।

প্রৌঢ় নারায়ণ ব্রহ্মচারী মানুষ; সংগীত তাঁর জীবন-সাধনা। শিষ্য তাঁর স্বল্প কয়েকজন। প্রথম জীবনে নৃত্য-কলাও চর্চা করেছেন। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আজন্ম-বৈরাগী মন বাঁধা পড়ে নি তাতে। সন্ন্যাসী হয়ে যান। পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। তাতেও ঠিক তৃপ্তি পান নি। ফিরে এসে লোকসমাজের একান্তে একটি নির্জন স্থান খুঁজে সেখানে এই সংগীতচর্চা নিয়েই ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুরধ্বনির অমৃত স্পর্শ বায়ুতে বহন করে লোকসমাজে নিয়ে গেছে। লোকসমাজ তাঁর কাছে ছুটে এসেছে। তাঁর নিজের শুধু একটি খেয়াল ছিল—সেটি হল এই যে, বৎসরে একবার তিনি ভারত পরিক্রমা করে—অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারী—দ্বারাবতী থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত তীর্থগুলিতে একবার তীর্থেশ্বরদের অঙ্গনে বসে গান শুনিয়ে আসতেন। শুধু দেবতা নয়, ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া নদ-নদীকেও গান শোনাতেন। সে অভ্যাস আজও রেখেছেন। দ্বারকায় ভগবানের মন্দিরে গান শুনিয়ে সমুদ্রতটে যান—যন্ত্রসংগীত শোনান—পুরীতেও তাই—জগন্নাথদেবের অঙ্গনে গান সেরে সমুদ্রকে গান শোনান। বারাণসীতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাকে সংগীতে বন্দনা করে দশাশ্বমেধঘাটে যান—গঙ্গাকে গান শোনান। কামাখ্যায় নীলপর্বতে কামাখ্যা দেবীকে গান শুনিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তটভূমিতে বসেন—সেতার নিয়ে ঝংকার তোলেন। এখানেও শেষ

নয় ; এই বিচিত্র মানুষটি যত মহৎ মানুষ আছেন—ছিলেন—তাঁদেরও গান শোনাতে যান—এবং যেতেন। শান্তিনিকেতন গেছেন কবিগুরুকে গান শোনাতে—ওয়ার্ধা গেছেন—সবরমতী গেছেন—মহাত্মাজী যখন মহাপ্রয়াণের পূর্বে দিল্লীতে ছিলেন সেখানেও গেছেন। তাঁকে ভজন শুনিয়ে এসেছেন। আক্ষেপ করেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে শোনাতে পারেন নি। ভারতের মুখ্যমন্ত্রী জহরলালের কাছে আজও যান নি—বলেন—তাঁর সময় কোথায়! সময় হোক, তখন যদি বেঁচে থাকি যাব।

বিচিত্রভাবে মুক্তোর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

এখানে নয়, বিদেশে। চীনে।

মুক্তামালাও তখন থেকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে এই গুরুর শিষ্যা হয়ে পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়েছে।

মুক্তামালার ঘরে আসনের উপর বসেছেন। পরনে সাদা থান—গায়ে আংরাখা, তার উপর উত্তরীয়—গলায় সোনার তারে গাঁথা রুদ্রাক্ষ ; মাথার চুল ধবধবে সাদা ; দাড়ি-গোঁফ রাখেন না—পরিচ্ছন্নভাবে কামানো ; সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা তার শুভ্রতার মধ্যে দিয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখের হাসিটি মিষ্ট—কপালে একটি হোমতিলক।

মুক্তা বললে—আমি অপরাধী। আমার জীবন সব আপনার কাছে আজও খুলে বলতে পারি নি। আজ বলব। আপনি জানেন আমার জন্মপরিচয়। আমি গোপন করি নি।

নারায়ণ বললেন—মা, তুমি পবিত্র। জন্মের কোন কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করেনি। জন্মের কলঙ্ক কোথায় স্পর্শ করে জান মা? করে যেখানে জন্মের জন্যই কর্মও মানুষের কলঙ্কিত হয় সেইখানে। তুমি তো মা তপস্বিনীর মত শুদ্ধ। এ কি মা, কাঁদছ কেন?

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল তার। একটু চুপ করে বোধ করি আত্মসম্বরণ করে সে বললে—বলেছি তো আপনার কাছে তা আমি গোপন করেছি। পারি নে বলতে। আমার জন্যে নয়—। আবার তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

আবার আত্মসম্বরণ করে বললে—।

—আপনি জানেন—আমি জীবনে একা। না। আমি একা নই। আমি মা। আমার সন্তান আছে।

চকিত হয়ে একবার তাকালেন শ্রীনারায়ণ। বললেন—বল মা বল!

মুক্তামালা বললে—সেদিন ডাক্তারের কাছ থেকে নিজেকে সজোরে মুক্ত করে নিয়েছিলাম। শুধু বলেছিলাম না—না—না।

তার কারণ এই নয় যে বিবাহ না করা পর্যন্ত তাকে আমায় স্পর্শ করতে দেব না। বিবাহের দাবি কামনাই আমার ছিল না। বিবাহেই ছিল আমার ভয়। আমার জন্মকলঙ্ক বিবাহ সত্ত্বেও আমার সন্তানকে স্পর্শ করবে। আমার নিজের সম্পর্কে ভয় ছিল—আমার রক্তে আছে দেহবিলাসবাসনা। যা জাগলে আমার সর্বদেহে মহিষের দেহজ্বালা—যা পাঁকে আকণ্ঠ ডুবেও যেমন মহিষের মেটে না—তেমনি একটা জ্বালা আমাকে এমনি পাঁকে ডুবতে বাধ্য করবে।

ডাক্তার হেসে ছেড়েই দিয়েছিল আমাকে সেদিন। বলেছিল—excuse me—ভুল হয়ে গেছে। চল ফিরে যাই। বিশ্বাস কর আমাকে।

আবার মুক্তো চুপ করে গেল।

নারায়ণ বললেন—থাক মা—

বাধা দিয়ে মুক্তো বললে—না থাকবে না। বলব, বলতেই হবে আমাকে। অপরাধ শুধু তার তো নয়—আমারও। এই ভয়, এই প্রতিবাদ আমার সত্য কিন্তু তাকে কামনাও তো আমার ছিল। আমার তপস্তা—হ্যাঁ নার্স হতে গিয়েছিলাম—এই তপস্তার জন্তে, এ যুগে অন্তের কাছে তপস্তা কথাটা হাস্তকর মনে হবে—আপনার হবে না।

—সে তো আমি চিঠিতে লিখেছি—কতবার বলি—এ তোমার তপস্তা।

হাসলে মুক্তো।

বললে—জানেন আমি নিজেই একদিন নিজেকে বিশ্লেষণ করে এর ব্যাখ্যা করেছি—এ আমার কমপ্লেক্স। মনের বিকৃতির জটিলতা। বাল্যে আমার মাকে দেখেছি ভগবানকে ডাকতে, তাঁর নিজের যে অতীত জীবন তার রূপ ছিল মহাজনটুলিতে—তাকে তিনি পাপ বলতেন। আমার জন্মের সত্যকে সযত্নে গোপন রেখেছিলেন, আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন—এ পাপ। নিজে জানতাম না নিজের পরিচয়, মিথ্যায় ছিল ঢাকা—সেই মিথ্যার উপর বসতি বেঁধে আমার সত্য পরিচয়কে করেছিলাম ঘৃণা। তাই যেদিন সত্য প্রকাশিত হল—মা বললেন নিজের মুখে—সেদিন নিজেকে নিজেই দিলাম দণ্ড; পাতিত্য নিজেই চাপিয়ে নিলাম নিজের মাথায়। শ্মশানঘাটে আমার পরিচয়ে সেখানকার লোকের বাঁকা হাসি একটা বাঁকা ছোরার মত আমার মনের মুখে ঠিক কপালে দাগ টেনে দিয়েছিল। তারপর থেকে অন্ত যে কেউ আমার দিকে তাকিয়েছে তার চোখের আয়নায় আমি যেন আমার মনের মুখের কপালের এই দাগ দেখেছি। ইস্কুলে গায়ত্রী আর হেডমিস্ট্রেস আমারই সে দেখাকে সত্য করে তুলেছিল। তারা উঁচু গলায় প্রকাশ করে বলেছিল—তোমার কপালে দাগ—কপালে দাগ। ভয়ে ঘরে ঢুকলাম। মনে হল আমি পাপ—আমার মধ্যে পাপের বাসা। মায়ের শিক্ষা—ইস্কুলের শিক্ষা আমাকে বললে—পবিত্রতার তপস্তা কর, জীবনটাকে শুদ্ধ কর, বঞ্চনা কর নিজেকে। গানে ছিল সহজ অধিকার, জন্মগত অধিকার, নাচেও ছিল—প্রথমটা অবশ্য জানতাম না। জন্ম থেকে পাওয়া বলে গান অনিবার্য আকর্ষণে টেনেছে—তবু গান গাই নি, গাইতে চাই নি, শিখতে চাই নি। ভয় হত—গান যা জন্মগুণে পেয়েছি সে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে যাবে ওই পঙ্কতৃষ্ণায়।

একটু থামলে মুক্তো। তার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ জড়তামুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে এখন। সে মুখ তুলেছে। কথা বলছে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে অসঙ্কোচে। থেমেছে সে একটু বিশ্রামের জন্ম।

গুরু তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হেসে বললেন—বিশ্লেষণ তো তোমার মিথ্যা নয় মা। সংসারে পাপ কখন সত্য ভেবে দেখ! পাপকে পাঁকের সঙ্গে তুলনা করলে, পাঁকের একটা পীড়া আছে, কিন্তু পাঁক থেকে উঠে স্নান যখনই কর, তখনই তো মানুষ তা থেকে মুক্ত। সে পীড়া তো থাকে না—থাকবার কথা নয়। স্নান করার পরেও যদি সে পীড়া কেউ মনে অনুভব করে তবে সেটা তো মানসিক বিকৃতিই বটে।

একটু থেমে আবার বললেন—আরও একটা অবস্থায় পাপের পীড়া থাকে না, যখন পাঁকের মধ্যে থেকে থেকে ওই পীড়াটা সইবার ক্ষমতা জন্মে যায়, তখন আর মানুষ মানুষ থাকে না—তখন ওই মহিষই হয়ে যায়।

মুক্তো বললে—এমন সহজ ভাবে সোজা সামনে তাকিয়ে এই কথাগুলো তখন মনে আসে নি। মনে এসেছিল বাঁকা ভাবে। পাপ পুণ্য অস্বীকার করে, সংসার সমাজ সব কিছুর উপর মর্মান্তিক আক্রোশে—ঘৃণায়।

ঘৃণা আক্রোশ এনে দিল জীবনে—ওই ডাক্তার।

* * * *

—"সেদিন প্রতিবাদ করতেই সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল, মাফ্ চেয়েছিল। হাসপাতালে ফিরে এসে নামিয়ে দিয়ে আবার বলেছিল—Please forget and forgive me.

এত রাত্রেও সুষমাদি জেগেছিল—সুষমাদি একা নয়—আরও পাঁচ সাত জন। ওরা নিত্যই এমনি জেগে আড্ডা দিত—জীবনের এই রসপানের নেশায় মাতলামি করত যতক্ষণ না দেহ ভেঙে পড়ত ঘুমে ততক্ষণ।

আমাকে দেখেই তারা খুব হুল্লোড় করেছিল—বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু আমি রূঢ়স্বরে বলে উঠেছিলাম—সুষমাদি! কারণ আমি পবিত্র দেহ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম।

তাতে সুষমাদিও থমকে গিয়েছিল—কিন্তু একমুহূর্ত পরেই সে সমান রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করেছিল—রাত্রি সাড়ে বারোটায় ডাক্তারের গাড়িতে তার পাশে বসে ফিরে এলি কোত্থেকে শুনি? সতী শিরোমণি আমার!

একমুহূর্তে মিথ্যে কৈফিয়ৎ এসে গেল। বললাম—থিয়েটারে সুরেন মেসো এসেছিল দীপাকে নিয়ে—সেখানে মেসোর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ডাক্তারবাবুদের থিয়েটার—ডাক্তারবাবু পার্ট করেছিলেন—তিনি তাঁকে দেখে ইনজেকশন দিয়ে নিজের গাড়িতে তাদের বাড়িতে দিয়ে এলেন। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম সঙ্গে এসেছি।

থমকে গেল ওরা। আমি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। শুয়ে শুয়ে কাঁদলাম।

প্রতারণা সেদিন তাদের করতে গিয়ে করলাম নিজেকে। সত্য কথাটা বলতে পারলাম না। দেহে তাকে পেতে—তাকে কেন কাউকে পেতেই আমার ভয় ছিল—কিন্তু মন আমার—আমার সেই যৌবনদিনে একজনকে চেয়েছিল বই কি। এ চাওয়া এ চাহিদা যে প্রকৃতির চাওয়া। আমার মন তাকেই চেয়েছিল। তারই জন্যে সেদিন শুয়ে শুয়ে আমি কেঁদেছিলাম। আজ বুঝতে পারছি—আপনার কাছে বলছি—সে আমাকে চেয়েছিল সেদিন—আমি তাকে নিজেকে দিতে পারি নি—সেই ক্ষোভে সেই বেদনায় আমি কেঁদেছিলাম। পরের দিনও কেঁদেছিলাম। কয়েকদিন দূরে দূরে সরেও থাকতাম। কিন্তু কয়েকদিনের পর আর পারলাম না।

একদিন হাসপাতালে ডাক্তার এল রাউণ্ডে। আমি ছিলাম—আমার কর্তব্য সব দেখানো—দেখাচ্ছিলাম। কিন্তু বুকের ভিতরটার দুরন্ত আবেগ বর্ষার মেঘের মত অকস্মাৎ ছুটে এসে সব ছেয়ে ফেলে গুরু গুরু করে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার হাত পা কাঁপছে।

যখন সে বেরিয়ে গেল তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললাম—আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। খুব করুণ কণ্ঠে বলেছিলাম। কানে আজও আমার সে দীন কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

তিনি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন।

ক্ষমা সেই হাসির মধ্যেই ছিল।

বুকের মধ্যে আমার তাকে পাবার কামনা তখন জেগেছে শেষরাত্রির ঘুমের মত।

কর্তব্যবোধ মমতাবোধ সব কিছুর আকুতি প্রেরণাকে ছাপিয়ে ছেলের শিয়রে জেগে থাকা মাও যেমন ঘুমে কাতর হয়—ঢুলে ঢুলে শেষে ঘুমিয়ে পড়ে—তেমনি করে জাগছিল আমার এই কামনা। এর সঙ্গে তার সমাদর মৃদু বাতাসের স্পর্শের মত আমার সে ঘুমকে গাঢ়তর করছিল। আমার তপস্যা শিথিল হল। ঘুমিয়ে পড়লাম।"

গুরু বললেন—থাক মা—

—না। শুনুন। দোষ সে লোকটির নিঃসন্দেহে—সে অপরাধী। তবু সে বিচিত্র মানুষ। এবং আমার মন—এও হয়তো বিচিত্র। না শুনলে বুঝবেন না। সে লোকটি আমার এ ঘুমের সুযোগ ঠিক নেয় নি। সে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করে যাচ্ছিল। আর বাড়ছিল তার থিয়েটারের নেশা। থিয়েটারের নেশাতেই চাকরি ছেড়ে প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে চেম্বার খুলে বসল। আমি চেম্বারে যেতাম। চেম্বারে দীপা আসত। দীপা দিনে দিনে খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। সিনেমাতে ছোটখাটো পার্ট পেয়েছে। অ্যামেচারে নায়িকা হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে আসত বসে থাকত। হাসত। গাঙ্গুলী ওদের বিনা পয়সায় দেখত।

বাজারে গুজব রটল—ডাক্তার প্র্যাকটিস ছেড়ে সিনেমা করবে। থিয়েটারেও নামবে। শুনলাম হাসপাতালে। সেদিন চেম্বারে গিয়ে আমি বললাম—না। এ করবেন না। না। আমি দেব না এ করতে।

তখনও আমি তাকে আপনি বলি।

সে বললে—না, এ মিথ্যে কথা। থিয়েটারের নেশার চেয়ে ডাক্তারিতে অনুরাগ আমার কম নয়। ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস করো না। কিন্তু ও হাসপাতালে ভাল লাগছিল না। তার অনেক কারণ। ওখানে আমার জীবনের সুযোগ নেই। সুযোগ যেদিন আসবে সেদিন থিয়েটারও ছেড়ে দেব। তুমি কি আমাকে আজও চিনলে না!

চুপ করে রইলাম। অস্বীকারের উপায় তো ছিল না।

সে বললে—কি, তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি গালব?

মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিতে, বললে—গাললাম—। ডাক্তারি ছেড়ে সিনেমা করব না। হল তো?

মাথাটা না-সরিয়েই বললাম—না। আর একটা।

—সেটা কি?

—দীপার সঙ্গে থিয়েটার করবেন না।

—দীপার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তুমি তা হলে নাম অভিনয়ে। আমি নায়ক তুমি নায়িকা। বল!

সেই মুহূর্তে সব ভেসে গিয়েছিল আমার। বলেছিলাম—হ্যাঁ।

সেই দিন অঘটন ঘটল। আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে ঠোঁটের উপর সে ঠোঁট রাখল। আমি আপত্তি তো করলামই না, চাইলাম এইভাবেই থাকি কিছুক্ষণ। ডাক্তার আমাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হেসে বললে—Oh sorry—I forget myself—take it easy.

. . .

অভিনয়ে নামলাম। এ পারদমতা আমার জীবনে ছিল। মেহ বোধ হয় আমার নাচের

ছন্দেই গড়া—কণ্ঠে স্বর আমার সুরে বাঁধা—নাম করতে দেরি হল না। দু-তিন বারেই নাম হল। চাকরি সেই ছাড়ালে। বললে—ও তোমার জন্যে নয়।

মাস তিনেকের মধ্যে ঘটে গেল।

আরও ঘটল। দীপা বাড়ি থেকে পালাল। চাঁপা মাসীর স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হল। সুরেন মেসো, রূপী দীপাকে ফেরাতে গেল—সে ফিরল না। যার সঙ্গে সে পালিয়েছিল সে সিনেমার একটা কিসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। সে আসতে দেয় নি। দীপাও চায় নি। তার ধারণা হওয়ার কারণ ছিল যে তার বাপ তার মা তার উপার্জন কেড়ে নিচ্ছে। তা নিত তারা। থিয়েটারের সিনেমার টাকা তারাই নিত হাত পেতে। এবং দিত না তাকে। চাঁপা মাসী গৃহস্থ হয়েও ও স্বভাবটুকু ছাড়তে পারে নি। ডাক্তারই চাঁপা মাসীকে দেখত—সেই দীপার সঙ্গে অভিনয়ের সূত্র থেকে। সে বলেছিল—মুক্তোকে বাড়ি আনুন সুরেনবাবু। ওকে ছুটি নেওয়াচ্ছি। এই বইটায় যদি ভাল পার্ট করে তবে চাকরি ছাড়িয়ে দেব। ও বাড়ি থাকলে দেখাশোনার সুবিধে হবে।

ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এল। হাতে পার্ট! বড় পার্ট।

ডাক্তার নতুন থিয়েটার-গ্রুপ করেছে। ছোট বই। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। ২৭শে বৈশাখ প্রথম। তারপর কয়েকদিন নানান প্যাণ্ডেলে। ডাক্তার অর্জুন—সে চিত্রাঙ্গদা। নাটক আর নৃত্যনাট্য মিশিয়ে করবার ঝোঁক হয়েছে ডাক্তারের। সুরেন মেসোকে বলেছিলেন—ওর নাচটা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে। আমরা আমাদের গ্রুপ থেকে ফী দেব আপনাকে।

চাঁপা মাসী সুস্থ থাকলে হয়তো চীৎকার করত। চীৎকার দীপার জন্য। কিন্তু তার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল—বোধশক্তিও বেশ ভাল ছিল না।

ডাক্তার তাকে বলেছিল—আমার মুখ রাখতে হবে।

ডাক্তারই একটা গ্রামোফোন এবং চিত্রাঙ্গদার গানের সব রেকর্ড কিনে দিয়েছিল।

—"আমারও তখন নেশা লেগেছে। রক্তে যেন জোয়ার ধরেছে। পৃথিবী ভুলেছি—দিন ভুলেছি—রাত ভুলেছি। গান গুঞ্জন করছি।

রোদন ভরা এ বসন্ত
কখনও আসেনি বুঝি আগে।
কখনও গাই—তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি—
তুমি এসো—বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন!
বক্তৃতা করি —পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি—নহি—
অবহেলা করি রাখিবে পিছে
সে নহি—নহি।

স্বপ্নও দেখতাম অভিনয়ের।

তারপর হল অভিনয়। সেও স্বপ্নের মত। আত্মহারা হয়ে অভিনয় করেছিলাম। অভিনয়ে নৃত্যে গানে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমার মনে নেই।

মনে আছে—অভিনয়ের শেষে কখন সে আমাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছে। আমি বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি। বুকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা—আকুল আগ্রহে সর্ব দেহ শিরা-

স্নায়ু থরথর করে কাঁপছে। তবে মুখে বলছি—না, না—না। তুমি তো তেমন নও। তুমি বৈজ্ঞানিক। তুমি যুক্তিবাদী, তুমি—

সে বলেছিল—আমিও আজ আপনাকে হারিয়েছি মুক্তো। তুমিও হারিয়েছ। আমি দেখতে পাচ্ছি।

বলেছিলাম—কি হবে ভাবো তো? না না!

সে বলেছিল—জীবন অঙ্ক নয় মুক্তো। জ্ঞান এক আর এক যোগ করলেই দুই হয়। কিন্তু জীবনে একটি পুরুষ একটি নারীর যোগফল সাধারণতঃ এক। নিরেনব্বুই ক্ষেত্রে এক। কখনও কখনও দুই হয়—সে তিনও হয় চারও হয়। জীবন অঙ্কে চলে না। বিদ্যায় চলে না বুদ্ধিতে চলে না—জীবন চলে আপন ছন্দে। বলে সে আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল।

আমি হারালাম, ডুবে গেলাম।"

* * *

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। স্থির নির্বাক। দু চোখের কোণে দুটি ফোঁটা জল ছোট দুটি মুক্তার দানার মত টলমল করছিল।

প্রতিমার মত মনে হচ্ছিল তাকে। মুখের ভাবে কি ছিল নির্ণয় করা কঠিন। বেদনা? না ক্ষোভ? না—হয়তো অপরিসীম ঔদাসীন্য।

নারায়ণ ডাকলে—মা।

প্রতিমার মুখে কথা ফুটল। সে বলতে লাগল—আমি মা হলাম। মাস তিনেক যেতে যেতেই অনুভব করতে পারলাম। ছুটে গেলাম তার কাছে। কি হবে? সে একটু চুপ করে থেকে বললে—অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পার না?

চমকে উঠলাম।

সে বললে—তোমাকে কোন হোমে রেখে দেব। সন্তান হলে তাকে অনাথ আশ্রমে দেব—

আবার চমকে উঠলাম—কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। ভাল আশ্রমে রাখব। টাকাপয়সা দেব—

—না। চীৎকার করে উঠলাম—

—কিন্তু—অন্য পথে বিপদ আছে—

—হে ভগবান! বলে এবার চীৎকার করে উঠেছিলাম। তারপর বলেছিলাম—না—না। তা দেব না। সে হতে দেব না আমি।

—তবে?

উত্তর দিতে পারি নি আমি।

সে-ই বলেছিল—তা হলে বিয়ের কথা বলছ? কিন্তু তা তো হয় না। বিবাহ তো আমি করব না। আমি বিবাহের উপযুক্ত নই। না—নই। আমি আমাকে জানি। তা ছাড়া তোমাকে বলি নি—আমি ইউরোপ চলে যাচ্ছি। আমেরিকান বন্ধু আছে আমার—তারা সাহায্য করছে। সে তো হয় না।

প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে অপমান করেছিলাম—সে কথা বলে নি। শুধু বলেছিল—এ যুগে এত অবুঝ হচ্ছ কেন তুমি?

নিরুপায় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসেছিলাম। বাড়িতে তখন লোক বসে আছে—আমায় পার্ট দিতে এসেছে। অনেক টাকা দেবে। আমার খ্যাতি রটে গেছে, আমি

বিখ্যাত হয়ে গেছি।

* * *

সে-ই তার সঙ্গে শেষ দেখা।

চলে যাবার সময় কিন্তু সে একটি মাতৃসদনে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।

সেখানেই হয়েছিল আমার সন্তান। পুত্র। তার জন্যও সে টাকা দিয়ে গিয়েছিল একটি সম্ভ্রান্ত আশ্রমে।

আমি প্রথম সন্তানকে ছাড়তে রাজী হই নি। কিন্তু শেষে ছেড়েছিলাম—নিজের প্রতি ঘৃণায় লজ্জায়। কি বলব আমি তাকে, যখন সে বড় হবে?

তারপর জীবনে এল সাফল্য। একের পর এক।

আমি একা, আমি নিঃস্ব, আমি রিক্ত। চাঁপা মাসী মারা গেছে, সুরেন মেসো মারা গেছে, দীপার অনেক দুঃখ-দুর্দশা। তিনবার বিয়ে করেছে।

আমি নানান দলে নাচলাম। আমাকে বিদেশে নিয়ে গেল। চীনে আপনার সঙ্গে দেখা হল। আমি অবাক হলাম। মনটা জুড়োল। আপনাকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু এই সত্যটি বলতে পারি নি আপনাকে। ছেলের জন্যেই আমি মরতে পারি নি। আমার জীবনশুদ্ধি হল না। হেরে গেছি আমি। প্রতিষ্ঠা নিয়ে আছি—সম্পদ নিয়ে আছি। আর আছি ছেলের জন্য। তার টাকা সেই অনাথ আশ্রমেই পড়ে আছে। আমার টাকাতেই সে এখন পড়ছে। রূপী যায়—তাকে দেখে আসে। সে তাকে চেনে—সে তার মামা। আমি যাই—দেখে আসি। দূর সম্পর্কের মাসী বলেই আমাকে জানে। সিনেমাতে নামিনি ছেলের জন্যেই। সে দেখবে আমার নগ্নরূপ।

নারায়ণের চোখ থেকে এবার জলের ধারা নেমে এসেছিল।

সেই দেখে চুপ করলে মুক্তামালা।

একটু পর বললে—আর একটু আছে। কিছুদিন আগে সে একখানা পত্র লিখেছিল কালিফোর্নিয়া থেকে—সেখানে এখন সে বড় ডাক্তার হয়েছে।

লিখেছিল—জীবনে আবার তার মোড় ফিরছে। সে ওখানকার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে বড় একটা কিছু করবার প্রত্যাশা রাখে। লিখেছে—আশা করি এতদিনে তুমি এটা সহজভাবে নিতে পেরেছ। Take it easy,—মহাভারত পড়েছ? ব্যাসের জন্মকথা ব্যাস নিজে বলেছেন—পড়ে দেখো, কোথাও সঙ্কোচ নেই—সত্যকে সহজভাবে বলেছেন। ঋষি পরাশর—ঋষি, তবুও মানুষ। তিনি জীবনের তাগিদে মিলিত হয়েছিলেন মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। বিবাহ না—মন্ত্র না—সাক্ষী না। তাতেই উৎপন্ন হলেন ব্যাস। ব্যাস নিন্দিত নন—পুরুষশ্রেষ্ঠ। তোমাকে শিল্পীখ্যাতি আমি দিয়ে এসেছি। যোজনগন্ধার সঙ্গে যদি তার তুলনা করি তবে আমাকে উদ্ধত ভেবো না। তুমি ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ছেলে বা মেয়ে আমি জানি না। যাই হোক সে—তাকে পাঠিয়ে দাও। তাকে মানুষ করব আমি—যোগ্য করেই করব। এ মডার্ন ম্যান বা উয়োম্যান। তোমার যোজনগন্ধার মত খ্যাতিতে অবশ্যই আসবে শান্তনু। তুমি সম্রাজ্ঞীর সৌভাগ্য লাভ কর।

হাসলে সে। তারপর বার বার ঘাড় নেড়ে বললে—না। সে অসাধারণ। কিন্তু এখানে তার ভুল হয়েছে।

মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন শ্রীনারায়ণ।

মুক্তো বললে—মহাভারতের যুগ পার হয়ে গেছে বাবা। অনেকটা চলে এসেছি আমরা।

একালে সত্যবতী পরাশরের মত ঋষির প্রিয়া হবার সৌভাগ্য—তা সে সৌভাগ্য হোক না কেন একদিনের—লাভ করার পরও কি তাঁকে বিস্মৃত হয়ে সিংহাসনের লোভে রাজরাজেশ্বরকে বরণ করতে পারে ?

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শিষ্যার মুখের দিকে গুরু।

কিছুক্ষণ পর মুক্তা বললে।

—বলুন। এর পরও কি আপনি বলবেন—

জিভ কেটে বললেন—না মা, না। আমি বলছি।

নীরবে অপেক্ষা করে রইল মুক্তামালা।

গুরু বললেন—সন্তানকে নিজের কাছে আন মা—তোমার ব্রত পূর্ণ কর। সত্যকে বুকে টেনে নাও। এই বলছি। বাকী তো ওইটুকুই।

সে বললে—না, তাকে তার জন্মদাতার কাছেই পাঠিয়ে দেব। ব্যাস তো তাঁর মায়ের কাছে ধীবরকন্যার কাছে থাকেন নি! একটু হাসলে সে।

একটু পর গুরু বললেন—তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দেবে ?

—নেই। চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বলে গুরুর পদধূলি নিয়ে উঠে চলে গেল। যাবার সময় বললে—আপনি গুরু। মীরা গানে ভজনা করে জীবন পূর্ণ করেছিল। সে হয়তো সেকাল। একালেও আমি আনন্দের মধ্যে পবিত্র পুণ্যের মধ্যে এই সাধনাতেই জীবন পূর্ণ করব। আর আমার অভিযোগ নেই।

গল্প

ছলনাময়ী

অসমতল গিরি-মাটির বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে কালো পাথরের স্তূপ মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে নাতিবৃহৎ পলাশের গাছে একটি শীর্ণ বনশোভার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্যে কতকগুলি খাপ্‌ড়ার বাংলো, পলাশবনের মাথার উপর বয়লারের চিমনী—এই লইয়া কলিয়ারী।

ধনী শ্বশুরের এমনই একটি কলিয়ারীর ঠিকাদারী লইয়া অমিয় জমির এই রুক্ষ ভৈরবী-প্রকৃতিময়ী দেশের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরের কলিয়ারীতে অভিনন্দন না হউক একটা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করিয়াছিল। কুটীর কর্মচারী বাবুরা ও আর সকলে ভিড় করিয়া আসিয়াছিল। বেবী-পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোও জ্বালানো হইয়াছিল।

অমিয় মনে মনে ম্যানেজার-বাবুকে অনুসন্ধান করিতেছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া ম্যানেজার বাবুকে এ প্রশ্ন করিতে কেমন তাহার বাধিতেছিল। উপস্থিত বাবুদের মধ্য হইতে একজন আসিয়া তাহাকে পরিত্রাণ করিল, সে কহিল—আজ্ঞে আমি হলাম এখানকার স্টোর-বাবু, ইনি কম্পাস, এঁরা দুজন মুন্সী, আর ইনি হলেন খাদ-বাবু।

অমিয় ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেল। কম্পাস মানে সে জানিত যন্ত্র। মানুষ কম্পাস হইল কেমন করিয়া সে বুঝিল না। অবশেষে একান্ত ভাল মানুষের মত কহিল—কম্পাস কি বললেন?

বেমানান রকমের লম্বা শীর্ণকায় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বেশ সপ্রতিভ হাসিমুখে বলিল—আজ্ঞে, আমি।

অমিয় অবাক হইয়া গেল।

কম্পাস বলিয়া গেল—এক্‌রা থেকে পাস করেছিলাম আজ্ঞে। তারপর থেকেই এই আশ্চয়েই আছি। সবে তখন এক লম্বর পিট্টু হইছে। আমিই তারপর দু লম্বর, তিন লম্বর সব কঁরাইছি। ইখানে কানাই কম্পাসকে না চেনে এমন কুলিকামিন আপনি পাবিন নাই।

অমিয় ভাবিল কম্পাস ইঁহার উপাধি। কিন্তু জাতিনির্ণয়ে গোল বাধিয়া গেল। নামটা বাঙালীর কিন্তু উপাধিটা বিদেশী। সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য সে প্রশ্ন করিল—আপনারা?

গলা হইতে মোটা কৃষ্ণবর্ণ একগোছা উপবীত বাহির করিয়া কম্পাস কহিল—আজ্ঞে বাম্ভন। উপাধি চক্রবর্তী, শাণ্ডিল্য গোত্ত, কুলীন আমরা আজ্ঞে। রামেশ্বরের সন্তান—দুপুরুষে ভঙ্গ—

অমিয় বলিল—তবে যে বললেন কানাই কম্পাস! কম্পাস কি আপনাদের কোম্পানীদত্ত উপাধি?

স্টোর-বাবুটি বর্ধমানের লোক, তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে ইনি—এখানকার সার্ভেয়ার কিনা। কলিয়ারীতে সার্ভেয়ারকে কম্পাস ব'লে থাকে। রেলওয়ে গুড্‌স্‌-ক্লার্ক যেমন মাল-বাবু আর কি।

হাঁপ ছাড়িয়া অমিয় কহিল—ও।

এতক্ষণে তাহার ভদ্রতার হুঁশ হইল, তাড়াতাড়ি সে কহিল—বসুন আপনারা, দাঁড়িয়ে আছেন যে!

সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিল—বেশ আছি আমরা, বেশ আছি। আপনি মালিক, আপনার সামনে—

ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়া অমিয় একটা সিগারেট ধরাইল। তারপর কহিল—কই, ম্যানেজার বাবু ত এলেন না।

কেহ উত্তর দিল না। সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল।

অমিয় আবার বলিল—কই, তিনি কোথায় ?

শীর্ণ কম্পাস বলিয়া উঠিল—অঃ, সত্যি কথা তার আর ভয়টো কি র'ইছে ? তিনি আজ্ঞে —কি রকম লোক মশায় কে জানে ! সন্ধ্যে বেলায় কি সব যোগযাগ করেন, ভূতপেরেত নিয়ে নাকি। বলে পিচাশসিদ্ধ—এই যি—এই যি ম্যানেজার-বাবু আসছেন আজ্ঞে।

সম্মুখের প্রান্তরে উজ্জ্বল একটা আলো অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। সেই আলোর পিছনে পিছনে একটি খর্বাকৃতি শীর্ণ মানুষ উপরে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—নমস্কার।

উজ্জ্বল বেবী-পেট্রোম্যাক্সের আলো পরিপূর্ণরূপে আগন্তুকের উপর পড়িয়াছিল। তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমিয় বিস্ময়ে স্তব্ধ, অভিভূত হইয়া গেল। হাতের সিগারেটটা কখন পড়িয়া গেছে। কাঁচা-পাকা দীর্ঘ রুক্ষ চুল আগন্তুকের মুখখানাকে অর্ধাবৃত করিয়া চারিদিকে বিশৃঙ্খলভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাড়িগোঁফে মুখের নিম্নাংশ সমাচ্ছন্ন। ললাটপ্রান্তে কেশঘন ভ্রূর নিম্নে অদ্ভুত দুইটি চোখ। কোটরগত অতি ক্ষুদ্র চোখের প্রদীপ্ত তারা দুইটি অচঞ্চল স্থির —দৃষ্টি নিমেষহীন, কঠিন। প্রান্তরের বুকের অদূরবর্তী বনান্ধকার পটভূমির সম্মুখে সে মূর্তি যেন এক অদ্ভুত-শোভন রহস্য।

অমিয় কোনরূপে নমস্কারটা সম্পূর্ণ করিল মাত্র। সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, আপনিই বাবুর জামাই ?

গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া অমিয় উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মহাশয়ের নাম ?

—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

—আর কোথায় ঠিকেদারী করেছেন ?

এতক্ষণে অমিয় নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছিল, স্বচ্ছন্দভাবে ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল—এই আমার হাতেখড়ি। আপনাদের সাহায্যের ভরসা করেই এসেছি এখানে।

ভদ্রলোকও ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন—সে পাবেন বৈ কি। আমরা সব দেখেশুনে দেব। বাবুও সে কথা লিখেছেন আমায়। কম্পাসবাবু রয়েছেন—

কম্পাস অমনি শতমুখ হইয়া উঠিল—হঁ, আজ্ঞা সব ঠিক করে দিব আজ্ঞা। কুলিকামিন কত চাই আপনার ? মাপ্ জোপ ষোলআনার জায়গায় আঠার আনা করি দিব। আর মেনেজারবাবু সহায় থাকলে ভয় কি ? কুলিকামিন ত উঁয়ার কথায় উঠে বসে। দেঁখাই দেন ত মেনেজারবাবু সেই গন্ধটা। জানেন জামাইবাবু, মেনেজারবাবু আমাদের সাধু লোক। সংসারে রইছেন তাই, নইলে এতদিন তৈলঙ্গ গোঁসাই হয়ে যেতেন।

ম্যানেজারবাবু নীরব হইয়া রহিলেন। কম্পাসের কথার অর্থ যে কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া অমিয়ও চুপ করিয়া রহিল।

কম্পাস কিন্তু ছাড়িল না। সে বলিল, দেন, দেন ম্যানেজারবাবু, জামাইবাবুকে একবার দেঁখাই দেন সিটো। বুঝলেন জামাইবাবু, যে গন্ধ আপনি ইচ্ছে করবেন সেই গন্ধই মেনেজার-বাবু হাত ঘষে বার করে দিবেন।

বিস্মিত অমিয় প্রশ্ন করিল, সত্যি, ম্যানেজারবাবু ?

ম্যানেজারবাবুর চোখের তারা যেন জ্বলিয়া উঠিল। অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া ভদ্রলোক

নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। দেহান্দোলনের গতিবেগে দীর্ঘ কেশপাশ দুলিয়া আরো বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সে মূর্তি দেখিয়া ভয় হয়। অমিয় প্রবল বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজারবাবু নিজেই বলিলেন, আপনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন অমিয়বাবু?

কি উত্তর দিবে অমিয় খুঁজিয়া পাইল না, সত্য বলিতে কি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি তাহার হইত না, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার মত জ্ঞানের গভীরতা বা চারিত্রিক দৃঢ়তা তাহার ছিল না।

সম্মুখের অন্ধকার প্রান্তরের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করতে পারে, অমিয়বাবু। অদ্ভুত সে শক্তি। আধুনিক যুগের বিশ্বাস সে শক্তি অন্ধ। কিন্তু তা নয়। সে অজ্ঞান, চঞ্চলা, ছলনাময়ী। ছলনায় সে মানুষকে প্রতারণা করে। তিনি নীরব হইলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগুলিও নীরব। রাত্রির অন্ধকার ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে দূরের বয়লারের গুম্ গুম্ শব্দ অবাধে ছুটিয়া চলিয়াছে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল কম্পাস। সে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, দেখাই দেন গন্ধটা জামাইবাবুকে।

ভদ্রলোক নিম্নস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, সত্যিই দেখবেন অমিয়বাবু?

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

—আচ্ছা, আমার হাত শুঁকে দেখুন।···কোন গন্ধ আছে কি? হাতে গন্ধ একটা উঠিতেছিল। অমিয় বার বার শুঁকিয়াও কিসের গন্ধ বুঝিতে পারল না। ভদ্রলোক নিজেই বলিলেন—ওটা গাঁজার গন্ধ। কোন সুগন্ধ নেই ত? আচ্ছা দেখুন। হাতখানি শূন্যে উর্ধ্বে তুলিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া লইলেন। তারপর অমিয়র হাতের উপর ঘর্ষণ করিয়া দিয়া বলিলেন—দেখুন। অতি মিষ্ট গন্ধের ঝলক অমিয়র নাকে ইতিপূর্বেই আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল ঐ অদ্ভুতদর্শন ব্যক্তিটির মুখের দিকে।

ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—সামান্য শক্তি। মধ্য-জীবনে সন্ন্যাস নিয়ে মন্ত্রসাধনায় একটু পেয়েছি। রাক্ষসী ছলনাময়ী সামান্য দিয়ে আমায় প্রতারণা করলে।· অসীম···অসীম শক্তিলাভ করা যায়—যা রাজার নেই, সম্রাটের নেই, জ্ঞানীর নেই, কারও নেই।

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব। প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঈষদ্দূরে তখনও বাক্যধ্বনির ক্ষীণ রেশ কাঁপিতে কাঁপিতে নিঃশেষে মিলাইয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর সচকিতের মত তিনি উঠিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন আজ। কাল দেখা হবে।

পরদিন হইতে অমিয়র ঠিকাদারী আরম্ভ হইল। অর্থাৎ খনি হইতে কয়লা তোলা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য সে একটা নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে করিবে। খনির মালিকের তরফ হইতে ম্যানেজার ও সার্ভেয়ার সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লইবেন ও কার্যপ্রণালী নির্দেশ করিয়া দিবেন।

ম্যানেজার এখনও আপিসে আসেন নাই। কম্পাস ধূমধামের সহিত জামাইবাবুর হিতান্বেষণ করিতেছিল। অমিয় কিন্তু চিন্তা করিতেছিল ম্যানেজারবাবুর কথা—সে কহিল—কই, ম্যানেজারবাবু ত এলেন না এখনও?

কম্পাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর কম্পাসের কাঁটার মত একপাক ঘুরিয়া গেল, অতি মৃদুস্বরে সে বলিয়া

উঠিল, উ বেটা পাজীকে আপুনি বিশ্বেস করবেন নাই। বেটা পয়লা নম্বরের চোর আর ভণ্ড। সব আমি ঠিক করে দিব।

অমিয় অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কম্পাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন মতে সে বুঝিতে পারিল না, অকস্মাৎ বিনা কারণে ম্যানেজারবাবুকে এমন ধারা গালিগালাজ কেমন করিয়া দেওয়া যায়।

কম্পাস কিন্তু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল অন্যরূপ। গর্বস্ফীতকণ্ঠে সে বলিয়া গেল—হঁ—ত কি? একটি আধ্‌লা উয়াকে আপুনি দিবেন নাই। পাঁড় মাতাল বেটা ভণ্ড। ঘরে আঠারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে মশায়, বিয়ে দেয় না বেটা। পরিবারকে ধরে মারে। কিছু বলি না মশয়ের ভয়ে—ভূত পেরেত দিয়ে কি করে দিবে শেষে!

অমিয়র মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই শীর্ণ কুটিল মানুষটির উপর অশ্রদ্ধার আর তাহার সীমা রহিল না।

কম্পাস বলিল—আর দয়া করে যদি কিছু দেন তবে উয়ার পরিবারকে—। ওই ধরে ঠেঙ্গাইছে বেটা পরিবার না হয় কন্যাকে ধরে ঠেঙ্গাইছে বেটা। কান্না শুনতে পেছেন নাই?

সত্যই চাপা-কান্নার আর্তধ্বনি ম্যানেজারের বাংলোর দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। অমিয় আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কি? শিক্ষিত ব্যক্তি, গৈরিক আবরণে যে একদিন অঙ্গ আবৃত করিয়াছিল, সাধনায় যে মানুষ খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছে,—তাহার এ কি ব্যবহার? কম্পাসকে সে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, ভদ্রলোকের কি মাথার গোলমাল আছে?

অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া কম্পাস বলিয়া উঠিল—সাধের গোলমাল। পাগল। ডাল নইলে ভাত খায় না—সাধের পাগল আমার। পান থেকে চুনটি খসলেই এই কাণ্ড মশয়! ঠেঙ্গায়ে বেচপাট করে দেয় বলে এক একদিন।···ওই যি বেরইচে মশয় বেটা। আমি পালাই মশয়, লইলে লিবে আমাকে একচোট। বেটা যে করে আমার দিকে চায় মশয়—মনে হয় খেঁয়ে ফেলাবে আমাকে।

কম্পাস ত্রস্তপদে বিপরীত দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল।

অমিয় দেখিল নিজের বাংলোর বারান্দায় ম্যানেজারবাবু খাদে নামিবার পোশাকে দাঁড়াইয়া আছেন। পরনে খাকী শার্ট, খাকী কামিজ, মাথায় হ্যাট, হাতে লাঠি। অমিয় হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সুপরিস্ফুট তাচ্ছিল্যের সহিত অর্ধ-নমস্কারে প্রত্যভিবাদন করিয়া গম্ভীরস্বরে তিনি ডাকিলেন—এদিকে শুনে যান।

অমিয়র বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। সে অসন্তুষ্ট চিত্তেই অগ্রসর হইল, আজ স্পষ্ট দিবালোকে মানুষটার প্রত্যক্ষ রূপ দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। রাত্রিতে প্রদীপ্ত আলোতে মুখের কুঞ্চন রেখাগুলি দেখা যায় নাই। রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ ললাট ত্রিবলীরেখার মত কুঞ্চন রেখায় রেখাঙ্কিত, নাসিকার প্রান্তের বামপার্শ্ব ঈষৎ স্ফীত, তাহার কোলে কোলে গণ্ডদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি কুঞ্চন-রেখা ঈষৎ নিম্নে শ্মশ্রুগুম্ফের মধ্যে আবৃত হইয়া গেছে। অসন্তোষে—ক্রোধে—ঘৃণায় মানুষটি যেন অতিমাত্রায় জর্জর, তাহারই অভিব্যক্তি পূর্ণ প্রকটিত।

বিনা ভূমিকায় ম্যানেজারবাবু বলিলেন—কাজ কি আরম্ভ করলেন আপনি?

অমিয় বলিল, না, আরম্ভ হয় নি এখনও, আপনারই অপেক্ষা করছি।

ভদ্রলোক যেন ঈষৎ খুশী হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন—আপনি শিক্ষিত লোক, কাজের

প্রণালী জানেন। আমার আদেশ না নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে সত্যিই বিরক্ত হতাম আমি। আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অমিয়ও তাঁহার অনুসরণ করিল। হাতের লাঠিটা তুলিয়া সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন—নদীর ধারে পাঁচ নম্বর ইন্‌ক্লাইনটায় জলের চাপ বড় বেশী। পাম্পিং-এর ভাল বন্দোবস্ত করা দরকার। সেটাই আগে দেখাই চলুন।

অকস্মাৎ অমিয় প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনার মনটা কি তেমন ভাল নাই ?

উত্তরে অতি রুক্ষস্বরে প্রশ্ন হইল—কেন ?

আর কোন প্রশ্ন করিতে অমিয়র শঙ্কা হইল। কি জানি—উত্তরে এই দুর্মুখ মানুষটি কি বলিয়া বসিবে !

অসমতল তরঙ্গায়িত গৈরিকবর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে মানুষের পায়ে রচা সরু পথখানিতে কয়লার গুঁড়ায় গুঁড়ায় কালো রং ধরিয়াছে। আশেপাশে পলাশগাছের সারি। উপরের আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া বয়লারের কালো ধোঁয়া যেন জল-ঘন মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে।

নীরবে পথ অতিক্রম করিতে করিতে ম্যানেজার বাবু বলিলেন, অমিয়বাবু।

শঙ্কিতভাবেই অমিয় উত্তর দিল—বলুন।

—এ কাজে আপনি নতুন ; আপনি জানেন কিনা জানি না, ম্যানেজারকে সন্তুষ্ট রাখতে ঠিকেদারকে কিছু দিতে হয়। সেটা আমাদের প্রাপ্য।

অমিয়র আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে নীরব হইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। ম্যানেজারবাবু বলিলেন—আমার অর্থের কিছু প্রয়োজন।—বিশেষ প্রয়োজন !

অমিয় তবু কোন উত্তর দিল না।

ভদ্রলোক বলিয়াই গেলেন—জীবনে অর্থ, ভোগ, সম্মান, প্রভুত্ব কামনা করেই এই সাধনায় আমি প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। ব্যর্থ হয়ে গেলাম। কিন্তু ভোগ, প্রভুত্ব এ আমার চাই—এ আমাকে পেতে হবে। রাজার, সম্রাটের কতটুকু ভোগ, কতটুকু প্রভুত্ব ? সে ছলনাময়ীকে স্ববশে আনতে পারলে, অনন্ত ভোগ, অসীম প্রভুত্ব—সে কল্পনা করতে পারবেন না। কল্পনা করা যায় না।

তিনি ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন, উত্তেজনার আবেগে কণ্ঠস্বর অদূরের বয়লারগর্ভের রুদ্ধ বাষ্পশক্তির মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপ, দুর্লভ বিলাস, শ্রেষ্ঠ আহার ইচ্ছামাত্রে ক্রীতদাসীর মত সে যোগাবে। আর প্রভুত্ব ? কি প্রভুত্ব আছে সম্রাটের ? মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা করতে পারে সে ? মৃত্যু যখন আসে—তখন সে সাধারণ মানুষের মত ভগবান ভগবান বলে নির্মম প্রকৃতির পায়ে মাথা কোটে। অন্ধ মানুষ জানে না—নির্মম নিষ্ঠুরা প্রকৃতি ক্রন্দনে টলে না। প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। তাকে আয়ত্ত করতে হয়, জোর করে স্ববশে আনতে হয়, নারীর মত—পৃথিবীর মত। তখনই সে হয় দাসী, মানুষের মনোরঞ্জনে বেশ্যার চেয়েও সে তখন মিষ্টমুখী।

অমিয় বুঝিল ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ নয়, বিকৃত হইয়া গেছে। তাঁহার আবেগ কিন্তু তখনও শেষ হয় নাই। তিনি বলিলেন—এইখানে নদীর ধারে এক শ্মশান আছে। সাধনার উপযুক্ত শ্মশান। এইখানে আবার আমি সাধনা করব। কিছু অর্থ চাই। আপনি দেবেন সে অর্থ আমাকে ?

এতক্ষণে অমিয় ধীরে ধীরে কহিল—পরে বলব আপনাকে। এখন কিছু বলতে পারলাম না।

ধীর মৃদুস্বরে ম্যানেজার বাবু বলিলেন—এবার আর ভুল করব না। ছলনায় মুগ্ধ হব না। জানেন অমিয়বাবু, কত বড় সাধনায় কত হীন প্রতারণা করলে আমার ছলনাময়ী রাক্ষসী? অন্ধকার জনহীন শ্মশানে শবের বুকে বসে তন্ত্রমতে সাধনা করছিলাম। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শবদেহ নিয়ে হিংস্র মাংসাশী শৃগালেরা কলহ করছিল, তারা কলহ ছেড়ে চীৎকার করে উঠল। মাথার উপর দিয়ে পেঁচারা কর্কশ রবে ডেকে চলে গেল। গাছের মাথায় ঘুম ভেঙে শকুনেরা পাখ্‌সাট মেরে তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল। সন্ সন্ শব্দে কাল-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। নরকপালের পাত্রে সুরা শোধন করছিলাম। সে সুরা পান করতে গিয়ে দেখি তাতে সুরার স্বাদ নাই—সে মধু—সুধা হয়ে উঠেছে। আনন্দে বুকটা নেচে উঠল। আবার পাত্রে সুরা পূর্ণ করলাম। শোধন করে চোখ বুজে ধ্যান করছি। এমন সময় মনে হল আমি বরফের মধ্যে ডুবে গেছি। তারপর অপূর্ব সুগন্ধ—মনে হল সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। তার মাধুর্য, তার গভীরতা আমি বর্ণনা করতে পারব না। সেই গন্ধ শতগুণে গভীর—শতগুণে মধুর—আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললে। আনন্দে আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। ভাবলাম আমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু প্রতারণা, ছলনা! তার ভাণ্ডারের সেই মধুস্বাদ আর এই মধুগন্ধ নগণ্য তুচ্ছ। তাই দিয়ে সে আমায় ভুলিয়ে দিলে। সামান্য জাদু-করের মত পারি শুধু জলকে ইচ্ছামত সুমিষ্ট করতে আর ওই গন্ধ আনতে।

—গোড় লাগি ম্যানিজর বাবা। গোড় লাগি, গোড় লাগি! বিলাসপুরী শ্রমিকের দল ম্যানেজার বাবুকে দেখিয়া কলরোল করিয়া উঠিল। পাঁচ নম্বর ইন্‌ক্লাইনে তখন তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার বাবু আবার বাংলোয় আসিয়া উঠিলেন। অমিয়র ছোট ভাই কাঠের একটা বল লইয়া খেলা করিতেছিল। ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—শরবৎ খাবে খোকা?

খোকার আপত্তি হইবার নয়। ঘাড় দোলাইয়া তৎক্ষণাৎ সে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

—বেশ, তবে এক ঘটি জল নিয়ে এস।

জল আসিল। বেশ ভাল করিয়া হাত ধুইয়া পাত্রের মধ্যে হাত দিয়া খোকাকে বলিলেন—খাও।

খোকা জল খাইয়া লাফাইয়া উঠিল। জল সত্য সত্যই শরবৎ হইয়া গিয়াছে।

ম্যানেজার বাবু কহিলেন—অমিয়বাবু!

—বলুন।

—কবে আমায় টাকা দিচ্ছেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় বলিল—বলেছি ত চিন্তা না করে কিছু বলতে পারব না। এত তাড়াতাড়িই বা করছেন কেন আপনি!

অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আছে আছে, তাড়া আছে। আপনি বুঝবেন না অমিয়বাবু। ডাক সব সময় আসে না, স্থির মন, দৃঢ়-সঙ্কল্প, সুযোগের সমন্বয় চাইবা-মাত্র পাওয়া যায় না।

অমিয় ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিল, কিন্তু সাধনায় অর্থের কি প্রয়োজন তা ত বুঝলাম না।

অতি মৃদুস্বরে তিনি কহিলেন, একান্তই শুনতে চান যখন শুনুন, শব চাই। উপযুক্ত শব সংগ্রহের জন্ম চাই অর্থ। অমিয়বাবু, আমার প্রয়োজন-মত উপযুক্ত শব শ্মশানে আসবে না। তাকে নিয়ে আসতে হবে। জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত করে নিতে হবে।

অমিয় শিহরিয়া উঠিল, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, আপনি আমার বাসায় আর কখনও আসবেন না।

সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, পশ্চাৎ হইতে অদ্ভুত হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—বসুন—বসুন, ভয় নেই। শব হবার উপযুক্ত লক্ষণ আপনার দেহে নেই।

ততক্ষণে অমিয় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি অমিয়র ঘুম হইল না। আতঙ্কনিপীড়িত মনের ছবি নিদ্রাও মুছিয়া লইতে পারিল না। তন্দ্রাঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বার বার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেছিল। কতবার সে উঠিয়া মাথায় জল ঢালিল। জল পান করিয়া ঘুমের চেষ্টা করিল। কিন্তু কুঞ্চিতললাট, তীক্ষ্ণদৃষ্টি তান্ত্রিকের মুখচ্ছবি মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল না। কানের পাশে অহরহ বাজিতেছিল সেই নিম্ন কণ্ঠের কয়টি কথা—জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত করে নিতে হবে।

অবশেষে শেষরাত্রে প্রকৃতি যখন স্বয়ং শীতলা হইয়া আসিল—মৃদু বায়ুপ্রবাহে অমিয়র বড় আরাম বোধ হইল। খোলা জানালার ধারে মাথা রাখিয়া ক্লান্তভাবে সে আপনাকে এলাইয়া দিল। প্রভাতে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন বেলা আটটা।

চাকরটা তাহার ঘুম ভাঙাইয়া বলিল—আজ্ঞে, সেই লম্বা মতন বাবুটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুখে-হাতে জল দিয়া অমিয় বাহিরে আসিল—দেখিল দীর্ঘ কম্পাস দাঁড়াইয়া আছে।

কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই কম্পাস বলিল—আজ্ঞে জামাইবাবু, মালকাটারা সব খাদে নামছে নাই; কাজ বন্ধ হয়ে রৈছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অমিয় প্রশ্ন করিল—কেন?

অভ্যাসমত মৃদুস্বরে কম্পাস বলিল—আজ্ঞে ঐ শালার কাজ।

—কার?

—ঐ শালা ম্যানেজারের। আবার কার? ভূতের রোজা বলে মালকাটারা উয়াকে বড়া ভক্তি করে আজ্ঞে। ই মশয়, ঐ শালার অন্তর-টিপুনি। ই আমি কালীর কিরা খেয়ে বলতে পারি আজ্ঞে।

কথাটায় অমিয়র অবিশ্বাস হইল না। সে বুঝিতে পারিল গত রাত্রির প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ এ। একটু চিন্তা করিয়া সে কহিল—চলুন, যাই আমি।

চা খাইয়া অমিয় একেবারে উঠিল ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়া। সম্মুখে বসিবার ঘরটি খোলাই ছিল। সে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরটার চারিদিকে আবর্জনায় পরিপূর্ণ। একদিকে একখানা মাদুরের উপর কতকগুলা মুড়ি ছড়ানো, কোণে একটা শূন্য বোতল··· মদের বলিয়াই মনে হয়—গড়াগড়ি খাইতেছে, পাশেই গাঁজার কলিকারও সন্ধান মিলিল। দরজাবিহীন একটা দেওয়াল—আলমারীর উপর একটা নরকপালের পাত্র, একটা পেরেকে ঝুলানো একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। সারা ঘরের মধ্যে বসিবার কোনও আসন নাই। অগত্যা অমিয় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ডাকিতে যাইতেছিল—'ম্যানেজারবাবু।' কিন্তু তাহার পূর্বেই বাড়ির ভিতরে ম্যানেজারের রুক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—চোপরাও হারামজাদী।

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় স্ত্রীলোকের কান্নার ধ্বনি শোনা গেল।

অমিয়র দেহের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। রূঢ় রুক্ষ কণ্ঠে সে ডাকিল, ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু!

নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি অমনি নীরব হইয়া গেল। অমিয় আবার ডাকিল, ম্যানেজারবাবু!

বাড়ির ভিতরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ম্যানেজারবাবু বাহিরে আসিলেন। সেই ভঙ্গি, সেই দৃষ্টি, সেই রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—কি?

উত্তেজনাবশে অমিয় প্রথমেই বলিয়া বসিল—আপনি কি মেয়েদের প্রহার করেন নাকি?

সে মুখভঙ্গির একচুল পরিবর্তন হইল না, ধীর ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন—করি।

অতি-উত্তেজনায় অমিয় প্রশ্ন করিল—কি তাদের অপরাধ?

গম্ভীর ভাবে উত্তর হইল—সে জানবার আপনার অধিকার?

—বাঃ—আপনি নিরীহ স্ত্রীলোক পেয়ে তাদের প্রহার করবেন—তাতেই বা আপনার কোন্ অধিকার শুনি?

—তারা আমার আয়ত্তাধীনে আছে। আমি একজনের স্বামী একজনের পিতা অর্থাৎ প্রভু। বুঝলেন?

অমিয় বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। তবুও সে কি বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বাধা দিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, বসুন, বসুন, স্থির হয়ে বসুন। বাজে কতকগুলো বকবেন না। আগে কাজের কথা সেরে নি। এত সকালে এসেছেন যে? কুলিদের হাঙ্গামা মিটল?

—না। মেটাবার দরকার বোধও করি না। আমি ঠিকেদারী ছেড়ে দিচ্ছি। কলকাতাতে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। আপনাকেও জানালাম। আপনি কোম্পানীর খাসে চালাবার ব্যবস্থা করুন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ম্যানেজার কহিলেন—আপনি সন্দেহ করছেন এ কাজ আমার। হ্যাঁ, করেছিলাম আমি। কিন্তু সেও ব্যর্থ করে দিচ্ছেন আপনি। ভাল—আমি কুলিদের বলে দিচ্ছি। কিন্তু কাল থেকে কুটীতে নতুন ম্যানেজার বন্দোবস্ত করুন আপনারা, আমি আর থাকব না। কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অমিয় তাঁহার মুখের দিকের চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার বলিয়া গেলেন, মনে সাড়া এসেছে—ডাক পেয়েছি। এ সুযোগ গেলে আর আসবে না। আজ থেকেই আরম্ভ করব আমি। এখুনি বেরুব নদীর ধারে, কৃষ্ণ সর্প চাই আমার।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় অবশেষে কহিল—কি হবে ম্যানেজারবাবু এসব করে? অনিশ্চিত— পদে পদে বিপদ—কিসের জন্যে ঘাড়ে নিতে যাচ্ছেন?

অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন—বুঝবেন না, আপনি সে বুঝবেন না অমিয়বাবু। আনন্দ—অমৃত ওইখানে আছে। ঐ শক্তি তার উৎস। এর স্বাদ আপনি পান নি। আপনি এর আকর্ষণ জানবেন না। অভিসারের আকর্ষণের মত্ততা অভিসারিকা ভিন্ন অপরে অনুভব করতে পারবেন না অমিয়বাবু।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, কহিলেন—আমার সময় বয়ে যাচ্ছে। আপনি আসুন, নমস্কার।

তিনি বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। অমিয় নির্বাক বিস্ময়ে সেইখানে বসিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রাচীর-অন্তরালে অতি কাতর মৃদু ক্রন্দনের শব্দ আবার জাগিয়া উঠিল।

অমিয় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েকটি মৃদু কাতর-বাক্যও তাহার কানে আসিয়া পৌছিল।

—তোমার পায়ে পড়ি গো, মেয়েটার মুখের দিকে তাকাও। তুমি গেলে কি করব আমি? কেমন করে বিয়ে দেব তার?

উত্তরে কোন কথা শোনা গেল না।

আবার নারীকণ্ঠের শব্দ পাওয়া গেল।—বেশ, তবে ওই কম্পাসবাবু স্নেহকে বিয়ে করতে চাচ্ছে—আমাদের পাল্‌টি ঘর—ওর সঙ্গে—

ক্ষিপ্তকণ্ঠে ম্যানেজার গর্জন করিয়া উঠিলেন—না-না-না। হবে না—হতে পারে না।

সব নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ম্যানেজারের কণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিল। অমিয় আশ্চর্য হইয়া গেল—সে কণ্ঠস্বর কাতর কাকুতিতে ভরা।

—করো না, করো না। মিনতি করে বলছি—তা তুমি করো না। আমার অনুরোধ তুমি রেখো।

প্রাচীর-অন্তরালে আবার সব নীরব হইয়া গেল। বাহিরে গৈরিক প্রান্তরে বায়ুপ্রবাহে পলাশবনের পত্রমর্মরে যেন গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী প্রকৃতি অকারণে উদাস হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। দূরে এখানে ওখানে চারিদিকে বয়লারের চিমনীর কালো ধোঁয়া প্রকৃতির নীল চোখের কোলে যেন ব্যথার কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় পথে নামিয়া পড়িল। একটা সঙ্গীতগুঞ্জন তাহার কানে আসিয়া পৌছিল—ন মাতা ন পিতা ন জায়া ন সুতো—ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর।

সমস্ত দিন অমিয়র মন কেমন ব্যথাতুর হইয়া রহিল। সে আকুল কাকুতি উদ্দিষ্ট মানুষটিকে স্পর্শ করিতে পারিল না—সেই ব্যর্থ কাকুতির কাতরতা তাহার তরুণ অন্তরকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে সারাটা দিন শুধু ঐ চিন্তাই করিল।

আকাঙ্ক্ষার কি উন্মত্ত মোহ মানুষের।

অপরাহ্ণে বাংলোর বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া সে উদাস নেত্রে অস্তায়মান রক্ত-সূর্যের শেষ রশ্মিমালার বর্ণান্তর-দৃশ্য দেখিতেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও যেন আনন্দ ছিল না, এ যেন কোন বেদনা আরক্ত হৃদয়ের কালের লীলাস্পর্শে মুহুর্মুহু রূপান্তর। এমন সময়ে দীর্ঘ কম্পাস আসিয়া পাশে দাঁড়াইল।—জামাইবাবু!

চোখ না ফিরাইয়াই অমিয় উত্তর দিল—কি?

—ডাকছেন আপনাকে একবার আজ্ঞে।

—কে?

—মেনেজারবাবুর পরিবার। এসেছেন তিনি আপনার বাড়িতে।

শশব্যস্তে উঠিয়া অমিয় বলিল—সে কি? আমাকে ডেকে পাঠালেই ত হত। তোমার কোন আক্কেল নেই।

হাত কচলাইয়া কম্পাস কহিল—তাতে তিনি কিছু মনে করবেন নাই আজ্ঞে। আপনকাদের আশ্চিত আমরা।

অমিয় প্রশ্ন করিল—ম্যানেজারবাবু কি সত্যই চলে গেলেন?

—হঁ—আজ্ঞে—সেই সোঁকাল বেলাতেই !

—কি বলছেন তাঁর স্ত্রী—তুমি জান ?

কম্পাস কয়বার কি বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। অবশেষে বলিল,—তেনার কাছেই শুনবেন আজ্ঞে।

বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমিয় দেখিল অবগুণ্ঠিতা একটি প্রৌঢ়া আর অনবগুণ্ঠিতা একটি যুবতী—কৈশোর তাহার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে অমিয় মেয়েটির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এই সেই কঠোর তান্ত্রিকের সন্তান। সন্ধ্যাকাশের গোধূলি-তারার মত শুভ্র, প্রশান্ত সুন্দর।

অমিয় বলিল—আমায় কিছু বলবেন মা ?

মাতৃসম্বোধনে অবগুণ্ঠনের অন্তরালেও নারীহৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সজল উচ্ছ্বাস অপ্রকাশ রহিল না। গলার শব্দ করিয়া কম্পাস সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। মেয়েটি একটি থামের আড়ালে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কম্পাসই আরম্ভ করিল—বলে ফেলান আপনি। জামাইবাবু সব ঠিক করে দিবেন। বড় দয়াল উনি আজ্ঞে।

বিরক্তিভরে অমিয় বলিল—থামুন আপনি।

কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে প্রৌঢ়া কহিলেন,—আমার অদৃষ্টের কথা ত সব শুনেছেন ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় মুখ নত করিয়া রহিল।

প্রৌঢ়া কহিলেন—দুটি অনুরোধ আপনার কাছে। আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন আর আমার মেয়ের বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিন।

মুখ তুলিয়া একান্ত কুণ্ঠিতভাবে অমিয় বলিল—দেশে আপনাকে পাঠিয়ে দেব বইকি। কিন্তু মা, আপনার মেয়ের কি ব্যবস্থা আমি করব ? আমি বড়লোকের জামাই কিন্তু নিজে ত বড়লোক নই।

প্রৌঢ়া বলিলেন—পাত্র আমার ঠিক আছে বাবা। কানাই দয়া করে মেয়েটিকে নিতে রাজী হয়েছে। কি বলে আশীর্বাদ করব আমি ওকে—

টপ টপ করিয়া জল তাঁহার চোখ হইতে পড়িল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল—কানাই কে ?

সলজ্জ হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া কম্পাস কহিল—নামটি আমার ভুলে গেছেন আজ্ঞে ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় বলিল—আপনার স্বামীর একটা মত নেওয়া—

—না, তাঁর মত নেই। তা থাকলে অনেক দিন এ শুভ কাজ হয়ে যেত বাবা।

—তবে ?

—কে-ই বা তবে হরিতকী-পণে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বাবা ? পৃথিবীতে ঐ লোকটি ছাড়া কেউ ত আমায় দয়া করলে না।

তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া কম্পাস বলিয়া উঠিল—উ-কি বলছেন আজ্ঞে আপনি ? মা বলেছি আপনকাকে—

অমিয় ভাবিতেছিল—কথা ত সত্য।

প্রৌঢ়া কহিলেন—এইখানে থেকেই কাজ সেরে যেতে চাই। চারদিন পরে বিয়ের দিনও আছে।

অমিয় বলিল—তাই হবে।

—কিন্তু যেন গোল না হয় বাবা। তিনি এখনও এখানেই আছেন কোথাও। জানলে শেষে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

কানাই বলিয়া উঠিল—তা কি হয় আজ্ঞে—চুপি চুপি কি বিয়া হয়? বাজনা কিছু করতে হবে আজ্ঞে। সেনেই ছেলেমানুষ, দুঃখ হবে মনে।

অমিয়র গাম্ভীর্য রাখা দায় হইয়া উঠিল।

কানাই বলিল—পাশের কুটীতে বন্দোবস্ত করছি আমি আজ্ঞে। কিছু জানতে পারবেন নাই শ্বশুরঠাকুর।

সেই বন্দোবস্তই হইল।

প্রথম রাত্রেই বিবাহের লগ্ন ছিল। নির্বিঘ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের আসরে কন্যার বেশ-ভূষা দেখিয়া কম্পাসকে শ্রদ্ধা না করিয়া অমিয় পারিল না। ইতিমধ্যেই কলিকাতা গিয়া কানাই বিবাহের বাজার করিয়া আনিয়াছে। বসনে-ভূষণে লাবণ্যময়ী মেয়েটি সুমনোরমা হইয়া উঠিয়াছে।

ভোজনের ব্যবস্থাও কানাই করিয়া ছিল। বরের বেশে সে-ই সকলকে আদর আপ্যায়ন করিতেছিল।

অমিয় সুপ্রসন্ন মন লইয়াই বাসায় ফিরিয়া শয়ন করিল। যাক···মেয়েটি পতিভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইবে সন্দেহ নাই।

প্রভাতে একটা কোলাহলে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কারণ অনুসন্ধান করিতেই একজন মুন্সীবাবু আসিয়া কহিল—আজ্ঞে, প্রকাণ্ড এক সাপ।

—কোথায়?

—আজ্ঞে কম্পাসের ঘরে। ভারী বেঁচে গেছে কম্পাস। বাসরে ছিল তাই, ঘরে থাকলে মিত্যু হত। মেয়েটি বড় লক্ষমানা জামাইবাবু।

—আন রে আন—জামাইবাবুকে সাপটা দেখিয়ে নিয়ে যা।

প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠির ডগায় রাত্রির মত কালো ভীষণ এক বিষধর মালার আকারে ঝুলিতেছিল। মরণের আক্ষেপে এখনও সে আপনার লাঙ্গুলাগ্র দংশন করিতেছে।

দ্বিপ্রহরে আপিসে চাপরাসী আসিয়া সংবাদ দিল। ম্যানেজারবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

অমিয় চকিত হইয়া কহিল—কোথায়?

—বাহারমে খাড়া আছেন হুজুর।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অমিয় বলিল—শুনো ইধর।

আরও নিভৃতে তাহাকে মৃদুস্বরে বলিয়া দিল—ম্যানেজারবাবুকো বেটীকো সাদীকে বাৎ উনকো মৎ বোল্না। সমঝা? আওর বাবু যব্ ঘরমে বৈঠেগা—তুম সব কোইকো ই বাৎ বোল দেও।

ম্যানেজারবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমিয় দেখিল গৈরিকে তাঁহার সর্বাঙ্গ আবৃত। ম্যানেজারবাবু বিনা ভূমিকায় বলিলেন—আমি মাইনেটার জন্ত এসেছি অমিয়বাবু।

অমিয় কহিল—বসুন।

অস্থির ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, না, সময় নেই আমার। টাকাটা দিয়ে দিন।

অমিয় প্রশ্ন করিল—বাড়ির দিকে গিয়েছিলেন?

—না—না। সন্ন্যাসের সে নিয়ম নয়। সাধনা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। আমার টাকাটা—

বাধা দিয়া অমিয় বলিল, সেটা আপনি পাবেন না, ম্যানেজারবাবু।

উগ্রস্বরে সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, কেন ?

ধীরভাবে অমিয় বলিল, আপনার স্ত্রী-কন্যা পাবেন সে টাকা।

উগ্রতর স্বরে তিনি বলিলেন—কে বললে তারা আমার স্ত্রী-কন্যা ! আর আমি করেছি কাজ, সে টাকা আমি পাব না তার অর্থ ?

বাধা দিয়া অমিয় বলিল—আপনার সঙ্গে যুক্তিতর্কে ফল নেই। এ ধরুন আমার সংকল্প। সে আপনাকে আমি জানালাম—যা খুশী আপনি করতে পারেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া তিনি অমিয়র হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন—অমিয়বাবু, ভিক্ষা —আমায় ভিক্ষা দিন।

ধীরে ধীরে হাত দুইটা টানিয়া লইয়া অমিয় বলিল—একান্ত দুঃখিত ম্যানেজারবাবু, তা আমি পারব না।

তান্ত্রিকের ক্ষুদ্র চোখ দুইটি ভীষণ হইয়া উঠিল - মাথাটা বার দুই আন্দোলিত করিয়া তিনি বলিলেন—উত্তম।

অস্থির পদক্ষেপে খর্বাকৃতি অসম্ভব-প্রয়াসী বাহির হইয়া গেলেন।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে চাহিয়া অমিয় দেখিল—সম্মুখে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর-বক্ষের শেষ সীমায় চিক্ চিক্ করিয়া কাঁপিতেছে মরীচিকাপ্রবাহ। দগ্ধ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অস্থির পদক্ষেপে খর্বাকৃতি তান্ত্রিক চলিয়াছেন সম্মুখের পানে।

দিন-বিশেক পর অপরাহ্নবেলায় চার নম্বর ইনক্লাইনের মুন্সী হাঁপাতেই হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল—আজ্ঞে, সর্বনাশ হয়েছে।

অমিয়র হাত হইতে খবরের কাগজখানা পড়িয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কি হয়েছে ?

—আজ্ঞে কম্পাস মারা পড়েছে।

—কি ? অমিয়র সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

—আজ্ঞে কম্পাস চার নম্বরের ভিতরে ধস চাপা পড়েছে।

ঘটনাস্থলে আসিয়া মুন্সী বলিল—আজ্ঞে, এই সব জানে।

অমিয় দেখিল দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ বিলাসপুরিয়া এক কুলি। সে যাহা বলিল তাহা এই—খাদের মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা তাহার কাজ—যেন ড্রাইভার সে। একটি মানুষের যাতায়াতের উপযুক্ত পথ সে কাটিয়া যায় ; পরে সাধারণ কুলিরা সে পথকে কাটিয়া পরিষ্কার করে। আজ খাদের একটা স্থানে কেমন চির্-চির্ শব্দ উঠিলে সে কম্পাসবাবুকে সে কথা জানায়। কম্পাস-বাবু সেখানে গিয়া লাঠি দিয়া সুড়ঙ্গের ছাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছেন—এমন সময় প্রচণ্ড বেগে উপর হইতে কয়লার স্তূপ তাঁহার উপর খসিয়া পড়িয়াছে।

অমিয় নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিল—খর্বাকৃতি মানুষটির কথা। সে কি ইহা জানিত ? জানিত বইকি। কানে তাহার বাজিতেছিল—মিনতি করে বলছি এ কাজ তুমি করো না, করো না।

দূরে ম্যানেজারের বাংলো হইতে কাতর ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রৌঢ়াকে

কানাই-কম্পাস যাইতে দেয় নাই। সে পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল—আমি ত তোমার ছেলে হলাম মা। ছেলেকে ফেঁলায়ে কুথা যাবে তুমি? তুমার ভার আমি নিলাম।

বিষণ্ণ আক্ষেপে অমিয় মনে মনে কহিল—হায় রে মানুষের দম্ভ! নিজের ভার কি তার নিজের হাতে যে পরের ভার সে নিতে যায়?

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা হইল এই যে হতভাগ্যের মৃতদেহটা পর্যন্ত উদ্ধার করা গেল না। খনির অন্ধকার গর্ভে খনিজ ধাতুস্তূপ-মধ্যেই সমাহিত হইয়া রহিল। শাস্ত্রের মতানুযায়ী শ্মশানে কুশপুত্তলী দাহের ব্যবস্থা হইল।···

অন্ধকার রাত্রি। নদীর প্রস্তরস্তূপময় তটভূমিতে শ্মশান। অমিয় কয়েকটি বাবুর সহিত প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পিছনে পিছনে সদ্যবিধবা, রুদ্ধবাক্, নবপরিণীতা বধূ—আর তার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু বিলাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল তাহার হতভাগিনী মা।

একজন বলিয়া উঠিল—একটা চিতা জ্বলছে।

সকলে দেখিল চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। তাহার মধ্যে শ্মশানের মধ্যস্থলে অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। নদীর কূলে কূলে পথ। পথপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ একটি ঘাটের ধারে একজন বলিল—এইখানেই আমাদের ব্যবস্থা করুন। যেখানে চিতা জ্বলছে ওখানে ঘাট নেই। নামতে, স্নান করতে বড় অসুবিধা হবে।

সেই ব্যবস্থাই হইল। নববধূ বিধবার বেশে সম্মুখে দাঁড়াইতেই মা আছাড় খাইয়া পড়িলেন। চিতা সাজানো হইতেছিল—কুশপুত্তলী দাহ হইবে।

অকস্মাৎ নৈশ প্রকৃতির মর্মচ্ছেদ করিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা! শব্দ-লক্ষ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকলে দেখিল ঈষদ্দূরে সেই জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে সদ্যবিধবার মূর্তি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

ছুটিয়া সকলে অগ্রসর হইয়া গেল।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে শবারোহী, খর্বাকৃতি তান্ত্রিক লাফ দিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—দূর, দূর হ।

মেয়েটি আর্তনাদ করিয়া উঠিল—কি করেছ বাবা গো—ও যে আমার···।

অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখা গেল, কম্পাসের নিথর বিবর্ণ শবদেহ পড়িয়া আছে আর তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তান্ত্রিক।

অমিয় চীৎকার করিয়া উঠিল—পাষণ্ড!

কোথায় কে? দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া শব্দ আসিল—আঃ—ছি, ছি, ছি! আঃ—আঃ!

মানুষ কয়টি নির্বাক নিস্পন্দ। সদ্যবিধবার আর্ত ধ্বনিও মূক হইয়া গিয়াছে। আবার নৈশ অন্ধকারের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া রব উঠিল—এবার আরও দূরে—আঃ—আঃ।

কে যেন কাহাকে নির্মম কশাঘাতে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে।

দীর্ঘ দশ বৎসর।

অমিয় এখন ধনী ব্যবসায়ী। বালিগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ি, মোটর কিছুরই অভাব নাই। সেদিন রাত্রে সে বালিগঞ্জ পার্কে বেড়াইতেছিল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। পার্কের মধ্যে লোক-

সংখ্যা কমিয়া গেছে। রাস্তার পাশের একটা বেঞ্চে বসিয়া কে বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। লাইট-পোস্টের পরিপূর্ণ আলোক তাহার উপর পড়িয়াছিল। অমিয় দেখিল একজন ভিক্ষুক। দীর্ঘ রুক্ষ চুল, ঘন শ্মশ্রুগুম্ফে আবৃত মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কোঠরগত ক্ষুদ্র চক্ষু, কুঞ্চিত ললাট।

অমিয় থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল যেন চেনা। অন্তরের স্মৃতি-মন্দিরে কত বিগত ছবি কালের বর্ণান্তরে ঢাকা পড়িয়া গেছে। অকস্মাৎ একখানা ছবি স্মৃতির সলিলে অবগাহন করিয়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। এ সেই তান্ত্রিক।

অমিয় বলিয়া উঠিল—ম্যানেজারবাবু!

ভিক্ষুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

অমিয় বলিল—চিনতে পারছেন না আমাকে, আমার নাম—

সে বলিয়া উঠিল—আপনি অমিয়বাবু?

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পর আবার অমিয় বলিল—আপনি আজও বেঁচে আছেন?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—আছি। বড় কষ্টেই দিন গেল। শবাসন ছেড়ে উঠে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। অহরহ বিধবা কন্যার ছবি মুখের উপর ভাসত। আমি অস্থির হয়ে চীৎকার করে ছুটে বেড়াতাম। এখনও—কখনও কখনও হয়।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় কহিল—আচ্ছা কম্পাসকে কি আপনিই—। কথা শেষ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইল।

তান্ত্রিক কহিল—হ্যাঁ, আমিই হত্যা করিয়েছিলাম—সেই বিলাসপুরিয়া কুলিটাকে দিয়ে। খাদের মধ্যে সে তাকে মেরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ডিনামাইটে ধস ছাড়িয়ে ঐ মিথ্যে সংবাদ দেয়। পরে সে শবদেহ আমাকে এনে দিয়েছিল। কম্পাসের দেহ অতি লক্ষণযুক্ত ছিল।—তার ঘরে সাপও আমি দিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার তিনি বলিলেন—রাক্ষসী ভীষণ প্রতিশোধ নিয়েছে মনে করেছে। কিন্তু না, আবার আমি দেখব।

অমিয় শিহরিয়া পা বাড়াইল। তিনি কহিলেন—কিছু পয়সা দেবেন? কদিন খাই নি কিছু।

অমিয় পকেটে হাত দিয়া কিছু অর্থ বাহির করিতেছিল।

অকস্মাৎ অতি চঞ্চলভাবে খর্বাকৃতি মানুষটি বলিয়া উঠিল—আঃ, ছি, ছি, ছি!

দুই হাত দিয়া সম্মুখের শূন্য পটভূমি হইতে কি যেন সে মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে আপনার হাতখানা সজোরে ক্ষিপ্ত পশুর মত সে কামড়াইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে দাঁতের পাশ দিয়া বীভৎস ভাবে রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িল।

সভয়ে অমিয় ডাকিল—ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু!

ক্ষত-বিক্ষত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া রক্তাক্ত মুখে একান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত ভাবে তিনি বলিলেন—ক্ষতি যন্ত্রণায় সম্বিৎ ফিরে আসে—তাই। মানুষ ত অমিয়বাবু—

রাধারানী

কোথা হইতে আসিয়া পড়িল এক কালীয়-দমন—অর্থাৎ কৃষ্ণ যাত্রার দল। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অচঞ্চল পল্লী-জীবনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবটা অনেকটা কোন কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর সম্মুখে তপস্যা-ভঙ্গের জন্য প্রেরিত দেবমায়ার মত হইয়া উঠিল।

দলটা খুব বড় নয়, জন ত্রিশ-বত্রিশ লোক—তাহার মধ্যে জনদুয়েক ভারবাহী, একজন চাকর, একজন পাচক, বাকী সাতাশ-আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহারা উত্তরমুখে চলিয়া ছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারাই জানে। পথে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম-প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। নিকটেই একটা বড় পুকুর। বেলাও তখন দু-প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। একজন রক্তচক্ষু দস্তুর প্রৌঢ় ভারবাহী দুইজনকে ও চাকরটিকে লইয়া স্থানটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উনান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভারবাহীদের ভারের বোঝা খুলিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, একখানা কড়াই, তারপর একটা টিনের মগ—একটার পর একটা, বাজীকরের ঝুলির ভিতরের ছোটখাটো নানা টুকিটাকির মত। বাকী সকলে পুকুরে মুখহাত ও হাঁটু পর্যন্ত পথের ধূলা ধুইয়া আসিয়া বটগাছের ছায়াতলে খানকয়েক পুরানো মাদুর ও চট বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে জনকয়েক গামছা বিছাইয়া বসিল। দলের মধ্যে গুটিছয়েক ছেলে, তাহারাই শুধু যেন এখনও ক্লান্ত নয়, শীর্ণ শরীর তার উপর মুখ শুকাইয়া গেছে,—তবু তাহারা স্থানটা আবিষ্কারের জন্য চঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া নতুন কিছু খুঁজিতেছিল। চোখে চোখে ইশারাও চলিতেছে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে দুটি ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়াও চলিতেছে।

রক্তচক্ষু দস্তুর প্রৌঢ় বলিল, পশুপতি শুয়ে পড়লে যে! ওঠ, একবার তামুক খাও। খেয়ে ভারী দুজনাকে নিয়ে একবার বাজারে যাও। জিনিসপত্র যা নাই তা কিনে নিয়ে এস। বলি রমণ, তোমার নাসিকা যে গর্জন করছে মাঝে মাঝে! ওঠ, উঠে আলুগুলো কুটে ফেল!

রক্তচক্ষু প্রৌঢ়ই দলের ম্যানেজার। কংস, আয়ান ঘোষ, ভীম বা যে কোন রাজার ভূমিকায় সে অভিনয় করিয়া থাকে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা উগ্রতা এবং রুক্ষতা আছে। একটা গাম্ভীর্যও আছে—দেখিয়া মনে ভয় হয়।

পশুপতি উঠি উঠি করিয়াও মধ্যে মধ্যে চোখ বুজিতেছিল, ম্যানেজার বেশ একটু গম্ভীর ভাবেই বলিল—ওঠ, ওঠ! ওই দেখ মূলগায়েনের গাড়ি এসে গেল!

সত্যই মূলগায়েনের গাড়ি আসিয়া পড়িয়াছিল, একখানা খোলা গাড়ির উপর গোটাচারেক বড় বড় কাঠের সিন্দুক জাতীয় বাক্স বোঝাই করিয়া সেই বাক্সের উপর ছাতা মাথায় দিয়া মূলগায়েন বসিয়া ছিল, তাহার সঙ্গে দু'টি সুশ্রী ছেলে। মূলগায়েনই দলের অধিকারী এবং পালাগানেও সে-ই অধিনায়কত্ব করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে-ই হয় বৃন্দা দূতী, নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সে-ই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী, কখনও সখী, কখনও রাণী—একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ অভিনয় করিয়া যায়। পালাগানের কঠিন এবং গভীর মারাত্মক গানগুলির সে-ই প্রথমে ধরতা ধরে। লোকটির

বয়স যে কত সে বলা কঠিন, তবে ছোটখাটো মানুষটি, বেশ সুশ্রী—সর্ব অবয়বের মধ্যে একটি কমনীয়তা আছে। তাহার সঙ্গের ছেলে দুইটির একটি সাজে রাধা অপরটি কৃষ্ণ।

পশুপতি আর বিলম্ব করিল না, সে ভারবাহী দুইজনকে লইয়া গ্রামের বাজারের ঠিকানায় বাহির হইয়া গেল। মূলগায়েন গাড়ি হইতে নামিয়াই প্রসন্নমুখে বলিল, সংসার যে পেতে ফেলেছেন দেখছি ঘোষাল মশায়। সাধে কি আর ব্রাহ্মণকে দেবতা বলেছে—প্রসন্ন দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই মা লক্ষ্মীকে এসে ভাণ্ডার খুলে বসতে হবে।

ম্যানেজার ঘোষাল প্রসন্ন হইতে সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে গম্ভীরভাবে আদেশ করিল, ওরে রাধু, পাত, শতরঞ্চিটা পেতে ফেল, হাত পা ধোবার জল নিয়ে আয়। আর ঠাকুর—শরবৎ তৈরী কর দেখি।

মূলগায়েন বলিল,—আপনাদের জল খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, সে পথেই নদীর ঘাটে সেরে নিয়েছে সব।

—তা বেশ! আমার সখী-সখাকেও জল খাইয়েছি পথে। বলিয়া সস্নেহে রাধা ও কৃষ্ণ—ছেলে দুটির দিকে চাহিল। তারপর একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিল,—সেও তো অনেকক্ষণ হল ঘোষাল মশায়! আমি বলি কি—সেরখানেক বাতাসা—,

ম্যানেজার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান মশায়। ওদিকে আবার সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লেগেছে। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কিছু দূরেই সেই ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে বিবদমান ছেলে দুইটা কখন নিঃশব্দে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চীৎকার করিলে ম্যানেজার বা দলের লোক জানিতে পারিবে, যুদ্ধে বাধা দিবে—তাই তাহাদের এ নিঃশব্দ যুদ্ধ।

ম্যানেজার আসিয়া দাঁড়াইতেই ছেলে দুইটা পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া অতৃপ্ত ক্রোধভরে বন্য পশুর মত শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুলিতে আরম্ভ করিল। একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া ছেলে দুইটার পিঠে সপাসপ ঘা-কতক কষিয়া দিয়া ম্যানেজার ছেলে দুইটাকে দুইটি পৃথক স্থানে বসাইয়া দিল। মূলগায়েন বলিল, হরিদাসকে বাজারে পাঠালাম ঘোষাল মশায়, নিয়ে আসুক এক সের বাতাসা। দুখানা ক'রে মুখে দিয়ে একটু জল খাবে সবে।

ম্যানেজার বলিল—দেখুন, এতে রেওয়াজ খারাপ হয়। আজ দিলেই কাল বলবে আমাদের বাতাসা দেওয়া হোক। আপনার কাছে তো কেউ যাবে না, জ্বালাবে সব আমাকে। এই দেখ—আজ বাতাসা মূলগায়েন নিজে হতে দিলেন। তা বলে—রোজকার রোজের কোন সম্পর্ক নাই এর সঙ্গে।

সেই ছেলে দুইটা ফুলিয়া ফুলিয়া তখনও কাঁদিতেছিল, ম্যানেজার অকস্মাৎ তাহার বড় বড় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কট কট শব্দ করিতে করিতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—কদলী-বন দলনের জন্য, মদ-মত্ত হস্তীকে আর বারংবার অঙ্কুশাঘাতে জাগরিত করতে হবে না। চোপ—বলছি চোপ! কাঁদবি তো ছেলেকে ওই ভাতের হাঁড়িতে সেদ্দ ক'রে খেয়ে নেব আজ! তাহার রক্তবর্ণ চোখের তারা দুইটা বনবন করিয়া চরকির মত ঘুরিতেছিল।

ছেলেগুলি এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মূলগায়েনও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—বেশ ভাল ক'রে একটা পান দাও তো সখি!

ম্যানেজার বলিল—রাধে, আমার জন্যেও একটা। রাধার ভূমিকার ফুটফুটে ছেলেটি, মূলগায়েনের পানের বাটা লইয়া কিশোরী মেয়ের মতই পান সাজিতে বসিল।

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া ছেলেগুলাও শান্তভাবে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মূলগায়েন

স্নান করিয়া তিলক কাটিয়া নির্জনে জপ করিতে বসিল।

ম্যানেজারের বিশ্রাম নাই, সে ঠায় রান্নার কাছে বসিয়া আছে। ওহে—জল দাও হে, জল। ভাত পুড়ে যাবে, অ-ঠাকুর! বলিতে বলিতে সে নিজেই এক ঘটি জল ভাতের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল। জল দিয়া উনানের কাঠগুলি টানিয়া বাহির করিয়া আগুন কমাইয়া দিল, তারপর সে নিজেও তেল লইয়া মাখিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরই তাহার হাঁকে-ডাকে নিদ্রাতুর দলটি সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল।—চান ক'রে নে সব। এই এই—ওহে শশী—ও শ্যাম—ওঠ হে—ওঠ সব। তখন তাহার নিজের স্নান হইয়া গেছে, লম্বা চৈতনের গোছাটা দুই হাতে টানিয়া গ্রন্থি দিতে দিতে সকলকে ম্যানেজার ডাক দিতেছিল।

একজন প্রৌঢ় আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া গান ধরিয়া দিল—'ঘুমিয়েছিলাম বাবুর বাগানে'। লোকটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট, কিন্তু কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা অপেক্ষাও তাহার ভঙ্গিটি আরো চমৎকার। স্বরের কৌশলে এবং ভঙ্গিতে খুব দূর হইতে ডাক শুনিয়া সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিতটা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একজন তেল বিতরণ করিতে বসিল—প্রত্যেকের বরাদ্দ একপলা। তাহার পর স্নান। স্নানান্তে সকলেই একখানা করিয়া আয়না ও চিরুনি বাহির করিয়া বসিল। প্রসাধন-পর্বটাই দীর্ঘ। নানা ছাঁদে টেরিকাটা শেষ করিয়া সব পাতা লইয়া বসিয়া গেল। সেই গায়ক প্রৌঢ়টি বাঁ হাতে খানিকটা মাটি খাল করিয়া তাহার উপর পাতা পাড়িল। পাতাঢাকা খালটিতে তরল ডাল অধিক পরিমাণে ধরিবে।

আহারের পরই একজন গ্রামে গিয়াছিল। ইহারই মধ্যে কে যেন কখন সন্ধান লইয়াছিল কে জানে, কিন্তু সঠিক সন্ধানই তাহারা পাইয়াছিল। লোকটি রায়েদের বাড়ির ভুলু রায়ের কাছে আসিয়া উঠিল। ভুলু রায়ের বয়স বৎসর চব্বিশেক, বেকার জমিদার-তনয়, আয় বাৎসরিক শতখানেক টাকা। কিন্তু তবুও সে এরণ্ডহীন দেশের মহাপাদপ, কায়া এতটুকু হইলেও ছায়ার ভণিতাটা তাহার বিপুল, লোকে না মানিলেও সে মাতব্বর সাজিয়া বসিয়া আছে।

ভুলু প্রথমটা একেবারেই গা-ছাড়া দিয়া বলিল—ক্ষেপেচ! লোকের ঘরে চাল অভাবে হাঁড়ি চলে না। লোকে যাত্রা শুনতে পয়সা দেবে!

লোকটি বলিল—বেশ তো একবার দেখুন—যদি না-ই হয় তো আর কি করা যাবে!

—তা—দেখ, তোমরা নিজেই চেষ্টা করে দেখ। এই লক্ষপতি বাঁড়ুজ্জেরা রয়েছেন, ওই গাঁয়ের শেষে রায়বাবু রয়েছেন। তারপর—ও পাড়ার তো সবাই বাবু, লম্বা কোঁচা—দেখ চেষ্টা ক'রে!

—দেখুন দেখি, রায়বাড়ির নাম হল বনেদী-বাড়ি! সে বাড়িতে না হ'লে আমরা চলেই যাব। আপনি চেষ্টা করলে কি না হয় বাবু! তবে আপনি না হলে হবে না।

ভুলু প্রসন্ন হইয়া বলিল—কি নেবে আগে শুনি, দক্ষিণে কত?

—সে যা হয় দেবেন, আপনাদের কাছে কি আমাদের কিছু বলা সাজে?

ভুলু হিসাব করিয়া দেখিল, গোটা পনের টাকা বেশ উঠিবে, দুই এক টাকা বেশী ওঠাই সম্ভব। সেটাকে সে পকেট-খরচ খাতে রাখিয়া দিয়া হিসাব করিল, আসরের খরচ—আলো, পান-তামাক ইত্যাদিতে গোটা তিনেক টাকা লাগিবে, সুতরাং বারো টাকা দিতে পারা যায়।

আরও দুই টাকা এদিক ওদিক বাদ দিয়া সে বলিল—এই দেখ, দশটি টাকা আর

খোরাকী এক মণ চাল—এই পাবে। পারো যদি তবে দলবল নিয়ে চলে এসো ; এই ন'টা নাগাদ গান জুড়তে হবে।

লোকটি হতাশ হইয়া বলিল—বাবু আমাদের দলের মাইনেটা দেন। বত্রিশ জন লোক—অন্তত ষোলটা টাকা দেন !

ভুলু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর একটি টাকা মেরে কেটে ! তোমাদের আবার কালীয়-দমনের দল, ও আর কেউ শুনতেই চায় না। শখের দল হ'লে বরং লোকে দিত চাঁদা খুশী হয়ে।

লোকটি বলিল—তাই ত ! একটু ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা এই দশ মিনিট পরেই আমি এসে খবর দিয়ে যাচ্ছি।

ভুলু রায় করিত-কর্মা লোক—এবং বিজ্ঞতাও তাহার এই বয়সে যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সে মনে করে। ওই এগার টাকাই দলটির পক্ষে 'পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা' একথা সে বেশ জানে। সে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই সে আসিয়া উঠিল 'উরু' দাদার বাড়ি। 'উড়োনচণ্ডী' হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'উরু'তে পরিণত লোকটির পরিচয় নামেই বিদ্যমান, সে থিয়েটারে পার্ট করে, স্থাবর অস্থাবর বেচিয়া কলিকাতায় যায়, বেশ গোলগাল চেহারা, মাথায় একটি টাক—সে বলে ও আমার টাকার টাক নয়, ফাঁকার টাক—সুখটাক নয়, দুখটাক।

—কি করছ উরুদা ?

—এই বসে বসে তামাক খাচ্ছি—আর তক্তা বাজাচ্ছি। বললাম তোদিগে যে, একখানা বই ধরে রিহারশাল বসিয়ে দে—তা—হুঁ ! পচে মরগে তোরা !

—সে হবে। এখন একটা যাত্রার দল এসেছে, কি করি বল দেখি !

—যাত্রা ? তা দে লাগিয়ে দে !

—কিন্তু ষোল টাকার কম যে কিছুতে ঘাড় পাতলে না। কাঁদাকাটা করছে। বলছে—দলের মাইনেটা পুষিয়ে দেন।

—বেশ, আমি এক টাকা দোব। তুমি আর সব দেখ।

—তা হলে আসরের ভারটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে।

—তা সব ঠিক করে দোব। দাঁড়া আলো এখুনি দেখে আসি—কুমারীশ ময়রার আলোটা ঠিক করতে বলে আসি। ওর ডে-লাইটটা খুব ভাল। উরুদা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া রওনা হইল। ভুলুও বাহির হইয়া যাইতেছিল—উরুর স্ত্রী তাহাকে ডাকিল—শোন—শোন, ও ঠাকুরপো ! ভুলু ফিরিল, উরুর স্ত্রী বলিল—এই দেখ আমি ভাই আলাদা দোব চার আনা, করাও যাত্রা। মেয়ে মহলে সবাই দেবে।

অতঃপর ভুলু গিয়া উঠিল শূলপাণির বাড়ি। বাড়িতে ঢুকিয়াই সে বুঝিল তাহার আসা ভুল হইয়াছে। বাড়িতে তখন তুমুল কলহ। বড় বৌয়ের পাঁচ বৎসরের কন্যা সেজ বৌয়ের কোলের মেয়ের দুধ তোলা দেখিয়া ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিয়াছে—সেই হেতু লইয়া কলহ। ভুলু ফিরিতেছিল, শূলপাণির ছোট ভাই নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল—সে ভুলুকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—ফিরলে যে !

—এসেছিলাম—তা—, একটু নীরব থাকিয়া সে বলিয়াই ফেলিল—একদল যাত্রা এসেছে। তাই, চাঁদা ক'রে—যদি হয় একরাত্রি তাই—তা—

—তা বেশ তো, হোক না একরাত্রি—চাঁদা দোব আমরা। বেশ !

বড় বৌ মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—'ঘরে ভাত নাই— বাইরে রোশনাই'— সেই বিত্তান্ত। লোকের তো সিন্দুকে টাকা ধরছে না তাই চাঁদা করে যাত্রা করবে!

মেজ বৌ বলিল—আমি ভাই আট আনা দিব।

সেজ বৌ বলিল—একটা টাকাই দাও দিদি। আমি তো আট আনা পাব। সেজবৌ আজ মেজবৌয়ের প্রতি প্রসন্ন ছিল—সে বলিল—তা হ'লে আমিই এক টাকা দিই। তুমি আমাকে এক টাকাই দিয়ো। বড়বৌ ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ভুলু, এই নাও ভাই। সবাই যখন দেবে—তখন আমরাই বা না দিলে হবে কেন? আমার ভাই এক টাকার দলে নাম নিকো খাতায়! আর ভাই সকালে আরম্ভ করিয়ো। হ্যাঁ।

ছোট ভাই বলিল—তবে আমারটাও নিয়ে যা।

ভুলু বলিল—একখানা শতরঞ্চি দিতে হবে কিন্তু আসরের জন্যে।

—বেশ, লোক পাঠিয়ে দিস।

কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলের দল বস্তা ঘাড়ে চাল আদায় করিতে আসিয়া বলিল—চাল দাও গো যাত্রার।

একদল মেয়ে আসিয়া বলিল—বড়বৌ, চল যেতে হবে তোমাকে।

আশ্চর্য হইয়া বড়বৌ বলিল—কোথায়?

—পদ্মকাকী চাঁদা দেয় নি। কেন দেবে না? চল যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বড়বৌ উঠিল, বলিয়া গেল,—মেজবৌ দেখিস তো ভাই। আমার ভাতটা না পুড়ে যায়! চল্!

লোকটি নিবেদন করিল,—এগার টাকা আর একমণ চাল, এর ওপর আর কিছুতেই উঠল না।

ম্যানেজার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—দলের মাইনেই তো বারো টাকা! এক টাকা কি আমরা গাঁট থেকে দেব নাকি?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার মধ্যে একখানি পূরবী রাগিণী ধরিবার জন্য বেহালাদার বাক্স হইতে বেহালাখানি বাহির করিয়া সুর বাঁধিতেছিল, সে বলিল—বসে থাকলে তো কেউ কিছু পাবে না। ব'সে থাকি, না ব্যাগার খাটি, কিছু কমই না হয় নেবে সবাই। সিকি বাদ বার আনা ক'রে দেন, বার সিকি তিন টাকা বাদ দিয়ে ন' টাকা মাইনে—দুটো টাকা থাকবে। ম্যানেজার বলিল—তা হলে তুমিই দেখ ওস্তাদ;—বলে কয়ে দেখ সব। আমি মূলগায়েনকে বলে দেখি। ঘুমালো নাকি মূলগায়েন?

মূলগায়েন ঘুমায় নাই—নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া ছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, এই গ্রামে বৎসর বৎসর যাত্রা করিতে আসিত। তাহার গুরু—অধিকারীর দলে সে তখন সাজিত রাধা। মনে পড়িয়া গিয়াছে।

ম্যানেজার আসিয়া ডাকিল—ঘুমালেন নাকি গো!

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া মূলগায়েন উত্তর দিল—বলুন।

—এরা যে এগার টাকার বেশী দিতে চায় না গো!

—তা হলে?

—সেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ওস্তাদ বলছে যে বসে থাকার চেয়ে দলের লোকে মাইনেও কিছু কম নিক—আপনারও কিছু কম থাক। হয়ে যাক ওতেই।

—বেশ। তাই হোক।

ম্যানেজার চলিয়া গেল। মূলগায়েন আবার চোখ মুদিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার মনোলোকে জাগিয়া উঠিল স্মৃতির ছবি।—

ছোট দশ বৎসরের কমনীয়কান্তি একটি ছেলে—দর্পণে দেখা সে রূপ এখনও তাহার মনে আছে। কেমন করিয়া কোথা হইতে সে যে যাত্রার দলে আসিয়া জুটিয়াছিল, সে জানিতেন পূর্ব অধিকারী। অধিকারীর ঘরেই স্নেহ-মমতার মধ্যে সে বাস করিত। সন্ধ্যায় গান শিখিত—অধিকারী পাখির মত তাহাকে শিখাইতেন, বৃন্দা প্রশ্ন করিত—বলি—হ্যাঁগো শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী, ব্রজের রানী তুমি, তোমার চোখে জল কেন গো ?

সে সুর করিয়া ঝোঁক দিয়া উত্তর দিত—বৃন্দে গো! পিরীতির রীতি এমন কেন বলতে পার সখি—

—কেমন সে রীতি বল দেখি ? আমি তো জানি না, বল তো শুনি ?

—পিরীতি এত দুঃখময় কেন সখি ?

—দুঃখময় ? না-না-না, তা কি হয়! পিরীতি তো সুখের সাগর গো!

—না, না সখি—পিরীতি বড় দুঃখময়! বলিয়া সে গান ধরিত—পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া নাহিতে নামিনু তায়।

যাত্রার আসরে মুখে অলকা-তিলকা আঁকিয়া বিচিত্র বেশ পরিয়া সে এমনি কথাগুলি বলিয়া যাইত। দেশ-দেশান্তরের কত বিচিত্র আসর—সামিয়ানা—নাটমন্দির—কত আলো—কত জন-সমাবেশ! এই গ্রামে বাঁড়ুয্যে বাবুদের প্রকাণ্ড নতুন নাটমন্দিরের সে শোভা—অপরূপ শোভা! তখন তাহার বয়স বারো।

সাজঘরের দুয়ারে গ্রামের ছেলেদের কত উঁকি-ঝুঁকি, তাহার সহিত আলাপ করিতে তাহাদের কত ব্যগ্রতা। মধ্যে মধ্যে ওই ঘোষালের মত রক্তচক্ষু উগ্রদর্শন হরিশ ঘোষ তাহাদের তাড়া করিত—এই ধর তো ছেলের পালকে! খাব! খাব! ছেলেরা ছুটিয়া পালাইত! আসরে বসিয়া তাহারা পান ছুঁড়িত, সে সেদিকে তাকাইলে দেখিত দাতাও কৃতার্থ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

যাত্রা ভাঙিয়া গেলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে ঘুমাইয়া ঘুম শেষ হয় নাই—সকালে বসিয়া সে সাজঘরের বারান্দায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিল। কানের মধ্যে তখনও যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। বৃন্দা যেন ডাকিল—শ্রীমতী! রাধে! তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। স্বপ্ন নয়। একটি আট-নয় বছরের মেয়ে তাহাকে ডাকিতেছে—শ্রীমতী—রাধে!

—ধেৎ ছেলে! ইয়ার্কী করতে এসেছ ?

মেয়েটি ছুটিয়া কিছুদূর পলাইয়া গিয়া দাঁড়াইল।—তোমাকে ডাকছে।

—ভাগ! সে আবার চোখ বুজিল।

—শ্রীমতী! তোমাকে আমার মা ডাকছে গো।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সে আবার আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মেয়েটি মিনতি করিয়া বলিল—আমার মা সন্দেশ তৈরী করেছে, তোমাকে ডাকছে, এস।

সন্দেশ! লুব্ধ ছেলেটি এবার না উঠিয়া পারিল না। দলের লোক জনকতক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনে গিয়াছে, কতক তখনও অসাড় হইয়া নিদ্রামগ্ন, সে উঠিয়া মেয়েটির সঙ্গে চলিল। আঁকাবাঁকা পল্লীপথ—দুই চারিটি লোক, কেহ যায় কেহ আসে।—

—ওই দেখ রে, ওই কাল রাধিকে সেজেছিল! নয় হে ছোকরা!

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ওই ও যে আমাদের বাড়ি চললো!

—তোমাদের কেউ হয় বুঝি?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বিপন্ন হইয়াও প্রতিবাদের সময় পাইল না। মেয়েটি এবার গতি দ্রুততর করিল—ত্বরিত গতিতে আরও কয়টা ছোট গলি ঘুরিয়া ঘন বৃক্ষপল্লবে বেষ্টিত ছোট একটি আঙিনায় আসিয়া উঠিল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের সুশ্রী মেয়ে—উজ্জ্বল হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—এস, এস—গোপাল এস। তোমার জন্যে আমি বসে আছি। মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর। গোপাল কেন হবে?—ও যে শ্রীমতী, রাধে।

মা তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল—পাজী মেয়ে কোথাকার—দেখবি?

মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইল। মা ছেলেটিকে সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিল—মুখ হাত ধোয়া হয়নি তো তোমার, গোপাল? বলিয়া নিজেই একটু তামাকের গুল-গুঁড়া, একটি তালপাতা, একঘটি জল নামাইয়া দিল। তারপর প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ গোপাল, আমরা বোষ্টম, আমাদের ঘরে একটু জল খাবে তো?

ছেলেটি বলিল—আমিও বোষ্টম।

—বোষ্টম! মেয়েটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাই তো বলি—বোষ্টম না হলে কি এমন সুন্দর রাধা হয়! একেবারে সাক্ষাৎ রাধা। তা হ'লে একটু জল খাও—কেমন?

ঘরের তৈরী ক্ষীরের নাড়ু, বড় চমৎকার। কিন্তু আর চাহিতে তাহার লজ্জা হইল। সে তাড়াতাড়ি জল খাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, একটি গান শোনাবে?

—কি গাইব বলুন!

—ওই যে শ্যাম শুকপাখী—!

গুন্ গুন্ করিয়া ক্রমশ কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া সে গাহিল—শ্যামশুকপাখী সুন্দর নিরখি ধরিলাম নয়ন-ফাঁদে!

একটা নয়, আরও একটা গান শুনাইয়া সে পান চিবাইতে চিবাইতে বাসায় ফিরিল।

সেই কয়জন অল্পবয়সী বাবু। তাহাদেরও আজ মনে পড়িতেছে। তাহারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এই ছোকরা, শোন তো!

—কি নাম তোমার—

—আজ্ঞে? সে কেমন ভীত হইয়া পড়িল।

—তোমার নামটি কি?

—আমার নাম? আমার নাম গৌরদাস দাস।

—কোথায় বাড়ি তোমার?

—আজ্ঞে, আমার মা বাপ কেউ নেই, আমি অধিকারী মশায়ের বাড়িতে থাকি।

—মাইনে-টাইনে দেয়? না, পেট-ভাতাতেই থাক?

সে চুপ করিয়া রহিল। একজন আবার বলিল—দেখ, আমাদের থিয়েটারের দল হয়েছে। আমাদের দলে যদি এস, তবে আমরা মাইনে দেব, মা বাপ নাই বলছ—বাড়িঘর করে দেব, বুঝেছ!

—আজ্ঞে না। শখের যাত্রা বা থিয়েটার তাহার ভাল লাগে না। সেখানে রাধাকে নাচিতে

হয়। এমন করিয়া বৃন্দা সেখানে রাধাকে ভক্তি করে না।

—কেন? এবার সে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর তাহাকে উত্ত্যক্ত করিল না—হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। বাসায় আসিয়া দেখিল—সেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে।

—শ্রীমতী!

এবার সে হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি বলিল—মা ডাকছে।

সেই বৎসর হইতে বাঁড়ুজ্জে বাড়ির রাস-যাত্রায় তাহাদের দলের বায়না বাঁধা হইয়া গেল। বৎসরে বৎসরে সে দলের সঙ্গে আসিত। বিনা আহ্বানেই সে এখন সেই আখড়াতে গিয়া ডাকিত—মা!

—কে, গোপাল—গৌরদাস! এস বাবা এস। এই তোমার জন্যেই খাবার করছি। গোপাল ক্ষীরের লাড়ু বড় ভালবাসে—না বাবা?

সে উত্তর দিবার পূর্বেই কলকণ্ঠে মেয়ে বলিয়া উঠিল—নাড়ুগোপাল! একবার হামাগুড়ি দিয়ে বস তো নাড়ুগোপাল!

—তোকে এইবার এক চড় মারব রাধু! মেয়েটির নাম রাধারানী।

নয় হইতে দশ—দশ হইতে এগার, এগার হইতে বারো বছরের মেয়েটি এখন অনেক শিখিয়াছে। সে গৌরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

গৌর বলিল,—দেখুন—রাগ দেখুন!

রাধু তাহার অভিনয়-ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিল—না—না—সখি—সে মুখ আর আমি দেখব না গো। কালো রূপ আর হেরব না। যমুনার জল কালো—যমুনায় আর যাব না গো। মাথার কেশ কালো—সে কেশ আর রাখব না সখি! নীলাম্বরীর বর্ণ কালো, নীলাম্বরী আর পরব না গো! দাও দাও—আমাকে গৈরিক বাস এনে দাও সখি, আমায় যোগিনী সাজায়ে দাও।

মা তাহার হাসিয়া বলিল—মরণ তোমার! গৌরদাস অমনি করে বলে নাকি? আর গায় কত সুন্দর—পারিস তুই?

—ছাই। ও আমি খুব পারি।

—বেরো বেরো বলছি। পালা!

মেয়ে সত্য সত্যই পলাইয়া গেল।

মা বলিল—হ্যাঁ বাবা গোপাল, এইবার তো বড়টি হ'লে—এইবার একটা ঘরদোর কর। রাধুর বাবা বলছিল—গৌর যদি বড় দলে যায়—অনেক মাইনে হয়। তোমার ভাবনা কি বাবা!

গৌর বলিল—অধিকারী আমাকে ঘরদোর করে দেবেন, জমি কিনে দেবেন—বলেছেন।

—হ্যাঁ বাবা, আমার রাধুকে বিয়ে করবে? আমার সাধ।

গৌর সলজ্জ মুখে নত দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিল। রাধারানীর রঙ করসা না হউক—এমন দেহভঙ্গি বড় দেখা যায় না। একটু দীর্ঘ তন্বী, পিঠে একপিঠ চুল—চোখের তারা দুইটি অহরহ চঞ্চল—কথা কহিবার সময় যেন নাচে!

গৌরের সলজ্জ নীরবতা দেখিয়া রাধারানীর মা পুলকিত হইয়া উঠিল—মৃদু হাসিয়া সে বলিল—রাধুর বাপের সঙ্গে সেই কথাই হয় আমাদের। তারও ভারি ইচ্ছে। বলে কি জান, গৌর আমাদের রাধারানী সাজে, রাধুও আমাদের রাধারানী—কেমন মিল হবে বল দেখি।…তা হ'লে আজ ওকে পাঠিয়ে দেব অধিকারী মশায়ের কাছে। অধিকারী মশাই

তো তোমার মা বাপ সব !

গৌর চুপ করিয়া রহিল, খাইতে বসিয়া সলজ্জ কুণ্ঠায় পূর্বের মত এবার আর চাহিয়া খাইতে পারিল না। রাধারানীর মা অযাচিত ভাবেই আরও কয়েকটা নাড়ু পাতে দিয়া বলিল—জামাই না হতেই লজ্জা আমার গোপালের !

আসিবার পথে নির্জন গলির মধ্যে রাধারানীর সঙ্গে দেখা হইল, রাধু তাহাকে দেখিয়া এক-পাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌর বলিল—মান বুঝি ? রাগ হয়েছে ?

রাধু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জারক্ত মুখে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল,—যাঃ !

তারপর দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি বুঝি শুনি নাই !

গৌরদাসের সমস্ত অন্তরটা আবেশময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল—কখন রাধারানীর বাপ আসিবে। কোন কিছু তার ভাল লাগিল না। গ্রামের ছেলেগুলি এখন বন্ধু হইয়া গিয়াছে, তাহারা পান আনে—সিগারেট দেয়। তাহারা আসিয়া আজ ফিরিয়া গেল। রাধুর বাপ আসিল সন্ধ্যার দিকে। অধিকারীকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভুর কাছে একবার এসেছিলাম আমি।

একখানা ছোট ঘরে অধিকারী, ম্যানেজার—দলের রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া থাকেন। স্বতন্ত্র তাঁর শয্যা ও আসন, ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। তিনি বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন,—কি বলুন !

গৌরদাস ঘরের পিছনের দিকে জানালায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার ছোট একটা ছিদ্র দিয়া সবই দেখা যাইতেছিল।

হাতজোড় করিয়া সহাস্যে রাধুর বাপ আপনার নিবেদন সবিনয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিল—এখন আপনার আদেশ না পেলে ত হয় না, আপনিই ত গৌরের সব—রক্ষক বলুন রক্ষক, বাপ বলুন বাপ—সবই আপনি।

অধিকারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—প্রস্তাব কিছু অন্যায় প্রস্তাব নয়। তবে গৌর এখন ছেলেমানুষ, বালক বললেই হয়। ছেলেটি ধরুন গান করেই খায়, কণ্ঠস্বর আর সঙ্গীত-বিদ্যা হল—সাধনার বস্তু। সংযম নইলে সাধনা হয় না—।

রাধুর বাপ বলিল, আমার কন্যাটিও খুব বড় নয়, এই আপনার বছর বারো হবে। আপনি অনুমতি করলে—এক আধ বছর পরেই না হয়—!

তাহার কথার মধ্যপথেই অধিকারী বলিলেন, ম্যানেজার বাবু একবার বাইরে যদি যান দয়া করে—তা হ'লে···দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যাবেন। হঁ্যা !

তারপর বলিলেন, দেখুন, আপনি হলেন বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ, তার উপর ভগবানের লীলাগান করাই হল আমার ব্যবসা। আমি তো আপনাকে প্রতারণা করতে পারবো না। একটা কথা—

কিন্তু কথাটা না বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন, নীরবেই মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাধুর বাপও নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে-ই উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবতা ভঙ্গ করিল,—প্রভু !

অধিকারী বলিলেন—বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে বাবাজী ; এতদিন এ কথা গোপন করেই রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আপনি যে প্রস্তাব করছেন—তাতে আপনার কাছে গোপন

রাখা চলে না। দেখুন,—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অধিকারী বলিলেন—ছেলেটি জাতিতে বৈষ্ণব নয়!

—বৈষ্ণব নয়! তবে? রাধুর বাপ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

—সকলে অবশ্য বৈষ্ণব বলেই জানে, ছেলেটিও তাই জানে। আমি বরাবর ওই পরিচয়ই দিয়ে এসেছি। অনেক দিন পূর্বে, ছেলেটির বয়স তখন ছয় কি সাত, সেই সময় বর্ধমানের পথ থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিলাম ওর চেহারা দেখে আর গান শুনে। সেই বয়সেই গান গেয়ে ছেলেটি ভিক্ষা করে বেড়াত, আমার দলের জন্যে ওকে এনেছিলাম। দোকানদার বলেছিল, ছেলেটির মা নাকি—। অধিকারী নীরব হইলেন।

বাবাজী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিল—মা নাকি—?

—মানে—কি বলব? এই নাচগান করত—মানে বারাঙ্গনা ছিল।

—বেশ্যা?

—হ্যাঁ, তাই।

পিছনের জানলার ধারে দাঁড়াইয়া গৌর কেমন অবসন্ন বিবশ হইয়া গেল—সে যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।

বাবাজীও স্তব্ধ হইয়া স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। অধিকারী আবার বলিলেন—ছেলেটিকে এনেছিলাম প্রথমে স্বার্থের জন্যেই। কিন্তু এখন বড়ই মায়া হয়ে গেছে। নিজের কাছেই রেখেছি, রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই, সেই জন্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল ক'রে একটু অধিকার হ'লেই—আমি ওকে বৈষ্ণব ক'রে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতি-কুলের বিচার বড় নয়—সে বাধাও নাই, তারপর দেখুন আপনি—

নিতান্ত অবসন্নের মত বার-কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাধুর বাপ জানাইয়া দিল—না—না—সে হয় না। আমরা জাত-বৈষ্ণব। ভেকধারী নই।

তারপর অধিকারীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে বলিল—আপনি মহৎ লোক—আপনি আমাকে জাতিপাত থেকে রক্ষা করলেন, চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল।

গৌরের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অর্থহীন; মাথার ভিতর যেন অসীম শূন্যতা নিঃশব্দ প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। বুকের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাসের মত একটা যন্ত্রণাদায়ক আবেশ নির্দয় ভাবে তাহাকে পীড়িত করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—বার বার মুছিয়া মুছিয়াও সে জল শেষ করিতে পারিল না। তাহার মা—! সে—! এবার সে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ দ্রুতপদে সকলকে এড়াইয়া—নির্জন পথ ধরিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল। সে কান্না তাহার আর ফুরায় না। তাহার মা—! সে—! ছি—ছি—ছি! রাধু—রাধারানীর কাছে সে অস্পৃশ্য!

সহসা একসময় অন্ধকার অনুভব করিয়া সে দাঁড়াইল। নির্জন প্রান্তর—পিছনে অনেক দূরে উজ্জ্বল আলোগুলির ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত প্রভা অন্ধকার শূন্যলোকে জমাট সাদা কুয়াশার মত ভাসিতেছে। আশপাশে সম্মুখে গ্রামের চিহ্নই অনুভব করা যায় না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের অন্ধকার-পথেই আগাইয়া চলিল। না—ছি-ছি!

কিন্তু রাধু? রাধুও হয়তো কাঁদিতেছে। সে আবার কাঁদিল।

তারপর? কত পথ, কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া কত বিভিন্ন যাত্রার দলে দলে ফিরিয়া সে নিজে দল গড়িল, নামটা পর্যন্ত সে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান

তাহার বড় ভাল লাগে। শখের যাত্রার দল তাহার ভাল লাগে নাই—সেখানে রাধা গান গাহিয়া নাচে! ছিঃ! রাধা অভিমানিনী, মর্যাদাময়ী, রাজনন্দিনী—ব্রজসুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া সে কি নটীর মত নাচিবে! কত বড় প্রেম—কত বড় সে বিরহ—কত দুর্বার সে অভিমান। ওরে আলোর সঙ্গে কি রঙের ভেজাল দেওয়া যায়! রাধা—রাধারানী—রাধু—রাধু।

একখানি কিশোরীর মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সে বলিতেছে—না না সখি। সে মুখ আর দেখব না গো! নীলাম্বরী আর পরব না সখি! দাও দাও আমায় গৈরিকবাস এনে দাও—যোগিনী সাজিয়ে দাও!

তাহার কৌতুকময় কণ্ঠ আজ যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে দলের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাজপোশাক লইয়া দল গ্রামের মধ্যে চলিয়াছে। বেহালাদার শশী বলিল,—মূলগায়েনের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ভাব না-কি ?

কথাটা চুপি চুপি সে ম্যানেজার ঘোষালকে বলিল।

ম্যানেজার বলিল—বোধ হয় শুয়ে শুয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। নাও-নাও—সব গুছিয়ে-গাছিয়ে চল, গাঁয়ের ভেতর। এই দেখ—ভদ্দরলোকের গ্রাম—চ্যাংড়ামি যেন কেউ না করে! বুঝলে!

তারপর সে অধিকারীর কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরে ডাকিল—মূলগায়েন! ওঃ, আপনার ইষ্ট-স্মরণ হয়ে গেল দেখছি। তা শুয়েই—কি রকম হল ?

চোখ মুছিয়া মূলগায়েন বলিল—শরীরটা ক্লান্ত ছিল—আর স্মরণে আপনি উদয় হ'লে—মানে, মনে পড়লে—কি মনে না করে থাকা যায় ?

—তা হ'লে চলুন গ্রামের মধ্যে। এরা সব চলে গেল।

ভুলু রায় ও উরুদাদা আরসটা বেশ ভাল করিয়াই সাজাইয়াছিল। চারিদিকে চারিটা ডেলাইটে আসরটা আলোয় আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে। সম্মুখে বসিয়া ছেলের দল, তাহার পিছনে একদিকে ভদ্রলোক—অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষেরা বসিয়াছে। পিছনে মেয়েদের আসর।

পালাটা হইতেছিল—দীর্ঘ বিরহের পর রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন—প্রভাসযজ্ঞ। বিরহিনী রাধা দ্বারকার পথের সন্ধান করিতেছেন—কোন্ পথে গেলে দ্বারকায় শীঘ্র যাওয়া যায়।

এই সময়—এতক্ষণে মূলগায়েন আসরে প্রবেশ করিল। মাথায় পাটীপাড়া ধরনের পরচুলা, তাহাতে সিঁথি। সিঁথির দুইটি শাখা চুলের রেখায় বেড়িয়া কবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। কানে পাশা, নাকে নথ, গলায় চিক ও সাতনর, হাতে কঙ্কণ, বাহুতে তাবিজ ও বাজুবন্ধ, পরনে বিচিত্র বেশ, কপালে তিলক-বিন্দুর সারি, নাকে রসকলি আঁকিয়া—দূতীরূপে সাজিয়া সে আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। দলের চাকরটি পিছনে পিছনে আসিয়া পানের বাটা, পরিপাটী ভাঁজকরা একখানি গামছা রাখিয়া দলস্থ একজনকে জিম্মা দিয়া গেল। পরম ভক্তিভরে মূলগায়েন প্রণাম করিয়া বসিয়া আসরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। আলোকিত আসরে সারি সারি মুগ্ধ শ্রোতার মুখ। কিন্তু রাধারানী কোথায় ? চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কই ?

—উঠুন গো আপনি, গান জমেছে ভাল। আপনি উঠলে আসর আগুন হয়ে যাবে। পিছন হইতে ম্যানেজার ঘোষাল মৃদুস্বরে ইঙ্গিত দিল। সে উঠিয়া দীর্ঘ সুর ছাড়িয়া ধরিল

একখানি ধ্রুপদাঙ্গের গান। শিক্ষিত সুমিষ্ট কণ্ঠের রাগিণীর আলাপে আসর যেন ভরিয়া উঠিল।

পরদিন বিদায় লইয়া সে বাসায় ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল—দলের যে ছেলেটি রাধা সাজে—সেই ছেলেটি।

বিদায়ের কর্তা হইয়া বসিয়াছিল—সেই উরুদাদা। ভুলু ছিল তাহার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ডানদিকে বসিয়া। উরুদাদা বলিল, নাঃ অধিকারী মশায়, মনে করেছিলাম কেষ্টযাত্রা ভাল লাগবে না, তা বেশ লাগল, চমৎকার। যেমন আপনার গলা—তেমনি শিক্ষা। সুন্দর! আর রাধা,—যে ছেলেটি—এই যে, এইটিই তো। বাঃ খাসা। ওর জন্যে আমরা এই আলাদা আট আনা দিলাম।

মূলগায়েন সবিনয়ে বলিল,—আপনারা মহৎ ব্যক্তি। গুণীর গুণ আপনাদের চোখে তো এড়াবে না। নাও রাধে। বাবুদের প্রণাম কর।

বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সহসা সে চমকিয়া উঠিল—এ কি—এ কোন্ পথে সে আসিয়াছে? এ তো সেই আখড়ার পথ! হ্যাঁ। এই তো! কিন্তু আখড়াটা কই? বোধ হয় এইটাই। উঃ—গাছগুলি কত বাড়িয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জবন যে বন হইয়া উঠিয়াছে।

—দাঁড়ালেন যে? ছেলেটি তাহার অনুসন্ধানরত বিচিত্র দৃষ্টি দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া মূলগায়েন বলিল—জল খাবে?

—না, আমার তো তেষ্টা পায় নি।

তবুও একবার উঁকি মারিয়া সে দেখিল, বনান্তরালে ঘরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত, কেহ কোথাও নাই। বনের ছায়ার নিবিড় অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখাও যায় না। বনের ঝরা-পাতা পচিয়া একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল, রাধু নাই।

দুর্দমনীয় একটা দুঃখের আবেগে বুকটা তাহার ভরিয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে সেই চেনা গলির পথটা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। কিন্তু চলিতে চলিতে তাহাকে বিব্রত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। নাঃ, এ সঙ্কীর্ণ পথে আসা ভাল হয় নাই। ওদিক হইতে একটা স্থূলাঙ্গী বিরলকেশী স্ত্রীলোক আসিতেছিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মধ্যপথেই এক পাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখে রাজ্যের বিরক্তি, মূলগায়েন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সন্তর্পণে সসঙ্কোচে স্থানটা পার হইতে হইতে গৌরদাসের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানেই একদিন লজ্জিতা রাধু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আশ্চর্যের কথা—আজও যে স্থূলাঙ্গী যেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেও রাধু। গাছের শিকড়ে শিকড়ে ঘর শীর্ণ হওয়ায় তাহারা স্থানান্তরে আখড়া বাঁধিয়াছে। সে এখন ঘরণী গৃহিণী, সন্তানের জননী। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা দেখিয়া তাহার শরীরটা অবসন্ন হইয়া আছে—এবং মনটাও তাহার ভাল নাই। দলের রাধাটিকে দেখিয়া বহুদিন পূর্বের এমনই এক কিশোরকে তাহার মনে পড়িতেছিল। সেও রাধা, কতবার মনে হইয়াছে—এ-ই যেন সে-ই! তাহাকে মনে করিয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিষণ্ণতা বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিরক্ত ভাবেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গৌরদাস পরম সম্ভ্রমভরে রাধুকে অতিক্রম করিয়া গেল, রাধুও অপরিচয়ের সঙ্কোচ লইয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে শূন্যপথ ; পিছনে রাধুর স্মৃতি-বিজড়িত ওই আখড়ার ভগ্নস্তূপ—ওই গলিপথটা গভীর আকর্ষণ করিতেছিল, বুকে অসহ দুঃখ—রাধু নাই ! বার বার তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটির গতির আকর্ষণে চলিবার অভিপ্রায়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মূলগায়েন রাধা ছেলেটিকে সম্মুখে আনিয়া বলিল—রাধে, তুমি আগে চল। রাধারানী ! রাধু না থাক রাধারানী আছে !

কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণযাত্রার দলটি গ্রামখানি ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। গাড়ির উপরে মূলগায়েন ও কৃষ্ণ ছেলেটির পাশে সেই রাধা ছেলেটি। মন্থর গতিতে গাড়িটা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ছেলের দল উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পল্লীর মেয়েরা ঘোমটার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। বুড়াদের মনও আজ কাজে বসিতেছে না। রায়দের মুলতুবী ঝগড়াটা আজ আবার সকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মেয়ে রাধু ঘাট হইতে ফিরিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল ; বাতের বেদনা যেন চাগাইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর কানের পাশে যেন গানের সুর বাজিতেছে। চোখ বন্ধ করিলে ভাসিয়া উঠিতেছে—যাত্রার ছবি ; রাধা বলিতেছে—না—না—সখি— !

কিন্তু চোখ খুলিলে—কই ? কোথায় ?